বাংলায় বিপ্লববাদ

*　*　*

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

*　*　*

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ—কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা - ১২

মূল্য ছয় টাকা মাত্র

পরিবর্ধিত সংস্করণ : : বৈশাখ, ১৩৬১

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

মা, বাংলার বিপ্লব যুগে বাংলাকে মন্থন করিয়া বিষ ও অমৃত ভগবান উঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সে হলাহল, দুঃখ বেদনা নীরবে বাংলার মায়েদেরই আকণ্ঠ পান করিতে হইয়াছে। বাংলার ঐ যুগের ব্যথার বড় অংশই গ্রহণ করিয়াছিল বাংলার অসংখ্য তরুণ যুবকের মায়েরা। মা, তুমি আজ পরলোকে, অনেক মা-ই পরলোকে। কিন্তু ইহলোক বা পরলোকের ব্যবধান সন্তানের কাছে মাতৃত্বের মহিমাকে ছোটও করে না, অস্পষ্টও করে না। যাহাদের কথা এখানে থাকিতে অনেক শুনিয়াছ, যাহাদের জন্য একটা মস্ত দরদ নিজের বুকে পোষণ করিতে, সত্য হউক মিথ্যা হউক, যাহাদের চাইতে 'ভাল ছেলে' বলিয়া কাহাকেও মনে করিতে না, সেই বিপ্লববাদীদের প্রসঙ্গে লিখিত আমার এই 'বাংলায় বিপ্লববাদ' তোমার ও সেই সঙ্গে আর সব জীবিত ও পরলোকগত মায়েদের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম। যাঁহারা সন্তানের অত ব্যথার দান নীরবে গ্রহণ করিয়াছেন, প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই, তাঁহারা অযোগ্য হইলেও সন্তানের দান বলিয়াই 'বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রহণ করিবেন, জানি। ইতি—

১৩৩০, জ্যৈষ্ঠ (১৯২৩, মে)
কলিকাতা

তোমাদের
নলিনী

পরিবর্ধিত সংস্করণের নিবেদন

পরিবর্ধিত আকারে 'বাংলায় বিপ্লববাদ' প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের দেড় বৎসর পরেই পুনঃ-সংস্করণের তাগিদ আসে। সে সময়েই 'টেররিষ্ট সাপ্রেশান অর্ডিনান্স' জারী হয়। কোনো পুস্তক নিষিদ্ধ না হইয়াও উহা সরকারী মতে আপত্তিকর (বলা বাহুল্য, সরকারের যাহাতে আপত্তি তাহাই রাজদ্রোহপদবাচ্য হইতে বাধা ছিল না) বিবেচিত হইলেই উহার প্রকাশক, লেখক, এমন কি পাঠকও দণ্ডযোগ্য হইবে।* এই কারণে এবং নূতন সংস্করণ বাহির হইলে উহা 'নিষিদ্ধ' হইতে পারে বলিয়া এতদিন প্রকাশের ব্যবস্থা হয় নাই; আজ ২৪ বৎসর পরে ইহা প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই কথাই বলিয়াছিলাম—বিপ্লব যুগের ইতিহাস আমি লিখি নাই—লেখা সম্ভবও নহে। আজ বিদেশী প্রভুত্বের অবসান হইয়াছে, সুতরাং এখন বিপ্লববাদের ইতিহাস লেখায় বাধা নাই, এই দাবী উত্থিত হইতে পারে। কিন্তু বাহিরের বাধা না থাকিলেও এবং অসুবিধা যাহা আছে তাহা অতিক্রম করা অসাধ্য না হইলেও, আমার নিকট অন্ততঃ দুঃসাধ্য বলিয়াই মনে হইয়াছে।

ইতিহাস না রাখাই যাহাদের আদর্শ ও কর্মনীতি, প্রকাশের যাবতীয় উপাদান নিঃসংশয়ে, নিশ্চিতভাবে নষ্ট করিয়া ফেলাই ছিল যে আন্দোলনের নিষ্ঠাবান কর্মীদের আদর্শ এবং যাহা লিপিবদ্ধই হয় নাই, 'শ্রুতিমাত্র লিখি আমি' ইহা যেখানে ইতিহাস রচনার প্রধান উপাদান (এ যুগের স্মৃতিশক্তিও নানা কারণে দুর্বল এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যও নয়)—সেখানে 'বিপ্লব যুগের ইতিহাস' লিখিবার পথ অন্ততঃ আমার নিকট সুগম মনে হয় নাই। সুতরাং যাহাকে ইতিহাস বলে তাহা আমি লিখি নাই। আমি লিখিয়াছি—অন্ততঃ

* এই আইনের আওতায় কুমিল্লায় একজন যুবক দণ্ডিত হয়। আপীলে মুক্তিলাভ করে। নোয়াখালিতেও একটি যুবক বিচারে পরে মুক্তিলাভ করে। উভয় ক্ষেত্রেই বিচারকগণ 'বাংলায় বিপ্লববাদ' সম্পর্কে বলেন: পুস্তকে বিপ্লব আন্দোলনের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। উহার [illegible] আলোচিত হইয়াছে।

লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি—বিপ্লব আন্দোলনের মর্মকথা। আমার বক্তব্যের সমর্থনে ঘটনার ও ব্যক্তির পরিচয় অনেক স্থলে উপস্থিত করিয়াছি।

বিপ্লব আন্দোলনের কাল সুদীর্ঘ—১৯০৪-৫ সাল হইতে কখনও মৃদুগতিতে, কখনও প্রচণ্ড গতিতে একপ্রকার ধারাবাহিক ভাবে নেতাজীর "দিল্লী চলো" সংগ্রাম-কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ প্রায় ৪০ বৎসরের ইতিহাস।

এই বিপ্লব ইতিহাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—১৯০৫ হইতে ১৯০৮–৯ সাল পর্যন্ত—এক অধ্যায়। ১৯১০-১৯১৪ সাল পর্যন্ত এক অধ্যায়। ১৯১৫ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত আর এক অধ্যায়। এই অধ্যায়েই ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্যে ভারতব্যাপী অভ্যুত্থানের প্রয়াস। এই অধ্যায়েই জার্মানীর সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাইবার উদ্যম। ইহার পরের অধ্যায় ১৯২৩ সাল হইতে ১৯৩০ (চট্টগ্রাম) এবং ১৯৩১-৩২-৩৩-৩৪ (আন্তঃ-প্রাদেশিক-ষড়যন্ত্র) সাল পর্যন্ত। ইহার পরবর্তী অধ্যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে। সুভাষচন্দ্রের ভারত হইতে অন্তর্ধান—জার্মানীতে ভারতের মুক্তি-সেনাদল গঠন, পরে পূর্ব এশিয়ায় প্রবাসী বিপ্লবী রাসবিহারীর সহযোগে 'আজাদ-হিন্দ' বাহিনী ও সরকার গঠন, মণিপুর অভিযান, ভারতের পবিত্র ভূমিতে স্বাধীন ভারতের পতাকা স্থাপন (ইহার সুবিস্তৃত ইতিহাস এন. জি. গান্‌পুলে, গিরিজা মুখার্জী, এ. সি. চাটার্জী, শা' নওয়াজ প্রভৃতির গ্রন্থে আছে)। ১৯৪২ সালের মহাত্মাজীর 'ভারত ছাড়' দাবীতে ভারতব্যাপী নিরস্ত্র জনতার প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও জাতীয় বিক্ষোভ গণ-বিপ্লবেরই অভিনব রূপ।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম প্রকাশ্য বিদ্রোহ, উহার দলিলপত্র আছে, 'রোজনামচা' আছে—উহার ইতিহাস লেখা চলে: সংক্ষেপে উহার ইতিহাস এই গ্রন্থে আমরাও দিয়াছি। কিন্তু ১৯০৫ হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত অসংখ্য বিপ্লবকর্মীর কার্যের ইতিহাস লেখাই দুঃসাধ্য। বিপ্লবীদের দল একটি নহে। যদিও উদ্দেশ্য সকলেরই এক, কর্মনীতিও মোটামুটি এক, তথাপি গুপ্ত দলগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র নেতৃত্ব থাকায় কোন দলের নেতা বা কর্মীর পক্ষেই সকল সংবাদ জানা সম্ভব নহে—বিশেষতঃ গুপ্ত কার্য-কলাপের কথা। ইতিমধ্যে অনেক বিপ্লবীর মৃত্যু ঘটিয়াছে, নেতৃত্ব বদল হইয়াছে। কম করিয়া বা বেশী করিয়া বলা, জানিয়া বা না জানিয়া কথা বলা, শোনা কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া ইত্যাদি নানা সমস্যা আছে।

বহু বিপ্লবীর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে দেখাসাক্ষাৎ করা সম্ভব হইলে এবং বিভিন্ন দলের নেতৃস্থানীয়গণ যথাসম্ভব স্মৃতিশক্তি হইতে ঘটনার বিবৃতি দিয়া গেলে,—এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পরস্পর-বিরোধী উক্তিগুলির সমাধান করা ও 'স্মৃতি' হইতে কথিত ব্যাপারগুলির সত্যতা সমসাময়িক দলিল-পত্র (যদি কিছু থাকে) হইতে যাচাই করা যদি সম্ভব হয়, তবে বিপ্লব-ইতিহাস লেখার দুঃসাধ্য কাজ অনেকটা সফল হইতে পারে। এই জন্য যে শ্রমসাধ্য প্রয়াস ও দীর্ঘ সময়-দান একান্ত অপরিহার্য তাহা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। তাই এই সংস্করণে যদিও বহু ঘটনার ও বহু বিপ্লবী-চরিত্রের সমাবেশ করা হইয়াছে, তথাপি ইহা ইতিহাস নহে। তবে ঘটনার প্রাণ, তাৎপর্য ও অভিপ্রায় ধরিয়া রাখাও ইতিহাসের বড় কাজ। এই সংস্করণে আমি সেই চেষ্টাই করিয়াছি। বিপ্লব আন্দোলনের মর্ম উদ্ঘাটন করিয়া দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। ইতিহাসের কথায় প্রসঙ্গতঃ বলিতে পারা যায়—বিদেশে বিপ্লবীদের প্রয়াস সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী দাবী ও কথা আছে। সাক্ষাৎ আলাপ করিয়াও হতাশ হইয়াছি। ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করিতেও সাক্ষাৎ জ্ঞান অপেক্ষা শোনা কথা এবং স্বীয় রুচিসম্মত কথা বলিতে সকলে দ্বিধাবোধ করেন না। যে সকল পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতেও নিঃসংশয় হওয়া যায় না, অনেকগুলিই ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা। সুতরাং সাহায্য গ্রহণ নিরাপদ নহে।

বৃটিশ শাসনের কালে বাধা-বিঘ্ন ছিল, আইনের ভয় ছিল। বিপ্লবের 'পাইওনিয়ার'গণের কেহ কেহ আত্মকাহিনী এবং স্মৃতিকথা সে সময়ে যাহা লিখিয়াছেন—তাহা উপভোগ্য সন্দেহ নাই—লেখকগণের যোগ্যতাও আছে; কিন্তু তাহা আত্মকাহিনীমূলক সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র। অপর একজন (শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগো) সমগ্র বিপ্লব-প্রচেষ্টাকেই ধিক্কার দান করেন এবং বিপ্লব-কর্মীদের ও নেতাদের 'বুজরুক' ও দুর্বলচিত্তের লোক বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোন বিপ্লবী নেতা উহার প্রতিবাদে অগ্রসর হন নাই। হয়তো আইনের বাধার জন্য প্রতিবাদ বিপজ্জনক বলিয়া, অথবা গোপনতাই আবশ্যক বলিয়া কেহ প্রতিবাদ করেন নাই। 'বাংলায় বিপ্লববাদে'র দ্বিতীয় সংস্করণে উহার প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। গোটা আন্দোলনের দিক হইতে উহার প্রতিবাদের প্রয়োজন আছে—সেই কারণে বর্তমান সংস্করণেও উহাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমানে বিপ্লব-প্রয়াসের গুণগান করাও আর বিপজ্জনক নহে। যাহা সেকালে লেখা বা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই তাহা আজ লেখা যায়, প্রকাশ করা যায়। সুতরাং আমাকে বন্ধু-বান্ধবগণ 'বাংলায় বিপ্লববাদ' সেইভাবেই সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লিখিতে বলেন। কিন্তু আমি তাহা সঙ্গত মনে করি নাই। তাহার কারণ, বিপ্লবীদের সম্পর্কে ও বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে যে কথা বলা তখন (১৯২০ সালে) বিপজ্জনক ছিল, 'বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থে—আইনের গণ্ডিতে থাকিয়াই—পরম শ্রদ্ধার সহিত সে সকল কথা তখনই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল, অর্থাৎ সমগ্রভাবে বিপ্লবীদের পরিচয় ঐ বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও দিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাঁহাদের প্রচেষ্টার স্বরূপ এবং তাঁহাদের প্রেরণাকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া যেভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহার একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যিক মূল্য আছে। যাহা প্রকাশ করিয়া লেখা যায় না—অথচ যাহা প্রকাশ করিতেই হইবে, দেশবাসীকে বুঝাইতে হইবে, যাহাদের কর্মনীতিকে প্রশংসা করায় বিপদ আছে, অথচ যাহাদের প্রশংসা না করিয়া পারি না, তাহা যদি প্রকৃত পক্ষেই পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয় তাহা হইলে প্রকাশভঙ্গির একটা স্বতন্ত্র মূল্য দাঁড়ায়। 'বাংলায় বিপ্লববাদে'ও হয়তো তাহা আছে, তাই আজ সুযোগ পাইয়াছি বলিয়া সেদিনের এই প্রয়াসচিহ্নকে নষ্ট করিতে চাহি নাই।

আইনের আওতায় পড়িয়া পুস্তক নিষিদ্ধ হইয়াছে অনেক। তাহা স্বতন্ত্র কথা। আইনের বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও 'বাংলায় বিপ্লববাদ' লিখিত হইয়াছিল, বিপ্লব-প্রয়াস ও বিপ্লবীদের ছোট না করিয়া। পুস্তকের সেই ভাষা, বক্তব্য বিষয় ও প্রকাশভঙ্গি আমি বর্জন করি নাই। উহার সাহিত্যিক মূল্য যদি কিছু থাকে তাহা থাকুক, ইহাই আমি চাহিয়াছিলাম। তবে সে সময়ে যেখানে নাম প্রকাশ করি নাই গোপনতার প্রয়োজনবোধে—বর্ত্তমানে সে সব স্থলে কতক কতক নামগোত্র স্থান পাইয়াছে।

বাংলার বিপ্লব-প্রয়াস—সমগ্র ভারতেরই বিপ্লব-প্রয়াস। বাংলার বিপ্লববাদীরা সর্বভারতেই বিপ্লব ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন, কারণ বৃটিশ প্রভুত্ব সমগ্র ভারতেই দৃঢ়মূল ছিল। একটি প্রদেশের ক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ সেকারণে অকেজো হইতে বাধ্য, আঘাত হানা চাই বৃটিশ শাসন-শক্তির মূলকেন্দ্রে। বাংলার বাহিরের বিপ্লব-প্রয়াস বাংলার বিপ্লব-প্রয়াসের সহিত জড়িত। এই সংস্করণে বাংলার বাহিরের বিপ্লব-প্রয়াসের পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু 'বিপ্লববাদ' প্রকৃতপক্ষে

'বাংলার বিপ্লববাদ', অর্থাৎ বিপ্লব-আদর্শ এবং উহার দর্শন বাংলার মৃত্তিকায় সৃষ্ট, পুষ্ট এবং পরিণত হইয়াছে। যদিও উহার আবেদন নিঃসংশয়ে সর্বভারতীয়, তথাপি উহার বৈশিষ্ট্য বাংলার। তাই পুস্তকের নাম যদিও 'বাংলায় বিপ্লববাদ' তথাপি ইহাতে প্রাদেশিকতার কোন সম্পর্ক নাই। তাহা গ্রন্থের আলোচনা ও বক্তব্য বিষয় হইতে সুস্পষ্ট হইবে। মহারাষ্ট্রে ও পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রয়াসের ইতিহাস আছে। মহামতি তিলকের অবদান স্বতন্ত্র বস্তু। কিন্তু ভারতের অন্যত্র খণ্ডিত ও সাময়িক বিপ্লব-প্রয়াস, উগ্রতম কর্মানুষ্ঠান ও বহু ব্যক্তির বীরত্ব থাকিলেও, ছিল না 'বিপ্লববাদ'। বাংলাদেশই সমগ্র ভারতের বিপ্লববাদের দ্রষ্টা, স্রষ্টা ও পোষক। ইহা না বুঝিলে, কেন মহারাষ্ট্রে উহা মুষ্টিমেয় কয়জনের মধ্যে থাকিয়া শেষ হইয়া গেল—অন্যত্রও সাময়িক প্রয়াসে পর্যবসিত হইল, আর কেনই বা বাংলার বিপ্লব-প্রয়াস ৪০ বৎসর কাল চলিতে পারিল, কি কারণে বাংলার যুবকগণ এত অধিক সংখ্যায় দীর্ঘদিন ধরিয়া বিপ্লবনিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারিয়াছিল তাহা সম্যক্ বুঝা যাইবে না।

রাসবিহারীর সম্পর্কে বহু কথা প্রকাশিত হইয়াছে—তাঁহার পত্র ও 'আত্মকথায়', গভর্ণমেণ্টের বিবরণীতে, শচীন সান্ন্যালের 'বন্দীজীবনে'—রাসবিহারীর অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ শ্রীমতিলাল রায়ের লেখনীতে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে রাসবিহারীর সম্পর্কে যাহা জানা সম্ভব ছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিষয়েও বহু পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাই বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রেরই পরিচয় দিয়াছি। ইহার কতক অজ্ঞাতই ছিল। সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধেও কতক ব্যক্তিগত জ্ঞানের কথা স্থান পাইয়াছে। নূতন সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিকালে বিপ্লবনিষ্ঠ অনেকের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। তাহার কতকগুলি এমনই বিচিত্র এবং বলিষ্ঠ বিপ্লবীচরিত্রের নিদর্শন যে প্রতিপাদ্য বিষয়ের দৃষ্টান্তরূপে দুই-চারিটি উল্লেখ না করিয়া পারি নাই।

বলা বাহুল্য—ঐগুলিকে ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ না করিয়া বিপ্লবী চরিত্ররূপে বুঝিতে হইবে। আরও অনেক চরিত্র সংগ্রহ করিয়া অঙ্কিত করা যাইত। কিন্তু আমার সময় ও সুযোগ হয় নাই।

এই নূতন সংস্করণ প্রকাশের জন্য কাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, কাহার নিকট করিব না—বুঝিতেছি না। বহু পুরাতন বিপ্লবী নেতা ও কর্মীর নিকট হইতে বহুবিষয়ে জানিয়া লইবার ও যাচাই করিবার সুযোগ হইয়াছে—

সুতরাং তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা চলে, কিন্তু এই পুস্তক লিখিতে বসিয়াই অনুভব করিয়াছি, শত শত জানা অজানা বিপ্লবী 'আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা'—তাঁহাদের ঋণ কেমন করিয়া শোধ করিব ? এ যে তাঁহাদেরই জীবনদানে জীবনলাভের ইতিহাস ; ইঁহাদের সকলের কাছেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হয়। তাই দু-চার-দশজনের নিকট ঋণ স্বীকার করিব না—সমগ্র বিপ্লব আন্দোলনের ছোট বড় সকল কর্মীর ও নেতার নিকট ঋণ স্বীকার করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বলিয়াছি—বিপ্লব সংস্থাগুলির কোন নিজস্ব ঐতিহাসিক দলিলপত্র নাই। বিপ্লবী দল ও তাহাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকারী দলিলপত্র কিছুটা আছে। সরকারী দলিলপত্রের সাহায্যে সিডিশন কমিটি ১৯০৬ হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত বিপ্লবীদল ও উহাদের কার্যকলাপের যে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিপ্লব ইতিহাসের অনেকটা প্রামাণ্য দলিল ও উপাদানরূপে গণ্য হইবে। বিশেষতঃ 'সিডিশন কমিটি'র পক্ষে কোন ব্যক্তি বা দল সম্পর্কে কোন পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন ছিল না। তাঁহাদের দৃষ্টিতে সকলেই 'শত্রু'—তাঁহারা অনেকটা নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়াই বিভিন্ন দলগুলিকে সমগ্রভাবে দেখিয়াছেন। তবে, কতকগুলি বিষয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও জানা (তখন পর্যন্ত) সম্ভব ছিল না। সে কারণে সিডিশন কমিটির বিবরণীতেও তাহার উল্লেখ নাই বা ভুল আছে। তথাপি ইহা প্রামাণ্য দলিলের মতই মূল্যবান।

[প্রসঙ্গতঃ এইখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি ; এই সংস্করণের ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—'বিপ্লবের নূতন টেকনিক্ লইয়া মহাত্মাজী দেখা দিলেন···স্বতন্ত্রভাবে ইহার আলোচনা করিব।' কিন্তু উহার আলোচনা অনেক দীর্ঘ হওয়ায় এবং আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় বলিয়াও এই গ্রন্থে উহা সন্নিবেশিত করিলাম না। স্বতন্ত্রভাবে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।]

ইতি—
বিনীত
গ্রন্থকার

কলিকাতা
বৈশাখ, ১৩৭১

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'বাংলায় বিপ্লববাদ' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পাঠকদের এবং প্রকাশকের যথেষ্ট চাহিদা ও তাগিদ থাকা সত্ত্বেও আমারই সময়াভাবে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় এই সংস্করণ প্রকাশে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল।

বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের মর্মকথাটি প্রকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, প্রথম সংস্করণে সেই চেষ্টাই করিয়াছি, দ্বিতীয় সংস্করণেও তাহাই করা হইয়াছে। সেই মর্মকথাটি—তাহাদের কর্ম, চেষ্টা, ত্যাগ, দুঃখ, ভুল, ভ্রান্তি সকলের অন্তরালে দেশসেবার পরম আকুতি। তাহাদের বাহিরের প্রকাশের অন্তরালে যে তত্ত্ব ও সত্য ছিল তাহার যথার্থ পরিচয় দিতে হয়তো সক্ষম হইয়াছি, হয়তো হই নাই; কিন্তু দেশকে স্বাধীন করিবার আকুল আগ্রহে যে তাহারা ঘর ছাড়িয়াছিল, পথে পথেই বাসা বাঁধিয়াছিল সঙ্গীর অদর্শনে, পতনেও পথ ছাড়িয়া গৃহে ফেরে নাই, পথের কণ্টকে রক্তাক্ত চরণ বিদ্ধ করিয়াছে—আন্দোলনের এই মর্মকথাটিই বক্তব্য, তাহাই বলিয়াছি।

ইতিহাস লিখিবার মত করিয়া 'বাংলায় বিপ্লববাদ' লিখি নাই, তাই ব্যক্তি ও ঘটনার হিসাব যথাযথ ভাবে করি নাই, অনাবশ্যক বলিয়াই করি নাই। আমার বক্তব্য বিষয়টি, বিপ্লব আন্দোলনের মর্মকথাটি, প্রকাশ করিতে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই 'ব্যক্তি' ও 'ঘটনা'র আশ্রয় লইয়াছি।

বর্তমান সংস্করণে কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, বহু বিষয়বস্তুও বাড়িয়াছে।

কলিকাতা
মাঘ—১৩৩৬
ইংরাজী—১৯২৯

বিনীত
গ্রন্থকার

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

'বাংলায় বিপ্লববাদ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। সাপ্তাহিক 'শঙ্খে' ইহার কতকটা বাহির হইয়াছিল, সম্পূর্ণ হয় নাই। বিপ্লবযুগের ঠিক ইতিহাস আমি লিখি নাই। লেখা সম্ভবও নহে। বিপ্লববাদের অনেক খবরই নানাভাবে প্রচারিত হইয়াছে। সংবাদপত্র ও পুলিশের রিপোর্ট, প্রচলিত জনরব, কোন কোন রাজনৈতিক মামলার বিবরণী, বিপ্লব যুগের স্বীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং 'রাওলাট কমিটি'র (সিডিশন কমিটির) রিপোর্ট প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া বিবৃত ঘটনাগুলি সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। কোথাও ভুল থাকিতে পারে,—তবে তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি হইবে না, কারণ আমি যাহা দেখাইতে চাহিয়াছি তাহা ইতিহাস নহে, বিপ্লববাদের অন্তর্নিহিত কতগুলি ভাব। অনেকেই বিপ্লবযুগকে সরাসরি ভাবে বিচার করিয়া, সেটা ভাল কি মন্দ, ইহা এক নিঃশ্বাসেই বলিয়া ফেলে, কিন্তু বিষয়টা সত্যই অত সহজে ধরা যায় না। প্রকাশটাই সংসারে সবখানি কথা নহে—প্রকাশের অন্তরালেও সময়ে সময়ে অনেক সত্য আত্মগোপন করিয়া থাকে—সে কথা না জানিলে, যাহা প্রকাশ হইয়াছে, তাহারও সত্যকার রূপকে ধরা যায় না। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই বিপ্লববাদের তথা বিপ্লবযুগের কতগুলি দিক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বিপ্লবযুগকে ভাল বা মন্দ বলিবার কোন উদ্দেশ্য লইয়া এই গ্রন্থ লিখিত নহে। গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য—ভুল ভ্রান্তি, দোষগুণ সহ দেশবাসীর কাছে বিপ্লবযুগকে পরিচিত করা। যাঁহারা সে যুগকে নিছক প্রশংসা করেন, আর যাঁহারা সে যুগকে নিছক নিন্দার্হ মনে করেন, তাঁহারা সেই যুগের সত্যকার পরিচয় পাইলে, প্রশংসা করিতে বা নিন্দা করিতে হয়তো আর একটু বিবেচনা করিবেন।

বাংলার বাহিরের বিশেষ কোন কথা আমি লিখি নাই। বাংলার বিপ্লববাদীদের কথাই আমি প্রধানতঃ বলিয়াছি। ব্যক্তিগত ভাবে কোন বিপ্লববাদীর জীবনকথা বলি নাই। সমগ্র ব্যাপারটাকে ফুটাইয়া তুলিতে স্থানে স্থানে ব্যক্তিগত দুই চারিটা কথা বলিয়াছি মাত্র।

বিপ্লববাদীদের জেলভোগের কোন পরিচয় দেই নাই, তবে জেলভোগটা কে

কেমন ভাবে গ্রহণ করিত তাহার পরিচয় দিতে, ঢাকা জেলের কথা সামান্য আলোচনা করিয়াছি। পলাতক নলিনী বাগচীর কথা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাকড়াসী লিখিত বিবরণী হইতে গ্রহণ করিয়াছি। সিডিশন কমিটির রিপোর্ট হইতেও অনেক সাহায্য পাইয়াছি। পরিশিষ্টে লিখিত 'অভিযোগের কথা' Modern Review, Amrita Bazar Patrika ও Englishmanএ প্রকাশিত তদন্ত কমিটির মন্তব্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। ইহাদের সকলের নিকটই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩০
কলিকাতা
ইংরাজী—মে, ১৯২৩

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা	...	১
বাংলায় মাল-মশলা ছিল	...	৪
রুশ-জাপান যুদ্ধের প্রভাব : পলাশীর পর দেড়শ বছর	...	৬
সূচনা	...	১১
বাংলায় দেশাত্মবোধের বৈশিষ্ট্য	...	১৬
স্বদেশী ও সাহিত্যে যোগাযোগ	...	২৫
স্বদেশী আন্দোলন দমনের প্রয়াস	...	৩৫
নানা ভাবের লোক-সমাগম	...	৩৭
বিপ্লবের প্রথম অঙ্ক	...	৪০
গুপ্ত ধারা : সমিতির দুর্দিন	...	৪৩
মামলা : জেলের এক অধ্যায় : জেল-বৃত্তান্ত	...	৪৯
মামলায় ফল হইল না	...	৬৩
আপন জনে ছাড়বে তোরে	...	৬৭
স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী	...	৭৩
কাজের পরিচয়	...	৭৮
গোপন ও অখ্যাত জীবন	...	৮৪
ডাকাতির কথা—বাহ্রা ও ট্যাক্সি ডাকাতি	...	৮৮
খুনের কথা	...	১০৯
সংস্থা বিস্তার—পুলিশী তৎপরতা	...	১১৭
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতে বিপ্লব-প্রয়াস	...	১২৬
গদর পার্টি ও কোমাগাটামারু	...	১৩২
জাপানে রাসবিহারী	...	১৪৩
জার্মান ষড়যন্ত্র অধ্যায়	...	১৪৮
বিপ্লবকর্মের ক্রমপরিণতি : ভয়ভাঙা : উগ্রতম প্রয়াস	...	১৬৩
বিপ্লবী বি-ভি দলের প্রচণ্ডতম প্রয়াস	...	১৬৮

বিষয়		পৃষ্ঠা
বিপ্লব-প্রচেষ্টার দ্বিতীয় পর্যায় : সংক্ষিপ্ত খতিয়ান	…	১৭৫
ঘটনাবলীর দিনপঞ্জী	…	১৮৫
"বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা" গ্রন্থের সমালোচনা	…	২০২
দ্বিতীয় পর্যায়ের দিনপঞ্জী	…	২২২
বিপ্লবী অবনী মুখার্জী সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত	…	২৩৪
বিনয় সরকারের সার্টিফিকেট	…	২৪১
বার্লিনে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ ও কমিটি গঠন	…	২৪৩
নূতন পর্যায়	…	২৪৬
চট্টগ্রামের প্রচণ্ডতম প্রয়াস	…	২৫১
সূর্য সেনের ফাঁসির পর	…	২৬৪
সমালোচকের দৃষ্টিতে বিপ্লবী	…	২৬৬
যতীন্দ্রনাথ ও বালেশ্বরের খণ্ডযুদ্ধ	…	২৭৩
রডা বন্দুক চুরির ব্যাপার	…	২৭৬
গৌহাটি খণ্ডযুদ্ধ সম্পর্কে নলিনী ঘোষের বিবৃতি	…	২৭৮
আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা	…	২৮১
টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা	…	২৮৪
বাঙ্গালার বাহিরে বিপ্লব-প্রচেষ্টা	…	২৮৫
বিপ্লবী সংগ্রাম-নিষ্ঠা—যোগেশচন্দ্র ও পূর্ণানন্দের বিবৃতি	…	২৯১
সোহনলাল পাঠক : গারলিকের হত্যাকারী কানাই	…	৩০৪
অত্যাচারের কবলে বিপ্লবী	…	৩০৬
বাংলার বিপ্লবদলের ইতিকথা	…	৩১৩
বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র	…	৩৩০
জার্মানীতে সুভাষচন্দ্র : অন্তর্ধানের পূর্বে : অপূর্ব অন্তর্ধান	…	৩৩৩
অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার : ভারতে নেতাজীর দূত	…	৩৪২
সুভাষবাবুর সংবাদ-সংগ্রহ-ব্যবস্থা : সুভাষচন্দ্রের আত্মবিশ্বাস	…	৩৪৫
যাহারা প্রাণ দিল কিন্তু কেহ মনে রাখিল না	…	৩৪৯
পরিশিষ্ট—বিবিধ কথা	…	৩৫২

উপক্রমণিকা

বাংলার কবি শিখ জাতির ইতিহাস ঘাঁটিয়া একটি সত্য পাইয়াছিলেন। ছন্দো-বন্ধে তাহাই ফুটাইয়া লিখিয়াছেন :—

"এসেছে সে একদিন,
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ,
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।"—

কবিরই জীবনকালে, তাঁহারই স্বদেশে—প্রদেশে, এই কথাটা সার্থক হইল, ছন্দঃ মূর্ত হইয়া উঠিল। "লক্ষ পরাণে—শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ"—সে সত্য যে কেমন ধারার, বিপ্লববাদীদের জীবন-মরণ খেলায় দেশবাসী তাহাই প্রত্যক্ষ করিলেন।

এমন আপন-ভোলা, এমন হিসাব-নিকাশে অবুঝ অনভিজ্ঞ মানুষ—যাহারা দেশকে পাইয়া আপন ভুলিয়াছিল, রাখিয়া ঢাকিয়া কিছু করিতে পারে নাই, দেশের হিসাব-নিকাশ বুঝিতে গিয়া আর সব হিসাব-নিকাশ ছাড়িয়া দিয়াছিল,—গুণিয়া গুণিয়া পা না ফেলিয়া যাহারা একেবারে মৃত্যুর দ্বারে গিয়া অমৃত সন্ধানের পাঁয়তারা অভ্যাস করিয়াছিল, যাহারা নামের ব্যাধিকে মন্ত্রগুপ্তিতে নিঃশেষ করিয়াছিল, প্রকাশকে লুকাইয়া উপেক্ষা ও অবহেলা করিয়াছিল, তাহাদের এই মৃত্যু-রঙ্গের জীবন-খেলা কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। সেই অজ্ঞাত অথচ কর্মবহুল জীবন-ভঙ্গীর একটু ছায়াচিত্রও তো কেহ রাখে নাই! আর সত্য সত্য তাহা রাখাও যায় না। যাহাদের খবর তাহাদের কাছ হইতে না পাইলে পাওয়া যায় না, ভাইবন্ধুও যাহাদের জীবন ও গতির সহিত অপরিচিত বা উহার পরিচয় রাখে নাই, দেশবাসী দূর হইতে যাহাদের শুধু লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু পরিচয় লইতে সাহসী হয় নাই, যাহাদের আপন জনে ছাড়িয়াছিল অথচ যাহারা সেই আপন জনেরই মুক্তি ক্রয় করিতে, আপন জন হইতে দূরে, দূর হইতে দূরে, তাহাদের জ্ঞানের বাহিরে গিয়াই মুক্তি সাধনায় লিপ্ত ছিল—তাহাদের ইতিহাস লেখা চলে না; আমরাও সে ইতিহাস লিখিব না। যাহারা ঘরে বাহিরে লাঞ্ছিত হইয়াও সেই লাঞ্ছনাকেই তাহাদের সান্ত্বনার বস্তু করিয়া তুলিয়াছিল, যাহাদের লাঞ্ছনাকে দেশবাসী উৎসাহিত করিয়—সম্মান করিয়া সহ্য করিবার মত গৌরবের সামগ্রী

করিয়া তুলে নাই, যাহাদের অগ্রপশ্চাতে cheering crowd জয়ধ্বনি করে নাই—যাহারা জেলে বা নির্বাসনে যাইতে বা তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে দেশবাসীর বাহবা পায় নাই,—হয়তো খুব বেশী হইলে, খবরের কাগজে শুষ্ক একটু খবর (news) মাত্রই বাহির হইয়াছে—ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিলেও যাহাদের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিবার সামর্থ্যও দেশবাসীর হয় নাই,—বুদ্ধিমান অভিজ্ঞদের কথায়, যাহারা কেবল ভুলই করিয়াছে,—সেই ভ্রান্ত-পথের মৃত্যু-যাত্রী এমন অদ্ভুত মানুষগুলির কথা কেমন করিয়া বলিব ?

যাহারা নির্বাসন, জেল ও দ্বীপান্তরবাস হইতে রুগ্‌ণ, ভগ্ন-দেহে, দেশে কোনরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি না করিয়া, নীরবে, দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ মাত্র না করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই নিন্দা-প্রশংসার অতীত মানুষগুলির কথা আজ কেন লিখিতে বসিলাম, সে কৈফিয়ৎ দিতে হয় পরে দিব, তবে তাহাদের কথা জানা ও শোনা ভাল, তাহাতে এই নাম-যশের কাঙ্গাল আমাদের মঙ্গল হইবে।

বাংলার বিপ্লববাদীদের, দেশবাসী সাধারণ ভাবে সন্ত্রাসবাদী অথবা অরাজকপন্থী আখ্যা দিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজ রাজ-কর্মচারীরা, তাহাদের কার্য-কলাপ ব্যাপকভাবে জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন—ইহারা কেবল এ্যানার্কিষ্ট, টেরোরিষ্ট নহে, ইহারা স্বাধীনতাপ্রয়াসী—বিপ্লববাদী।

বাংলার বিপ্লববাদীরা হয়তো ভুল করিয়াছিল, হয়তো ভ্রান্ত ধারণায় পরিচালিত হইয়াছিল, কিন্তু এ-যুগে স্বাধীনতার মূর্তি তাহারা যে অন্ততঃ কল্পনা করিতে পারিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহারা যাহা চাহিয়াছিল, সেজন্য তাহারা কতখানি দিতে পারিয়াছে, কতখানি দিতে পারে নাই, কতখানি ব্যর্থ হইয়াছে, কতখানি সফল হইয়াছে, তাহা জানিতে হইলে, তাহাদের ভিতরকার সত্যটির অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহাদের বাহিরের প্রকাশটার অন্তরালে কোন্ বস্তুটি লুকাইয়া আছে, তাহার সন্ধান পাইলেই বুঝা যাইবে ইহার কতখানি সত্য কতখানি মিথ্যা। একেবারে লুকাইয়া লুকাইয়া, কাহাকেও জানিতে না দিয়া, মৃত্যুর দ্বারে গিয়াও যাহারা আত্মগোপন করিতে পারে, তাহাদের ঐ গোপন ব্যাপারটির মধ্যে কেবল কি সৎসাহসের অভাবজনিত ভীরুতার গ্লানিই রহিয়াছে, না আরো কিছু আছে, তাহাও আমাদের জানিতে হইবে। এই জানায় আমরা কতখানি শিখিতে পারিব, কতখানি ভুলিতে পারিব, তাহার বিচার পরে করা যাইবে।

এমন ঘটনাও জানা গিয়াছে, উভয় পক্ষের (পুলিশ ও বিপ্লববাদী) সাক্ষাতের

ফলে দুইদিকেই গুলি চলিল……বিপ্লববাদী আহত অবস্থায় হাঁসপাতালে শায়িত —পুলিশ নাম জানিতে ব্যগ্র—dying declaration, মৃত্যুকালীন জবানবন্দী চাহে।

মৃত্যুশয্যাশায়ী বিপ্লববাদী অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া আছে। অপরে যাহাই জানুক, সে নিজে জানে, দেশহিত-ব্রতে উদ্বুদ্ধ হইয়াই সে আজ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে। তাহার এই ধারণার মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনার লেশমাত্রও নাই। জীবনের এমন শেষ সময়ে সাধারণ ব্যক্তি আত্মগোপন করিতে পারে না, বরং আত্মপ্রকাশ করিয়া যায়। ইচ্ছা হয় তাহার কার্যাবলী দেশবাসী সম্যক বুঝে। যাহাদের জন্য সে মরিতেছে তাহারা আজ জানুক যে, তাহাদের জন্যই সে প্রাণপাত করিল। এমন ধারার ইচ্ছাই সাধারণ মানুষের হয়। কিন্তু বাংলার বিপ্লববাদীদের আত্মগোপনভঙ্গী সাধারণ নহে; শিক্ষা ও সাধনা ভিন্ন তেমন আত্মগোপনে সামর্থ্য আসে না। মৃত্যুর সময়েও ইচ্ছা নাই কেহ তাহাকে জানুক, কেহ তাহার 'মূল্য' বুঝুক—কোন message (বাণী) নাই, "unwept, unhonoured, and unsung"-ই সে যাইতে চাহে!

তাই মৃত্যুশয্যাশায়ী বিপ্লববাদীর ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর বাহির হইল, Don't disturb, let me die peacefully :—বিরক্ত ক'র না, আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।

একবার স্থির হইয়া, এমন মৃত্যুর মহিমার কাছে আমাদের নামযশের আকাঙ্ক্ষার কথা ভাব, আর বুঝিতে চেষ্টা কর, কেমন করিয়া তাহারা আত্মবিনাশ করিয়াছে, জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিয়া সংসার হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, প্রতিষ্ঠার একবিন্দু কামনাও রাখে নাই। মৃত্যুর দ্বারে যেখানে প্রকাশের কোনও ভয় নাই, সেখানে গিয়াও খ্যাতিকে প্রত্যাখ্যান করিয়া শান্তিতে মরিয়াছে। নিজের কর্মে নিজের তৃপ্তি হইয়াছে, তাই অপরের অপেক্ষা না রাখিয়াই আত্মপ্রসাদের শান্তিতে মরিতে চাহে—জগতে আর চাওয়ার কিছুই নাই, কেবল দেওয়ারই সে মালিক। এই আত্মগুপ্তিকে কি বলিব? যাঁহা বলিতে হয় বল, কিন্তু ইহা অপূর্ব!

এই "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" লোকগুলির চরিত্র যে কেমন করিয়া এমন অদ্ভুত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা বাংলার বিপ্লববাদের ক্রমবিকাশের ধারা জানিতে পারিলে, বুঝা যাইবে।

১

বাংলায় মাল-মসলা ছিল

একটা জাতির উঠা-পড়া, বাঁচা-মরা কাহারো অনুগ্রহে হয় না, নিগ্রহেও হয় না; সে বাঁচা-মরার একটা নিয়ম আছে; সেই নিয়মের ব্যতিক্রমে আমরা মরিও নাই, বাঁচিবও না।

মৃত্যুকে বরণ করিয়া অনেক জাতি বাঁচে, আবার বাঁচাকে আঁকড়াইয়া থাকিয়া অনেক জাতি মরে। ভোগকে ত্যাগের দ্বারা সত্য করিয়া তুলিতে হয়; সেই খবর না জানিলে, ভোগ সম্ভব হয় না। উপনিষদে আছে, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।'

স্বদেশীযুগের বাঙ্গালী ত্যাগের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিল। সেই ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই বাংলার যুবজন শেষে বিপ্লবাগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সেই আগুনের খেলায় জাতিহিসাবে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী সায় দেয় নাই।

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ ইহাদেরই উদ্দেশ করিয়া ১৯১৯ সালে বলিয়াছিলেন—Who in their eagerness for political progress have broken the law—অর্থাৎ "রাজনৈতিক অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষায় যাহারা আইন ভঙ্গ করিয়াছে"। কিন্তু সেই 'আইন ভঙ্গ' যে কেমন ধারার তাহা অনেকেই জানে না।

বাংলায় বিপ্লববাদ মুখ্যতঃ ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা প্রচারিত হইয়া সাধারণতঃ নব্য বাঙ্গালী সমাজে বিস্তৃত হইয়াছিল; তাহা অতিক্রম করিয়া বাংলার সাধারণ মনকে সমভাবে উদ্দীপ্ত করে নাই, করিতে পারে নাই।

তবে জাতীয় জীবনে উহার ব্যাপকতা অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রীয় বিপ্লব একটা জাতিতে হঠাৎ সম্ভব হইয়া উঠে না, তাহার গোড়ায় আরো অনেকখানি কথা থাকে। বাংলাদেশে বিপ্লব আরম্ভ হইত না, যদি বিপ্লবের যোগ্য মন বাংলার শিক্ষিত সমাজ পূর্বাহ্লেই প্রস্তুত করিয়া না রাখিত। 'স্বদেশীর'ও বহুপূর্বে মনের দিক দিয়া বাঙালী 'বিপ্লববাদী' হইয়া পড়িয়াছিল। এই খবরটি না রাখিলে বাঙালীকে কিন্তু সম্যক বুঝা যাইবে না। ধর্মে, সমাজে, শিক্ষায় সেই বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বাঙালীর মনেই সর্বপ্রথম এই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষাও ব্যাপকভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল। মহারাষ্ট্রে বিপ্লবচেষ্টার ইতিহাস আছে। ১৮৭৪

সালেই তাহা দেখি। সুতরাং 'বাংলার মনে সর্বপ্রথম' এই উক্তি অত্যুক্তি মনে হইবে। কিন্তু আমরা তাহা মনে করি না। কারণ যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে।

ঐ যে নদীয়ার আঙিনায় গৌরাঙ্গটি নাচিয়াছিলেন, তাঁহার প্রভাবে বাঙালীর সাহিত্য সমাজ ও ধর্ম যে বিচিত্র নবীন রাগে রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল—মানুষকে শ্রেষ্ঠ করিয়া দেখিবার যে গণ্ডি-কাটা গতি সে যুগে বাঙালীকে পাগল করিয়াছিল—আজিকার বাঙালীর সেই সন্ধান রাখারও প্রয়োজন আছে। তাহার পরবর্তী যুগে রামমোহন, রাজনারায়ণ ও বিদ্যাসাগর পুরাতনের বন্ধনকে ভাঙ্গিবার যে আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন,—মুক্তির জন্য এই যে সে যুগের ব্যাকুলতা, এই যে বন্ধনকে, অবসাদকে, হীনতা ও মিথ্যাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও শিক্ষায় বিদ্রোহ—ঐখানেই বিপ্লবযোগ্য মনের পত্তন। একদল বাঙালী 'স্বদেশীযুগে'[১] এই মনের জোরেই বিপ্লব পথে ছুটিয়া রাষ্ট্রীয় মুক্তি অর্জন করিতে চাহিয়াছিল। ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও সাহিত্যে যখন মানুষ মুক্তিকে চাহে, তখন সকল সময় সে মাত্রা ঠিক রাখিয়া চলিতে পারে না; মুক্ত হইবার ব্যাকুলতায় সে গণ্ডি-ভাঙ্গিয়াও চলে।

নব্য বাংলায় সেই গণ্ডি-ভাঙ্গার যুগ ঠিক কবে আরম্ভ হইয়াছিল বলা না গেলেও একথা বলা চলে যে ডিরোজিও, রামতনু, রাজনারায়ণ প্রভৃতির যুগেই সেই ভাঙ্গার সূত্রপাত হয়। নূতনের নেশায় পুরাতনকে, মুক্তির আগ্রহে বন্ধনকে ভাঙ্গিবার ও ছিন্ন করিবার উন্মাদনা সেই সময়কার যুবজনের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। সেই ভাঙ্গার মুখে তাঁহাদের যে আদর্শ-নিষ্ঠা, ত্যাগ ও দৃঢ়তা দেখি, তাহা কেবলই উচ্ছৃঙ্খলতা বা ভ্রান্তি বলিয়া মনে করিতে মন সরে না, সেখানেও তাঁহাদের মুক্তির বাসনায় ব্যাকুল টাট্‌কা তাজা চিত্তগুলি জাতীয় সম্পদ হইয়া রহিয়াছে! জোর করিয়া পার্কে বসিয়া 'অভক্ষ্য' ভক্ষণে উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিতে পারে, কিন্তু মুক্ত হইবার ভ্রান্ত বাসনাকেও শ্রদ্ধা না করিয়া পারা যায় না। বাঙালীকে জানিতে হইলে বাংলার সেই ভাঙ্গার অধ্যায়টাও আমাদের জানিতে হইবে।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ সকলেই জাতির কাছে নানাভাবে সেই এক 'মুক্তি'ই প্রচার করিয়াছিলেন। বন্ধনহীন, মুক্ত, তাজা মন

১। বঙ্গ-ভঙ্গ রোধকল্পে 'বিলাতী বর্জন' আন্দোলন ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল প্রয়াস 'স্বদেশী আন্দোলন', 'স্বদেশীযুগ' প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে।

তাঁহাদের শিক্ষায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে সেই মনের মালিক হইয়াই বাংলার যুবজন দেশাত্মবোধের নূতন ধারায় মাতিয়া একেবারে এক অপূর্ব পথে যাত্রা করিয়া বসিল।

সে পথের আদি-মধ্য-অন্তে যে কত অদ্ভুত কর্ম, কত কঠোর ব্যথা, কত রক্তাক্ত স্মৃতি রহিয়াছে, সে পথে যে কত দেবতা অপদেবতার মিলন ঘটিয়াছে, স্বর্গ-নরক একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছে, তাহাও সেই বন্ধুর দুর্গম পথের বিস্তৃত পরিচয়কালে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারিব।

বাংলার বিপ্লববাদীদের এই সুদীর্ঘকালের কার্য-প্রণালীর মধ্যে আর একটা জিনিষ বুঝিতে পারিব, তাহা এই যে, ভাসা ভাসা বা অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া একটা জাতি প্রথম জাগে, নানা অবস্থায় পড়িয়া, কর্মক্ষেত্রের নানা অভিজ্ঞতায় কিন্তু সেই উদ্দেশ্য ছাড়িয়া ক্রমে বৃহত্তর উদ্দেশ্যে, বৃহত্তর আদর্শে সেই জাতি অনুপ্রাণিত হয়। তদানীন্তন বাংলা কোন্ উপলক্ষে, কোন্ সূত্র অবলম্বনে জাগিয়া ক্রমে কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও ঘটনা-বিবৃতিকালেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

জাতির ধর্ম, সাহিত্য ও সমাজ বাংলার বিপ্লববাদীদের কাছে যে একটা স্বতন্ত্র রূপে দেখা দিয়াছিল—বাংলার উগ্রপন্থী-মধ্যপন্থী রাজনীতিবিদ্‌গণের, বাংলার সংরক্ষণশীল গোঁড়া এবং উদারনৈতিক সমাজ-সংস্কারকগণের কোন একটা মতই যে তাহারা পরম সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারে নাই, এদিকেও তাহাদের চিন্তাধারা যে একটা স্বতন্ত্র পথ ধরিয়াই চলিয়াছিল, তাহাও এই প্রসঙ্গ আলোচনায় কতকটা বুঝা যাইবে।

২

রুশ-জাপান যুদ্ধের প্রভাব

রুশ-জাপান যুদ্ধ জনচিত্তকে প্রভাবিত করে। ঠিক যে কারণে রুশ-শক্তির পরাজয়ে পাশ্চাত্যের অপর শক্তিগুলি প্রমাদ গণে, ঠিক অনুরূপ কারণেই জাপানের জয়ে এশিয়ার অপরাপর শক্তিগুলি উল্লসিত হয় ও প্রেরণা লাভ করে। ইউরোপে বিজ্ঞানযুগের আবির্ভাবের পরেই পাশ্চাত্য শক্তির দিগ্বিজয় ও এশিয়ার পরাজয় চলিয়া আসিয়াছে। গোটা এশিয়াই পাশ্চাত্য শক্তিগুলি ভাগাভাগি

করিয়া ভোগ করিতেছিল। পাশ্চাত্যের বিবদমান শক্তিগুলি আত্মকলহ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত্যাগ করিতে পারিলে সমগ্র এশিয়াই তাহারা যদৃচ্ছ ভোগদখল করিতে পারিত৭ জাপান ভিন্ন এশিয়ার অপর সব জাতিই তখন দুর্বল। ইউরোপ যেন প্রভু—এশিয়াবাসী দাস এবং শোষিত হইবার জন্যই রহিয়াছে! ইউরোপের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভুত্ববোধ সকল ইউরোপীয় শক্তির মধ্যেই বিদ্যমান। এশিয়াতে ক্ষমতা লইয়া তাহারা পরস্পর কলহ করিলেও, এশিয়াবাসী সম্বন্ধে তাহাদের সকলকার ধারণাই একই রকমের।

রুশ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। রুশিয়ার পরাজয় দূর হইতে কোন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী পাশ্চাত্য শক্তি উপভোগও করিতেছে, কিন্তু একটি ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে ইউরোপীয় মনের সত্য পরিচয়: ক্ষুদ্র জাপান ইউরোপের বৃহত্তম সাম্রাজ্য-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ১৯০৪ সালে। যেদিন সর্বপ্রথম জাপানীরা বৃহদাকার রুশবন্দীদের জাপানী বন্দরে আনিল—সেদিনের সেই ব্যাপারটা সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শী ফরাসী বর্ণনা করিতেছেন, "তাহারা যখন দেখিল ইউরোপীয় শ্বেতজাতি সত্যসত্যই এশিয়াবাসীর হস্তে বন্দী তখন তথাকার উপস্থিত অন্যান্য ইউরোপীয়গণ—ফরাসী, জার্মান, বৃটিশ ও আমেরিকান—তাহাদের বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলিয়া গেল এবং সকলের মধ্যেই একইকালে সমভাবে আতঙ্কের ঝড় বহিয়া গেল।" ঠিক তেমনই জাপানের এই জয়ে এশিয়াময় প্রবল উৎসাহ ও উত্তেজনার সঞ্চার হয়। বাংলার বিপ্লববাদীরা যখন বিপ্লব সমিতি গঠনের কার্যে ধীরে ধীরে নামিতেছে তখনই রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের এই জয়। এই জয় বিপ্লববাদীদের ক্ষেত্র-প্রস্তুতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল, কারণ জনগণের সেই মানসিক উত্তেজনা ও উৎসাহের মূল্য সামান্য ছিল না।

৩

পলাশীর পর দেড়শ বছর

পলাশী যুদ্ধে (১৭৫৭) ইংরেজের রাজ্যপ্রতিষ্ঠার সূচনা হয় বটে, কিন্তু সমগ্র ভারতের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে তাহার প্রায় একশত বৎসর লাগিয়াছে। ভারতবাসী বিদেশী শাসনকে আশীর্বাদরূপে মানিয়া লয় নাই। পলাশীর পর হইতে ১৮৪৮ সালের গুজরাট যুদ্ধ পর্যন্ত এই ৯১ বৎসর ইংরেজকে যুদ্ধের পর

যুদ্ধ করিয়া গোটা ভারতের স্বাধীনতা হরণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু দেখা যায়, এই ৯১ বৎসর ভারতবাসী সংঘবদ্ধ হইয়া বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ করে নাই। এক অংশ আক্রান্ত হইলে অপর অংশ ভিন্ন পথে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজিয়াছে, তথাপি ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় নাই। বহু রাজ্যে বিচ্ছিন্ন ভারত ১ শত বৎসর ইংরেজ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে চাহিলেও সেই প্রয়াস খণ্ডিত ও ক্ষুদ্র আকারে দেখা দিয়াছে। তাই দেখি বিদেশী আক্রমণ হইতে স্বাধীনতা রক্ষার এই দীর্ঘ চেষ্টায় সমগ্র ভারতে মাত্র ৪২০০০ ভারতবাসী জীবন দিয়াছে। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের অধিবাসীর পক্ষে স্বাধীনতার মূল্য হিসাবে এই প্রাণদান কতই না তুচ্ছ ও নগণ্য!

কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহকালে অর্থাৎ বিদেশী শাসন হইতে ভারতকে মুক্ত করিয়া লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের কার্যে ২ লক্ষের উপর সিপাহী এবং তাহাদের সমর্থক দেশবাসী প্রাণ দান করে। এই প্রাণ-দানের সংখ্যা হিসাবেও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের এই প্রয়াসকে জাতীয় জীবনের তাপযন্ত্রের উচ্চতর মান দেওয়া চলে। বিদেশী শাসনের অত্যাচারে লজ্জা দুঃখ ও দৈন্যে মৃতপ্রায় জাতীয় জীবনেও স্পন্দন দেখা যাইতেছিল। ইংরেজ শাসন-শক্তির বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের যে মিলিত ক্ষোভ ছিল তাহাই সিপাহী বিদ্রোহ আকারে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার ছিল অসাম্প্রদায়িক ও সর্বভারতীয় রূপ। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সিপাহীদের এবং তাহাদের নায়কগণের রাষ্ট্রপরিচালনার যোগ্যতা সম্পর্কে আস্থার অভাব এবং সেই সংগে ইংরেজের নূতন সভ্যতার প্রতি কিছুটা মোহ এই বিদ্রোহ প্রয়াস হইতে তাহাদের দূরে রাখে। জনসাধারণও সংঘবদ্ধ ও সচেতন ছিল না। বিদ্রোহ ব্যর্থ হইবার এইগুলি অন্যতম কারণ। অন্যথায় সিপাহীদের ও তাহাদের নায়কগণের ঐকান্তিকতা, সংগ্রামনিষ্ঠা, ত্যাগ অল্প ছিল না। এই অভ্যুত্থানের ব্যাপকতার তুলনায় বিশ্বাসঘাতক এবং দলত্যাগীর সংখ্যাও ছিল খুবই নগণ্য। ইহাও বিদ্রোহীদের আদর্শ-নিষ্ঠারই পরিচয়। সিপাহী বিদ্রোহকে পূর্ব বাংলায় আমরা 'কালা-গোরার' যুদ্ধ বলিতে শুনিয়াছি। নামকরণ অর্থপূর্ণ।

সিপাহীবিদ্রোহ কেবল বৃটিশ রাজশক্তিকে ভারত শাসনের সাক্ষাৎ দায়িত্ব গ্রহণে, ভিক্টোরিয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদানে বাধ্য করে নাই, শাসন-নীতির ধারাও বদলাইয়া দেয়। অতঃপর ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় তাহাদের ভারতসাম্রাজ্যের

স্তম্ভরূপে ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও জমিদারগণকেই গণ্য করিতে থাকেন। শিক্ষিত ভারতবাসী সম্পর্কেও তাঁহাদের মনে দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। কারণ সিপাহী বিদ্রোহের সমকালে এবং উহার পরে শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা অভাব অভিযোগ পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। সুবিবেচক এবং উদারদৃষ্টিসম্পন্ন (কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী) ইংরেজও ভারতে বৃটিশ শাসনের মূল ভিত্তিতে যে গলদ বিদ্যমান তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন বিস্তারের মূলে ছিল অনাচার, জোর জুলুম এবং কপটতা ও অসাধুতার অন্তহীন ইতিহাস। ইংরেজ ইতিপূর্বে পৃথিবীর অন্যত্র যে সকল উপনিবেশ গড়িয়াছিল, সেই সকল উপনিবেশ হইতে ভারতবর্ষের অবস্থা স্বতন্ত্র। ভারতের আছে প্রাচীন সভ্যতা, আছে অভিমান ও গৌরববোধ। সামরিক শক্তিতেও সে নিতান্ত তুচ্ছ নহে। সামাজিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি যে কারণ-পরম্পরায়ই তাহারা বৈদেশিক শাসনাধীন হউক না কেন—ইংরাজ শাসনকে অপরিহার্য মনে করে নাই, অত্যাচার ও জুলুমই মনে করিয়াছে। নিজেদের অনৈক্য ও দুর্বলতার ছিদ্রপথে ইংরেজ আসিয়াছে—যুদ্ধবিগ্রহে পরাভূত করিয়া আসে নাই; এই ছিদ্র না থাকিলে ইংরেজ প্রভু হইতে পারিত না—এই বোধ দেশে বিদ্যমান ছিল।

বিদেশী শাসন জনসাধারণকে যেভাবে রক্তশূন্য করিয়া ফেলিতেছিল, লুব্ধ ইংরেজগণের শাসন ও পীড়নে যে বেদনা জনচিত্তে গুমরাইয়া মরিতেছিল যোগ্য নেতৃত্ব পাইলে তাহা যে বিদ্রোহের আকারে দেখা দিতে পারে—সিপাহী বিদ্রোহের মতই দেখা দিয়া অধিকতর ব্যাপক হইয়া উঠিতে পারে, তাহা চিন্তাশীল ইংরেজও বুঝিতেছিল। ইতিমধ্যে বাংলায় কৃষকবিদ্রোহ তথা নীলবিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৮৬০-৬১ সালে শ্বেতাঙ্গ নীলকরগণের যে অত্যাচার চলিয়াছিল, ইংরেজ শাসন-শক্তি ঐ অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ বণিকগণের দোসররূপে অবিচার ও অনাচারে রাজদণ্ডকে যেভাবে কলঙ্কিত করিতেছিল তাহাতে সর্বংসহা বাংলার দরিদ্র প্রজাও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। "নীল বুনবো না"—এই যে মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্প সেদিন বাংলার কৃষক করিয়া বসিল তাহা সংঘবদ্ধ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা অহিংস গণ-আন্দোলন। ইংরেজী-শিক্ষিত নব্যবাঙ্গালী শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের অত্যাচার হইতে বাংলার কৃষকদের রক্ষার জন্য লেখনীমুখে যে অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল (হরিশ্চন্দ্র মুখার্জী, নবগোপাল ঘোষ প্রভৃতি সংবাদপত্রে এবং দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটকে) তাহাতে দেশে ইংরেজের উপর বিদ্বেষ ছড়াইতে

থাকে। সেকালের ইংরেজ বণিকগণ দেশবাসীর নিকট পশুবৎ বিবেচিত হইতে লাগিল। ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের মোহ টুটিতে থাকে। নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিয়া তোলে শিক্ষিত বাঙালীর সংবাদপত্র ও সাহিত্য। অতঃপর শাসনকর্তৃপক্ষকে নীলকরদের সংযত করিতেই হয়।

কিন্তু এই সঙ্গে ইংরেজ জাতির মধ্যে যে স্বাধীনতার আদর্শ-নিষ্ঠা ছিল—ইংরেজের মধ্যেও যে মানবপ্রেমিক বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ দুইচারজন ছিলেন, তাঁহারাই শুধু শিক্ষিতজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। এই সকল হৃদয়বান ব্যক্তির সাক্ষাৎ তখন মিলিত বলিয়াই ইংরেজী-শিক্ষিতের মনে ইংরেজের শুভবুদ্ধির উপর, ন্যায় বিচারের উপর তখনও পর্যন্ত আশা সামান্য হইলেও থাকিয়া যায়। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণের' অনুবাদ করিয়া পাদ্রী লং কারাগারে গমন করেন—'স্বজাতি' ইংরেজদের দ্বারা লাঞ্ছিত হন। কারাগারে যাইবার কালে লং বলেন :—"আমি এইরূপ কার্যে অর্থাৎ অত্যাচারী ইংরেজের বিরুদ্ধে নিপীড়িত বাঙালী প্রজার স্বপক্ষে দাঁড়াইয়া সহস্রবার জেলে যাইতে গৌরব বোধ করিব।"

ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রেরণা মিঃ হিউম্ দিয়াছিলেন। শুধু মিঃ হিউম্ই নহেন—স্বয়ং বড়লাট ডাফরিন্ও উৎসাহ দিয়াছিলেন। তাহার কারণও ছিল। ইংরেজের ভারত বিজয়ের মূলে যে গ্লানি পুঞ্জীভূত ছিল—ইংরেজ রাজপুরুষরা তাহা জানিতেন। তাঁহারা সিপাহী বিদ্রোহ দেখিয়াছেন—নীলবিদ্রোহ দেখেন, ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনে রাজনৈতিক কামনা লক্ষ্য করেন। এই রাজনৈতিক চেতনাকে বিধিবদ্ধ আন্দোলনের খাতে প্রবাহিত করিয়া আয়ত্তে রাখিতে পারিলে গণবিদ্রোহ দেখা দিবে না—সময় সময় ধীরে ধীরে কিছুটা শাসন-সংস্কার দিবার ব্যবস্থা করিলেই চলিবে; কংগ্রেসের সৃষ্টিকালে ইংরেজ রা[illegible] সহানুভূতির মূলে ছিল এই প্রেরণা। সিপাহী বিদ্রোহের পর ২৫ বৎসরের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতরে যে রাজনৈতিক দাবী উপস্থিত করার উদ্যম দেখা দেয়, তাহা কংগ্রেসের কাঠামোর মধ্যে এইভাবে সস্নেহে স্থান দেওয়া হইল। কিন্তু দুইদিনেই ইংরেজ দেখিল ইহাও তাহার অভীষ্টলাভের সহায় হইবে না। কংগ্রেসের ক্রমপরিণতির ইতিহাস আমাদের আলোচ্য নহে। আমরা এখানে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা, উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, শিক্ষিতের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা এবং ঐ চেতনাকে ধীর মন্থর গতিতে আবেদন

নিবেদনের পথে পরিচালনার প্রয়াসের কথা বলিয়া ১৯০৫ সালের জাতীয় আন্দোলনের অধ্যায়ে প্রবেশ করিতেছি। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকেও বঙ্গবিপ্লব বলা চলে। উহা যেন দেখিতে দেখিতেই স্বাধীনতার আন্দোলন হইয়া উঠিল। বাঙালী এই সূত্রেই স্মরণ করিল সিপাহীযুদ্ধের শহীদদের—

'সার্দ্ধশত বর্ষ গত ভারত সন্তান যত
একবার করেছিল পণ।'

অর্থাৎ সেই বিদ্রোহই আবার পঞ্চাশ বৎসর পরে 'আমরা' আরম্ভ করিলাম। সিপাহী বিদ্রোহের বিস্মৃতপ্রায় নায়কদের স্মরণ করা হইল এই সঙ্গীতে,—সেই তান্তিয়া, কুমার সিং, ঝাঁসির রাণী, নানা সাহেব প্রভৃতিকে।

৪

সূচনা

রুশ-জাপান যুদ্ধ বাংলার জাতীয় জাগরণের গোড়ায় যে অনেকখানি কাজ করিয়াছে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু বড়র সংগে ছোটর বিরোধ বলিয়াই হউক বা এশিয়াবাসীর সংগে ইউরোপের প্রবল রাজশক্তির লড়াই বলিয়াই হউক, আমাদের সহানুভূতি স্বভাবতই জাপানের উপর গিয়া পড়িয়াছিল এবং সেইখানেই যেন বাঙালীর মনেও একটা ক্ষীণ আশা জাগিয়াছিল। এশিয়ার ক্ষুদ্র জাপান যেমন ইউরোপের প্রবলতম শক্তি রুশকে পরাভূত করিয়াছে, তেমনি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়া আমরাও ইংরেজকে শেষে পরাভূত করিতে পারিব, এমন আশা দেশে জাগানো সহজ হইল। জাপান যেন আত্মজন, এইরূপ ভাব দেখা দিল। জাপানের উপর সহানুভূতিতে বাঙালী একটা এ্যামবুলেন্স্ কোর পর্যন্ত খাড়া করিতে উদ্যত হইল।

ঐ সময়ে এবং তাহার কিছু পূর্ব হইতেই শরীর-চর্চার দিকেও একদল লোক বেশ নজর দিলেন। ৺পি. মিত্র, ৺যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺সরলা দেবী, শশী চৌধুরী প্রভৃতির উৎসাহে তেমন গোটা কয়েক দলও গড়িয়া উঠিল। সে সকল আখড়ায় বা সমিতিতে আত্মরক্ষার নানাবিধ কৌশল ও লাঠিখেলার চর্চা চলিতে লাগিল। তখনকার শরীর-চর্চা কিন্তু সাধারণতঃ রাস্তা-ঘাটে রেল-

ষ্টিমারে দাম্ভিক গোরার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্তই চলিয়াছিল। গোরার অত্যাচার নেটিভের বর্ধিত প্লীহা ফাটাইলেও—অপরাধীর মুক্তিলাভ জাতির চিত্তে অপমান-বোধ জাগাইতেছিল। ঘুষির বদলে ঘুষি দেওয়ার জন্য শারীরিক সামর্থ্য দরকার—এই বোধ তখন বেশ দেখা দিতেছে—এখানে সেখানে তাহার অল্প স্বল্প দৃষ্টান্তেও জনচিত্ত খুসী হইতেছে। ঐ লাঠিখেলা ও আখড়ার সংগে এবং অন্তরালে ঐ সময়ে গুপ্ত সমিতির কল্পনা এবং তাহা গড়ার চেষ্টা চলিতেছিল। তবে তাহাদের কোন বিশেষ কার্যকলাপ তখনও দেশে প্রত্যক্ষ হয় নাই—দুই চার দশজন সভ্যই গুপ্ত সমিতিতে ছিল। গল্পগুজবও তাহারা করিত মনে হয়। আমরা কিন্তু মফঃস্বলে থাকিয়াও (১৯০৪ সালের কথা বলিতেছি) গুপ্ত সমিতির কথা শুনিতাম। যথা, শুনিতাম :—'রিভলবার পকেট হইতে বাহির করিয়া একজন কোন এক সাহেবকে সমঝাইল—এই দেখ আর একটা।' নোয়াখালির তারানাথ বলিত—'ইংরেজ তো গেল বলে। অস্ত্রশস্ত্র সব জোগাড়, ওরা গেল বলে।' লোকে তারানাথ রায়চৌধুরীকে বলিত—'তারা পাগলা।' স্কুলেখক, গুপ্ত যুগান্তরেও লিখিত। রিভলবার সমেত ধৃত হয় ও সাজা হয়।

তরোয়ালের প্রতিনিধি লাঠির ভাঁজের কৌশলে, আর আনন্দমঠের ছত্রেছত্রে তখনই একদল বাঙালী স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। তখনও কেবল মনের মধ্যে, বন্ধুর সংগে গল্পে, সময়মত ও ঘটনাচক্রে এক আধ বার স্বাধীনতার অসম্ভব রকমের জল্পনা-কল্পনা চলিত। বলা বাহুল্য তখনো সেটা কার্যে পরিণত করার কোন সক্রিয় চেষ্টা চলে নাই। এই সময়ে অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বে, বোমাওয়ালাদের কয়েকটা বিপ্লব-কেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাও ব্যাপক কিছু নহে। দুই-চার-দশজন লইয়া শলা-পরামর্শ মাত্র, 'গুপ্ত সমিতি' স্থাপনের চেষ্টা মাত্র। ব্যাপক সংগঠন, সংস্থা বা organisation যাহাকে বলে, তখন পর্যন্ত তাহার কিছুই হয় নাই। বঙ্গ-ভঙ্গ ব্যাপারে স্বদেশী আন্দোলনের যে সূত্রপাত হয়, তাহা হইতেই মুখ্যভাবে বাংলার বিপ্লববাদের সূচনা ও তাহা প্রসারলাভ করিতে থাকে। সুতরাং প্রধানতঃ স্বদেশী আন্দোলনের আমল হইতে আমরা কথা আরম্ভ করিব।

১৯০২ সাল হইতে বা তাহারও পূর্ব হইতে বাংলার শিক্ষিত জনের চিত্ত যখন পরাধীনতার দুঃখ লজ্জা হইতে মুক্তির জন্য ব্যাকুল, এই মুক্তির জন্য

অসোয়াস্তি বোধ করিতেছে, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় যখন শিক্ষিত জনের মন প্রমত্ত—সেই সময়েই প্রস্তাব উঠিল বঙ্গভঙ্গের। তাই বলিতে হয়, বুঝি বড় শুভক্ষণে বাংলাদেশ বিভক্ত করিতে বড়লাট কার্জন গোঁ ধরিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পূর্ব-বাংলায় সফর দিয়াও আসিলেন। জমিদারদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু ময়মনসিংহের মহারাজ সূর্যকান্ত তাঁহার বাড়ীতেই লর্ড কার্জনকে বলিলেন, 'আমি সমর্থন করিব না।' বাংলাদেশ সমস্বরে আবেদন জানাইল—"আমাদের ভাগ করিও না।" কত সভা-সমিতি, কত দৌড়-ঝাঁপ! সেই উচ্ছ্বাস যাহারা দেখিয়াছে তাহারাই জানে সে কি ব্যাপক উত্তেজনা! যখন আবেদন বিফল হইল, বাঙালীর আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হইল, তখন ক্ষোভে যেন বাঙালী গর্জিয়া উঠিল। 'বয়কট' মন্ত্র চারিদিকে ঘোষিত হইল। লর্ড কার্জন মনে করিতেন—বাঙালীই প্রকৃতপক্ষে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিতেছে। তিনি একস্থলে বলেন, "কোন একটা প্রদেশের কতিপয় লোক একস্থানে বসিয়া কৃত্রিম 'জনমত' সৃষ্টি করিবে—আর তাহাই অপরকে গ্রহণ করাইবে,—ইহা দেশের (ভারতের) পক্ষে শুভ হইতে পারে না।" বাঙ্গালীর দুষ্টপ্রভাব হইতে ভারতকে রক্ষা ও বাঙ্গালীকে প্রভাবহীন দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যেই 'বঙ্গ-ভঙ্গ' পরিকল্পনা।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন বক্তৃতায় এ-দেশবাসীর স্বাভাবিক মিথ্যাচারের উল্লেখ করেন। তাহাতেও জাতীয় মর্যাদায় আঘাত লাগে। ঐ সালের মার্চ মাসে কলিকাতার ওভারটাউন হলের বিরাট জনসভায় বড়লাটের এই দাম্ভিক উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। লর্ড কার্জনও যেন আর অপেক্ষা করিতে পারেন না; ঘোষণা করা হয়—১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলা বিভক্ত হইবে। কিন্তু লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না; তিলক—গোখ্‌লে—খাপার্দে—লালা লাজপৎ—সর্দার অজিৎ সিং বাংলার দাবীই সমর্থন করিলেন; গোখলে বলিলেন—'জনমত যদি এই ভাবেই উপেক্ষিত হয়—তবে শেষ হউক স্বৈরাচারী শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা।' সুরেন্দ্রনাথও গর্জিয়া উঠিলেন, 'আর নিবেদন নয়—নিজের পায়ে দাঁড়াইব।' লর্ড কার্জনের পরিবেশিত বিষ যেন অমৃত হইয়া জাতিকে বাঁচাইল। যখন আত্মসম্বিতে বাঙ্গালী জাগিয়াছে—জাগিতেছে—তখনই হইল এই বঙ্গভঙ্গ—বাঙ্গালী চিত্তের অগ্নিগর্ভে যেন ঘৃত নিক্ষিপ্ত হইল। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের বিরুদ্ধে

সরকারী দমননীতি যজ্ঞাগ্নির সমিধ যোগাইল। ইতিপূর্বেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' বিদেশী-শাসনের বিরুদ্ধে জনচিত্ত উন্মুখ করিয়া তুলিতেছিল—বারীনবাবুর 'যুগান্তর' আসে পরে। ১৯০৬ সালে বরিশাল কনফারেন্স ভাঁঙিয়া দেওয়ায়—অপমান ও অসন্তোষ জাতির বুকে তুষানল জ্বালাইল। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সরকারী দমননীতির সমর্থকরূপে কাজীর বিচার চালাইলেন। 'যুগান্তর' সম্পাদককে সিডিসনের দায়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। সম্পাদক ভূপেন দত্ত আত্মপক্ষও সমর্থন করিলেন না। শ্রীঅরবিন্দের লেখা প্রমাণের জন্য বিপিন পাল মহাশয়কে সাক্ষী মানা হইলে সত্যবাক্ পাল মহাশয় সাক্ষ্যদানে অসম্মত হন। এই অপরাধে কিংস্‌ফোর্ড তাঁহাকে ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। বিপিনবাবুর মামলার দিন আদালতে বিপুল জনসমাবেশ হয়। জনৈক ইংরেজ সার্জেন্ট জনতা তাড়াইবার জন্য জোরজুলুম করিতে থাকিলে উদ্ধত সার্জেন্টকে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র সতের বৎসরের কিশোর সুশীল সেন আদালত প্রাঙ্গণেই মুষ্টাঘাত করে। কিংস্‌ফোর্ড বিচার করিয়া সুশীলের প্রতি বেত্রদণ্ডের বিধান করেন। ব্রহ্মবান্ধব কিংসফোর্ডকে 'কশাই কাজী' বলিয়া আখ্যাত করেন। কাব্যবিশারদ গান বাঁধেন :

> 'আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবি
> আমি কি মা'র সেই ছেলে ?
> দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
> কে পালাবে মা ফেলে ?
> যায় যেন জীবন চলে।'

এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য কিংস্‌ফোর্ডের আদালতে ব্রহ্মবান্ধবের বিচার চলে। ব্রহ্মবান্ধব বিবৃতি দেন,—'বিদেশী আদালতে বিচারার্থী হইব না'। বস্তুতঃ, বিচারকালেই ব্রহ্মবান্ধব হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার কথিত 'ফিরিঙ্গী' কারাগারে আর যাইতে হয় না। 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', অরবিন্দের ও বিপিনচন্দ্রের ইংরেজী 'বন্দেমাতরম্' ও 'নিউ ইণ্ডিয়া'-কে সায়েস্তা করিবার জন্য কিংস্‌ফোর্ড কঠোর রাজদণ্ড উদ্যত করেন। কিন্তু অগ্নিবাণী উচ্চারিত হইতেই থাকে। কিশোর বালক সুশীলের অঙ্গে বেত্রাঘাত, পরাধীনতার দুঃখবোধে সংবেদনশীল জাতীয় দেহে যেন বেত্রাঘাত করিল। বিপ্লবী নায়কগণ এ হেন কিংস্‌ফোর্ডকে ধরাধাম হইতে সরাইবার নির্দেশ দিলেন। ক্ষুদিরাম ও

প্রফুল্ল চাকী সেই নির্দেশেই কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করিতে মজঃফরপুর গমন করেন। এই ভাবেই শাসক শক্তির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনার সক্রিয়, সার্থক ও সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রয়াসের মধ্যে দেখা দিল,—সক্রিয় বাধাদানের প্রেরণা। এই বাধাদানের প্রেরণাই বিপ্লব-আন্দোলনের পুষ্টিসাধনে সহায় হয়—দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী বিচিত্র পথে।

সকল আন্দোলনই আরম্ভ হয় কলিকাতায়—তারপর তাহা লুফিয়া লয় মফঃস্বল। বাংলার লাঠিখেলা বল, বোমা বল, সব কিছুরই আরম্ভ এইখানে। তখন আমাদের ছাত্রজীবন। পূর্ববাংলায় যেন একটু বেশী উত্তেজনা। আজিকার এ দিনেও ঐ স্বভাবটা তাহার যায় নাই, বুঝি যাইবেও না। 'বাঙালের গোঁ' নাকি বড় বিশ্রী।—ছাত্র হইলে কি হয়—ছাত্র-শিক্ষক এক সংগেই আমরা স্বদেশী সভা করিয়া বেড়াই। তখন 'সঞ্জীবনী' আর 'প্রবাসী'ই বেশী স্বদেশী ছিলেন। এই দুইখানা কাগজই আমরা বেশী পড়িতাম। সন্ধ্যা, নবশক্তি প্রভৃতি একটু পরে আসে। তখন কিন্তু আমরা 'খাঁটি' স্বদেশী অর্থাৎ তখনও 'অপবিত্র' হই নাই, বিপ্লবের বালাই রাখি না। বঙ্গভঙ্গ রদ করিতেই হইবে, নতুবা আমাদের মান ইজ্জত আর থাকে না—উহাই ছিল তখনকার প্রধান কথা। বাঙালীকে ভাগ করিয়া ফেলিল—কি সর্বনাশ! কত যুক্তি যে তখন দিতাম তাহার আর অন্ত নাই। সে সমস্ত কথা মনে হইলে হাসি পায়। তবে বঙ্গভঙ্গে ঠিক যে কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হইল, তাহা কিন্তু বুঝিলাম না। না বুঝিলে কি হয়, ও ত' নিমিত্ত মাত্র। বাংলার প্রাণে যে জোয়ার আসিয়াছিল সে জোয়ারে 'জয় মা' বলিয়া তরী ভাসাইয়াছিল সকলেই, ভাবিয়াছে পরে। ভালমন্দ বলিব না, কিন্তু ইহাই দস্তর। স্বদেশী হইয়া কিন্তু প্রথমেই রৌদ্র-বৃষ্টির সংগে দস্তরমত 'নন্‌-কো-অপারেশন' আরম্ভ করিয়া দিলাম। রৌদ্র বা বৃষ্টি হইলে ডিফেন্‌স্‌ বা আত্ম-রক্ষার জন্য আর ছাতা ব্যবহার করিতাম না। কেন জানি না, স্বদেশী কাপড় পরিতে আরম্ভ করিয়াই দেখিলাম দেহখানি বেশ সাত্ত্বিক হইয়াছে—চুল একটু এলোমেলো হইয়াছে, পাদুকা অদৃশ্য হইয়াছে! এদেশে সাত্ত্বিকতার ইহাই লক্ষণ। প্রথম মিলনের আবেগে কেবলই আনন্দ! শুনিয়াছি ছাতা বিক্রয় কমিয়া গিয়াছিল। বৃষ্টিতে ভিজিয়াই সকলে সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিবে। দৈবাৎ যদি কেহ ছাতা মেলিয়া ফেলিত তাহাও ঐ ত্যাগের রাজ্যে তৎক্ষণাৎ বন্ধ। গ্রামে গ্রামে সভা—পাঁচ মাইল দশ মাইল দূরে দূরে সভা।

রৌদ্র মাথায় করিয়া খাঁ খাঁ করা মাঠের মধ্য দিয়া দল বাঁধিয়া সভায় চলিলাম,—মুখে আবার ঐ সময়েই গানের সুর খেলিতেছে—'নগরে নগরে জাল্‌রে আগুন, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ।' সে কি বেপরোয়া আনন্দ—আজ কেবলই মনে হয় 'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ!' বাংলার তরুণ হৃদয়গুলি আজ তেমনি ত' মাতিয়া উঠিয়াছে, আজ মাতৃমংগল শংখধ্বনিতে তেমনি ত' উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে; তাইত আশা, জাতির কাণ্ডারী ভগবানই জাতির হাল ধরিয়া আছেন আমরা ত' নিমিত্ত মাত্র![১]

বাঙালীর বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষেই দেখা দিল 'স্বদেশী'। স্বদেশী শিল্প বাণিজ্য, স্বদেশী সাহিত্য ও শিক্ষা। ১৯০৬ সালে 'ডন্‌' সোসাইটির সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়িয়া উঠে। অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর শিক্ষক। অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ, বিনয় সরকার ও মোক্ষদা সামাধ্যায়ী, রাধাকুমুদ প্রভৃতি আসিয়াও যোগ দিলেন।[২]

৫

বাংলায় দেশাত্মবোধের বৈশিষ্ট্য

বঙ্কিমচন্দ্রের আমল হইতে বাংলাদেশে বিশেষ করিয়া দেশাত্মবোধ জাগিতেছিল।—হেমচন্দ্র, নবীন, রঙ্গলাল, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মনোমোহন বসু দেশের কথা গাহিলেন।—গোবিন্দ রায় আক্ষেপ করিলেন 'কতকাল পরে বল ভারত রে, দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে',—কিন্তু সে দেশাত্মবোধ যেন সুধীসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ, অনুকূল বাতাসের অভাবে জনসাধারণ তাহার স্পর্শ পাইল না। শেষে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে সারা বাংলার একাত্মতা বুঝাইতে গিয়া বাঙালী ঐক্যমন্ত্র উচ্চারণ করিল। সেইখানেই দেশাত্মবোধের জন্ম, দেশ ও দেশবাসীর প্রতি মমত্ব-বুদ্ধির উন্মেষ। তাহার পর আবেদন-নিবেদন করুণ ক্রন্দন যখন ব্যর্থ হইল,

---

১। ১৯২০ সালে লিখিত—লেখক

২। সতীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'ডন্‌ সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা করেন ১৯০২ সালে—বঙ্গ-ভঙ্গ জনিত উত্তেজনা দেখা দিবার পূর্বেই। 'ডন্‌ সোসাইটি'র গঠনমূলক স্বদেশী সাধনা জাতীয় ভাবধারা পুষ্টির বিশেষ সহায় হয়।

তখন বাঙালী বুঝিল, 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।' তখন আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা। ক্রমে বাঙালী কেমন করিয়া দেশাত্মবোধে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল,—প্রথম জাগরণের উত্তেজনা ও বিদ্বেষের অন্তে, কেমন করিয়া দেশভক্তিকে আশ্রয় করিয়া দেশ-মাতৃকার চরণে জীবন উৎসর্গ করিল, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া নবীন বাঙালী নবীন সন্ন্যাসী সাজিতে বসিল—একে একে তাহা বলিতে চেষ্টা করিব। একটা জাতি একদিনে জাগে না; গোড়ায় অনেক মাল-মসলা ব্যয় করিলে তবে তাহার জাগরণে সৃষ্টি সূচিত হয়। যে সময়কার কথা বলিতেছি, তখন একদিকে 'বয়কট' আর 'পিকেটিং'-এর উন্মাদনা, অপর দিকে বাংলার সাহিত্যিক ও কবিকুল সহস্র ধারে শুদ্ধ দেশাত্মবোধকে ঢালিয়া দিয়া জাতির চিত্তটি কানায় কানায় ভরিয়া তুলিতেছিলেন।

আত্মসম্মানে আঘাত পাইয়া ইংরেজের উপর ক্রুদ্ধ আবেগে যাহার গতি, বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার দারুণ জেদই যাহার কর্মপ্রবর্তনার মূল, ইংরেজের পার্লামেণ্ট হইতে বঙ্গভঙ্গ রদের হুকুম আদায় করিয়া লইবার জন্যই যাহাদের তর্জন-গর্জন—তাহারা কিন্তু দুইদিন পরেই আবেদন-নিবেদন, তর্জন-গর্জন একই কালে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া নূতন সুরে গান বাঁধিল। সে গানের ছত্রেছত্রে মাতৃমহিমা কীর্তিত হইল, সে গানের অপূর্ব ছন্দে, সুরে, মূর্ছনায় দেশমাতৃকার চিরন্তন মূর্তি মূর্ত হইয়া বাঙালীর কাছে প্রত্যক্ষ হইল;—সে গান বাংলার প্রাণ নিংড়ানো রসে সিক্ত হইয়া ভাষা জননীকে পুষ্ট, সুষ্ঠু ও শ্রেষ্ঠ করিল; সে গানের আকুল আহ্বান তরুণ বাংলাকে ঘর ছাড়াইয়া পাগল করিল! বাঙালী সেদিন দেশকে এমন সত্য করিয়া পাইল—যাহা সহজেই তাহার কাছে দেশ-ধর্মেই পরিণত হইল। দেশ যে আর মাটির বস্তুটিই নহে—এ যে জাতির যুগ-যুগান্তের সাধনার জমাট বিগ্রহ, এ বিগ্রহের সেবায়ই যে জীবন ধন্য হয়, জীবের অমৃত লাভ হয়—এই ধারণা বাংলার কর্মীদের মধ্যেই প্রথম জাগিয়া উঠিল। সে শুদ্ধ ভাবধারায় আবেদন নাই, নিবেদন নাই, তর্জন নাই, গর্জন নাই, পরমুখাপেক্ষিতা নাই, পরবিদ্বেষ নাই—যাহা রহিল তাহা শুধু মাতৃভক্তি—অনাবিল দেশপ্রীতি! যাহা রহিল, তাহা দেশমাতৃকার জন্য সর্বস্ব ত্যাগের উদাত্ত গদগদ করুণ আহ্বান—সে গান, সে সাহিত্য যে সত্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অমর। বাংলার দেশাত্মবোধের আকৃতি, প্রকৃতি সে ধারায় স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। সে ভাবের ধারায় অবগাহন করিয়াই বাংলার যুবকগণ বঙ্গভঙ্গ রদ করাই আর

দেশসেবা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই—দেশকে সনাতন ও নিত্য নূতন করিয়া এক সংগেই পাইল। বাঙালী কেবল দেশভক্তিরই কথা বলে নাই—দেশভক্তির দর্শনও বাঙালী মনীষার অপূর্ব অবদান। তাহারই আলোচনা করিতেছি।

বাংলার স্বাদেশিকতা বা স্বাজাতিকতা পাশ্চাত্য স্বাদেশিকতা বা স্বাজাতিকতা নয়। জাতীয়তার ঋষি বংকিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন: দেশকে পরবশ্যতার বন্ধনমুক্ত করিতে হইলে চাই দেশ-সন্তান। কিন্তু সন্তানের সাধনার বস্তুটি, সাধ্য বিষয়টি হওয়া চাই সত্য, শিব ও সুন্দর। সুদীর্ঘ সাধনায় তিলে তিলে আত্মদান, আত্ম-ত্যাগের আত্ম-প্রসাদ, সর্বপ্রাপ্তির সর্বরিক্ততা যে আধ্যাত্মিক-ভিত্তিতে সম্ভব, বংকিম তাঁহার দেশভক্তের মাতৃমন্ত্রের মধ্যে তাহারই রূপদান করিলেন। একটা পরবশ জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রাম-নিষ্ঠ কর্মীদের কর্মসাধনার পক্ষে, সংকল্প-সিদ্ধির পক্ষে ইহার উপযোগিতা অসাধারণ। দেশকেই বংকিমচন্দ্র শুধু বড় করেন নাই, বংকিমচন্দ্র দিয়াছেন দেশের সংগে দেশধর্ম—দেশের সংগে দিয়াছেন দেশ-দর্শন। ইহা অতুলনীয়। এইখানে বংকিমচন্দ্র সাহিত্যিকের, কবির, স্রষ্টার মহিমা অর্জন করিয়াছেন। রাজনীতিক বুঝিতে পারেন—দেশকে স্বাধীন না করিতে পারিলে, দেশবাসীর কল্যাণ নাই। দেশ-প্রেমিক প্রিয় স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইতে পারেন; কিন্তু সাহিত্যিক তাহারও বড়; কারণ সাহিত্যিকই আনিয়া দেন দেশভক্তির দর্শন। দেশ-প্রাণ সত্যানন্দ বলিতে পারেন, দেশের মুক্তির জন্য জীবন-সর্বস্ব বলি দিব। কিন্তু দেশ-ভক্তির স্রষ্টা যে সাহিত্যিক, তিনিই বলিতে পারেন: জীবন দিলেই হইবে না—আরও চাই—ভক্তি!

পাশ্চাত্য স্বাজাতিকতা ও স্বাদেশিকতার মধ্যে যে অসত্য ও অনাচারের গ্লানি রহিয়াছে বাংলার কবি-সাহিত্যিকগণের ভারতীয় আদর্শ ও সাধনালব্ধ স্বকীয় দৃষ্টি তাহার অকল্যাণ হইতে আমাদের স্বাদেশিকতাকে রক্ষা করিতে প্রয়াসী ছিল। পাশ্চাত্য স্বাজাতিকতার মধ্যে একটা প্রচণ্ড পরবিদ্বেষী স্বাদেশিকতার রূপ বংকিমচন্দ্র দেখিয়াছিলেন। স্বাদেশিকতার পরপীড়নমূলক আসুরিকতাকে প্রজ্ঞাদ্বারা—সংযত সাধনার দ্বারা দিব্যমহিমা দান করার জন্যই "বন্দেমাতরমের" প্রয়োজন। দেশকে ভৌগোলিক সীমার মধ্যে দেখিলেই চলিবে না, আমার ভক্তিস্পর্শে স্বদেশ সীমা ছাড়াইয়া অসীমে লীন হইয়া যাইবে—দেশ-সেবার এই দর্শনই বাংলার মনীষা সর্বকালের দেশভক্তের আদর্শরূপে উপস্থিত করিলেন।

এই স্বদেশ—মাটির বস্তু নহে। এই দেশের মধ্যে অনন্ত সত্তা বিরাজ করে। কর্মীর পক্ষে দেশের মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা শক্ত কথা নহে—বংকিমচন্দ্র ইহা শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস করিতেন। বস্তুতঃই হিন্দু যদি একখণ্ড শালগ্রামের মধ্যে অনন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পারে—দেশের মধ্যে পারিবে না কেন? সুজলা সুফলা দশপ্রহরণধারিণী দেশ-শক্তি। শরীরের মধ্যে যেমন প্রাণ, তেমনি দেশের দেহে সেই পরমাশক্তি, এই মাকে বিশ্বমায়ের সংগে একান্ত করিয়া পাইব: 'তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল-পাতা'—এইতো আমার দেশ। বংকিমের 'বন্দেমাতরম্' সেই স্বদেশপ্রাণতাকেই বরণ করিল—যে স্বাদেশিকতা, যে মাতৃভক্তি বিশ্বমায়ের মধ্যে সত্য।

পাশ্চাত্যের স্বাদেশিকতার মধ্যে যে পরবিদ্বেষ ছিল তাহা এতই উগ্র ও মূঢ় যে পাশ্চাত্যের বহু পণ্ডিত উহার জন্য দুঃখ ও লজ্জা অনুভব করিয়া উহাকে ধিক্কার দিয়াছেন। Ruskin-এর মনে হইয়াছে 'absurd prejudice', Grant Allen বলেন 'a vulgar vice', Havelock Ellis-এর দৃষ্টিতে 'a virtue among barbarians'। যে যত বেশী পর-বিদ্বেষী সে ততবড় স্বদেশভক্ত রূপে বিবেচিত হইত। স্বাদেশিকতার এই আক্রমণাত্মক পরবিদ্বেষ, এই অসহনশীলতাই মানবতার বিরোধী। কিন্তু স্বাদেশিকতার এই রূপই সত্য নয়। স্বাদেশিকতা মানবতার অবিরোধী হইয়াও যে সার্থক হইতে পারে বাংলার মনীষার ইহাই শ্রেষ্ঠ অবদান।

মানুষ, এবং মানুষের শিক্ষা দীক্ষা আদর্শ যে কত উন্নত প্রসারিত ও মহান হইতে পারে তাহার কোন সীমা নাই। সাধনার দ্বারা মানুষের উন্নতিবিধান যেমন সম্ভব—ভাবাদর্শের উন্নতি ও প্রসার তেমনি সম্ভব। মানুষ তথা মনুষ্য-সমাজ মাতৃ-ভক্তিকে এমন স্তরে আনিয়াছে যেখানে অপরের মায়ের কণ্ঠ নিপীড়ন না করিয়াও আমরা আপন মাকে পরিপূর্ণরূপে ভালবাসিতে পারি। তেমনি স্বাদেশিকতাকে দেশধর্মে পরিণত করিয়া উহাকে মানুষই পারে মানবতার অবিরোধী করিতে; শুধু তাহাই নহে, পারে মানবতার সহিত স্বাদেশিকতাকে অভিন্ন করিয়া তুলিতে। বংকিমের 'বন্দেমাতরম্' এই দিক হইতে অপূর্ব।

কিন্তু ইহা প্রচলিত হিন্দুধর্ম বা হিন্দুধারণাসম্মত ছিল না। বরং বংকিমের দেশ-দর্শন প্রচলিত হিন্দুধর্মের কাছে জুলুম মাত্র। তাই সাধু প্রকৃতির গৃহী হেমেন্দ্র প্রথমটায় বলেন, এ তো জননী নয় এ যে দেশ। বংকিমচন্দ্রের কথা,—

২২০২

দেশভক্তের অন্য মা নাই—জননী জন্মভূমিই আমাদের মা—অন্য উপাস্য নাই বলিলে বলিতে পারা যায়,—কেন, প্রাচীন ভারতে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—এ-কথা তো আছে? তাহা আছে, কিন্তু স্বদেশকে স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করা এক কথা, আর তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম—ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে, তুমি বাহুর বল হৃদয়ের ভক্তি—তোমাকে নমস্কার—তুমি অবলা নও—বহুবলধারিণী—একথা এ-যুগের বাংলার সাহিত্যিকেরই কথা—নবীন বাংলার বংকিমের কথা। এই দেশাত্মবোধের মর্মস্থল মন্থন করিয়াই বংকিমচন্দ্র বলিতে পারিয়াছিলেন—মা যে সত্যই বহুবলধারিণী, চাই এই প্রত্যয়। বলা বাহুল্য, এই প্রত্যয় দেখা দেয় মাকে ভালবাসিলে। বংকিমচন্দ্র দেশজননীকে খণ্ডিত করিয়া দেখিতে চাহেন নাই। দেশভক্তির সংকীর্ণতা কাটাইয়া উঠিবার জন্যই চাই পরিপূর্ণ রূপ। নতুবা দেশসেবার দর্শন মিথ্যা হইয়া যায়। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র দেশভক্তের, দেশ-সন্তানের রক্ষাকবচ। ইহা সন্তানকে দেশসেবার প্রেরণাই শুধু দিবে না, দেশজননী যে বিশ্বজননীরই অবিচ্ছেদ্য অংগ এই সত্যও উপলব্ধি করাইবে। পরবর্তীকালে এই একই কথা বলেন বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ :—

"ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বমায়ের
আঁচল পাতা।"

বাংলার নবযুগের এই স্বাদেশিকতা পাশ্চাত্যের মতই সক্রিয়, কিন্তু ভারতীয় বিশ্বমানবতার আদর্শে মহিমান্বিত, তাই পরজাতিপীড়ক নহে—ইহাই বুঝিবার

আমাদের জাতীয়তাবোধ আসলে কি বস্তু বাঙলার বিপ্লব আন্দোলনের সাহিত্যে তাহা লিপিবদ্ধ দেখি। শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ইংরেজী 'নিউইণ্ডিয়া' ও 'বন্দেমাতরম'-এ জাতীয়তার নবজন্ম দান করেন। শ্রীঅরবিন্দের 'ধর্ম', 'কর্মযোগিন্' সে-দিনে বাঙলার দেশকর্মীদের দেশসেবার যে দিব্য দান করিয়াছিল তাহার সন্ধান আবশ্যক।

১৯০৮ সাল হইতেই অরবিন্দ পূর্ণ সত্যের সন্ধানী। ভগবদ্বিশ্বাসী ভয় দূর করিতে হইবে—অন্তর ও বাহিরের ভয়। ব্রহ্মবান্ধব বলেন বিদেশী আদালতে বিচার চাইনা। জাতীয়তা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেন-

Nationalism is a religion that has come from God

অরবিন্দ বোম্বাই বক্তৃতায় বলেন, "Suffer that she (Mother) may rejoice."

'নিউইণ্ডিয়া'য় বিপিনচন্দ্র বলেন :—আমাদের আদর্শের নবভারত neither Hindu—nor Mohammedan—nor even British. এই তিনের সংস্কৃতি-সমবায়ে নূতন ভারত জন্মগ্রহণ করিবে। বাঙলার রাখিবন্ধন দিনে ১৯০৬ সালের ১৬ই অক্টোবর বিপিনচন্দ্র বলেন :—"প্রতি মানুষটির জীবন মহিমময়। বৃহত্তর ও মহত্তর (divine) জাতীয় জীবন অধিকতর ধন্য—কারণ, ব্যক্তি এই সমষ্টির মধ্যে স্বীয় চরম সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু ধন্য, ধন্য, সেই বিশ্বমানবতার মহাজীবনই ধন্য—যাহার মধ্যে জাতীয় জীবনের সমগ্রতার পরিপূর্তি ও পরিণতি।"

শ্রীঅরবিন্দ বাঙলার বিপ্লব-আন্দোলনের তথা 'স্বদেশী' ও 'জাতীয় আন্দোলনের স্বরূপ' ১৯০৮ সালের বোম্বাই বক্তৃতায় উদ্ঘাটিত করেন। "যখন সত্যই বাণী আসিল—বাঙালী তখন বাণী গ্রহণের জন্য প্রস্তুতই ছিল। মুহূর্তে বাঙালী সেই বাণী গ্রহণ করিল। গোটা জাতি মুহূর্তে জাগিয়া উঠিল, মোহনিদ্রা মুহূর্তে টুটিয়া গেল। বাঙালী জাতি সহসা জাগিয়া পলকে স্বপ্ন-জড়িমা ভাঙিয়া মুক্তিপথ চিনিল—এবং সমগ্র ভারতকে ঐ পথের সন্ধান দিয়া আহ্বান করিল, জাতির আছে দিব্য জীবন, জাতির দৈন্য ও দুর্গতি সত্য নয়, জাতির আছে মৃত্যুহীন জীবন, এই জীবন লাভই উহার নিয়তি, আজ বাঙলা এই সত্য এবং বিশ্বাসের মধ্যে জীবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।"

অরবিন্দ পূর্ববাঙলায় বক্তৃতা দেন ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে : "এমন সময় যখন মনে করা সম্ভব ছিল যে কতকশ্রেণীর—শাসক শ্রেণীর শিক্ষিত শ্রেণীর, হইলে ব্যবসায়ী শ্রেণীর জাগরণ যথেষ্ট বিবেচিত হইত। কিন্তু এই যুগ জনজাগরণের যুগ, এ যুগ কোটি কোটি লোকের তথা গণতন্ত্রের যুগ। বর্তমানের জীবন-সংগ্রামে যদি কোন জাতিকে বাঁচিতে হয়, যদি কোন জাতি স্বরাজ পুনরুদ্ধার এবং উহা রক্ষা করিতে চায় তাহা হইলে জনগণকে জাগাইতে হইবে—জাতীয় জীবনের সংগে তাহার সচেতন সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে—যেন প্রত্যেকে অনুভব করে জাতির অর্জিত স্বাধীনতায় সে-ও স্বাধীন।"

পরাধীনতা যে জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তির পরিপন্থী হইয়া রহিয়াছে সে কথা স্বামী বিবেকানন্দের বজ্র-বাণীতে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অধ্যাত্মজগতে যেমন ভারত প্রভু হইবার অধিকারী—আচার্যপদ লাভ করিতে সক্ষম, তেমনি রাষ্ট্রনৈতিক বশ্যতার অবসান ঘটিবে, রাষ্ট্রক্ষেত্রেও ভারত নিজের প্রভু হইবে। বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে দিগ্‌বিজয় বাঙলার যুবকগণকে আত্মসম্বিতে সচেতন করিল—ত্যাগী ব্রহ্মচারী স্বদেশপ্রাণ সন্ন্যাসী সাজাইল। সে যুগে বহু বিপ্লব-কর্মী প্রকৃতপক্ষে স্বামীজীর আদর্শে জীবন গঠন করিতে, তাঁহারই বাণী জীবনে সার্থক করিতে শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিল। সাক্ষাৎভাবে না হইলেও, স্বামীজীর বীর মূর্তিই যেন গুরু—তাঁহারই নিকট তরুণ-বাঙলা লইল দীক্ষা। স্বামীজী যে তদ্‌গত-চিত্ত, বীরভক্ত যুবকদের কামনা করিয়াছিলেন—সেই আদর্শে জীবন গঠন করিবার জন্যই ত্যাগী-ব্রহ্মচারীর জীবন তাঁহারা যাপন করিতেন। গীতা তো ছিলই, তাহার সঙ্গে স্বামীজীর বক্তৃতাবলী, বিবিধগ্রন্থ, স্বামীজীর শিষ্য শরৎ চক্রবর্তীর "গুরুশিষ্য সংবাদ" হইয়া উঠিল নব-গীতা, নব-জীবন-বেদ।

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু হয় ১৯০২ সালে। ইতিমধ্যে স্বামীজীর উদ্বোধন মন্ত্রে জাতি উদ্বুদ্ধ হইতেছে। ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজের তৎকালীন প্রতিষ্ঠা যে মূল্যহীন, বেদান্ত-কেশরী তাহা সুস্পষ্ট বুঝিয়াই সমগ্র জাতির মধ্যে সমপ্রাণতার বাণী দান করেন :—এই দীন দরিদ্র কৃষক-মজুরই জাতির মেরুদণ্ড, শক্তি যে রহিয়াছে ঐখানে, ওরাই জাতির ভরসা, তথাকথিত শিক্ষাভিমানী ভদ্রগণ নয়—দেশাত্মবোধের এই মর্মকথাই স্বামীজী ঘোষণা করেন।

বংগভংগ রদ করিতে যখন বিদেশী বর্জনের দারুণ প্রতিজ্ঞা লইয়া পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে বাঙলার ছাত্রগণ জোর 'পিকেটিং' চালাইতেছিল, আর প্রৌঢ়গণ বক্তৃতা দ্বারা তাহাতে ইন্ধন যোগাইতেছিলেন, তখনও কিন্তু বাহির-নিরপেক্ষ হইয়া বাঙালী দেশাত্মবোধকে একান্ত ভাবে আশ্রয় করে নাই—তখনও লর্ড কার্জনের হঠকারিতাই ছিল তাহাদের দেশসেবার প্রধান উপকরণ।

তখন বাঙালী উন্মাদকণ্ঠে গাহিত—

"সাত কোটি লোকের করুণ ক্রন্দন,
শুনে' না শুনিল কুর্জন দুর্জন
তাই, নিতে প্রতিশোধ মনের মতন
করিলাম রাখি-বন্ধন।"

তারপর গাহিল—

"নগরে নগরে জ্বাল্‌রে আগুন
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ,
বিদেশী বাণিজ্যে কর্‌ পদাঘাত
মায়ের দুর্দশা ঘুচারে ভাই।"

শুধু বিদেশী বাণিজ্যে পদাঘাত করিলেই যে মায়ের দুর্দশা ঘোচে না—একথা বাঙালীর কাছে তখনও সত্য হইয়া উঠে নাই। কিন্তু দুই দিন না যাইতেই, বাংলার প্রাণে স্বদেশীর যে শুদ্ধ সত্য ধারা বহিতেছিল, কবি ও সাহিত্যিকদের কণ্ঠে তাহা মূর্ত হইয়া উঠিল।

যে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি একদিন বিদেশীর সংগে তুলনা করিয়া, বিদেশীর সুখ সভ্যতা সম্পদের কাছে দাঁড়াইয়া নিজেদের কেবলি ছোট ভাবিয়া, দেশের দুঃখে গাহিয়াছিলেন, 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি', 'একি অন্ধকার এ ভারতভূমি' প্রভৃতি নানা দুঃখ-দৈন্যের গান, সেই রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিই দেশাত্মবোধের নূতন ধারায় অবগাহন করিয়া গাহিলেন,—

"ওগো মা, তোরে দেখে দেখে
আঁখি না ফেরে।
তোর দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে।"

দেশ যে সনাতন, দেশ যে কুর্জনের আগেও ছিল পরেও থাকিবে—ইংরেজ সভ্যতার সৃষ্টির আগেও ছিল পরেও থাকিবে—সত্যকার দেশ যে জীবন্ত—সেখানে আমার ভক্তি আশ্রয় করিলে আর ত সে ছোটটি থাকে না। মাকে ত কোন অবস্থায়ই কেহ ছোট ভাবিতে পারে না—মাতৃত্ব নিজেই যে সত্য, পূর্ণ। তাই অনুতাপে কবি গাহিলেন—

"যখন অনাদরে চাইনি মুখে,
ভেবেছিলাম দুঃখিনী মা,
আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে,
দুঃখের বুঝি নাইকো সীমা"—

কিন্তু আজ মাকে চিনিয়াছি—মার ঐশ্বর্যে, মার চরণের দীপ্তিতে আকাশ আজ আলোকিত—

"আকাশে আজ ছড়িয়ে গেছে,
ঐ চরণের দীপ্তিরাশি।"

কাঙাল যে আর আমি নই, তাহাও জানিয়াছি ; মার হৃদয়ে, যেখানে রতন মাণিক জমিয়া আছে, তাহারও সন্ধান পাইয়াছি—

"কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, হৃদয়ে তোর রতন রাশি,
জানি মা তোর মূল্য জানি,
পরের আদর কাড়বো না, মা।
আমি তোমায় ছাড়ব না।"

শুধু কি তাই! দেশমাতৃকার মধ্যে বাঙালী কবি তখন বিশ্বমাতাকে সত্য করিয়া উপলব্ধি করিলেন—

"ও আমার দেশের মাটি
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

অনেক সময় বাহিরের কোন ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া মানুষ ও জাতি জাগে—কিন্তু যদি সে জাগরণের উপকরণ শেষে নিজের মধ্যেই সে একান্ত করিয়া না পায়, তবে তাহার জাগরণ কখনো স্থায়ী হয় না। কারণ বাহিরের তাগিদ, আঘাত তাহাকে বরাবর সজাগ রাখিতে পারে না, কর্মের দ্যোতনা দিতে পারে না ; তাগিদ আসা চাই ভিতর হইতে, অন্তরের মণিকোঠায় যে আত্ম-দেবতা রহিয়াছেন সেইখান হইতে,—তবেই তাহা স্বাভাবিক হয়, সত্য হয়, সুতরাং স্থায়ী হয়।

কথাটা হইতেছে এই, লর্ড কার্জনের বংগভংগকেই যাহারা দেশসেবার প্রধান ও শেষ উপকরণ করিয়াছিল, তাহারা দুইদিন পরে—যখন 'আসল পথে আঁধার নেমে' তখন—আর দেশসেবায় লাগিয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু যাহারা বংগভংগকেই আর দেশসেবার উপকরণ করিয়া দেখিল না—দেশকে বাহির-নিরপেক্ষ হইয়াই পাইল—তাহারা ঘন অন্ধকারেও পথ খুঁজিল, সহজে আর ফিরিল না।

বাংলার সাহিত্য এই জাতীয় আন্দোলনে কি অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহার বিশদ পরিচয় দেওয়া এ-স্থলে সম্ভব নহে। বাংলা সাহিত্যিকরা যে বিপ্লব-কর্মীদের দোসর রূপে আন্দোলনের সংগে সংগে চলিয়াছিল, তাহাই দেখাইব। এ-ছাড়া এ যেন গোটা জাতির আন্দোলন—গণ-আন্দোলন। তাই রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া পল্লীর অখ্যাত কবিও সার্থক রচনার অর্ঘ্য সাজাইয়াছেন। মিথ্যা যশের জন্য নয়—আন্তর প্রেরণায়। যার যা' শক্তি সবই যে দিতে হইবে এই মাতৃ-পূজায়।

৬

স্বদেশী ও সাহিত্যে যোগাযোগ

বাংলার স্বদেশী আন্দোলন বস্তুতঃই আদর্শ জাতীয় আন্দোলন। জাতির সর্বাঙ্গে এই আন্দোলনের স্পর্শ। জাতীয় আন্দোলন ভাব-সংঘাত হইতেই প্রাণ-শক্তি অর্জন করে। জাতির সাহিত্যে উহার ছাপ অনিবার্য। দেশে জাতীয় আন্দোলন চলিতেছে অথচ সাহিত্যে তাহার ছাপ নাই, ইহা বস্তুতঃই অস্বাভাবিক। হয় জাতীয় আন্দোলন মিথ্যা, নয়তো সাহিত্যিক উদাসীন। একটা জাতি রাজনৈতিক মুক্তি চাহিতেছে—চলিয়াছে সংগ্রাম—দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা, মৃত্যু,—তথাপি সংগ্রামের শেষ নাই। সাহিত্য সৃষ্টির এইরূপ শ্রেষ্ঠ উপাদান থাকা সত্ত্বেও যদি সাহিত্যিক সেই উপাদান যথাযথ কাজে না লাগায়, অথবা রাজশক্তির শাসনদণ্ডের ভয়ে সাহিত্যিক উদ্যমে বাধা পড়ে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে জাতির রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার সংগে সাহিত্যের যে যোগ বাঞ্ছনীয় সাহিত্যিক তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। স্বদেশী যুগ প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী শিল্পের যুগ, স্বদেশী সাহিত্যের যুগ—স্বদেশী সংগীতের যুগ—স্বদেশী দর্শনের যুগ। এক কথায় স্বদেশী সর্বগ্রাসী বা সর্বগ্রাহী। সাহিত্য এই স্বদেশী যুগকে আশ্রয় করিয়া যেমন পুষ্ট হইয়াছে, তেমনি সাহিত্যও স্বদেশীকে পুষ্ট ও মহিমান্বিত করিয়াছে।

সাহিত্যের সংগে রাজনীতির এই যে নিবিড় সম্বন্ধ, ইহাই উভয়ের পরিপূরক হিসাবে উভয়কে পুষ্ট করিয়াছে। তাহারই কিছু পরিচয় দিতেছি :

বিপ্লবীকে বলা হইতেছে,—"বৃটিশের শক্তি দুর্বার, প্রবল সামরিক শক্তির সে অধিকারী, তাহার উপর দেশের লোকই তো বৃটিশ শাসক সম্প্রদায়ের

[illegible]। বৃটিশের অর্থের অভাব নাই,—অস্ত্রের অভাব নাই। আপনাদের অস্ত্র কোথায়, সামরিক শক্তি-সামর্থ্য কোথায়, লোকবলই বা কোথায়?" তখন বাংলার কবিই বিপ্লবীর কণ্ঠে ভাষা দিলেন:

"যার মাতৃ-কণ্ঠে বাজিছে শৃঙ্খল
দুর্বল সবল সে কি ভাবিবে?"

এই ভাবাবেগে প্রশ্নই যে ভাসিয়া যায়। ভাবাতিশয্যে পাগ্‌লামো থাকে। কিন্তু কবি-সাহিত্যিক উহাকেই দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এমনই মহিমান্বিত করিয়া তোলেন যে উহা সকল হিসাব-বুদ্ধির বাহিরে চলিয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দ পত্নী মৃণালিনীকে তাঁহার তিনটি 'পাগলামী'র পরিচয় প্রসংগে লেখেন: "দেশকে মা বলিয়াই জানি। কোন রাক্ষস যদি সে মায়ের বুকে বসিয়া রুধির পান করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সংগে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে ছুটিয়া যায়?" ইহা ভাবোচ্ছ্বাস মনে হইতে পারে—কিন্তু ইহার আবেদন রোধ করিবে কে? দুর্গম পথে যাত্রার প্রয়োজন, আজ মৃত্যুভয় তুচ্ছ করা চাই—জানিয়া শুনিয়া বিপদ বরণ করিতে হইবে—দেশজননীর শৃংখল মোচন করা তো মরণভীরু দুর্বল-চিত্তের কর্ম নয়। কবি-কণ্ঠে আহ্বান আসিতেছে:—

"কে আছ বিপদে না করি দৃক্‌পাত মৃত্যু নির্যাতন দৈব বজ্রাঘাত
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে মার মুখ চেয়ে—এসো কে মরিতে পারিবে?"

হয়তো স্বাধীনতার দুর্গম পথে যাত্রা করিয়াও সিদ্ধির মুখ দেখিব না, ব্যর্থ ই হইতে হইবে। হউক না ব্যর্থ এই প্রয়াস, তবু দেশের মুক্তি-কামনায় মরিতে হইবে—চলিতে হইবে। কবি শুনাইলেন:—

"হউক ভগ্ন জলধিমগ্ন, তবু তরী বাহি মরিবি কে—
আয় আজি আয় মরিবি কে?"

শাসক-শক্তি শাসাইতেছে—'রক্তপাত হইবে, সাবধান!' প্রত্যুত্তরে বিপ্লবীর সংকল্প কবির কণ্ঠে ভাষা পাইতেছে—

"ডরিনা রক্ত ঝরিতে ঝরাতে, দৃপ্ত আমরা ভক্তবীর!
শুধু মায়ের চরণে নম্রশির!"

মায়ের সন্তান আজ মায়ের জন্য মরিতে ভয় পাইতেছে না—বাংলার মায়ের মুখ আজ এই কারণেই উজ্জ্বল।

"মা'র মুখ চেয়ে আত্মবলি দিয়ে—সে-মুখ উজ্জ্বল করিবে।"

বিচক্ষণ বিবেচক বুদ্ধিমানরা—বিপ্লব-প্রয়াসকে পাগলামি মনে করে। কবি ভরসা দেন :

"যে তোরে পাগল বলে
তারে তুই বলিসনে কিছু !

*   *   *

আজকে তোরে পাগল ভেবে
অঙ্গে যে তোর ধূলা দেবে
কাল সে প্রাতে আপনা হতে
আসবে রে তোর পিছু পিছু।"

বিপ্লবীর মনেও প্রশ্ন জাগে—আমাদের প্রয়াস কি সফল হইবে না ? কবি আশ্বাস দেন :

"হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে
ওহে বীর হে নির্ভয়।"

পথে নামিয়া যাহাদের ভাবনার অন্ত থাকে না—এই দুর্গম বিপ্লব-পথ তাহাদের নয়। বিপ্লবীরাও দ্বিধাগ্রস্ত মরণ-ভীরুদের চাহে নাই। কবির কথাও তাই :

"যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না।
যদি তোর ভয় থাকে তো করি মানা।
যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে
ভুলবি যে পথ পায়ে পায়ে ;
যদি তোর হাত কাঁপে ত নিবিয়ে আলো
সবায় করবি কাণা।"

এতো যে দিতে হবে বিনিময়ে পাবো কি ? এ দানের প্রতিদান কি ? ফল লাভ কি,—হিসেবী-বুদ্ধি এমন কত প্রশ্ন তুলিবে। কিন্তু বিপ্লবীর এই যাত্রাপথে পাওয়ার প্রশ্ন নাই—দেওয়ারই আহ্বান। এই পথেরই দর্শন কবির কণ্ঠে শুনি :

"যদি তোর আপন হতে অকারণে
সুখ সদা না জাগে মনে,
তবে কেবল তর্ক করে সকল কথা
করবি নানা খানা।
তুই ফিরে যা' না।"

আদর্শ বিপ্লবীর চাই আত্মত্যাগের আত্মপ্রসাদ—সর্বরিক্ততার সর্ব-প্রাপ্তি। দেখিতে পাই—বিপ্লবীর জীবনদানের তপস্যা কবি ও সাহিত্যিককে প্রভাবিত করিতেছে। এই অপূর্ব যোগাযোগ ভিন্ন কোন আন্দোলনই জাতীয় আন্দোলন হইয়া উঠে না।

জাতীয় সাহিত্য জাতির আত্মার বাণী। জাতীয় সাহিত্য জাতির জাগরণের, জাতির জীবনের পশ্চাতে পশ্চাতে চলে না—জাতিকে লইয়া আগাইয়া যায়। অথবা বলা চলে, জাতির জীবন লইয়া সাহিত্য চলে বটে, কিন্তু সেই জীবনটি যেমনতরো হওয়া চাই—তাহারই আদর্শ অগ্রে অগ্রে পরিবেশন করিতে করিতে সাহিত্য আগাইয়া যায়; সেই উধ্বর্যাত্রার সংকেত-শঙ্খধ্বনির পশ্চাতে পশ্চাতে উজান বাহিয়া আসে জাতীয় জীবনের ভাব-গঙ্গা; জাতির মরাগাঙে বান ডাকে—মৃত সাগর বংশ সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। বাংলার সাহিত্যিকদের সাহিত্য-সাধনায় অন্ততঃ ঐ যুগে আমরা তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি—কিসে আমার জীবন ধন্য হইবে? কবির কণ্ঠে বিপ্লবীর কামনা মূর্ত হইল—

"আমি ধন্য হব মায়ের জন্য লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিলে।
আমার যায় যেন জীবন চলে,
শুধু তোমার কাজে জগৎ-মাঝে 'বন্দে মাতরম্' বলে।"

বলদর্পিত বিদেশী শাসক শক্তি পীড়নের দ্বারা জাতির স্বাধীনতার সত্য-সংকল্পকে কি ব্যর্থ করিতে পারিবে—অত্যাচারী রাজশক্তিরই হইবে জয়, সত্যের প্রতিষ্ঠা কি বিধাতার আশীর্বাদ পাইবে না—বিধির বিধান মিথ্যা হইবে? কবি শাশ্বত বাণী উচ্চারণ করিতেছেন—

"বিধির বিধান কাটবে তুমি এতো শক্তিমান?
আমাদের ভাংগা-গড়া তোমার হাতে এতো অভিমান?

শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও
হও না যতই বড়—আছেন ভগবান।"

সত্যের প্রতি এই আস্তিক্য বুদ্ধি সাধনার সিদ্ধিতে বিশ্বাস আনিয়া দেয়।

অত্যাচার কর—ভয় দেখাও—ভয়ই ভাঙিবে। জাতির অভ্যুত্থানপ্রয়াসকে বজ্রবাঁধনে বাঁধিতে চাহিতেছ, বাঁধ; উহাই ভয় ভাঙাইবে, বাঁধন আল্‌গা করিবে। ওদের আঘাত যত জোরে পড়িবে আমাদের সংকল্পের দৃঢ়তা ততই বৃদ্ধি পাইবে।

"ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে
ওদের আঁখি যত রক্ত হবে—মোদের আঁখি ফুটবে
ওরা যত জোরে মারবেরে ঘা ততই যে ঢেউ উঠ্‌বে।"

বাংলায় তখন দমননীতির নিষ্ঠুর রক্তচক্র চলিয়াছে। উহার সম্মুখীন হইতে হইবে জাতিকে। কবি এই নির্যাতনের ফলে জাতির অধিকতর সংকল্প-নিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখিতেছেন।

জাতীয় আন্দোলনের কর্মী ও আন্দোলনের চারণ হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। কোথাও বিপ্লবীদের এক পা আগে আসিয়া সাহিত্যিক পথ দেখাইতেছে; আবার কোথাও বিপ্লবীদের জীবনদানের তপস্যা, দেশজননীকে ভালবাসার শ্রেষ্ঠ মূল্যদানের মহিমা—সাহিত্যিককে প্রেরণা দিতেছে; বিপ্লবীদের জীবন সাহিত্য-সৃষ্টির উপাদান হইয়া উঠিতেছে। কল্পনাকে হার মানাইয়া চলিয়াছে—বাস্তব ঘটনা। বাংলার বিপ্লবীদের অকুতোভয় অভিযানের চরণ-ছন্দে সাহিত্যের শতদল ফুটিতে লাগিল। তাই না কবি বলেন: "দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া!"

পরবর্তীকালে এমনটি হয় নাই। ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে মহাত্মাজীর আবির্ভাব এবং তাঁহার আন্দোলন—শুধু ভারতে নয়—সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে এক মহান্ গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। মহাত্মাজীর অহিংসা—সত্যাগ্রহ-আদর্শের জন্য নিয়ত-সংগ্রাম-নিষ্ঠা—অপূর্ব। মহাত্মাজী স্বয়ং তাঁহার আদর্শ ও নীতির জীবন্ত বিগ্রহ। এ-ছাড়াও তাঁহার কর্ম ও আদর্শের দর্শন তিনি দান করিয়াছেন, তাঁহার অজস্র ভাষণে-লিখনে বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র দেশের সাহিত্যিক ও কবির অংশ উহাতে কতটুকু? অমন যে বাংলা সাহিত্য তাহার মধ্যেও বিরাট অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক সংগ্রাম-পদ্ধতি লইয়া

সাহিত্য-সৃষ্টির তেমন প্রয়াস নাই। স্বদেশী ও বিপ্লব আন্দোলনে বাংলার সাহিত্য সৃষ্টিতে সাহিত্যের যে চিরন্তন আবেদন দেখি, ছোট-বড় অসংখ্য কবি ও সাহিত্যিকের মংগল স্পর্শ লক্ষ্য করি, পরবর্তী কালে তেমন দেখি না। অসহ-যোগের অধ্যায়ে কবি নজরুল এবং অপর দু' একজন কবির যে প্রেরণা দেখি, তাহাও ঐ পূর্বেকার বিপ্লবী-প্রেরণা। যথা :

"দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল ভুলিতেছে মাঝি পথ
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ;
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ,
এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।

* * * *

কাণ্ডারী! তব সমুখে ওই পলাশীর প্রান্তর
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর
ঐ গংগায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর
উদিবে সে রবি আমাদের খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেলো যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান ?"

অথবা নজরুলের অপর সংগীত

"মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়
মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যুজয়ের ফল

* * * *

মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।"

অথবা

"চল্‌রে নওজোয়ান শোন্‌রে পাতিয়া কাণ
মৃত্যু-তোরণ দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান।
ভাঙ্‌রে ভাঙ্‌ আগল, চল্‌রে চল্‌রে চল্।"

এই সব সংগীত শ্রোতার মনে যে প্রেরণা জাগায় তাহাও পূর্বেকার সেই রক্তাক্ত জীবন দানের, বিপ্লবের দুর্গম পথ-যাত্রারই প্রেরণা। কবির আবেদনে যে সুর ধ্বনিত হইতেছে তাহাও অসহযোগপূর্ব বিপ্লবেরই সুর—অহিংসা ও অসহযোগের

মধ্যে যে মহান বীর্যবত্তার সংযত সাধনা আছে তাহার প্রেরণা আসিতেছে না। কবিও যেন স্বাধীনতার জন্য সেই পুরাতন বিপ্লবীদেরই জয়গান করিতেছেন।

বলিয়াছি, সাহিত্য জাতির আত্মার বাণী। বাংলার বিপ্লব-সাধনা জাতির গোটা অন্তরাত্মাকে অধিকার করিয়াছিল—সাহিত্য ও সাহিত্যিক তাহা হইতে দূরে থাকিতে পারে নাই। জাতির সমগ্র সত্তাকে উহা নাড়া দিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলনের প্রেরণা সাহিত্যিকদের মধ্যে স্বদেশীযুগের সেই সৃষ্টির প্রেরণা আনিতে পারে নাই, তাহার কারণ মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন বাঙালী গ্রহণ করিলেও উহার নব আবেদনে সে অভিভূত নহে, পুরাতন খাত বহিয়াই যেন উহা আসিয়াছে; তাই বাংলার কবিমনে উহার যথেষ্ট প্রভাব নাই।

এই সত্য লক্ষ্য করিবার ও বুঝিবার যে, স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ, আরম্ভ করিয়াছে, চলিয়াছে আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী অভিনব মুক্তি-সংগ্রাম—কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাই না। একজন দরদী সমালোচক বলিতেছেন :—বাংলার মাসিক পত্রগুলি পাঠ করিলে একজন বিদেশী লোক বুঝিতেই পারিবে না, আমাদের দেশে রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রাম চলিতেছে। যখন পরাধীনতার দুঃখে আগুন জ্বলিবার কথা, বাংলা সাহিত্যে তখন চোখের জলের বান ডাকিতেছে। যখন মুক্তিসংগ্রামের যাত্রীদের তূর্যধ্বনি শুনাইতে হইবে,—তখন বাংলা মাসিক সাহিত্য যৌন-সমস্যার সূক্ষ্ম আলোচনার ফাঁপরে পড়িয়াছেন।” অবশ্য হালে—তথা আধুনিক কালে বাংলার কতিপয় শক্তিমান সাহিত্যিক জনগণের সাহিত্য সৃষ্টির সুমহান ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আশা আকাংক্ষা ও বৈপ্লবিক আবেদন সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান হইয়াছে। এই দিকে শক্তিশালী লেখকদের আবির্ভাব লক্ষ্য করিতেছি। ইহা স্বতন্ত্র কথা—স্বতন্ত্র অধ্যায়ের কথা। সে কথা থাকুক; বলিতেছিলাম স্বদেশী যুগের কথা। স্বদেশী যুগ যেমন বাংলা জাতীয় সাহিত্যের পটভূমিতে দেখা দেয়, তেমনি দেখিতে পাই এই স্বদেশী যুগে তথা বঙ্গ-বিপ্লব-যুগে বাংলার কবি—সাহিত্যিক—সাংবাদিক স্বদেশী ভাবকে পুষ্ট করিয়া তোলেন। জ্ঞাত অজ্ঞাত কত কবির যে দেখা মিলে তাহার ইয়ত্তা নাই। রবীন্দ্রনাথের অজস্র দানের কথা বলিয়া শেষ করিতে পারিব না; তবে ইহা বলিব—দেশাত্মবোধক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতগুলি—প্রেরণামূলক

সঙ্গীতগুলির অধিকাংশ ঐ স্বদেশী যুগের—বঙ্গ-বিপ্লব-যুগের দান। ঐ স্বদেশী যুগের কতিপয় সঙ্গীতের পরিচয় লইলে আমরা বুঝিতে পারিব, ঐ যুগের চিত্তলোকে স্বদেশী আন্দোলন কতটা গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছিল—জাতির আশা-কামনা স্বদেশী সাধনার সংকল্প কিভাবে বাংলার সঙ্গীত সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল।

প্রথম যুগে স্বদেশী গান মিলে না, পুরাণো গানই নূতন ভাব জাগায়। হেমচন্দ্রের 'বাজরে শিঙা বাজ এই রবে', মনমোহনের 'দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন', গোবিন্দ রায়ের 'কতকাল পরে বল ভারতরে', রবীন্দ্রনাথের 'একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক জগতজনের শ্রবণ জুড়াক', 'বন্দেমাতরম্' সংগীতও গাওয়া হইত।—অতঃপর গানের অভাব কবিগণ ও গায়কগণ পূরণ করিতে লাগিলেন। ভাব সম্পদে তাহা অতুলনীয়। কামিনী ভট্টাচার্যের 'জাগো, ওগো কাঙালিনী জননী!' 'অবনত ভারত চাহে তোমারে'।—রজনীকান্তের 'সেথা আমি কি গাহিব গান'—কাব্যবিশারদের 'স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান।' সত্যেন দত্তের 'কোন দেশেতে তরুলতা, সকল দেশের চাইতে শ্যামল।' অজ্ঞাতনামা কবির 'ভুলোনা, ভুলোনা এদেশের কথা'—অপর অজ্ঞাত কবির 'মেরে সোনেকা হিন্দুস্থান।' আচার্য মনোমোহনের 'চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে ও ভাই জীবন আহবে চল্।' সুন্দরীমোহনের—'চাই না তব শিক্ষা'—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের—'বঙ্গ আমার জননী আমার'—শুধুই কি গান। নাট্যকারগণের বলিষ্ঠ প্রেরণা আসিতে লাগিল—গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' 'স্বদেশী'র পূর্বযুগে প্রেরণা যোগাইয়াছে। নাট্যকারগণই শুধু নহে। মুকুন্দের যাত্রা—ভূষণদাসের যাত্রা জনমনকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিল। মুকুন্দের গান—'দশ হাজার প্রাণ যদি আমি পেতাম।' ভূষণ দাসের—'আর আমরা পরের মাকে মা বলিয়ে ডাকব না'—এমনি কত কবির কত গানই আছে। সামান্য কয়েকটি কথাই উল্লেখ করিলাম। এছাড়া সাধারণ পল্লী-কবিদের চিত্তেও স্বদেশী যুগ দোলা দিয়াছে।

ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অজ্ঞাত কবির দল—জনগণের চিত্তলোকে ক্ষুদিরামকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। 'এবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'—এই গানটির প্রচলন ছিল খুব, কিন্তু ইহা তেমন ভাবসমৃদ্ধ নয়। ক্ষুদিরাম সম্পর্কে আগরতলার সভা-কবি মদনমোহন মিত্রের গানটি উল্লেখযোগ্য। পুলিশ

তখন স্বদেশী গান নিষিদ্ধ করিয়াছে। সভা সমিতিও যেমন নিষিদ্ধ—দশজনকে শুনাইয়া স্বদেশী সঙ্গীত করাও তেমনি অসাধ্য। কিন্তু পল্লীর দুইটি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ছেলে স্বদেশী গান করিয়াই ভিক্ষা করিত। পুলিশ তাহাদেরও ধমক ধামক দিয়াছে। ওরা তখন খঞ্জনী বাজাইয়া আবার নিমাই সন্ন্যাসে সুর তুলিয়াছে—

"আমার নিমাই সন্ন্যাসে গেল ভারতীর সনে"

এ-ছাড়া ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়াই বেশী কিছু বলিত না। মদন বাবুর রচিত গানগুলি ওরা গাহিয়াছে। তাঁহার রচিত ক্ষুদিরামের গান যেটুকু মনে আছে লিপিবদ্ধ করিতেছি—

ও ভাই ক্ষুদিরাম! সকলকে ছেড়ে গেলিরে!
ও ভাই ক্ষুদিরাম।
গেলিরে স্বর্গপুরে না জানি কত দূরে
ভব-সিন্ধুর ওই-পারে করিলি বিশ্রাম।
ক্ষুদি তুই ত্রাণ পেলি, যে-পথ দেখায়ে গেলি
সে পথ বিনে বাঙ্গালী পাবেনা আরাম।"

কিন্তু স্বর্গে প্রফুল্ল আছে তো?—

"প্রফুল্ল সখার সনে, দেখা কি হয় সেখানে
পিতামাতার চরণে ঘটে কি প্রণাম?"

স্বর্গবাসী ক্ষুদিরামকে কবি অতঃপর স্বাধীনতার প্রশ্ন শুধাইতেছেন—

"মানবের স্বাধীনতা যদি না থাকে সেথা,
তবে যে মানবের বৃথা, বৃথা স্বর্গধাম!
ও ভাই ক্ষুদিরাম।"

স্বাধীনতা ভিন্ন স্বর্গও চাই না!

দেশ আছে বটে কিন্তু দেশের মালিক আমরা নই। ইংরেজ-শাসনকালে নানা সমৃদ্ধির জৌলুষ দেখি, কিন্তু শোষণে জাতি যে নিঃস্ব হইয়া গেল। কবির গান—

"তড়িতের দীপ্‌নি করে, বাংলা আলো করে
তবু ঘোর অন্ধকারে বাঙালী রয় এখন—
আমাদের বংগভূমি আমাদের নয় এখন—
বণিকের রংগভূমি বণিকালয় এখন।"

ইংরেজ আমলে আমাদের দুঃখ বাড়িয়াছে—পূর্বে এমন হাহাকার ছিল না। পূর্ববঙ্গের পল্লীকবি 'মোমিন' বলিতেছেন :

"সোনার ছ্যাশে শয়তান আইসারে
ছ্যাশে আগুন জ্বালাইল।
মোদের ফকির বানাইল।"

মুকুন্দদাসের—"ছিল ধান গোলাভরা
শ্বেত ইন্দুরে করলে সারা।"

স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের—

"স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে
এ-দেশ তোদের নয়!
এ-যমুনা গঙ্গানদী এ-সব তোদের হতো যদি
পর পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বায়!"

কবি আদর্শ স্বদেশ-ভক্তের কামনা করিতেছেন :

"লোহার চাইতে বেশী শক্ত ভক্তবীরের মাংস রক্ত
তাঁদের বুকের অস্থি দিয়া বজ্র তৈরী হয়।"—

তাদেরই যে প্রয়োজন, অন্যথায়—

"কুকুর মেকুর ছাগল কবে দেশের মালিক হয়?"

পরবশকে ধিক্‌কার দিতেছেন :

"নপুংসকের গোষ্ঠী তোরা—জন্ম অন্ধ কানা খোঁড়া
ভিস্তি-আলা পাংখা কুলি—পীলা ফাটার ভয়
কার স্বদেশে সর্বনেশে এমন অভিনয়!"

এই সকল সঙ্গীতে দেশভক্তির চিরন্তন আবেদন নাই বটে—কিন্তু স্বদেশী যুগে যুগোপযোগী তথা সাময়িক সঙ্গীতের অজস্র ধারা যে বাংলার শত শত কবি বহাইয়াছিলেন তাহা অনুভব করিবার।

স্বদেশী আন্দোলন দমনের প্রয়াস

সেই বয়কটের পুরাদমের সময়, নেতাদের গাড়ীও খুব টানা হইল। ঘোড়াগুলি বুঝি হতভম্ব হইয়া ভাবিল—'এরা ক্ষেপেছে!' তখনও ফুলের মালা, বাহবা, ধন্য ধন্য থামে নাই। কয়দিন পরেই যখন সরকার রুদ্রমূর্তি ধারণ করিলেন, মুসলমানদের সহায় করিয়া নির্যাতন আরম্ভ করিলেন—পূর্ব বাংলার জামালপুর প্রভৃতি স্থানে মুসলমানেরা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হইল না—তখন আন্দোলনের গতিভংগি চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইতে দেশের লোক সংঘবদ্ধ যুবশক্তি কামনা করিতে লাগিল—এই অনুকূল বাতাসে হু হু করিয়া 'সমিতি'র পত্তন হইতে লাগিল। যুবকগণ দলবদ্ধ হইয়া শরীর-চর্চা, লাঠিখেলা চালাইল—দলবদ্ধ হইয়া নানাস্থানে অত্যাচারের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হইয়া উঠিল। স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানেরা শুধু যোগ না দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বিরুদ্ধতাও করিতে লাগিল। জামালপুরে হিন্দুর প্রতিমা উন্মত্ত মুসলমানেরা ভাঙিয়া ফেলিল: কুমিল্লায় ঢাকার নবাব বাহাদুরের গমন উপলক্ষে দাংগা-হাংগামা বাধাইল। একদল মুসলমান হিন্দুদের নির্যাতন করিতেও চেষ্টা করিল, হিন্দু যুবকেরাও আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইল। ইংরেজের ভেদনীতির জয় হইতে দেখিয়া দেশভক্ত হিন্দুমুসলমান সমভাবেই মর্মপীড়া ভোগ করিতে লাগিলেন। জামালপুরে উন্মত্ত জনসংঘকে কে বা কাহারা গুলি করিল। পরে জানা যায় কলিকাতার বিপ্লবকেন্দ্র হইতে প্রেরিত লোকের দ্বারা গুলি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বিপ্লববাদীরা এই সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল না। তাহারা এই উন্মাদনার মধ্যেই তাহাদের দলপুষ্টি করিয়া যাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, এই বিরোধের মূলে যে ইংরেজের ভেদনীতিই কার্য করিতেছে, বিপ্লববাদীরা এই কথাই বুঝিল; এবং ইংরেজের উপরেই অধিকতর বিরূপ হইয়া উঠিল। মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা বা দুর্বুদ্ধি তাহাদের ছিল না। তবে বাঙালীকে সর্ববিধ সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত ও সজাগ করিতে যুবকদের বাছিয়া বাছিয়া দলে লইতে লাগিল। কৃত্রিমযুদ্ধের প্রদর্শনীতে এই প্রস্তুতির প্রমাণ মিলিতেছিল।

এই সংঘর্ষের মধ্যে যে নূতন শক্তি জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহা দেখিয়া যুগপৎ রাজপুরুষেরা ও দেশের মাথাওয়ালা নেতারা সকলেই শংকিত হইয়া উঠিলেন। নেতারা বক্তৃতা পর্যন্তই দিয়াছেন, কিন্তু সত্যই যে বাংলার যুবকগণ তাঁহাদের হাতছাড়া হইয়া ক্রমে এক নূতন পথের পথিক হইয়া পড়িতেছে, তাহার ইংগিত পাইয়া তাঁহারা কতকটা শংকিত হইয়া উঠিলেন। রাজপুরুষেরাও দেখিলেন, মুসলমানদের লেলাইয়া বা গুরখা-পিটুনীর দৌলতে বাঙালীকে ঠাণ্ডা করা যায় নাই, বরং সংঘর্ষের মধ্যে নূতন শক্তির আস্বাদ পাইয়া বাঙালী নূতন ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। রাজশক্তির একথা বুঝিতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। যাহাই হউক, সরকার মূলে কুঠারাঘাত করিতে নূতন আইন করিয়া সমিতিগুলি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন—নানা আইনের নাগপাশে জাতিকে বদ্ধ করিলেন। সভা সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়ার ও বাহবা পাওয়ার কোন সুযোগই আর রাখিলেন না। যাঁহারা 'প্ল্যাটফরম্' কাঁপাইয়া কত বক্তৃতা দিতেন তাঁহারা ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন। কিন্তু সব ঠাণ্ডা হইল না। পূর্বেই বলিয়াছি, বংগভংগের পূর্বেই বাংলায় কয়েকটা বিপ্লব-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার অনুষ্ঠাতারা সহানুভূতির অভাবে তখন কিছুই ব্যাপক ভাবে করিতে পারেন নাই। এই সমস্ত সমিতি স্থাপিত হওয়ার পর তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র বাড়িল। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক প্রকাশ্য সমিতির মধ্যেই অল্প বিস্তর ইঁহাদেরই প্রভাব আসিয়াছিল।

'যুগান্তর' ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকা একপ্রকার প্রকাশ্যেই গুপ্তসমিতির প্রয়োজনীয়তার আভাস দিয়া চলিয়াছিল। ডাকাতি করিয়া অর্থ-সংগ্রহের কার্যকে ইহারা সমর্থন করিত—খুন ও ডাকাতিতে উৎসাহ দিত। এ-ছাড়া ছিল 'বর্ত্তমান রণনীতি'—'মুক্তি কোন্ পথে।' বাংলাদেশের সকল আখড়ার মোড়লরাই সে সমস্ত পড়িত ও পড়াইত। এই ভাবেই নানা কেন্দ্রে কোথাও সাহিত্যের ভিতর দিয়া, কোথাও প্রচারকের মারফতে বিপ্লবের পথ গড়িয়া উঠিল। সুতরাং আইন-নিষিদ্ধ হইয়া সমিতিগুলি যখন বন্ধ হইয়া গেল, তখনই সব 'বিপদ' শেষ হইল না। সরকারও দেখিলেন, বিপদ লোকচক্ষুর অন্তরালে পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

৮

নানাভাবের লোক-সমাগম

বিপ্লববাদীদের কয়েকটা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই কয় শ্রেণীর লোকই নানা উদ্দেশ্য ও প্রেরণায় বিপ্লবানুষ্ঠানে যোগদান করে। বাংলার বিপ্লববাদীদের বিশ্লেষণ করিলেও এইরূপ নানা শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হইবে মনে হয়।

প্রথম শ্রেণীর লোক কতকটা দার্শনিক ভাবাপন্ন। ইহারা জীবনটাকে অত্যন্ত উচ্চ আদর্শের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখেন—বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্ন-উত্তরের অপেক্ষা তেমন রাখেন না। বলা বাহুল্য, ইহারাই বিপ্লবের ভাবসম্পদের স্রষ্টা। ইহারা স্বভাবতঃই ত্যাগী। জগতের বৈষম্য ও পরাধীনতা ইহাদিগকে পীড়া দেয়, সেই পীড়িত হৃদয় লইয়াই ইহারা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কোমলে-কাঠিন্যে ইহারা গড়া। 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি' বাক্য ইহাদের প্রতিই প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক কতকটা উত্তেজনাপূর্ণ কর্মানুষ্ঠান প্রয়াসী। বিপ্লবের কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে যে 'রোমান্স' আছে তাহা তাহাদের কাছে প্রিয়তর। ইহারা স্বভাবতঃ কতকটা নির্ভীক। অবশ্য এই শ্রেণীতেও 'দেশপ্রীতি' যথেষ্ট থাকে।

আর একটি শ্রেণী বা তৃতীয় শ্রেণীও এই বিপ্লবানুষ্ঠানে যোগদান করে। ইহারা সাধারণতঃই কোন নিয়মের অধীনে থাকিতে চাহে না। 'স্বাধীনতা' বা উচ্ছৃংখলতা তাহাদের প্রকৃতিতে অত্যধিক প্রবল। 'কাহাকেও তোয়াক্কা করি না' ভাবটাই তাহাদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। তোয়াক্কা করিতে চাহে না বটে, কিন্তু অপরে তোয়াক্কা করুক—এটা তাহারা চাহে। প্রবৃত্তির অনুরূপ চলিবার অবসর যথেষ্ট মিলিবে মনে করিয়াই ইহারা এ দলে যোগদান করে। পরে ইহারাই প্রভুত্ব লইয়া দলাদলি করে, ঝগড়া করে। আর এক শ্রেণী আছে—চতুর্থ শ্রেণী, ইহারা শুধু স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিপ্লবানুষ্ঠানে যোগদান করে। বিপ্লবের শত্রুও আবার ইহারাই!

বিপ্লবী দলে কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক যোগ দিয়াছিল, তাহার একটা তালিকা আমাদের ধারণানুযায়ী আমরা এখানে দিলাম। বাংলার বিপ্লববাদীদের মধ্যে এই চারি শ্রেণীর লোকই ছিল। অবশ্য মুখ্যভাবে বিপ্লব গড়িয়া তুলিয়াছে প্রথম

ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ। তবে কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক ইহাতে আসিয়া কেমন করিয়া যোগদান করে তাহাও ক্রমেই আমরা বুঝিব।

বলিয়াছি, বাংলার 'মরা গাঙে বান' ডাকিয়াছিল, তরী আর কেহ ঘাটে স্থির রাখিতে পারে নাই। বাংলার যাহারা প্রাণবান তাহারা স্বদেশী আন্দোলনে সাড়া না দিয়া তিষ্ঠিতে পারে নাই। তখনও 'মধ্যপন্থী' 'চরমপন্থী' সৃষ্ট হয় নাই। তখন একপন্থী—হয় দেশ না হয় সরকার। যাহারা দেশের নহে, তাহারা সরকারের সহায়। বাংলার অবস্থা তখন এইরূপ। তখনো বক্তৃতার পূর্ণযৌবন। বক্তৃতা, সংগীত, লেখা অজস্রধারে জাতীয় ভাব পুষ্ট করিতে লাগিল। এমনি তখন দেশের অবস্থা যে তখন 'স্বদেশী না হওয়াটাই' একটা বিড়ম্বনা।

ঠিক এমনি অবস্থা যখন দেশের হয় অর্থাৎ যশ প্রার্থনা করিতে হইলেও এই এক পন্থা ভিন্ন আর উপায় থাকে না, তখন কাঞ্চনের সঙ্গে কাঁচও আসে। শুধু তাহাই নহে, তখন মেকি আসিয়া খাঁটিকেই তাড়াইতে চাহে। অন্ততঃ মেকি আসিয়াই আসর জমকাইয়া বসে। কারণ মেকি ধরিবার কষ্টিপাথর তখনো ত দেখা দেয়! কথা পর্যন্তই যখন লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে সক্ষম, তখন ঐ সমস্ত যশলাভেচ্ছু ব্যক্তিরা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়। এমন কি প্রকৃত কর্মীরাও তাহাদের ভীড়ে পিছনে থাকিতে বাধ্য হয়। আন্দোলনের ঠিক সূত্রপাতে ইহারা আসে না—কি জানি যদি ইহাতে মনোবাসনা সিদ্ধ না হয়; কিন্তু যেই দেখে যে এই ত যশলাভের সময় তখন ইহারাই হয় অগ্রদূত।

বিপ্লববাদের কথা বলিতে গিয়া সেই স্বদেশী আন্দোলনের কথা আবার টানিয়া আনিলাম; তাহার কারণ, এখান হইতেও তাহার কতকটা উপকরণ আমাদের সংগ্রহ করিতে হইবে।

স্বদেশী আন্দোলন যখন একেবারে পুরাদমে চলিয়াছে, বাংলার প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ মনীষী ও হৃদয়বানই যখন ইহাতে যোগ দিয়াছেন অথচ তখনও উদ্যত রাজরোষ পতিত হয় নাই, তখনকার একটা স্বদেশী সভার কথা বলি।—বক্তা প্রশ্ন করিলেন, স্বদেশের জন্য কে জীবন ও সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে! অমনি টেবিলের পাশ হইতে, তিনজন ভদ্রলোক দাঁড়াইলেন—চশমা চোখে, চমৎকার জামা গায়ে, মাথায় টেরী—দেশের জন্য ইহারা জীবন দিবেন! ছোট সহর—হৈ চৈ পড়িয়া গেল। মা ও স্ত্রী ত কাঁদিয়া আকুল—'স্বদেশের জন্য সন্ন্যাসী হইল!' কিন্তু শেষে আর সর্বস্ব ত্যাগের প্রয়োজন তাঁহাদের হয় নাই। আজও

তাঁহারা আছেন। বেশ সুখেই আছেন—কেহ প্রফেসর, কেহ উকিল, কেহ ব্যবসায়ী—অতীত স্মৃতি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। অথচ মনে পড়ে, সরকারের ধর্ষণ নীতি আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্যন্ত, তাঁহারা কথার জোরেই মোড়লী করিয়াছিলেন। শেষকালে, বিপদ আসিয়াই অনেক সম্পদ আমাদিগকে দেখাইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের যে সময়টার কথা বলিতেছি তখন বক্তৃতা ও বয়কটই প্রধান কার্য। সে বয়কটে অনুনয়-বিনয় ছিল, হাতে-পায়ে ধরা ছিল, জোর-জবরদস্তিও ছিল। বয়কট দ্বারাই ইংরেজ সায়েস্তা হইবে ইহাই ছিল প্রধান ভাব। সেই ভাব আশ্রয় করিয়াই আন্দোলন চলিত। সুতরাং জনমনে বিদ্বেষ কিছুটা ছিল না, বলিতে পারি না।

একদিকে বাঙালীর বিলাতী বর্জনের উগ্র চেষ্টা, অপর দিকে লাট ফুলার প্রভৃতির লাঠির আগায় বিলাতী প্রচলনের প্রয়াস,—এই দুয়ের মধ্যে পড়িয়া 'স্বদেশী' বুঝি আর টিঁকে না। একদল লোক 'স্বদেশী'র অর্থ নূতন করিয়াই বুঝিতে চাহিল।—স্বদেশী অপেক্ষা 'স্বদেশী' লাঠিতে আস্থা যেন তাহাদের কিছু বেশী। "জুড়ে দে ঘরেতে তাঁত, সাজা দোকান, বিদেশে না যায় ভাই গোলারি ধান" প্রভৃতি স্বদেশ সেবা ও সংগঠন-মূলক গান ও উক্তি বাঙালীর প্রাণে তখন আর ভাবের সাড়া তুলিতে পারিল না। কিন্তু 'আয় আজি আয় মরিবি কে'—আহ্বানে, বাঙালীর প্রাণে উন্মাদনা জাগাইল। মরণের কথায় কি রস আছে কে জানে, কিন্তু সেই মরণের, ধ্বংসের রুদ্রতালে তরুণ বাঙালীর হৃদ্‌যন্ত্র নূতন ছন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল; তরুণ বাঙালী সেই ভাবাবেগে সৃষ্টিকে একেবারেই বাদ দিয়া চলিল, ধ্বংসকে বরণ করিয়া ধ্বংসের জন্যই শক্তিসংগ্রহে ব্যস্ত হইল।

সরকার হইতে তখন প্রচণ্ড ধর্ষণ নীতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নেতাগণ passive resistance (নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ) প্রভৃতির কথা যে না বলিয়াছিলেন তাহা নহে—কিন্তু বর্জন দ্বারা বংগবিভাগ রদ হইবে, এ সমস্ত কথা তখন তরুণ বাঙালীকে আর বিশ্বাস করানো যাইত না। 'স্বদেশী'র কল্যাণে, বিলাতী বর্জনে, ইংরেজ কাহিল হইয়া নেতাদের প্রার্থিত বস্তু দিতে বাধ্য হইবেন—সেই আশা শেষ হইল। সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করিয়া যে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল, স্বভাবতঃ তাহার উপর যবনিকাপাত হইল। শুধু কি তাহাই? ক্রমে এই ধর্ষণের প্রতিষেধ প্রয়াসে একদল বাঙালী 'স্বদেশী'কে অবান্তর বিষয়ই করিয়া বসিল। তখন অন্য পন্থার সন্ধানেই তরুণ বাঙালী ব্যস্ত। সেই শ্রেণীর

বাঙালী বংগভংগ রদ করাটাই আর বড় করিয়া দেখিল না। একেবারে বলিয়া বসিল—'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়!' তখন ভাবের মুখে কেই বা ভাবিয়াছে, এত সত্বর স্বাধীনতা মিলে না—দুর্বল জাতি এত হঠাৎ সবল হয় না। যে ব্যাপারে জনসাধারণের চেতনার ঘনিষ্ঠ সংযোগ নাই, তাহা আকাশ হইতে কি কাছে আসে? তবু অসাধ্য সাধনের প্রয়াসই চলিবে—বিধাতার তাহাই ছিল ইচ্ছা। বিধাতা কোন্ চেতনাকে কেমন করিয়া সফল করেন কে জানে! স্বাধীনতা অর্জনের দুর্গম পথ-যাত্রায় বাংলার বিপ্লবী তরুণগণ কি মূল্য দিতে পারিয়াছে তাহার পরিচয় ক্রমেই মিলিবে।

৯

বিপ্লবের প্রথম অঙ্ক

১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে যে আইন পাশ হয়, সেই আইনের জোরেই ১৯০৯ সালের জানুয়ারীতে পূর্ববঙ্গের কতকগুলি সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ১৯০৮ সালের নভেম্বরে অশ্বিনী দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুবোধ মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, পুলিনবিহারী দাস, ভূপেশ নাগ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, সতীশ চাটার্জ্জী নির্বাসিত হন। বলা বাহুল্য, ইঁহাদের মধ্যে সকলেই বিপ্লববাদী ছিলেন না। এতদিন পর্যন্ত, অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত (১৯০৫ সাল) হইতে ১৯০৯ পর্যন্ত—সমিতিগুলি দাঁড়ানই ছিল। বিপ্লববাদীদের নানা কার্যকলাপ তখনই দেশে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—তাহা দেখিয়া এবং এই সম্বন্ধে নানা কথা শুনিয়া সাধারণ দেশবাসী এবং এই সমস্ত সমিতির সাধারণ (বহিরংগের) সভ্যরা সহজেই বুঝিয়া লইল,—'দেশে একটা কিছু হইতেছে।'

চারিদিকে যখন লাঠিখেলা, কুস্তি-ডন, স্বেচ্ছাসেবকের ড্রিল, কৃত্রিম যুদ্ধ চলিতেছে, এমনি সময়ে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এলেনের পৃষ্ঠদেশে আগ্নেয়াস্ত্র গুলি বিদ্ধ হয়—যদিও সুনিপুণ চিকিৎসায় আশ্চর্য রকমে তিনি

বাঁচিয়া যান। এই ঘটনা ঘটে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে। তাহার পর বোমাও কয়েক জায়গায় ফাটে। ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের পর প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করিয়া ধরা দিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইল, ক্ষুদিরাম হত্যাপরাধে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিল—ক্ষুদিরাম বালক, প্রফুল্লের বয়সও বেশী নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি, 'যুগান্তর' খোলাখুলিই লিখিত। অর্থাৎ আইন বাঁচাইয়া লিখিত না—জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই লিখিত। কলিকাতার বোমার আড্ডায় পুলিশ হানা দিল—বাছা বাছা কেহই বাঁচিল না—একে একে বোমার ও বিপ্লবের অগ্রদূতেরা প্রায় সবাই ধরা পড়িলেন। বিপ্লব-নেতারা দেশবাসীকে গুপ্ত সমিতির অস্তিত্বের কথা জানাইতে স্বীকারোক্তি করিলেন। এই স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে দেশবাসী ভালো ও মন্দ দুই-ই ভাবিল। যে সমস্ত বিপ্লববাদী তখনও বিভিন্ন স্থলে বাহিরে ছিলেন, তাঁহারা অনেকেই এই স্বীকারোক্তিকে ভাল চক্ষে দেখিলেন না। কিন্তু মানুষগুলি যে জীবনটাকে কিছুই মনে করে না, কাঁচা মাথা দিতে যে একেবারেই গররাজী নহে—একথা দেশ বুঝিল। তাহার উপর 'এপ্রুভার' নরেন গোঁসাই যখন ইংরেজেরই জেলের মধ্যে কানাই দত্ত ও সত্যেন্দ্র বসুর পিস্তলের গুলিতে ধরাশায়ী হয়, তখন দেশ ভাবিল—এরা দুর্জয় সাহসীই শুধু নহে, এরা অদ্ভুত কৌশলীও। দুর্জ্ঞেয় রহস্যভেদের জন্য কত যে অদ্ভুত কাহিনী কল্পিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ফাঁসির হুকুমের পর কানাই দত্ত ওজনে বৃদ্ধি পাইলেন। ধর্ম ও অধর্মের তত্ত্বকথা বুঝা বা বুঝানো সহজ কথা নহে। কে জানে কিসে ধর্মরক্ষা হয় আর কিসে ধর্ম যায়! পাপ পুণ্য, হিংসা অহিংসা সকলেরই বিচার-কর্তা যিনি তাঁহার দৃষ্টিই অভ্রান্ত। যাহাই হউক, হত্যাকারী হইলেও কানাইকে তাহার দেশবাসী অধার্মিক বলিয়া গণ্য করে নাই—ইহা নিশ্চিত। ফাঁসির দড়ি যে গলায় পরাইয়া দেয়, সেই সাহেব বলিল—এমন লোক দেখি নাই! কানাইয়ের মৃতদেহ লইয়া শোভাযাত্রা হইল, কানাইয়ের ভস্ম পবিত্র বলিয়া অনেকে গৃহে স্থান দিল। সেই মৃত্যুবাসরে, বাঙালী কলিকাতার রাস্তায় কাব্যবিশারদের গানের পদটি পরিবর্তন করিয়া গাহিল :—

আমায় ফাঁসি দিয়ে কি মা ভুলাবি
আমি কি মার সেই ছেলে?

এ সমস্ত মরণের কথায় এমন একটা উন্মাদনা তখন সৃষ্টি করিল যে, অনেক তরুণ যুবক জীবনকে তেমন মরণের জন্যই তৈয়ারী করিতে পারিলে যেন কৃতার্থ হয়।

জীবন-যুদ্ধের আর কোথাও ইহারা জয়ী হইতে চাহিল না, একেবারে মরণ-যুদ্ধে জয়ী হইতেই বদ্ধপরিকর হইল। ফলে তাহারা কতকটা সৃষ্টিছাড়া ও সংসারে অপটুই রহিয়া গেল। নেতারা কিন্তু আবার এইসব সংসারে অনভিজ্ঞদের মধ্যেই 'ত্যাগের বস্তু' অধিক লক্ষ্য করিতেন। মরণের বীজ-মন্ত্র এই সব শুদ্ধ, শান্ত, সংসারানভিজ্ঞদের কানেই দিতেন আগে। রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথায় বলিতে চাহিলে, নেতারা বলিতেন, 'এ শুদ্ধ আধার।' লোভ নাই, নাম যশের খেয়াল নাই, সংসারের ভাল-মন্দ তেমন বুঝে না—কিন্তু মরণের জন্য নেতার ইংগিতের অপেক্ষায় এক পায়ে খাড়া। যেখানে মরিতেই হইবে, বাঁচিবার কোন উপায় নাই, সেখানে এমন সব আধারই প্রেরিত হইত। গুপ্ত-যুগান্তর লিখিল :—

"না হ'তে মা বোধন তোমার ভাংগিল রাক্ষস মংগল-ঘট,
জাগো রণচণ্ডী জাগো মা আবার, আবার পূজিব চরণ-তট।"

কানাইয়ের মৃতদেহের শোভাযাত্রার পর সরকার সত্যেন বসুর বেলায় সাবধান হইলেন, শোভাযাত্রার সুযোগ বন্ধ করা হইল। যাহাই হউক, এ সমস্ত মরণ ও মারণের ভংগিতে এবং দুঃসাহসী ও সুশৃংখল (organised) কয়টা রাজনৈতিক ডাকাতিতে যে একটা অভিনব ভাব-তরংগ বাংলার বুকে বহিয়া গেল, তাহার 'রোমান্স' ও ভাবাবেগে স্বদেশ-ভক্তদের যুগ-যুগান্তরের নিরুদ্ধ ক্ষাত্রশক্তি যেন 'উঁকি' মারিয়া উঠিল। কেহ নেতাদের কাছে যুক্তি শুনিয়া, কেহ বা স্বভাবেরই ঝোঁকে, ঐ বৃত্তিটি অনুশীলনের সামান্য একটু বিকৃত অবসর পাইয়াই যেন মাতিয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, নেতাদের ইচ্ছানুযায়ী খুব চমৎকার আধার সকলে না হইলেও এই মরণ-মারণের ভীষণ পথে লোক জুটিতেই লাগিল। এই মরণপাগল মানুষগুলির কথা বলাও শক্ত, বুঝানোও শক্ত!

১০

গুপ্ত-ধারা

গুপ্তব্যাপারে কল্পনার স্থান অনেকখানিই থাকে—ফলে যাহারা ভিতরের খবর রাখে না তাহারা বাহিরে থাকিয়া ইতিমধ্যেই গুপ্তসমিতিওয়ালাদের অসম্ভব শক্তির কথা, অসম্ভব সফলতার কথা প্রচার করিতে লাগিল।

আমাদের দেশ আধ্যাত্মিক দেশ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এক দৈব উপায়ে সুসিদ্ধ হইবে, দেশের কোন কোন উর্বর মস্তিষ্কে ইহা লইয়া দস্তুরমত জল্পনা-কল্পনাও চলিত। স্বকর্ণে শুনিয়াছি, কেহ কেহ বলিয়াছেন (অবশ্য ইঁহারা বিপ্লববাদী নহেন, কিন্তু গল্প করিতে বিপ্লববাদীর দাদা), সিপাহী বিদ্রোহের কুমারসিংহ তপস্যা করিতেছেন, দেবীর বর পাইলে তিনি আবার দেশোদ্ধারে বহির্গত হইবেন। তিনি সন্ন্যাসীবেশে এখনো দেশের জন্য মহাসাধনা করিতেছেন—অমানুষিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। নানাসাহেবের কথাও শোনা যাইত। ঢাকা স্বামীবাগের স্বামীজীকে কেহ কেহ নানাসাহেব মনে করিত। পুলিনবাবু এই স্বামীজীর নিকট যাইতেন, স্বামীজী সমিতির প্রতি অনুরাগী ছিলেন, যুবকদের শরীর-চর্চায় উৎসাহ দিতেন দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি সত্যই নানা সাহেব—দেশের পরাধীনতা ঘুচাইবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—এমন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাই নাই, স্বয়ং পুলিনবাবুর মুখেও এমন কথা শুনি নাই। বস্তুতঃ আদর্শনিষ্ঠ বিপ্লবীরা এইসব কথার উপর গুরুত্ব দেন নাই। তাঁহাদের অন্তরের কথাই যেন বাংলা সাহিত্যে মুখর হইয়াছিল—

"হবেনা হবেনা খোল তরবার—এসব দৈত্য নহে তেমন"—(হেমচন্দ্র)।

অর্থাৎ দেব-আরাধনে যে ভারত-উদ্ধার হইবে না, এ বিষয়ে অধিকাংশ বিপ্লবীদের কোন সন্দেহ ছিল না। তবে দেশের লোক যে দৈব ব্যাপারে অনেকটা শ্রদ্ধাবান, একথা তাহারা জানিত; সুতরাং প্রয়োজনমত সন্ন্যাসীর ভোল তাহারাও সময় সময় গ্রহণ করিতে কসুর করে নাই। প্রথম দিককার নেতাগণ কেহ কেহ ব্যক্তিগত ভাবে ত্যাগ তপস্যার শক্তিতে আস্থাবান ছিলেন —ইহাও দেখা যায়।

১৯০৬ হইতে ১৯০৯ পর্যন্ত কতকগুলি খুন ও ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। এ

সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইহাতে অসম্ভব রং চড়াইয়া, সদ্য সদ্য স্বাধীনতা-লাভের জল্পনা কল্পনা যুবকমহলে চলিত। মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের পর আলিপুর বোমার মামলারও এক অধ্যায় অভিনীত হইয়া গেল। সুতরাং তাহা লইয়াও দেশে একটা আলোড়ন এবং আলোচনা চলিতে বাধা থাকিল না। অনেকে এমনও ভাবিল, খুব সামান্য পিস্তল বন্দুকই ধরা পড়িয়াছে—গোপনে রহিয়াছে অনেক।

এমনি যখন দেশের মনের অবস্থা, তখন সমিতিগুলি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। কিন্তু যাহারা ভুল করিয়াই হউক, বা স্বপ্রকৃতির প্রভাবেই হউক, ঐ সমিতির মধ্য দিয়াই দেশের কাজ করিবে ভাবিয়াছিল, তাহারা সরকারী আইনকেই চরম বলিয়া মানিয়া লইল না। বাহিরে ইহার সঙ্গে দ্বন্দ্বে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া সমস্ত কর্ম্মই অতঃপর গুপ্তভাবে করিতে মনস্থ করিল।

বিপ্লব-আন্দোলনের ইহাই নূতন ধারা। আগে প্রকাশ্য সমিতির অন্তরালে গুপ্তকর্ম্মপন্থা চলিত—এখন সবখানিই গুপ্ত। এখন যাঁহারা কর্ম্মী ও প্রধান হইয়া রহিলেন—তাঁহাদের নিজেদের আত্মপ্রসাদ ভিন্ন কিছুই আর সান্ত্বনার রহিল না। স্বদেশী আন্দোলনের গোড়াকার সে সহানুভূতি, সে প্রশংসা নাই (অন্তত প্রকাশ্যে ছিল না)—কাহারও ভাল বলার নাই, একেবারে 'একলা চল রে।' যাঁহাদের উৎসাহে বা সহায়তার ভরসায় কর্ম্মীরা কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন, তাঁহারা আর কথা কহেন না। আলিপুরের মামলায় নরেন গোস্বামীর স্বীকারোক্তির পর ধনীদের সাহায্য লাভের পথ বন্ধ হইল। নরেন গোঁসাই যেমন অনেকের নাম করিয়া ফাঁসাইয়াছে তেমনি গোপন-দানের কথাও গোপন থাকিবে না; ধরাও পড়িবে, ধরা পড়িলে একরারও কেহ হয়তো করিবে—এমনি ভাবের শঙ্কা বড়লোক সমর্থকদের মধ্যে দেখা দিল। নরেন গোঁসাইর সাক্ষ্যদান তাঁহাদের উৎসাহের পথ বন্ধ করিল। কেহ কেহ দুইদিন সখ্ করিয়া বিপ্লবদলের খবর লইতে ইচ্ছা করিতেন। তখন ভাবিয়াছিলেন, তেমন কিছু ভয় নাই। কিন্তু পরে অধিকতর বিপদ দেখিয়া তাঁহারাও অচেনা হইলেন। বিপ্লববাদীরা এবারে সম্পূর্ণ লোকচক্ষুর অন্তরালেই স্থান বাছিয়া লইল।

বিপ্লবীদের সেই আত্মগোপনে, সকল রাজনৈতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টা হইতে দূরে থাকার ফলে, বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক দিকেই আর যোগ্য লোকের আবির্ভাব সম্ভব হয় নাই। ইহার কারণ আছে।

১৯০৫ সাল হইতে স্বাধীনতা-কামী বিপ্লবপন্থীদের দ্বারা কংগ্রেসের দেহে নূতন মতবাদের আঘাত পড়িতে লাগিল। জাতির স্বাধীনতার আকাংক্ষা পূরণের সংগ্রাম-নিষ্ঠার অভাবে জাতির নিকট কংগ্রেস অকেজো অসার হইয়া পড়িয়াছে—'উগ্র' বা বিপ্লবপন্থীরা ইহাই ঘোষণা করিতে লাগিল। "আমরা চাই বৃটিশ-প্রভুত্ব-বর্জিত স্বাধীনতা—কোন শাসন-সংস্কার নহে।" এই বাণী ধ্বনিত হইল—অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্রের কণ্ঠে। তাঁহারা বাংলার বিপ্লব-সংস্থারই নায়ক। মহামতি তিলক, অজিত সিংহ ও লালা লাজপত রায়—বাংলার সংগে কণ্ঠ মিলাইলেন। ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেসে যে দক্ষযজ্ঞ হইল—সেখানে আর কিছু না হউক, নূতন দল কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারুক—পুরাতন তথা সংগ্রাম-বিমুখ কংগ্রেস নেতৃত্বের মৃত্যু ঘটিল। আবার কংগ্রেসে প্রাণস্পন্দন ফিরিতে থাকে আনি বেশান্তের কংগ্রেস অধিবেশনে, ১৯১৭ সালে। অতঃপর কংগ্রেসের রূপান্তর ও নবজন্ম ঘটে—মহাত্মাজীর আবির্ভাবে ১৯১৯-২০ সাল হইতে। বিপ্লবের নূতন টেক্‌নিক্ লইয়া মহাত্মাজী দেখা দিলেন। আসমুদ্র হিমাচল নড়িয়া উঠিল। স্বতন্ত্রভাবে ইহার আলোচনা করিব। বাংলার বিপ্লববাদীদের এই গুপ্ত-পন্থার দরুণ মধ্য-পন্থীরাই যে দূরে গেলেন তাহা নহে, উগ্রপন্থীরা—যাঁহারা বিপ্লবী-বাংলার গোড়া-পত্তনে যোগ্যতম অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহারাও ক্রমে সরিয়া পড়িলেন—'সম্পর্ক' রাখা তাঁহাদের পক্ষেও আর সম্ভব হইল না। যোগ্য লোকের অভাব কেন দেখা দেয়, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

সাহিত্য ক্ষেত্রেই হউক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হউক কোন একটা উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইলে, একটা বৃহতের আকাঙ্ক্ষা ভিতরে না জাগিলে, কোন দিকেই বড়লোক জন্মায় না, সাহিত্যে বা রাজনীতিতে কোন নূতন বাণী শুনা যায় না। বাংলাদেশে যখন সিভিলিয়ানদের বাংলা শিক্ষার যোগ্য করিয়া সেই সীমাবদ্ধ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া, গোড়ায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্য বাংলা পুস্তক প্রণীত হইতেছিল, তখন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে না ছিল কোন নূতন বাণী, না ছিল কোন সত্য সৃষ্টি। রাজনীতিক্ষেত্রেও তেমনি যখন গতানুগতিক পদ্ধতিতে বড় বড় চাকুরীলাভের সুবিধাগুলি ভারতবাসীর করায়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস বছরের পর বছর রাজনৈতিক চর্চা করিয়া যাইতেন, তখন তাহাতেও না ছিল কোন প্রতিভার বিকাশ, না ছিল কোন নূতন বাণী।

যাহাই হউক, তবু বাংলায় যাঁহারা রাজনীতিক আন্দোলন করিতেন তাঁহারা একভাবে গড়িয়া উঠিলেন ; পরাধীন দেশে তাঁহারা 'রাজনীতিক' বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিলেন। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তাঁহারা যতটুকু হইয়াছেন, ঠিক ততটুকুই। আর কোন নূতন শক্তি বা নূতন ভাব এক্ষেত্রে কাজ করে নাই। তবে অসহযোগ উপলক্ষে চিত্তরঞ্জনের রাজনীতি ক্ষেত্রে আবির্ভাব আর এক নূতন অধ্যায়।

ইহার একটি প্রধান কারণই বাংলার বিপ্লবপ্রচেষ্টা। এ কথায় একটুও ভুল নাই, গুরুকে সোজা রাখে খাঁটি শিষ্য : নেতাকে নেতার যোগ্য করিয়া তোলে খাঁটি কর্মী। নেতা যাহাদের উপর নেতৃত্ব করিবেন, তাহারা যদি খাপখোলা তলোয়ারের মত ধারালো ও আগুনের মত উজ্জ্বল হয়, তাহারা যদি তেজস্বী, ত্যাগী, সত্যকার কর্মী ও উচ্চভাবাপন্ন বুদ্ধিমান হয়, তবে হয় নেতা দিন দিন যোগ্যতর হইয়া উঠিবেন নতুবা নেতৃত্বের আসন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন। বাংলার যে সমস্ত যুবক রাজনৈতিক মুক্তি চাহিত, যাহারা ত্যাগী, যাহারা কার্যত জীবনপণ করিয়া কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে চাহিত—তাহারা অধিকাংশই তখন এই বিপ্লবদলে যোগ দিয়াছিল। বাংলার যুবজন হয় এই বিপ্লবে যোগ দিয়াছিল, নতুবা রাজনীতি ছাড়িয়া অন্যদিকে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, বা কিছুই করে নাই। সুতরাং বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে নেতাদের যোগ্যতর হইবার প্রবল তাগিদ যেমন ছিল না, তেমনি এদিকে নূতন যোগ্য লোকের আবির্ভাবও হয় নাই। বাংলার বিপ্লবপ্রচেষ্টা বাদ দিলে, বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে এই জন্য তেমন তেজস্বী সর্বভারত-মান্য রাজনীতিবিদের সন্ধান মিলে না। কেবল 'খাড়া বড়ি থোড়, থোড় বড়ি খাড়া' অনুবৃত্তি করিয়া প্রথম আমলের দুই চারিজনের নাম করা যায় মাত্র।[১]

(১) চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাব এক স্বতন্ত্র অধ্যায়।

১১

সমিতির দুর্দিন

'অনুশীলন' 'সুহৃদ' প্রভৃতি সমিতিগুলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করার পূর্বেই বিপ্লববাদীরা লোক সংগ্রহে মন দিয়াছিল। ইতিমধ্যেই অনেক কিশোর ও যুবক ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে, তাহারা সমর্পিত-প্রাণ। তাহাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমিতির জন্যই বিলাইয়া দিয়াছে। সমিতি বে-আইনী ঘোষণা হওয়ায় ইহারা কোথায় যায়? আড্ডা সবই উঠিয়া গিয়াছে; অন্নসংস্থানেরও কোন উপায় নাই। এতকাল ইহারা সমিতির কাজ করিয়াছে, খাওয়া-দাওয়া থাকা সমিতিতেই হইত। গড়া জিনিস হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, কর্মীরা নিরুপায়। নেতাদের কেহ জেলে, কেহ নির্বাসনে। সমিতির মুরুব্বি, সহায় যাঁহারা, তাঁহারা অনেকেই অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া সরিয়া পড়িলেন। পরিচিত অনেকেই ভরসা করিয়া সংস্রব রাখে না। 'পদস্থ' ব্যক্তিদের দ্বারও বন্ধ হইল। একেবারে যাহারা অন্তরঙ্গ, যাহারা সব ছাড়িয়া আসিয়াছিল তাহারাই এ দুর্দিনেও পরস্পর যুক্ত হইয়াই রহিল। অপর যাহারা অর্থাৎ যাহারা অন্তরঙ্গ নহে কিন্তু দলেই আছে, তাহারা মূল দল হইতে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হইল।

বিভিন্ন দলের যাঁহারা নেতা, অথচ ধরা পড়েন নাই, তাঁহারা নিজ বাটীতেই কোনপ্রকারে আড্ডাগুলি রাখিলেন, অর্থাৎ পুরাতন বন্ধুগণ সেইখানে যাওয়া-আসা করিত, দলরক্ষার চেষ্টা চলিত। কিন্তু যে সমস্ত দলে ঘরছাড়া লোকের সংখ্যা অধিক, দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঢাকা-অনুশীলন, তাহাদের হইল বিপদ। একটা স্থান ত চাই। পুলিশের ১০৯ ধারা হইতে রক্ষাও ত পাইতে হইবে। বাড়ী ফিরিতেও কেহ চাহে না, বাড়ী গেলেই আবদ্ধ হইতে হইবে। অনেকের বাড়ী ফেরাও সহজ ছিল না। সাজানো ঘরগুলি ত ভাঙিয়াছেই, এখন সামান্য কাঠ খড়গুলিই ইহারা কতকটা ভবিষ্যতের আশায় কৃপণের ধনের মতই বুকে করিয়া রহিল।

ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানের সমিতিগুলি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এক ঢাকা অনুশীলন সমিতিরই প্রায় ছয়শত শাখা-সমিতি ছিল। সমিতিগুলি সবই আজ উঠিয়া গেল।

এমনি ভাঙা অবস্থায়, কলিকাতার একটি বাটীতে কয়েকজন যুবক থাকে। হাতে কিন্তু তাহাদের টাকা নাই। এই সমস্ত যুবকদের মধ্যে আবার ফেরারীও আছে। কলেজের ছাত্ররা বাড়ী হইতে নির্দিষ্ট টাকা আনিয়া পড়ে। তাহাদের কাছ হইতে কিছু কিছু পায়। কতই বা আর হইবে, জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া ছাত্রেরা কিছু কিছু দেয়। আরো বাহিরের দুই একজন হয়ত সময় সময় সামান্য কিছু কিছু দেয়। এমনি ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। এক আধটা জামা হয়ত আছে, তাহাই প্রয়োজন হইলে সকলেই ব্যবহার করে। পোষাক পরিচ্ছদের জন্য কোনও কষ্টই কাহারো হয় নাই, সেদিকের অভাবও কেহ অনুভব করে নাই। কিন্তু অন্নাভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। একদিনের কথা: সেদিন হিসাবে দেখা গেল, মূলধন যাহা আছে তাহা ভাগ করিলে মাথা পিছু দুই পয়সা মাত্র পড়ে। সাব্যস্ত হইল 'আলু লইয়া আইস।'—শুধু আলু সিদ্ধ করিয়াই সেদিন খাওয়া হইল, ভাত আর জুটিল না। এমনি কষ্টের খাওয়া এক আধদিন নহে, মাসের পর মাস চলিল—ঐ সময়টায় অনেকেই নানাপ্রকার যোগ-ধ্যান আরম্ভ করেন। যোগের নানা নিয়ম অনুষ্ঠান প্রবলভাবে চলিতে লাগিল। পার্থিব জগতের অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক অবস্থা বেশ আশাপ্রদ!—কলিকাতায়ই তখন ঢাকা সমিতির অনেক কর্মী ও কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত হইয়াছে।

এ অবস্থায়ও দল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। যাহারা নেশা করিয়াছিল, নেশাখোর খুঁজিয়া সহজেই বাহির করিল। অবশ্য যাহাদের নেশা স্বল্পকালস্থায়ী তাহারা, নেশা ফুরাইয়া যাওয়ায়, সুবোধ বালকের মত বাড়ীতে গিয়া 'যাহা পায় তাহাই খাইতে' লাগিল। সেয়ানারা সময় থাকিতেই সরিয়া পড়িল। বিপদের এ ত শুধু সূত্রপাত—একথা যাহারা সেয়ানা, তাহারা ভাল করিয়াই বুঝিল।

কলিকাতার আলিপুর বোমার মামলায় অনেকের শাস্তি হইল। যাহারা ধরা পড়ে নাই—তাহাদেরও তেমনি দুঃখকষ্ট। এদিকে সেদিকে তাহারাও নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে লাগিল। সন্ত্রাসমূলক খুন-জখম আরম্ভ হইল। নন্দলাল ব্যানার্জি, আশুতোষ বিশ্বাস, সামশুল আলম প্রভৃতি তাহাদের উদ্যোগে পিস্তলের গুলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। পুলিশ কলিকাতায় এই বোমার মামলা ও হাওড়া ষড়যন্ত্র বা Howrah Gang case করিয়া পূর্ববাংলায় মনোনিবেশ

করিল। সামশুল আলমের হত্যার পর ১৯১৪ সাল অর্থাৎ জার্মান যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কলিকাতার দিকের দলের আর বিশেষ কোন বিপ্লব-কর্মানুষ্ঠান লক্ষিত হয় না। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা ১৯১০ সালের প্রথমভাগে ৫০ জন বিপ্লবী লইয়া আরম্ভ হয়। ১ বৎসর পরে ১৯১১ সালের এপ্রিলে মামলার যবনিকাপাত হয়। কতকগুলি স্বতন্ত্র দলের বিভিন্ন কর্মানুষ্ঠান বলিয়া ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়—কেবল ইতিপূর্বেই হলুদবাড়ী ডাকাতিতে যাহাদের সাজা হইয়াছিল—তাহাদেরই ষড়যন্ত্র মামলায় সাজা হইল। সিডিশন কমিটি এই সম্পর্কে বলেন—'এক বৎসর কাল ৫০ জন বিপ্লবীকে আবদ্ধ রাখায় কলিকাতার দিকে বিপ্লবী প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। পুনরায় যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে ১৯১৪ সাল হইতে বিপ্লব কার্য আরম্ভ হয়।'

১২
মামলা

১৯১০ সালের প্রথম ভাগে পুলিনবাবু অন্যান্য নেতৃবর্গের সঙ্গে নির্বাসন (Deportation) হইতে ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ব বাংলায় ইতিমধ্যেই আবার সমিতি (গুপ্তভাবে) কতকটা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। খোঁজখবর রাখার বন্দোবস্ত হইয়াছে। জিনিসপত্র,—বন্দুক, পিস্তল, টোটা ইত্যাদি যথা স্থানে রক্ষার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। হঠাৎ যাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল ধীরে ধীরে তাহা জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। এবারে সরকারও ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেন।

পুলিশ যে এক বিরাট ষড়যন্ত্র মামলা বাধাইতে প্রবলভাবে চেষ্টা করিতেছে, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। 'অনুশীলনে'র প্রধান কাহাকেও আর বাদ দিবে না—ইহাই জানা গেল। এইসময়ে পুলিনবাবুকে গা-ঢাকা দিতে অনেকেই বলিল, কিন্তু তিনি অস্বীকার করিলেন; বলিলেন—ছেলেরা নিরুৎসাহ হইবে। পূর্বেই, অর্থাৎ ঢাকা-সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হইবার কিছুকাল পরেই, সমিতির কেন্দ্র স্থানান্তরিত হইল বিক্রমপুর সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ে। শ্রীমাখন লাল সেন তখন প্রধান পরিচালক। মনে রাখিতে হইবে এখন হইতে সবখানিই গুপ্ত। পুলিশের কর্মচাঞ্চল্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহাকে পুলিশ সন্দেহ করে তাহার বন্ধুবান্ধব

আত্মীয়-স্বজন সকলেই সন্দেহের পাত্র হয়। ফলে বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন কেহই আর তেমন বন্ধুর ও আত্মীয়ের সঙ্গ চাহেন না—রাস্তায় দেখা হইলে, আড়-চোখে চাহেন। দেশের সাধারণ অবস্থা এমনই ভীতিসঙ্কুল। *

আমরা তখন কলিকাতার মেসে থাকিয়া পড়ি। যাঁহারা পরবর্তীকালে বিপ্লববাদী বলিয়া সর্বজনগণ্য, তাঁহারা সে স্থানে পদার্পণ অবশ্যই করিতেন। তাঁহাদের অনেকের স্বভাবে অনেক দেখিবার ও শিখিবার জিনিস ছিল। যথাস্থানে দুই একটি চরিত্র আমরা দেখাইব। সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলা চলে—বিপ্লববাদীদের ভিতর ধর্মভাব অর্থাৎ একটু ধ্যান-ধারণা, ব্রহ্মচর্য-পালন, নিষ্ঠা বর্তমান থাকিত। সাদাসিধা ভাব, আহারে-বিহারে সংযম তাঁহাদের মধ্যে খুবই দেখিয়াছি। মেসে যাঁহারা আসিতেন (বিপ্লববাদী) তাঁহাদের অনেকের ভিতরেই এই রকম একটা সাত্বিক ভাব দেখিয়াছি।

* * * *

১৯১০ জুলাই।—দুইটা বাজিতেই মনটা কেমন হইল। চারিদিকে অনেকেই ধরা পড়িয়াছেন। ক্লাস হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। খবরের কাগজখানা হাতে লইয়া ছাত্রাবাসে ঢুকিতে যাইতেই দুইজন ভদ্রলোক নাম জিজ্ঞাসা করিলেন—হাতও ধরিয়া ফেলিলেন। সংগে সংগে এদিক সেদিক হইতে কতগুলি লালপাগড়ি আসিয়া জুটিল, গাড়ীতে উঠাইল। পরে সাহেবের মুখে জ্ঞাত হইলাম ঢাকাই-পরোয়ানা বলে ধৃত হইয়াছি, 'ঢাকাইমাল' ঢাকায়ই যাইব। কলিকাতার পুলিশ বেশী সম্মান (অর্থাৎ military guard) দেখাইল না, একজন ব্রাহ্মণ চোরের সঙ্গে বাঁধিয়া লালবাজারের দিকে রওনা করিল! সঙ্গে সামান্য দুই চারজন পুলিশ। রাস্তায় একটি স্ত্রীলোক আমাদের দেখিয়া বলিল,—'বাঃ রে, ভদ্রলোকের কোমরে দড়ি!' মনে মনে ভাবিলাম, তবু এখনো গলায় দড়ি নয়। আমিই একা সেদিন ঢাকার ষড়যন্ত্রের মামলার জন্য লালবাজারে অপেক্ষা করিয়া আছি। সন্ধ্যা হইল। নরক গুলজার করিয়া কতকগুলি চোর, মাতাল সেখানে হল্লা সুরু করিয়া দিয়াছে। সেখানেই একপাশে বসিলাম—বৃদ্ধা মায়ের কথা মনে হইল। আমার সেই সঙ্গী ব্রাহ্মণ চোরটি (সে ইতিমধ্যেই কয়েকবার ব্রাহ্মণ বলিয়া আমার কাছে ও অপরের কাছে তাহার ন্যায্য দাবী জানাইয়াছে) আমার সঙ্গেই আছে। কলির এই কৃষ্ণের জীবটি পাঁচ ছয়বার এই বড়ু-বিদ্যার অনুশীলনে ধৃত হইয়াছে!

এই সদব্রাহ্মণটি গা ঘেঁসিয়া আলাপ আরম্ভ করিল।

—ভাই একটা সিগারেট দাও না।

আমি বিনীত'ভাবে বলিলাম—সিগারেট আমি খাইনা।

—একটা বিড়ি।

—বিড়িও খাইনা।

বেচারা কিন্তু বিশ্বাস করে নাই।

একটু পরে বলিল, ম্যাচিসটা দাওনা ভাই।

বলিলাম—আমার কাছে নাই।—বন্ধু এবার একেবারে হতাশ হইলেন।

ঘরের নানা দিকে নানা দল। মাতালেরা একটু হুঁসিয়ার হইয়াই নিজেদের বংশমর্যাদা জ্ঞাপন করিতেছে। সমাজের এতগুলি 'ধুরন্ধর' জীবনে কখনো একত্র দেখি নাই—মনে একটা অসোয়াস্তির ভাব আসিল। একটু পরে, রাত্রি তখন প্রায় দুইটা হইবে, সেই ব্রাহ্মণ চোরটি আমাকে বলিল, তোমার ঐ কাগজটা দাও ত ভাই।—মনে নাই, সঙ্গে আমার কি একখানা সংবাদ-পত্র ছিল।

প্রশ্ন করিলাম—কি ক'রবে ?

—সিগারেট ধরাব।

বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—সিগারেট ধরাবে! বুঝাইয়া বলায় বুঝিলাম,—উপরে যে গ্যাস-বাতি জ্বলিতেছে সেখান হইতে কাগজ মারফতে আগুন সংগ্রহ করা হইবে। কাগজের অংশ গ্রহণ করিয়া বারে বারে ব্যর্থ হইয়াও ব্রাহ্মণ অধ্যবসায়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। কাগজের অংশ পাকাইয়া লাঠি-গোছ করিয়া আগুন সংগৃহীত হইল। ভায়ারা কেহ থাকিলে গান চলিত, —'ও তোর বারে বারে জ্বালতে হবে, হয়ত বাতি জ্বলবে না।' ব্রাহ্মণ-তনয়ের মুখে আজ অগ্নি নাই—কিন্তু প্রাণে অধ্যবসায় আছে। সিগারেট ত ধরান হইল।—আর যায় কোথায়,—একটা ছোকরা, ব্রাহ্মণের গলা টিপিয়া ধরিয়া মারে আর কি! 'শালা চোর, আমার পকেট মেরে বিড়ি নিয়েছে,'—হৈ চৈ হল্লা।—এমনই সময় আবার এক বৃদ্ধ, চোখে দেখে না, চীৎকার করিয়া উঠিল 'আমি হাগ্‌বো।' বলিয়াই বসিতে উদ্যত। আবার চারিদিক হইতে গালাগালি। কেউ বলিল 'ডানে যা', কেউ বলিল 'বাঁয়ে যা'—আর সবাই হাসিতে লাগিল! আমার পাশে একটা ছোকরা বসিয়াছিল, বলিলাম, 'ওকে ধ'রে ঐদিকে বসিয়ে দাও।'—বেচারী কথাটা শুনিল।

রাতটা প্রভাত হইলে যে বাঁচি! বিচারের পূর্বে হাজতের এ অপূর্ব ব্যবস্থা দেখিয়া, শাস্তিলাভের পূর্বেই দোষী নির্দোষীর এইরূপ অদ্ভুত শাস্তির নমুনা দেখিয়া মনে হইল, বিচারের অভিনয় করিতে গিয়া মানুষকে বুঝি বা ভগবানের বিচারশালায় হাজির হইতে হয়। যাহাই হউক শেষ রাত্রিতে 'ঠাকুর' ভাত ডাল দিয়া গেল—আমি লইলাম না। যে-ভঙ্গীতে আসিয়া প্রভু প্রসাদ গ্রহণ করিতে বলিলেন, তাহাতে অভ্যাস বশতঃ হঠাৎ মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল, 'খাব না।'—দ্বিতীয় বাক্য-ব্যয়ের প্রয়োজন কাহারো হইল না।

ভোর হইতেই আর সকলকে লইয়া গেল, রহিলাম একা আমি। বড়ই ভাল লাগিল, শুইয়া পড়িলাম। একটু পরেই উঠিয়া দেখি সম্মুখের কামরায় আরও দুইজন ভদ্রলোক। 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে,' চেহারায় বুঝিলাম —'স্বদেশী!' আলাপ হইল। 'প্যামফ্লেটিং'-এ ধৃত হইয়াছেন। গুপ্ত-যুগান্তর। ওঁরা জেলেই থাকেন। এখানে কি যেন প্রয়োজনে আনিয়াছে। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম,—'হাঁ দাদা, জেলে থাকার জায়গা কেমন—এখানকার মত নয়ত?'—ওঁরা বলিলেন,—'না, এক একটি 'সেল'।' এই সংবাদে হাতে যেন স্বর্গ পাইলাম! ভাবিলাম—শুইয়াও ত দিন কাটাইতে পারিব, না হয় আপন মনে গান গাহিব। বৈকালে মুড়ি দিয়া গেল, খুব খাইলাম। আজই ঢাকা মেলে যাইব—মন কতকটা প্রফুল্ল হইল।

বাক্স, পুস্তকও আমার সঙ্গে চলিল। ট্রেনে একটি বন্ধু রাস্তায় খাওয়ার জন্য পুলিশের হাতে টাকা দিয়া গেলেন। আর একজন সাধারণ লোক—বাবু-টাবু নহেন—'স্বদেশী' শুনিয়া পুলিশ কর্মচারীর দিকে বারে বারে দৃষ্টিপাত করিয়া খাবারের ঠোঙা আনিয়া আমায় বলিলেন, 'কিছু খান'।—খাইতে পারিলাম না, ধন্যবাদ দিলাম! খাইলাম না বটে, কিন্তু পুলকিত হইলাম। রাজনীতিক শিক্ষা নাই বটে, কিন্তু দেশবাসীর প্রাণ আছে। বুঝিয়া আঘাত করিতে পারিলে প্রাণের তারে সুর বাজে। সেদিনে বিপ্লববাদীরা কোথাও বড় সহানুভূতি পায় নাই, অথচ দেশবাসীর সহানুভূতিই মানুষকে উৎসাহিত করে, শক্ত করে। সাধারণ একজন লোকের এই সহানুভূতিতে সত্যই সেইদিন সেই সময়ে পুলকিত হইয়াছিলাম। পুলিশের অনুমতি লইয়া খাইতে প্রবৃত্তি হইল না—বেচারী

কোন্ বিপদে পড়িবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি! কিন্তু এমন শ্রদ্ধার দান উপভোগ করায়ও অন্তর পরিশুদ্ধ হয়।

গোয়ালন্দ ষ্টীমারে পরিচিত লোক দেখিলাম। কথা কহে না। মনে হইল, 'যদি কেউ না কথা কয়, ওরে ও অভাগা।' আমাদের তেমন অবস্থায় দেখিয়া আত্মীয়-স্বজন, বিপ্লববাদী, বিপ্লববাদীর পরিচিতের পরিচিত, অথবা বুদ্ধিমান কেহ কাছে আসিত না—সরিয়া সরিয়া যাইত, পাছে পুলিশ নাম টুকিয়া লয়! কিন্তু কাছে আসিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইত, কথা জিজ্ঞাসা করিত হাবা-গঙ্গারাম দুই চার জন, আর বিপ্লবের নামগন্ধ জানে না যাহারা, তাহারা।

ঢাকায় একটা কি দেড়টায় গেলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কুঠিতে যাওয়ার হুকুম হইল—গেলাম। চারিদিকে সঙ্গীন চড়াইয়া প্রহরীরা 'অভ্যর্থনা' করিল। সাহেব ঘুমাইয়াছেন, সুতরাং আমরা অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। সেখানে আরও একটি ভদ্রলোক অপেক্ষা করিতেছিলেন—একই গোয়ালে যাইব। দুইটা বাজে—তিনটাও বাজিয়া গেল। দারোগার হাতে টাকাটা রহিয়া যায় দেখিয়া, কনষ্টেবলগুলি কতকটা সেই দুঃখেই যেন বলিল 'আপনি খান না, খাবার খান।' খাবারের নামে আমার মাথা গরম হওয়ার যোগাড়। অগত্যা পশ্চিমদেশীয় বন্ধুদের কথায় খাবার আসিল—ঢাকাই অমৃতি! একটু খাইয়া ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইলাম। সহানুভূতিতে গুর্খা সিপাই পর্যন্ত ধমকাইল, 'বোকাবাবু, জেলে এ সমস্ত খাবার কোথায় পাবে?'—যাক্, সাতটা বাজিলে সাহেবের সুখ-নিদ্রা ভাঙ্গিল! ডাক হইল, হাজির হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়া হইয়াছে? আমি উত্তরে 'না' বলার আগেই দারোগা-পুঙ্গব বলিয়া বসিলেন, 'হাঁ, আমি খাওয়াইয়াছি।' সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাত খাইয়াছে?' খাই নাই শুনিয়া জেলে লিখিয়া দিলেন—'ভাত দিবে।'

ঢাকা জেলে রওনা হইলাম, ক্রমেই পদবী বাড়িতে লাগিল। আটজন সিপাহী সঙ্গীন তুলিয়া লইয়া চলিল। হাঁটিয়া চলিলাম।—হুকুম হইল, হল্ট্। থামিলাম। জেলের ফটক ফাঁক হইল—ঢুকিলাম। স্বয়ং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ সাহেব আসিলেন। পায়ের জুতা, পরিধানের কাপড় খুলিয়া নিজ হস্তে দেখিলেন।

"অরণ্য আড়ালে রহি কোনো মতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হ'তে,
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে, ভূতলে।"

আমরাও তেমনি দরজার আড়ালে কোনও মতে থাকিয়া সাহেবের হস্তে পরিধেয় বস্ত্র ফেলিয়া দিলাম। নূতন নূতন তখনও লজ্জা ত্যাগ করিতে পারি নাই। পরে আর গাত্রতল্লাস দিতে সরমে মরিতাম না। যাহাই হউক, আইনমাফিক লেখালেখি হইল। আবার ফটক খুলিল। জন ত্রিশ গুর্খা কুকরি হাতে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে; মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলাম; হুকুম হইল, 'মার্চ্'। আমরাও উৎসাহেই চলিলাম। মনে হইল, ক্রমোন্নতি। ঢাকা জেলের ৪৫টি 'সেলে'র একটিতে ঢুকিলাম। গৃহসজ্জা—একটি চাটাই, একটি কম্বল! চমৎকার, এত আশা করি নাই। দরজায় তালা দিতে না দিতেই পাশের সেল হইতে ডাক আসিল, 'কে—কোত্থেকে?' উত্তর শুনিয়া, আবার প্রশ্ন—'আর কে কে ক'লকাতায় ধরা পড়েছে?' উত্তর দিলাম। আবার দরজা খোলা হইল, 'ঠাকুর' ভাত ডাল দিয়া গেল। জল দেওয়ার সময় আস্তে বলিল, পুলিনবাবু পাঠাইয়াছেন, নাম কি?—নাম বলিলাম। মনে হইল, দূর ছাই, এ যে বাড়ীর মত গো!—ভাবিয়াছিলাম সবটাই লালবাজার!—দুঃখ সুখ আপেক্ষিক, তাই ঐ রাত্রে পচা ডাল ভাতও সুস্বাদু লাগিল—লালবাজারের স্মৃতি মনে ছিল কি না!

পাশের কুঠুরি হইতে আরো দুই একটা কথা হইতেই গুর্খার ধমক আসিল, 'হল্লা মৎ করো। বাৎচিৎ একদম মানা হ্যায়।' ব্যাপার কিছু বুঝিলাম। চাটাই বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। মাটি ঝাড়িবার ধৈর্যও আর ছিল না! যখন ঘুম ভাঙিল তখন দেখি—দরজা খোলা।

১৩
জেলের এক অধ্যায়

বিপ্লববাদীরা ফাঁসিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, গুলির আঘাতে মরিয়াছে; সুদীর্ঘ, দুঃসহ কঠোর কারাবাসের ফলে কেহ রুগ্ণ হইয়াছে, কেহ মরিয়াছে, কেহ বা উন্মাদ হইয়াছে, কেহ সুস্থ অবস্থায়ও ফিরিয়াছে! বিপ্লববাদীরা নির্জন কারাকক্ষে সুদীর্ঘকাল রহিয়াছে ও গম ভাঙিয়াছে, ঘানি টানিয়াছে, বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, হাত-বেড়ি পা-বেড়ি পরিয়াছে; সাধারণ কয়েদীর খাদ্য খাইয়াই জীবনধারণ করিয়াছে, কিন্তু সাধারণ কয়েদীর মতও স্বচ্ছন্দে জেলবিহার করিতে

পারে নাই। বিপ্লববাদীরা অন্তরীণে,—কেহ সুদূর পল্লীতে, কেহ সমুদ্রের বেলাভূমে, কেহ সুন্দরবনের জঙ্গলে স্থান পাইয়াছে,—বিপ্লববাদীরা 'দলন্দা'য়, 'কীড ষ্ট্রীটে', ডিষ্ট্রিক্ট জেলের হাজতে শক্তি ও ভক্তির পরীক্ষা দিয়াছে; ভুল-ভ্রান্তি ও সত্যের যাচাই সেই কষ্টিপাথরে হইয়াছে। কোনও বিপ্লববাদীই তাহার সাধারণ কারাবাসকে দুঃখের রূপে ত দেখিতে পারে না! তাহার শতশত সতীর্থ যে তিলে তিলে সুদীর্ঘকাল দুঃখে কষ্টে কঠোর কাঠিন্যের মধ্যে মনুষ্যত্বকে বজায় রাখিয়াছে!—দু'চার বৎসরের জেল ভোগ, পাঁচ সাত বৎসরের রাজবন্দী (State Prisoner) রূপে জেলবাসের কথা যে সেই কঠোরতর ব্যথার কাছে ম্লান হইয়া যায়! তুলনায় আমাদের দুঃখের কথা যে একেবারেই ছেলে খেলা। তাই জেলের কোন দুঃখের কথা গাহিবার আহাম্মকী আমাদের নাই। বন্দী অবস্থায় থাকিয়া নানা সঙ্গলাভে যে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, সেই কথাই বলিব। সে অভিজ্ঞতার কথায় বিপ্লববাদীদের সম্বন্ধে দেশবাসী যে কতকটা কথা জানিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। জেলের কথা তাই সামান্য ভাবেই কিছু বলিব।

* * * *

ঢাকার জেলেই আছি। মামলার ব্যাপার দেশবাসী জানেন, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। যাহারা শুধু 'সঙ্গে আসিয়াছে', তাহারা জেলে আসিয়াই আপশোষ করে—"এ সামান্য সম্পর্কটুকু না রাখিলেই ত হইত!" মোটকথা সে বেচারা মনে প্রাণে কখনো বিপ্লববাদী নহে, কেবল 'সঙ্গে আসিয়াছে।' কিন্তু যখন ঠিক হইল যে, 'নিস্তার নাই', তখন সেও আর পিছনে থাকিতে চাহে না, দশ জনের মধ্যে একজন হইতে চাহে। বলা বাহুল্য, ইহারা প্রকৃত বিপ্লবের মাথাও নয়, হাতও নয়, পা-ও নয়, ইহারা শুধু স্পর্শদোষে দুষ্ট!

যাঁহারা সমিতির লাঠিখেলার পরে সত্যই এমন ভীষণ অবস্থায় পড়িবেন ভাবেন নাই, এমন করিয়া জেল ভোগের জন্য প্রস্তুত হন নাই, তাঁহারা প্রথমটায় একটু 'কেমন কেমন' হইয়া পড়েন, মনে হয়, সবটাই বড় নূতন! কিন্তু ইহাদের মধ্যেও যাঁহাদের প্রাণ থাকে, তাঁহারা দুই দিনেই সামলাইয়া উঠেন, কারাদুঃখ সহজেই অপর সকলের মতই বরণ করিয়া লন! হয়ত যে কথা আগে ভাবেন নাই, বুঝেন নাই, তাহাই এখন এত সব নূতন লোকের সঙ্গে পড়িয়া ভাবেন ও বুঝেন। সরকারের এই ভাবের ধর-পাকড়ের ফলে কেহ কেহ জেলে গিয়াই প্রকৃত বিপ্লববাদীদের সঙ্গ লাভ করিয়া বিপ্লবপথে পা দেন।

অপর যাহারা বিপ্লবদলে ঢুকিয়াছিল নিজেদের সুবিধার জন্য, মনে মুখে যাহারা এক নহে, স্বার্থে যাহারা শত স্থানে বাঁধা, তাহারা কিন্তু আসিয়াই খোঁজে—মুক্ত হইবার সহজ পথ আছে কিনা। তাহাদের এই মানসিক ভাবনা যে মুখে প্রকাশ পাইত তাহা নহে। কারণ, ইচ্ছা কার্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে, ইহারা ইচ্ছাকে গোপন রাখিতে জানিত। লোকচরিত্রজ্ঞ নেতা যিনি, তিনি হয়ত দুই দিনে ইহাদের চিনিয়া ফেলেন; কিন্তু সকলে সব সময় ইহাদের চিনিতে পারে না। সম্ভাবনা থাকিলে ইহারা বাহির হইবার পথ খোঁজে, কিন্তু অসম্ভব হইলে ও ভয়ের কারণ থাকিলে, সুযোগ ও সুবিধার অপেক্ষায় থাকে। বলা বাহুল্য, দলের অত্যধিক প্রভাবে বা অন্য কোন কারণে 'সরকারী সাক্ষী' না হইতে পারিলেও কারাবাসকালে এবং জেলের বাহিরে আসিয়া তাহারা বিপ্লবের সুহৃদরূপে আর থাকে না। অপর পক্ষে যাঁহারা ইহার অন্তরঙ্গ, যাঁহারা ইহার প্রকৃত স্রষ্টা, যাঁহারা বুঝিয়া শুনিয়া জানিয়াই আসিয়াছেন—যাঁহারা জেল দ্বীপান্তর বা আর যা-কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহারা জেলে আসিয়াও সে চিন্তায়, সে ভাবনায়ই কাল যাপন করেন। নিজেদের কথা, বাহির হইবার কথা ভাবেন না, ভাবেন কি করিয়া অভীষ্টলাভ হইবে। আর এক প্রকৃতির লোক জেলে দেখা যায়, যাঁহাদের যুক্তির পরিবর্তন খুব সত্বর হইতে থাকে, অর্থাৎ যে যুক্তি দুই দিন আগে নিজেই দিয়াছেন, জেলবাসের সময় তাহার বিরুদ্ধেই যুক্তি দেন। চুপ করিয়া থাকার দরুণ অবসর পাইয়া, নিজেদের ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিয়াই হউক অথবা সুদীর্ঘ দুঃখ কষ্টের কথা স্মরণ করিয়াই হউক, ইহারা মুখ্য বিপ্লববাদীদের মতে আর মত মিলাইতে পারেন না, পূর্বের পথের ভুল-ভ্রান্তি আসিয়া নূতন করিয়া দেখেন।

পূর্বে বলিয়াছি, বিপ্লববাদীদের মধ্যে ধর্মভাব কিছু বেশী দেখা যাইত।* বিপ্লববাদীরা সাধারণতঃ ত্যাগী এবং অনেকেই অবিবাহিত ছিল। ভোগাকাঙ্ক্ষা একটু কম বলিয়া এবং জেলে আর কিছু করিবার নাই বলিয়া সহজেই তাহারা ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে লিপ্ত ও আকৃষ্ট হইত। আলিপুর মামলা হইতে আরম্ভ করিয়া বিপ্লববাদীদের রাজবন্দী জীবনে ও কারাবাস কালের অবস্থায়ও ধ্যান-

* বিপিনচন্দ্র বক্সার জেলে—অরবিন্দ আলিপুর জেলে একই প্রকারের 'সত্যের আলো'র দর্শন লাভ করেন—উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় শ্রীঅরবিন্দের উক্তি।

ধারণা করিতে দেখা গিয়াছে। এ 'ধর্মের দেশ' বলিয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক কতক বিপ্লববাদী শেষকালে 'ধার্মিক'ই হইয়াছেন, বিপ্লব-পন্থাকে আর পথ মনে করেন নাই। আবার কেহ কেহ এই সমস্ত ধ্যান-ধারণায় পরম আনন্দ লাভ করিয়া, অধ্যাত্মজীবনের রসাস্বাদনে ব্যাকুল হইয়া—গৃহ ত পূর্বেই ছাড়িয়াছিলেন—একেবারে সমস্ত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসও নিয়াছেন। কেহ কেহ সে পথে উন্নত অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছেন।

বাংলার বিপ্লববাদীরা জাতীয়তাকে মানবজীবনের উচ্চ ভাবসম্পদের দিক দিয়াই বিচার করিয়াছিল। ভারতের জাতীয়তাকে ভারতের বিশিষ্ট সাধনা ও সভ্যতার দিক দিয়াই বুঝিতে চাহিয়াছিল। মনুষ্যত্বের পূর্ণতার প্রয়োজনের দিক দিয়াই স্বাধীনতাকে একান্ত জাতীয় প্রয়োজন বলিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে চাহিয়াছিল। আবার কেহ কেহ 'রাজনীতি' যে ভারতের কথা নহে, ইহা বলিয়া, অধ্যাত্ম সম্পদের সঙ্গে ধর্মের প্রয়োজন হিসাবে—রাজনীতিক প্রয়োজন নহে—দেশসেবাকে জুড়িয়া দিলেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যাত রাজনীতি বুঝিতে যতখানি দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয়, ততখানি রাষ্ট্রবিজ্ঞান-জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। ভারতের বিশিষ্টতার জন্যই হউক বা যে জন্যই হউক ইহারা দেশকে মুক্ত করিতে গিয়া ভারতের বিশিষ্ট অধ্যাত্মজীবন লাভ করিতেই ব্যস্ত হইলেন।

কিন্তু যাঁহাদের 'বিপ্লবে' পাইয়া বসিয়াছিল, 'দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ' ইহাই যাঁহারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা ধ্যান-ধারণার ব্যাপারেও যেন মাত্রা রাখিয়া চলিতেন। এমন কি, অনেক সময় যেন তাঁহারা শঙ্কিত হইতেন, পাছে অধিক ধর্ম-চর্চায় এ পথ কেহ ছাড়িয়া দেয়, দেশের সেবাকেই একমাত্র ধর্ম মনে না করে। ভাল কি মন্দ, আজও বলিতে পারি না, যাঁহারা জেলে ও রাজবন্দী অবস্থায় নিত্য নিয়মিত ধ্যান-ধারণায় অধিক সময় ব্যয় করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই বাহিরে আসিয়া তেমনটা আর করেন না, অথবা নানা অভাবের তাড়নায় এবং নানা কর্মপ্রসঙ্গে করিতে পারেন না।

আমাদের ষড়যন্ত্র মামলায় এখান সেখান হইতে ক্রমে অনেকেই আসিয়া হাজির হইলেন। ৪৫টি সেল পূর্ণ করিয়া আমরা রহিলাম। কেহ কেহ 'পায়ের মল' বাজাইয়া আসিল। নানা ধারায় ইহাদের পূর্বেই শাস্তি দিয়াছে; আবার ঐ ষড়যন্ত্র মামলারও ইহারা আসামী। পায়ে ডাণ্ডা-বেড়ি! কোন বিশেষ অপরাধের জন্য এই শাস্তি নহে, রাজনৈতিক বলিয়াই ইহারা Dangerous

'সাংঘাতিক'। ইহাদের মধ্যে একটি ছিল বালক, বয়স ১৪।১৫, মুখে হাসি লাগিয়াই আছে (অবনী গাঙ্গুলী—আদাবাড়ী অস্ত্র-আইন মামলায় দণ্ডিত)। হাসির প্রধান কারণ—কাছাকাছি, মুখোমুখি হইলেও মুখ খুলিবার হুকুম নাই। ইহারা কি সাধনা করিয়াছে, জানি না—তবে এ বয়সে ২।৪ বছরের কঠোর কারাবাস, আরো ৫।৭ বছর মাথার উপর ঝুলিতেছে; কিন্তু তবু গম পিষে (অস্ত্র মামলায় সাজা হইয়াছিল বলিয়া জেলে গম পিষিতে হইত), গান গায়; কোন স্পেশাল diet নহে, একেবারে খাসা জেল diet* রোজ খায়, বাড়ী হইতে কোনো তদ্বির নাই; কিন্তু তবু মুখের হাসি বুকের আনন্দ কমে নাই।

জেলে কথা বলার তেমন সুযোগ মিলিত না। কোর্টে অবনীর সঙ্গে আলাপ করিতাম।—"অবনী, বাড়ীতে পত্র লেখ?" মাথা নাড়িয়া অবনী জানায়, "না"। মায়ের কথায় ওর চোখ ছলছল করে—কিন্তু 'অশ্রু তাহাতে নাই।' "তোমাকে ধরিয়া পুলিশ, 'কোথা হইতে অস্ত্র পাইলে—কে দিলে' জিজ্ঞাসা করে নাই? মার ধোর করিয়াছে?"—"হ্যাঁ, আমি আগাগোড়া এক কথাই বলি, 'কিছুই জানি না'।" "তোমাকে যে ডাণ্ডা বেড়ি দিয়া রাখিত—কষ্ট হইতো না?" হাসিয়া অবনী বলে—"এ আবার কষ্ট কি?"—"ঘানি ঘুরাইতে পারিতে?" "প্রথম, প্রথম অভ্যাস নাইতো, কষ্ট হইতো ('কষ্ট হইতো' এ কথা বলিতে অবনী সঙ্কুচিত হইত) শেষে কোন কষ্ট হইতো না।" অবনীকে একদিন জিজ্ঞাসা করি—"এই মামলায় কি হবে?"—"কি হবে, ফাঁসী দিতে পারবে না—দ্বীপান্তর, না হয় জেল।"—অবনী যেন এজন্য প্রস্তুত। সে জেলে প্রতিদিন ব্যায়াম করিত—জেলভোগের জন্য যোগ্যতর হইত। অবনী গ্রামের স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। পড়াশুনা তাহার হয় নাই। কিন্তু পড়াশুনা না হইবার মত ছেলে সে নয়। দায়ী কে? নেতারা বলিবেন—ব্যক্তিগত প্রশ্ন, কাহার কি হইল, হইল না তাহা ভাবিয়া তো স্বাধীনতার সংগ্রাম আয়োজন চলে না! নরমেধ যজ্ঞে নরবলি দিতে হইবে তবে না মায়ের উদ্ধার! অবনী আমাকে মুকুন্দদাসের গানটি গাহিতে বলিত এবং শিখিত:

"ভয় কি মরণে—রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে।"

* সেকালের জেল diet অতিশয় নিকৃষ্ট ছিল।

দেশ-মাতৃকার দৈব-শক্তিতে বিশ্বাসী বালক অভীঃ মন্ত্রের সাধনা করিয়াছে। রাজনৈতিক মতবাদ, স্বাধীনতার পথ এসবের সমস্যা লইয়া সে আলোচনা করিত না, জটিলতার মধ্যে যাইত না—যাইতেও পারিত না। কিন্তু দেশের জন্য নেতার নির্দেশে মরিতে হইবে—সংক্ষেপে ইহাই সে বুঝিয়া রাখিয়াছিল। অবনী আজ কোথায়? শত শত অখ্যাত যুবকের মতো কোথায় সে তলাইয়া গিয়াছে—কে সন্ধান রাখে? ইচ্ছা হয়—কেবল, 'কাব্যে উপেক্ষিত' এই ধরণের ছেলেদের জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিয়া ধন্য হই।

অনেকে কঠোর শাস্তির জন্যই প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিয়া আছেন, সুতরাং জেলের ভাত খারাপ, ডাল বিস্বাদ, বলিয়া কিছু মনেই করিতেন না। যাঁহারা ধরা পড়িবার পূর্বে 'সমিতির' মধ্যেই খাইতেন তাঁহারা তো বলিতেনই, "সমিতিতে তো সুধু নুন-ভাতও খাইয়াছি। সমিতির ব্যবস্থা হইতে এ ব্যবস্থা মন্দ নহে।" বিপ্লববাদীরা আহার লইয়া গোলমাল করিয়াছে 'রাজবন্দী' অবস্থায়। তাহাও নানা কারণে, এবং কিছুটা পরে, নতুবা জেলের খাওয়া যতই খারাপ হউক, সে জন্য কোন অভাব অভিযোগ জানায় নাই। কারণ এ যেন জানা কথাই।

ভোর হইলে মুখহাত ধুইতে ও পায়খানায় যাইতে একঘণ্টা বাহিরে রাখে; আবার 'সেলে' নেয়। বৈকালে একঘণ্টার জন্য বাহিরে নেয়, আবার সেলে। বিচারাধীন আসামীকেও তখন এই ভাবেই রাখা হইত।

কতকটা খোলা জায়গায় এক একজন গুর্খা রাখালের হেপাজতে এক একজন বিপ্লববাদীকে নির্দিষ্ট কয় হাত জায়গার মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু কথা বলার হুকুম নাই। ভক্ত গুর্খা কুকরী খুলিয়া হুকুমের সেবা করে, সুতরাং গুর্খার সঙ্গে নিত্যই ঝগড়া লাগিয়া থাকিত। এত কাছে থাকিয়াও কথা বলা চলিবে না—এই শাস্তি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ভিন্ন তো সকলে সহ্য করিতে পারে না, তাই কথা বলিয়া ফেলে। বড়রা অবশ্য কথা বলেন না।

নেতৃস্থানীয়েরা সাব্যস্ত করিয়া দিলেন, কথা বলিও না। তবে যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, কথা বলিও—কিন্তু গুর্খা বা সাহেবের সঙ্গে এ নিয়া তর্ক করিও না। এ জন্য যে শাস্তি দেয়, দিবে। সেজন্য প্রস্তুত হইয়াই কথা বলিও।

ফলে এই দাঁড়াইল:—প্রয়োজন হইলে কথা বলা হইত। গুর্খা হয়ত আসিয়া মানা করিত, ধমকাইত, নালিশ করিবার ভয় দেখাইত। আর নালিশ করিলেই শাস্তি! কিন্তু যতক্ষণ প্রয়োজনীয় কাজ শেষ না হইত, ততক্ষণ 'বক

আর ঝক কানে দিয়েছি তুলো' নীতি অবলম্বন করিয়া কথা চলিতই। অবশ্য নিষ্প্রয়োজনেও যে কথা না চলিত তাহা নয়, তবে সেটা নেতৃস্থানীয়েরা করিতেন না। অপরে অভ্যাসবশতঃ করিয়া ফেলিতেন। গুর্খার হস্তে ধরা পড়িবার ভয় তাঁহাদের ছিল না। ভয় ছিল, নেতাদের। যাহাই হউক ছয়মাস পর্যন্ত কথা বলা বন্ধ ছিল। শেষে আমাদের ভগ্নস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করিয়া হুকুম দেওয়া হইল, দুইজন করিয়া কথা বলিতে পার,—তাহাও ব্যারিস্টার সি· আর· দাশের (চিত্তরঞ্জনের) সওয়াল যুক্তির প্রভাবে। সাধারণ কয়েদীরা একত্র থাকিতেও কথা বলিতে পারে, কিন্তু বিপ্লববাদীর বেলায় কর্তৃপক্ষ মৌনব্রতের ব্যবস্থাই করিতেন। প্রত্যেক জেলে, এমনকি শেষ দিকে অর্থাৎ ১৫।১৬।১৭ সালেও রাজবন্দী (state prisoner) ও অন্তরীণের সময় পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের সংগে বিপ্লববাদীদের যত গোলমাল হইয়াছে, তাহার অধিকাংশের মূলেই ছিল এক দিকে এই কথা বন্ধ করিবার প্রয়াস, অপরদিকে কথা বলিবার চেষ্টা। ১৯১৮ সাল হইতে রাজবন্দীদের একত্রই রাখা হইত। খেলাধূলা, পড়াশুনা, পাকশালায় কর্তৃত্ব ইত্যাদির ব্যবস্থাও ক্রমে হইয়াছিল। কিন্তু ফল তাহার ভাল হইয়াছিল কিনা তাহা স্বতন্ত্র বিচার্য।

১৪

জেল-বৃত্তান্ত

জেলের জীবন স্বভাবতঃই সংযত। তাহার মানে এই যে, জেলের নিয়মে তেমন অসংযমী হওয়ার সুবিধা ছিল না। তবু, কর্তৃপক্ষের বিচারে, আমাদের অসংযম নাকি মধ্যে মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িত। সেজন্য হাত-কড়ি পা-বেড়ি প্রভৃতিও চলিতে লাগিল। একদিন কথাবার্তা লইয়াই গোলযোগ বাধিল। বেড়াইবার সময় কি একটা ব্যাপারে গুর্খাদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি চলিতেছিল। এমন সময় একটি লোকের একটি মাত্র ইংগিতে পঁয়তাল্লিশ জন আসামীর যে যেখানে ছিল কথাটি মাত্র না বলিয়া নিজ নিজ সেলে গিয়া গম্ভীর হইয়া বসিল;—ইহাই নাকি ভয়ের কথা। এতগুলি লোক, একটা লোকের কথায়, গুর্খা সিপাহীর সঙ্গে ঝগড়া পর্যন্ত না করিয়া, ইঙ্গিতমাত্রে বেড়ান বন্ধ করিয়া

সেলে গিয়া ঢুকিল! তাইত!—অমনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে খবর গেল। তিনি পত্রপাঠ আসিয়া হাজির। তিনি সকলকে বাহির করিয়া বেত মারার জায়গায় নিলেন। সকলেই ভাবিল বেত মারা হইবে। মারা হইলও বটে, তবে আমাদের অঙ্গে নহে—একটা নির্জীব বালিশের উপর। সাহেব ইঙ্গিতে বুঝাইলেন, সাবধান, যদি দুষ্টামি কর, এই রকম করিয়া বেত মারা হইবে। বেত মারার অধিকার যে বিচারাধীন (under trial) অবস্থায়ও তাঁহাদের অক্ষুণ্ণই আছে, ইহা জেল কোড্ পড়িয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাদের শিখাইলেন। কিন্তু হইলে কি হয়, যে সংযম কোথাও শিখি নাই তাহা সাহেবদের ইচ্ছায় দুইদিনে শিখা যাইবে কেন? সুযোগ পাইলেই কথাবার্তা চলিতে লাগিল। গুর্খা ত চটিয়া লাল। দুই চারজন গুর্খা আবার এমনি ছিল, যেন জন্মের দিন হইতে চটিয়াই আছে—জীবনে কখনও হাসে নাই, চোখ লাল করিয়াই আছে। ধ্যান-ধারণা, জপ-তপ-প্রার্থনার মধ্যেও তাহারা বাধা দিতে আসিত। স্তোত্র-পাঠের শব্দ হইলে বলিত, বাৎ-চিৎ মৎ করো।

গুর্খা সিপাহীরাই ইংরাজের সব চাইতে বিশ্বাসী ভৃত্য। জেলে বিপ্লববাদীদের প্রতি ইহারা যেমন নিষ্প্রয়োজনে 'প্রীতি' (!) দেখাইয়াছে এমন আর কেহ দেখায় নাই। পরবর্তী কালে পাঠান সিপাহীরাও স্থানে স্থানে দুর্ব্যবহার করিয়াছে।

যাহাই হউক এমন অবস্থায় ঢাকার মোকদ্দমা চলিল। সে-সময় দুঃখের মধ্যেও অনেকেরই ত্যাগ ও নির্ভীকতার পরিচয় পাইয়াছি।

ভোগ করার তো সেখানে কিছুই ছিল না তবু কেহ কেহ হয়ত তাহারই মধ্যে সামান্য প্রয়োজনীয় জিনিসটুকুই একটু আরামদায়ক করিয়া লইত। আবার কেহ কেহ ঐ সামান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মধ্য হইতেও অনেকখানিই বাদ দিয়া চলিতেন—কারণ সংযম ও কঠোরতা পুরামাত্রায় চাই। অনেকেই জানিতেন, কঠোর শাস্তি হইবে। অনেকেই শরীরটা বেশ সবল করিয়াই রাখিতে চাহিতেন, ডন বৈঠক করিতেন, কারণ সুদীর্ঘ মেয়াদ খাটিতে, গম ভাঙিতে, ঘানি টানিতে শরীরই তো প্রধান সহায়। মনের অবস্থা তখনও সকলের বুঝা যায় নাই, বুঝা সহজও নহে। মানুষ নিজের মনের কথাও সকল সময় বুঝে না।

ও-দিকে মামলা চলিল। তবে মামলার দিকে আসামীদের মধ্যে দুই জন বৃদ্ধ ও একজন মুরুব্বি ভিন্ন আর বড় কাহারো লক্ষ্য ছিল না। যাহা হইবার হইবে—ভাবটা যেন এই গোছেরই। কৌঁশুলী মিঃ সি. আর. দাশ, প্যারীবাবু,

শশাঙ্কবাবু, শ্রীশবাবু, বীরেনবাবু, হেমেন্দ্রবাবু, বিভুবাবু প্রভৃতি উকিল সহ যখন হাকিমকে মামলা বুঝাইতে ব্যস্ত—তখন 'ডকে' আসামীরা হয়ত রুটির ময়দা ছানিয়া সরকার পক্ষের ব্যারিষ্টার গার্থ সাহেবের মুখ গড়িতে লাগিয়াছে! যে সাহেবের মুখ যত বিশ্রী, তাহার মুখ গড়া হইত তত সহজে ও শীঘ্র! মধ্যে মধ্যে হৈ চৈ ব্যাপারে হাকিম বিরক্ত হইয়া পড়িতেন। মুরুব্বিরা বলিতেন, 'চুপ চুপ'! একদিন কোর্টে মিঃ আপটন—জুনিয়ার ব্যারিষ্টার—ও মিঃ গার্থের মূর্তি (মুখ) একেবারে চমৎকার করিয়া গড়া হইল। শ্রীশবাবু লইয়া গিয়া সাহেবদের দেখাইলেন, সাহেবেরা একটু হাসিল বটে, কিন্তু মনে করিল হয়ত ঠাট্টা করিয়াছে! শ্রীশবাবু আস্তে বলিয়া গেলেন ওদের যেমন মুখ গড়িয়াছ তেমনি মিঃ দাশেরও (সি. আর. দাশ) মুখ গড়িয়া দেও—তবেই ওরা কিছু মনে করিবে না। চেষ্টাও হইল—কিন্তু শিল্পী বলিলেন, 'সুন্দর মুখ গড়িতে পারি না। কোথাও একটু বিশ্রী খুঁত্ না থাকিলে লক্ষ্য ঠিক করিয়া গড়া যায় না!' এমনি ভাবে আদালতে দিন কাটিত।

* * * *

জেলে গিয়া কেহ কেহ বেশ ধ্যান-ধারণা আরম্ভ করিলেন। ইহাদের মধ্যে দুই একজন সত্যই পরে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস নিয়াছেন। অক্ষয় দত্ত—ডাক নাম লোহা বা Iron—ত্যাগে, চরিত্র-মাধুর্যে, সাধনায়, জেলে থাকিতেই ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস দিয়াছিলেন। সেই মৌন-ব্রতধারীকে অনেক বিরক্ত করা হইত, কিন্তু মৌনীই শেষে জয়ী হইলেন, বিরক্ত করা সম্ভব হইল না। তাঁহার ব্রত সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি এখন সর্বত্যাগী—ভারত-বিখ্যাত সন্ন্যাসী শান্তিনাথ।

পূর্বেই বলিয়াছি, ধর্মের দেশ বলিয়াই হউক বা অন্য কারণেই হউক, বিপ্লব-বাদীরা সাধারণতঃ জেলে গিয়া একটু সাধন ভজন করিত। এ অবস্থায় যাঁহারা প্রাণায়াম প্রভৃতির মাত্রা হঠাৎ চড়াইয়া দিলেন, তাঁহারা কেহ উপযুক্ত দীক্ষার অভাবে হইলেন অসুস্থ, কেহ বা বিপ্লবের পথ ছাড়িলেন। সুদীর্ঘকাল জেলে একটা প্রকোষ্ঠে সময় কাটাইতে হইবে এই নিমিত্ত (মনে রাখিতে হইবে লেখাপড়া করিয়া সময় কাটাইবারও সম্ভাবনা তখন ছিল না)* এবং ভবিষ্যৎ জীবনের গতি

* বহুদিন পর্যন্ত বিপ্লবী রাজনৈতিক বন্দীরা বই খাতা কলম পায় নাই। ১৯২০ সালের পর অসহযোগ আন্দোলনে দণ্ডিত বন্দীদের আমলে খেলাধূলার এবং পুস্তকের ব্যবস্থা হয়।

প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও প্রকার নিশ্চয়তা না থাকায় স্বভাবতই যুবকদের মধ্যেও ভগবদ্‌ভক্তি দেখা দিত, একটা শরণাগতির ভাব আসিত। মানুষ যেখানে নিরুপায়, শরণাগতি সেখানে সহজেই আসে। তাহার উপর সংসারের বন্ধন কাহারও বড় একটা ছিল না। সকলেই ভাবিত, যাক ভগবৎচিন্তা করিয়াই জীবন কাটাইব। দুঃখ কি, ভগবৎচিন্তার মস্ত অবসর। অবশ্য সুদীর্ঘ কারাবাসের মধ্যে তেমন নিষ্ঠার সহিত এই ভাবটিকে সকলেই বরাবর বজায় রাখিতে পারেন নাই। দুঃখ কষ্ট অনেককে পীড়িত করিয়াছে; আবার অনেককে যে কিছুই করিতে পারে নাই তাহাও দেখিয়াছি। সেই জেল-দ্বীপান্তরের মধ্যে তাঁহাদের মুক্ত জীবন একটুও ম্লান হয় নাই। আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া সোনা খাঁটি হইয়াছে, আরও উজ্জ্বল হইয়াছে।

ষড়যন্ত্রের মামলায় প্রায়ই দুই একজন এপ্রুভার দাঁড়ায়, সেই হয় সরকারের প্রধান অবলম্বন। ঢাকার এই মামলায় সরকার কোন এপ্রুভার পায় নাই। তবে প্রাণায়াম প্রভৃতি অশুদ্ধ উপায়ে সাধন করিয়া একজন (বিজয় রায়) বিকৃত-মস্তিষ্ক হয়, সে-ই মোকদ্দমা শেষ হইলে অসংলগ্ন কতকগুলি কথা বলিয়া ফেলে। তাহা অবশ্যই আদালতে গ্রাহ্য হয় নাই। এক কারণ, তখন মোকদ্দমা শেষ হইয়াছে, দ্বিতীয় কারণ—তাহার কার্যকলাপে জেল কর্তৃপক্ষই তাহাকে উন্মাদ বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৫

মামলায় ফল হইল না

গবর্ণমেণ্ট দুইদিনেই দেখিলেন, ষড়যন্ত্র মামলা করিয়াও বিপ্লববাদীদের বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। বিপ্লবী কর্মানুষ্ঠান বাড়িয়াই চলিল। নেতৃস্থানীয় অনেকের শাস্তি হইল বটে, কিন্তু দেশে বিপ্লবানুষ্ঠান চলিতেই লাগিল। এমনকি ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা চলিবার সময়ই পিস্তল ছোটে, বোমা ফাটে, কতকগুলি হত্যাকাণ্ড ঘটে, অনেক অস্ত্র-শস্ত্র ধরা পড়ে, অনেকগুলি রাজনৈতিক-

১৯১৭।১৮ সাল হইতে রাজবন্দীরাও পড়াশুনার সুবিধা পায়। পরবর্তী কালে সেই সুযোগ বহু পরিমাণে বাড়ে। এমন কি ১৯৩০।৩১ সালে পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থাও হয়।

ডাকাতি হয়। দুঃসাহসিক বড় বড় ডাকাতিও হয়।* ধর-পাকড় চলিতে লাগিল, পুলিশী লাঞ্ছনা বাড়িল; কিন্তু এত সব ধর-পাকড় সত্ত্বেও বিপ্লববাদীরা 'গুপ্তসমিতি' ত্যাগ করিল না। বিপ্লবী কর্মানুষ্ঠানও বন্ধ করা গেল না। মোট কথা, বাংলায় তখন আবেদন-নিবেদন বা প্রতিবাদ বা প্রকাশ্য আন্দোলনে যাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, তাঁহারা এই সমস্ত বিপ্লববাদীদের উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারেন নাই। বিপ্লবীগণ একই কালে মডারেট, একষ্ট্রীমিষ্ট সকলকেই বাদ দিয়া চলিল। 'দেশের কাজ' তাহারা শুধুই বিপ্লবের দিক দিয়া বিচার করিয়া, ধ্বংসের শ্মশানেই সৃষ্টির মঙ্গলঘট স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হইল। আবেদন প্রতিবাদ বা অপেক্ষা করিবার ধৈর্য তাহাদের একটুও ছিল না।

বিপ্লববাদীদের উগ্র কর্মে ও ত্যাগে দেশে তখন এমনি একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল, যাহাতে আইনসঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা ও তাহাদের প্রচেষ্টা ম্লান হইয়া গেল। সেদিকে দেশের লোকেদের আর কোন আকর্ষণই রহিল না। অন্ততঃ ভাবপ্রবণ তরুণ বাংলার কাছে ঐ পথ যেমনি অকেজো তেমনি নিরর্থক বলিয়াই বিবেচিত হইল। যাহাই হউক, দেশের অন্য কোন পন্থীর সঙ্গে কোথাও একটু বিরোধ না করিয়া এবং যতটুকু সম্ভব প্রত্যেকের কাছ হইতে তাঁহাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সাহায্য লইয়া বিপ্লববাদীরা তাহাদের পূর্ব পন্থাতেই যুক্ত রহিল, উহা ত্যাগ করিল না। ১৯০৯।১০।১১।১২।১৩ সাল পর্যন্ত মোটামুটি একই পন্থায় কাজ চলিল।

যদিও নেতারা জেলে গেলেন, কেহ কেহ সরিয়া পড়িলেন, কিন্তু তথাপি দেশে বিপ্লবের এই স্রোত বাড়িয়াই চলিল। বাংলার যুবকগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, প্রচেষ্টা সবই বিপ্লবমুখী হইয়া পড়িতে লাগিল। কেমন করিয়া এই বিপ্লব সত্যই একদিন সশস্ত্র-বিদ্রোহ আকারে সফল হইবে, সে কথা সাধারণ সভ্য কিংবা অনেক প্রধানের পক্ষেও তখন সুনির্দিষ্ট করিয়া বলা হয়ত খুবই শক্ত ছিল। কিন্তু

* ঢাকা সমিতির কেন্দ্র সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত—পূর্বে বলিয়াছি। এই কেন্দ্র হইতে বহু কর্মানুষ্ঠান চলে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সবাই বিপ্লবী —ছাত্রগণের অনেকে দলভুক্ত। পুলিশের নজর পড়ে। তল্লাস চলিতে থাকে। ডাক-পিয়ন মারার ও টাকা ছিনাইয়া লওয়ার মিথ্যা মামলায় কয়েকজন বিপ্লবীর সাজা হয়। অতঃপর সোনারং হইতে কেন্দ্র উঠাইয়া দিতে হয়। ঐ কেন্দ্রে বহু ফেরারী ছিল। শাপে বর হইল। ফেরারী কর্মিগণ বিভিন্ন জেলায় চলিয়া যায়—ফলে বিপ্লবকেন্দ্র ছড়াইয়া পড়ে।

তবু ঐ বিপ্লবের নামে, এই জটিল বন্ধুর সীমাহীন পথেই সকলে পা ফেলিতে লাগিল। এত বাধা সত্ত্বেও নূতন কর্মীর অভাব হইতেছিল না। নানা অযোগ্য লোক যেমন বাহির হইতেছিল, যোগ্য লোকও তেমনি বাহির হইতেছিল। অগ্রণীরা কেহ কেহ সরিয়া গেলেও স্থলে স্থলে দলবৃদ্ধি এবং দলের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দল বাড়া ভাল না হউক, কিন্তু এ পথের পথিক যে জুটিত, তাহাই লক্ষ্যের বিষয়।

ইহারও একটা হেতু আছে। বাংলার বিপ্লববাদ কোন ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। জাতির স্বতঃস্ফূর্ত দেশাত্মবোধ নানা ভাব-সংঘাতে রূপান্তরিত হইয়া বিপ্লব আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। যদি কোন ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার ঐ জাগরণ সূচিত হইত, তবে নেতাদের অবর্তমানে বা 'অন্তর্ধানে' বা ডিগ্‌বাজিতে তাহাতে স্বভাবতঃই যবনিকা পড়িত। কিন্তু কতকগুলি সমর্পিত-প্রাণ কর্মী সর্ব-নিরপেক্ষ হইয়াই উক্ত প্রেরণা আপন অন্তর-লোক হইতে লাভ করিয়াছিল। মানুষ যখন অন্তর-দেবতার আদেশে কোন বস্তুকে লাভ করিতে ব্যস্ত হয়, তখন তাহার দ্যোতকরূপে বাহিরের কোন 'বাণী', কোন মহাপুরুষের 'আদেশ' বা অপর কোন 'নির্দেশ' বর্তমান না থাকিলেও চলে। সহায়-সম্বলহীন বিপ্লববাদীরা নিজেদের ভাবকে নিজেরাই সৃষ্টি করিয়াছে, নিজেরাই পুষ্ট করিয়াছে। কাহারো বিয়োগ, কাহারো অভাব তাহাদের পথ রুদ্ধ করিতে পারে নাই। বিপ্লবের অগ্রদূতগণ, এমন কি অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর প্রভৃতিও সাক্ষাৎভাবে বিপ্লব-দলের সহিত সম্পর্ক-শূন্য। বারীনবাবু, পুলিনবাবু প্রভৃতি নেতারাও দ্বীপান্তরে। মিত্র মহাশয় (পি. মিত্র) মৃত। কিন্তু তাহাতে বিপ্লবীরা বিন্দুমাত্র দমে নাই। ভারতের প্রায় সব জাগরণই নেতার অভাবে, একজন শ্রেষ্ঠ নায়কের অভাবে একেবারে অসহায়ভাবে নিঃশেষ হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসের পাতায় পাতায় নেতৃবিশেষের অদ্ভুত কর্মশক্তির, আর উক্ত নেতার অভাবে ঐ নেতারই শিষ্যদের অদ্ভুত অবসাদের কথা লিপিবদ্ধ আছে। একের অভাবেই যেন সকলেরই অভাব হইয়া পড়ে। কিন্তু বাংলার বিপ্লববাদের অবস্থা ছিল অন্য প্রকার। বাংলার তরুণদল এই আন্দোলনকে ব্যক্তিবিশেষের নেতৃত্বের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। তাহারা সকলেই (ব্যক্তিবিশেষ নহে) প্রাণ দিয়া ইহার সত্যমিথ্যা ভুলভ্রান্তি চলার পথে পথে যাচাই করিয়াছে। নেতার আদেশে তাহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে

ঘটে, কিন্তু নেতার আসনও তাহারা দেশের আসনের অনেক নীচেই রাখিয়াছিল। দেশ যেন তাহাদের সমগ্র হৃদয় দখল করিয়া বসিয়াছিল, নেতার আসন কোনদিনই দেশের উপরে জয়ী হইতে পারে নাই। বাংলার যুবজন বিপ্লববাদের ভিতর দিয়া একটা নূতন ভাব দেশে আনিয়া দেয়—তাহা জনশক্তির প্রভাব; তাহা সাধারণতন্ত্র, ব্যক্তিতন্ত্র নহে। বলা বাহুল্য, এই জনশক্তি বা সাধারণতন্ত্র বিপ্লবী দলের সাধারণ সদস্যদের সদিচ্ছা বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমষ্টিগত অভিপ্রায়ের প্রভাব। এই প্রভাব বহু জনের ইচ্ছা ও শুভ কামনায়ই দুর্নিবার ছিল। ব্যক্তি-প্রাধান্য সেখানে ছিল না; দেশসেবার মাপকাঠিতেই সেখানে ব্যক্তির নিত্য বিচার হইত। বাঙ্গালার ছোট বড় সকল বিপ্লবী দল সম্বন্ধেই ইহা সত্য।

নিজের জীবনে, সর্বস্বের বিনিময়ে সত্যকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা বিপ্লববাদীদের মধ্যে, দুই একজনের নহে, অনেকেরই ছিল। সুতরাং তেমন সব ব্যক্তি আদর্শকে লাভ করিতে অপর কাহারো অপেক্ষা না করিয়া নিজের অন্তরের জোরেই একেবারে বেপরোয়া হইয়া চলিতে ইতস্ততঃ করিত না।

গড়িয়া তোলার একটা গৌরব আছে,—অনুকরণ করায়ও আছে অগৌরব। একটায় মানুষকে মানুষ করে, তাহার জীবনকে সচল যৌবনধর্মে তেজীয়ান করে, অপরটি মানুষকে পীড়িত করে,—সৃষ্টির আবেগের একান্ত অভাব হেতু একটা পঙ্গুতা আসিয়া তাহার সত্যকার জীবনধর্মকে দীন হীন করিয়া দেয়।

বাংলার এই জাগরণ যেন বাঙালীর নিজস্ব। তাহার ভুল-ভ্রান্তি, ভাল-মন্দ সবই বাঙালীর গড়া। তাহাতে বাঙালীর একটা প্রভুবুদ্ধিই কাজ করিয়াছে—কোন দাস-বুদ্ধি নহে। অনুকরণের দৈন্য নাই,—সৃজনের গৌরব আছে। ভারতের অন্য প্রদেশে ইহার অভাব ছিল। অন্য অন্য প্রদেশে খণ্ডিত ও সাময়িক বিপ্লব প্রয়াস এবং ব্যক্তিগত বীরত্ব ছিল—কিন্তু ছিল না বিপ্লববাদ। বস্তুতঃ বাংলাদেশই সমগ্র ভারতের হইয়া বিপ্লব-বাদের দ্রষ্টা স্রষ্টা ও পোষক।

এই সমস্ত নানা কারণেই বাংলার বিপ্লব আয়োজন বাধা-বিপত্তিতে, নেতার অভাবে থামে নাই। নিত্য নিত্য নব নব কর্মী আসিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। বরং প্রথম দিককার নেতাদের (পাইওনিয়ার) অপেক্ষা পরবর্তী কালের কর্মীরা বাধা-বিপত্তি ঠেলিয়াছে বেশী, বিপ্লবনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছে বেশী। একটা প্রেরণা যেন বাঙালী বিপ্লববাদীদের পথ নির্দেশ করিয়া চলিয়াছিল, নেতার

আদেশের অভাবেও তাই তাহারা অসহায় হইয়া বসিয়া পড়ে নাই। ইহার ভুল-ভ্রান্তি দোষ-গুণ সবই তাহাদের একেবারে নিজস্ব বলিয়াই বাংলার কর্মীরা আত্মবিশ্বাসেও দুর্জয় হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলার যুবকেরা এই প্রভু-বুদ্ধির ফলে কতকটা গোঁড়া ও একগুঁয়ে, কতকটা দাম্ভিকও হয়ত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার ফলেই যে তাহারা একটা জীবন্ত সংঘে পরিণত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই, নানা বাধা-বিপত্তি সত্বেও কর্মীর পর কর্মী জুটিতেছিল। দেশের বুকের মাঝখান হইতেই যেন কর্মীরা দেশের বাণীকে গ্রহণ করিতেছিল, দরদ দিয়াই যেন দেশের বুকের ব্যথা টের পাইতেছিল। পথই তাহাদের পথে টানিতেছিল—পথ-প্রদর্শক যেন অবান্তর।

১৬

আপন জনে ছাড়বে তোরে

স্বদেশীর সূত্রপাত হইতে বিপ্লববাদীদের সমিতিগুলির মধ্যে নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া জুটে। গোড়ায় যে সমস্ত সমিতি ও সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে খাঁটি বিপ্লববাদী ছাড়া অন্য লোকও ঢুকিয়াছিল। প্রথম অবস্থায় পদে পদে বিপদকে বরণ করিতে হইত না বরং একটা প্রতিপত্তি লাভের অবসর ছিল বলিয়াও অনেকে দলে ঢুকিয়াছিল। ইহারা সমিতির প্রকাশ্য ব্যাপার পর্যন্ত গিয়াই যে কেবল ক্ষান্ত ছিল তাহা নহে, গুপ্ত ব্যাপারেও কিছু কিছু লিপ্ত হইয়াছিল। তবে সে-সমস্ত গুপ্ত ব্যাপারের সত্যকার নির্যাতনের দিকটা তখনও আরম্ভ হয় নাই বলিয়া পরীক্ষা তাহাদের পরে হইয়াছে।

১৯১০।১৯১১ সালের পর হইতে বিপ্লববাদীদের মধ্যে কতকটা মতভেদ দেখা দিল। আদর্শ লইয়া একটা বুঝাপড়া চলিতে লাগিল। পথ লইয়াও মতান্তর দেখা দিল। পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্রই এই ভাব অল্পাধিক ছিল। কেহ—এ পথে কিছুই হইবে না, এই বিশ্বাসে বিপ্লবপন্থা ছাড়িতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন—স্ত্রীশিক্ষা ভিন্ন এ দেশ উঠিবে না; কেহ পল্লী-সেবা ও সংগঠনের কথা বলিলেন; কেহ কেহ বলিলেন; জাতিভেদ না উঠিলে কিছুই হইবে না, জাতিভেদই বিপ্লবের অন্তরায়। কেহ বলিলেন, শিক্ষাই নাই,

আমাদের ভাব দেশের কয়জন বুঝিবে, শিক্ষাবিস্তার ভিন্ন কিছুই হইবে না। কেহ বলিলেন, এ দেশ ধর্মের দেশ, ধর্ম ভিন্ন এ দেশ কিছু বুঝে না—ধর্মের ভিত্তিতে দাঁড়াইলে তবেই এ দেশ উদ্ধার পাইবে।—এই রকমের নানা কথায় অনেকে সে সময় বিপ্লববাদীদের দল ছাড়িলেন। তাঁহারা সকলেই যে স্ত্রী-শিক্ষা, সমাজ-সংগঠন ও সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার ও ধর্মচর্চায় দিন কাটাইতেছেন এরূপ বলা যায় না। তবে বিপ্লববাদীরা মনে করিত, তাহারা পথ ও দল ছাড়িয়া যাইবে, ইহাই প্রধান কথা।

যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা, সমাজ-সংস্কার করিবার কথা বলিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে, মতের দিক দিয়া, বিপ্লবীদের কোন বিরোধ ছিল না। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম ভিন্ন কিছু হইবে না বলিলেন—তাঁহাদের সঙ্গেই বিপ্লববাদীদের সাক্ষাৎভাবে একটা মতবিরোধ দেখা দিল। বিপ্লববাদীদের কর্মপ্রচেষ্টার পিছনে একটা উচ্চ আদর্শ ছিল। নানা বিরুদ্ধ মন্তব্যের মুখে তাহারা সেই দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়াই দলের কর্মীদের টিকাইয়া রাখিত। কিন্তু যাঁহারা ধর্মের কথা বলিয়া বিপ্লব-পন্থা ছাড়িলেন তাঁহারা গুপ্ত-বিপ্লব-পন্থাকে আক্রমণ করিতে ধর্মের উচ্চ-তত্ত্বের অবতারণা করিয়াই এই পন্থাকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে সেবামূলক সংঘ-শক্তি গড়িয়া পরে দেশকে স্বাধীন করার প্রস্তাবও উঠিল। মোট কথা, মানুষ ভালমন্দ যাহাই করুক, নৈতিক যুক্তির তাহার অভাব হয় না। যাঁহারা বিপ্লবপন্থা ছাড়িলেন তাঁহারা যেমন আধ্যাত্মিক দোহাই দিতেন, যাহারা বিপ্লবপন্থায় যুক্ত হইয়া রহিল তাহারাও তেমনি ভিন্নভাবে তাহাদের যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিত।

অবস্থা দাঁড়াইল এই,—রাজশক্তি তাহাদের পিষিয়া মারিতে সচেষ্ট, তাই বাহিরে তাহারা দাঁড়াইতে পারে না,—এদিকে ঘরেও বাধা-দ্বন্দ্ব-মতান্তর। একে তো দেশবাসীর জ্ঞানের বাহিরে গিয়াই তাহাদের দাঁড়াইতে হইবে, তাহার উপর এমনই সময়ে আবার যাহারা তাহাদের পথকে এতদিন পথ ভাবিয়াছিল, যাহারা এতদিন ছিল তাহাদের পথের সাথী তাহারাও বিপথ বলিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল।

এই সকল ঘরছাড়া বিপ্লববাদীদের দুঃখকষ্টকে সহানুভূতি বা প্রশংসার দৃষ্টিতে ঘরের বা বাহিরের মা বোন বাপ ভাই কেহই দেখিবার সুযোগ বা সময় পান নাই। মা, যিনি পেটে ধরিয়াছেন, তিনি হয়ত কাঁদেন, তাহাও নীরবে;

ছেলে যে কি করিয়াছে তাহা যে তিনিও জানেন না! 'বড়'গলায়' ছেলের দুঃখের কথা তো তিনি বলিতে পারেন না। পাড়ার 'অমুকে' 'অমুকে' বলিতেছে ছেলে 'ডাকাতি' করিয়াছে! মায়ের সান্ত্বনারও কিছু নাই। একথাটা ব্যথার মন লইয়া বুঝিতে চাহিলে বুঝিবে, বিপ্লববাদীদের মায়ের দুঃখও কেমন অসহনীয়। মা জানেন, ছেলে তাঁহার অনিন্দনীয়, কিন্তু তাহাও নীরবে জানেন, নীরবে বুঝেন—বলিবার নহে। কোন পরিবারের পুরুষেরা হয়ত মাকে সান্ত্বনা দেয়; ছেলের ভালর দিকটা দেখায়; আবার অনেক পরিবারের পুরুষেরাও হয়ত মাকে ছেলের অন্যায়ের কথাই বলে। প্রশংসা একটুও নাই। মায়ের ব্যথা অবর্ণনীয়। এস্থলে বিপ্লববাদীর ব্যথাও বুঝিতে হয়। বিপ্লববাদীর দুঃসহ কারাবাসে, মায়ের সান্ত্বনা ব্যাপারেও সে নিশ্চিন্ত নহে। কারণ দেশবাসী গিয়া মাকে তো বলিবে না যে,—ছেলে তোমার দেশের জন্য দুঃখ সহিতেছে, আজ তোমাদের আনন্দের দিন।* বিপ্লববাদী জানে, ছেলের দুঃখকে মায়ের গৌরবের বস্তু কেহ করিবে না। বরং 'খুনে' 'ডাকাত' বলিয়া কেহ কেহ গ্রাম্য-শত্রুতা সাধন করিয়াছে, ব্যথাও দিয়াছে। বিপ্লববাদীদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মায়েরাও দুঃখ কম সহে নাই। তবে অনেক বিপ্লববাদীর জননী, ছেলের দুঃখ-কষ্টকে নীরবেই গৌরবের বস্তু ভাবিয়াছেন। ছেলেকে ফিরিয়া পাইয়া ধরিয়া রাখিতেও চাহেন নাই, আবার যখন সে বিপ্লব-পথেই যাত্রা করিয়াছে, তখনও মা তাহাকে মঙ্গল আশীর্বাদই করিয়াছেন। যাহাই হউক, ঘরে বাহিরের এই অবস্থা লইয়া বিপ্লববাদীরা তখন নূতন কর্মক্ষেত্রে নামিতেছে।

বিপ্লববাদীরা তাহাদের দলকে খাড়া রাখিতে একপ্রকার বদ্ধপরিকরই হইল। সশস্ত্র বিদ্রোহ, আজ হউক, কাল হউক, করিতে হইবে, একথা বুঝিয়াই তাহারা দলকে অব্যাহত রাখিতে ও দলের বিস্তার সাধনে তথা লোক-সংগ্রহে উদ্যত হইল। এই সম্পর্কে অর্থের প্রয়োজন হইলে ডাকাতি করিয়াছে, প্রকাশের সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য খুন করিয়াছে। কিন্তু সেই প্রকাশ্য বিপ্লবের দিন যে কবে আসিবে তাহা তখনো তাহারা ঠিক জানিত না। তবু একটা আশা তাহাদের ছিলই। সেই আশা লইয়াই—সৈন্যদলে যেমন চেষ্টা চলিতেছিল—তেমনি বিদেশে কর্মী পাঠাইয়া অস্ত্র-সংগ্রহের চেষ্টাও চলিতেছিল। কিন্তু সকলে

* যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন এমনই ছিল দেশের অবস্থা।

এই পথে—এইভাবে প্রস্তুতির পথে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব মনে করিতেন না। সেই জন্য ডাকাতি ও খুন প্রভৃতি তাঁহারা অনর্থক ও ক্ষতিকর মনে করিতে লাগিলেন এবং কার্যতঃ কোন বিপ্লবী কর্মানুষ্ঠান করেন নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তখন যুবকগণ বিপ্লবী কর্মানুষ্ঠান দেখিয়া দলে ভিড়িত। দলের বিস্তৃতি ও লোক সংগ্রহের জন্যও বিপ্লবী কর্মানুষ্ঠান, বিপ্লবীদের ভাষায় action, কার্যকরী ছিল। ঐ ধরণের কোন না কোন কর্মানুষ্ঠান ভিন্ন কেবল কথায় দল রক্ষা চলিলেও দলের বিস্তৃতি চলিত না, এবং চলে নাই।

১৯১৪ সালে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর যে ভাবে বাংলার সকল বিপ্লবদলই নব-উদ্যমে কার্যক্ষেত্রে নামিয়াছিল, সে ভাবে যদি পূর্ব হইতেই নামিত তবে অবস্থা যে আরও গুরুতর হইয়া উঠিত তাহাতে সন্দেহ নাই। একথা বলিয়া বাংলার বিপ্লববাদীরাও শেষে আপশোষ করিয়াছে। যাহাই হউক, এই মতভেদের সময়, বাংলার কোন কোন দল, বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও, তখনকার এই সকল কার্যপ্রণালীকে অনুসরণ বা সমর্থন করিতে চাহে নাই। কিন্তু কোন কোন দল, পূর্ববৎ দলপুষ্টি ও দলরক্ষার পথেই চলিতে লাগিল। তবে তাহাদের নিজেদের কোন কোন বিশিষ্ট কর্মীও মতভেদ হেতু দল ছাড়িলেন এবং পরে তাঁহারা বিপ্লবপন্থাকেই ছাড়িয়া দিলেন। এই সময়টা অর্থাৎ ১৯১০ হইতে যুদ্ধ-পূর্ব ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বিপ্লবীদের নিষ্ঠা ও প্রত্যয়ের অগ্নিপরীক্ষা গিয়াছে। বলিয়াছি, এই মতভেদ সত্বেও নিষ্ঠাবান বিপ্লববাদীরা ঐ পথ ত্যাগ করে নাই। শেষ পর্যন্তও তাহারা নিজেদের মত অনুসারে পথ করিয়া লইয়াছে, পাহাড় প্রমাণ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছে। আর যাঁহারা মত মিলাইতে পারেন নাই বলিয়া দূরে গেলেন—তাঁহারা হয় মত পরিবর্তন করিয়া আবার বিপ্লবদলে ফিরিলেন, নূতন উদ্যমে দল গড়িলেন—নতুবা একেবারেই দূরে সরিয়া গেলেন।

বাংলার তরুণ সম্প্রদায় কিন্তু বিপ্লববাদীদের দিকেই আকৃষ্ট হইল। 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'! ধর্ম-কথায় তরুণ বাঙালীর মনের চিঁড়া ভিজিল না। ইহার একটা প্রধান কারণ বিপ্লববাদীদের যুক্তি নহে, তাহাদের কর্মপ্রবণতা ও ত্যাগ। অপর পক্ষের তেমন কর্মপ্রবণতা ছিল না বলিয়াই দেশের যুবক, যাহারা একটা কিছু করিতে চাহে, তাহাদের কথায় আকৃষ্ট হইত না। বিপ্লববাদীরাই দেশের যুবকদের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া রাখিল। ক্রমে তাহাদের

যুক্তি প্রভৃতি বাংলার যুবক সম্প্রদায়ের কাছে অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। ইহার একমাত্র কারণ তাহাদের একান্ত আন্তরিকতা,—ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও তাহাদের জীবন্ত সচল ভঙ্গী। সেই জীবন্ত চেষ্টা ছিল বলিয়াই দেশের লোকও বিপ্লববাদীদের কর্মশক্তিতে বিশ্বাস হারায় নাই।

বিপ্লববাদকে যুবকদের কাছে অপ্রতিহত করিতে বিপ্লবীরাও সাধ্যমতো চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। দেশের যাহা কিছু সম্পদ সবই বিপ্লববাদীরা নিজেদের বলিয়াই মনে করিত। প্রত্যেক বস্তুকেই তাহারা নিজেদের প্রয়োজনে খাটাইতে চেষ্টা করিত। কোন্ দিন কোন্ কথা, কোন্ গাথা কে কোন্ উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছে কে জানে, তবে বিপ্লববাদীরা সেই গাথাকেই নিজেদের প্রয়োজনে খাটাইয়াছে। যে কথায় তাহাদের মনের জোর বাড়িবে, যে কথা তাহাদের কার্য সমর্থন করিবে তাহা তাহারা দেশবিদেশের ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস, কাব্য হইতে গ্রহণ করিয়াছে। বিপ্লব অনুষ্ঠানকে, তাহাদের প্রত্যেক কর্মকে, যুক্তিসহ করিতেও তাহারা ত্রুটি করে নাই—সে যুক্তি বাহিরের কাহারও কাছে দিতে না হইলেও নিজেদের মধ্যে সর্বদাই দিতে হইত।

রবীন্দ্রনাথের অনেক গান বিপ্লববাদীরা তাহাদের কাজে লাগাইয়াছে। যখন দেশশুদ্ধ লোক একটা পথে চলিতেছে, তখন যদি কেহ লক্ষ লোকের সভায় গাহে—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল্‌রে'—তবে তাহা উপভোগ্য যতই হউক, ইহার সত্যকার সৌন্দর্যটুকু ফুটিয়া উঠেনা। কিন্তু বিপ্লববাদী যখন দুইচারিজন বন্ধুর সঙ্গে নির্জনে বসিয়া নিজেকে সত্যই একলা মনে করিয়া প্রাণের আবেগে গাহিত—গাহিতে শোনাও গিয়াছে—

"যদি কেউ আলো না ধরে,
ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে,
তবে বজ্রানলে, আপন বুকের পাঁজর
জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বল্‌রে।"

তখন বিপ্লববাদী নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিত। তাহার সেই অশ্রু-জল, শ্রোতার চোখেও ধারা বহাইত। সেই ত্যাগ ও দুঃখের প্রভাবে শ্রোতা

প্রভাবান্বিত হইত। সাহসী কর্মী ও ত্যাগীর চোখের জল বড় দুঃখের—সহানুভূতিতে শ্রোতার হৃদয় নূতন ভঙ্গীতে নাচিয়া উঠিত।

কবি যে উদ্দেশ্যেই লিখুন, বিপ্লববাদী তাহার খোঁজ রাখিত না। সে তাহার নিজ প্রয়োজনেই তাহা ব্যবহার করিত।

যখন একে একে অনেকেই দল ছাড়িল, বিপ্লববাদীরা তখন গাহিত—

"যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
আমি তোমায় ছাড়ব না মা।"

এমনি করিয়াই বিপ্লববাদীরা বল পাইয়াছে, ভরসা পাইয়াছে। বাহির হইতে কোন বল কেহ দেয় নাই, তাই এমন করিয়াই কাব্য গাথা, সাহিত্য, ধর্ম হইতে তাহারা নিজেদের সান্ত্বনা, সহায়, শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে। পরবর্তীকালে দেশ-নেতারা—তাহাও বিপ্লবী কর্মীদের প্রভাবে—বিপ্লবীদের কর্ম-পন্থাকে নিন্দা করিয়া বিপ্লবীদের দেশ-ভক্তিকে প্রশংসা করিয়া যে ধরণের কর্তব্য পালন করিতেন তাহাতে আদর্শ-নিষ্ঠ বিপ্লবী কোন সান্ত্বনা পাইত না। কর্মীর কর্মের —(কর্মও তাহার অসংখ্য নহে) নিন্দা করিলে সান্ত্বনার থাকে কি? অথচ বিপ্লবীদের মুখ খুলিয়া কিছু বলিবার সাধ্য ছিল না।

কোনও কিছু বলিবার সাধ্য যখন তাহার নাই, কোথাও দাঁড়াইয়া নিজেকে সমর্থন করিবার উপায় নাই তখন সে সান্ত্বনাস্বরূপে ভাবিত,—

"তোরা নেই বা কথা বল্লি
না হয় চুপে চাপেই চল্লি।"

সেই 'চুপেচাপে'র পথেই বিপ্লববাদীরা চলিতে লাগিল, সহকর্মীদের বিচ্ছেদেও ভরসা ছাড়িল না। কবির কথাই মনে করিল,—'আপন জনে ছাড়বে তোরে, তা ব'লে ভাবনা করা চল্‌বে না।'

১৭

স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী

প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছি যে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি বিপ্লবীদের কাছে একটা স্বতন্ত্র রূপে দেখা দিয়াছিল। এখানে আমরা সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া পরের পরিচ্ছেদে বিপ্লববাদীদের কার্যাবলীর পরিচয় দিব।

সকল দেশেই এমন কতকগুলি লোক জন্মায় যাহারা দেশের ধূলিকণাকে সত্যই সোনার কণা মনে করে। দেশের আকাশ-বাতাস, চন্দ্রসূর্য, গ্রহতারা,—দেশের বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, নদী-পাহাড় তাহাদের প্রাণে আনন্দের ঢেউ তোলে; দেশের প্রতিটি বস্তু যেন তাহাদের বুকের রক্ত। দেশের আচার-ব্যবহার, বেশভূষা, ভাষা তাহাদের বড় আদরের ও দরদের। দেশের কোন জিনিসের উপরই, তাহা যেমনই হউক, কোন অনাদর কোন অশ্রদ্ধা তাহারা সহিতে পারে না। যাহার মূল্য কাণাকড়িও নহে তাহাও শুধু দেশের বস্তু বলিয়াই অমূল্য—তাহার প্রতি অনাদর করিতে বুকে ব্যথা বাজে। এই প্রকৃতির লোক আমাদের দেশেও ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তার উদ্বোধন ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের ভাব-প্রভাব যে অনেকখানি ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। সিকাগোর বিশ্ব-ধর্ম সভায় স্বামিজীর জয়জয়কার বস্তুতঃ ভারত-আত্মার আত্ম-সম্বিতেরই জয়-ধ্বনি। সেই নব জাতীয়তার প্রভাবে জাতির আচার, ব্যবহার, সমাজ, ধর্ম সকলের উপরই একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠে।

ইংরাজী শিক্ষা, সভ্যতা ও স্বাধীনতার প্রভাবে পূর্বে দেশের অনেক জিনিসকেই যাহারা ভাল চক্ষে দেখে নাই, এখন 'স্বদেশী'র প্রভাবে দেশের সকল জিনিসকেই তাহারা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিল। অবশ্য সেই সব অনুরাগে বাড়াবাড়িও কিছু ছিল। এদিকে স্বদেশীর সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রচলিত ধর্মে শ্রদ্ধা করাও স্বদেশধর্ম বলিয়াই গণ্য হইল। তাই আমরা দেখি, যাঁহারা প্রচলিত হিন্দুধর্মে তেমন বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁহারাও স্বদেশী আন্দোলনের পর হিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ সত্যই আচার-ব্যবহারেও হিন্দু হইলেন; কেহ আবার সাধারণ হিন্দু হইতেও বেশী গোঁড়া হইলেন। এই

ধর্মভাবের সঙ্গে যে অনেকটা স্বাদেশিকতা জড়িত ছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। 'যে ধর্ম, আচার, ব্যবহার আমার দেশের কোটি কোটি লোক স্বীকার করিয়া লইয়াছে, আমিও তাহাকে স্বীকার করিব,' ইহাই যেন তাঁহাদের ভাব। স্বদেশী-যুগের অনেক নেতা জাতীয়তাকে ধর্মের সঙ্গে অচ্ছেদ্য করিয়া বুঝিলেন ও বুঝাইলেন। এই সমস্ত ভাবের প্রভাবে বিপ্লববাদীদের মধ্যেও কতকটা ধর্ম-ভাব প্রবেশ করিয়াছিল। তবে বিপ্লববাদীদের ধর্মবোধের সঙ্গে দেশের প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিস্তর তফাৎ ছিল। বিপ্লববাদীরা স্বাদেশিকতার খাতিরে যেমন কতকটা গোঁড়া ছিলেন তেমনি দেশের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া তাঁহারা অনুদারতাকেও সর্বদাই বর্জন করিয়াছেন। দেশের হিতের জন্য তাঁহারা ব্যক্তিগত আভিজাত্য বা বংশের সংস্কার, ব্যক্তিগত সামাজিক সুখ-সুবিধা অনায়াসে বর্জন করিয়া চলিয়াছেন। সেই জন্যই তাঁহাদের চালচলনের সঙ্গে একদিকে যেমন গোঁড়া হিন্দুর খাপ খাইত না, তেমনি ব্রাহ্মসমাজীদেরও খাপ খাইত না। যে বিপ্লববাদী মাথায় টিকি রাখিয়াছে,—নিরামিষভোজী, সে-ই আবার অবিচলিত চিত্তে (ব্রাহ্মণ হইয়াও), হিন্দুসমাজ যাহাদের অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের অন্ন গ্রহণ করিয়াছে। প্রয়োজন হইলে যে-কোনও জাতের যে-কোন রান্নাই খাইয়াছে, সে জন্য আপশোষও করে নাই, প্রায়শ্চিত্তও করে নাই। অথচ মজা এই, তাহারা হিন্দুসমাজের বুকের উপরে এ সকল কাজ করিলেও হিন্দুরা তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ তেমন করে নাই, বরং বাংলার যুবকেরা সেই ভাবেই কতকটা প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের একান্ত দেশপ্রীতিতে দেশের লোকের বিশ্বাস ছিল। দেশবাসী তাহাদের আপনজন মনে করিত বলিয়াই তাহারা সমাজের প্রচলিত নিয়মকে অনেক সময় উপেক্ষা করিয়া চলিলেও তাহাদের সঙ্গে দেশবাসীর বিরোধ বাধে নাই। তাহার কারণ দেশের সমগ্র জিনিসের উপর তাহাদের অকৃত্রিম ভালবাসাকে কেহই সন্দেহ করিত না।

হিন্দুর ছুৎমার্গ বা জাতিভেদ বিপ্লববাদীদের কাছে আমল পাইত না। তবে সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য লইয়া বা সমাজকে 'অন্ধকার হইতে আলোকে' টানিবার জন্য তাহারা জাতিভেদ দূর করিতে প্রচারকার্যে নামে নাই। কিন্তু তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন ও আচরণের প্রভাবেই জাতিভেদ ও ছুৎমার্গ পরিহারের পথ সমাজে প্রশস্ত হয়। বিপ্লব-জীবনের প্রয়োজনে ও দেশাত্মবোধের স্বাভাবিক গতিতে যেখানে যাহা প্রয়োজন তাহারা করিয়া গিয়াছে। একান্ত স্বাদেশিকতায়

ফলে তাহারা একদিকে যেমন গোঁড়া ছিল, আবার ভারতবর্ষকে দুনিয়ার সঙ্গে সমান তালে চলিবার যোগ্য করিয়া তুলিতে তেমনি অসম্ভব রকম উদার ছিল। সেক্ষেত্রে কোনও শাস্ত্রের দোহাই, ধর্মের দোহাই, প্রথার দোহাই তাহাদের বিন্দুমাত্রও দমাইতে পারে নাই।

মানুষ যাহা মনে প্রাণে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাকে নিরাপদ করিতে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর অবিরোধী করিতে সে ব্যস্ত হয়। ধর্মই বল, সাহিত্যই বল, আর সমাজই বল—বিপ্লববাদীরাও তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের অবিরোধী করিয়াই তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে চাহিত। গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত বিপ্লববাদীরা একটু অন্য ভাবেই বুঝিয়াছে। মহাভারতের আপদ্ধর্ম, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের রাক্ষসবধের জন্য ক্ষত্রিয় রামকে আহ্বান, তাহাদের কাছে নূতন ধর্মের ইঙ্গিত দিত। রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে,—'লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দমধুর হাওয়া!' কবি কি উদ্দেশ্যে গানটি লিখিয়াছেন কবিই বলিতে পারিতেন, কিন্তু বিপ্লববাদীরা সেই গানের মধ্যেও তাহাদের কথাই শুনিল। কোন কোন বিপ্লববাদীর মুখে ব্যাখ্যা শুনিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথ গানটি লিখিয়াছিলেন নবীন বাংলার এই নূতন বিপ্লব পথের যাত্রাকে লক্ষ্য করিয়া।

এমনটি দেশে আর হয় নাই, একেবারেই নূতন, তাই কবি লিখিয়াছেন, 'দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।' তরুণ বাংলার এই নব অভিযানে কবিও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। এ নব ভাব, কোথা হইতে কোন্ সুদূর সাগর-পার হইতে কে আনিল? কবিরও ইচ্ছা যায়, কূল ছাড়িয়া এই নব অভিযানে যোগ দিতে—

"কোন্ সাগরের পার হ'তে আনে
কোন্ সুদূরের ধন।
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।"

তরুণ বাংলার উপর বড় বিপদ, রুদ্র রাজশক্তির গর্জন ও নিপীড়ন; বিপদ-মেঘ আসিয়া সব ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; তবে ভরসা, তরুণ বাংলা মরে না, মধ্যে মধ্যে তাহার মৃত্যু-হীন জীবনীশক্তি প্রকাশ পাইতেছে—

"পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।"

কবি আজ ভাবিতেছেন, কোন্ বিধাতা তরুণ বাংলাকে কোন্ পথে লইয়া যাইবে, কোন্ সুরে আজ যন্ত্র বাঁধিয়া তাঁহাকে কোন নূতন সুরে গান গাওয়াইবে?—

"ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার
হাসি কান্নার ধন।
ভেবে মরে মোর মন
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র
কি মন্ত্র হবে গাওয়া।"

দেশের কাব্য, সাহিত্য, সকলই তাহারা তাহাদের বিপ্লবের দিক হইতে বুঝিতে চাহিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানের বিকৃত অর্থ দেখিয়া হয়ত হাসিতেন* কিন্তু বিপ্লববাদীরা তাহাদের প্রয়োজনে এমন করিয়াই অনেক জিনিস বুঝিয়াছে।—কেই বা এমন করিয়া না বুঝে?—একই ধর্মগ্রন্থ হইতে বিরুদ্ধবাদী উভয়েই উভয়ের যুক্তিই খণ্ডন করে নাকি?

বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনায় তাহারা জাতীয়তার সন্ধান বিশেষ করিয়া পাইত। যে বিপ্লববাদী লেখাপড়া তেমন জানে না—সেও দেশের অনেকখানি ইতিহাস, দেশের অনেকখানি সাধনার কথা ও বিদেশের অনেক বিপ্লবের খবর রাখিত। পৃথিবীর বিপ্লববাদীদের চিন্তাধারার সহিত তাহারা ঐ ধরণের সাহিত্য ও নানা আলোচনার ভিতর দিয়া যুক্ত হইয়াছিল। এসব বিষয়ে তাহাদের শিক্ষা সাধারণ শিক্ষিত লোক হইতে অনেক বেশী ছিল।

* রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে তাঁহার গানের ব্যাখ্যা দেখিয়াছিলেন। লেখক সেই প্রসঙ্গ তুলিলে কবি হাসিয়া বলেন, তোমার ব্যাখ্যা দেখিয়াছি। ব্যাখ্যা ঠিক, ইহাও বলেন নাই, ব্যাখ্যা ভুল, ইহাও বলেন নাই। লেখকও অহেতুক কৌতূহল দেখাইতে সাহসী হন নাই।

তবে পল্লবগ্রাহিতা প্রভৃতি দোষ যে ছিল না তাহা নহে। সাধারণ বিপ্লববাদীর পুস্তকসংগ্রহ-ব্যাপারে সাধারণতঃ দেশ-বিদেশের ইতিহাস, বিপ্লববাদীদের জীবনী, বিপ্লব-সাহিত্য, ফরাসী-বিপ্লব ও সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, জাতীয় ভাবোদ্দীপক গ্রন্থ, যে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণী-সংক্রান্ত পুস্তক, কর্মী ও ত্যাগীদের জীবনী, প্রচুর ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি স্থান পাইত। একপাশে গীতা উপনিষৎ অপর পাশে রুষ-বিপ্লবের ইতিহাস! নিষিদ্ধ পুস্তক, তাহারা সযত্নে রক্ষা করিত। সাধারণতঃ উপন্যাস, গল্পের বই, বা কবিতা-পুস্তক অপেক্ষাকৃত কম থাকিত। তবে যে উপন্যাসে দেশের জন্য লড়াইয়ের কথা থাকিত তাহার কথা আলাদা। প্রেম-কাহিনীমূলক উপন্যাস 'আর্ট' হিসাবে মূল্যবান হইলেও, সাধারণ বিপ্লববাদীরা তাহার বিশেষ মূল্য দিত না।

মানুষ যখন স্বার্থত্যাগ করে,—ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, নাম-যশ, ভয়-ভাবনা যখন মানুষ ত্যাগ করিতে পারে, তখন সমাজ-বিষয়ে ধর্ম-বিষয়ে ও রাষ্ট্র-ব্যাপারে তাহার সিদ্ধান্ত অনেকটা অভ্রান্ত হয়। মানুষ অনেক সময় সত্য যে কি তাহা বুঝে,—সমাজের নিয়ম প্রণালী কেমন হওয়া উচিত তাহাও বুঝে,—কিন্তু স্বার্থ ও সংস্কারের খাতিরে যাহা বুঝে তাহা করে না। নির্মমভাবে সকল ছাড়িয়া একেবারে সর্বপ্রকারে রিক্ত হইয়াই তবে মানুষ সত্যকে পায়। রাজনীতি নিয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারাও এমন একটা জায়গায় আসেন—যখন সত্যকে অদূরে দেখিয়াও প্রভাব-প্রতিপত্তি, বাধা-বিপত্তি, নাম-যশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে একেবারে নির্মমভাবে ছাড়িয়া সত্যকে স্বীকার করিতে পারেন না। কেহ নীরবে থাকেন, আবার কেহ তাঁহার কাছেই সকলকে ফিরাইয়া আনিতে চাহেন। সমাজেও কত লোক কত উদারতার কথা বলেন, কিন্তু তাঁহারাও এমন একটা জায়গায় আসিয়া পড়েন যখন উদারতাকে, সত্যকে মানিয়া নিলে পূর্ব-অভ্যস্ত অনেক সুখ-সুবিধা ছাড়িয়া অনেকখানি দুঃখকে স্বীকার করিতে হয়। তাই সত্যকে ছোট করিয়া খণ্ডিত করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে চাহেন। ধর্ম-ব্যাপারেও তাই; সত্যস্বরূপকে ভরসা করিয়া অনেকেই বুঝিতে চাহেন না—কারণ সেক্ষেত্রে অনেক পাওনা ছাড়িতে হয়—দুঃখের অনেক দেনা মাথায় করিতে হয়। 'জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়িতে গেলে ব্যথা বাজে!' ব্যথা বাজে না কার?—যে খাপ-খোলা তলোয়ার, তার। বিপ্লববাদীদের মধ্যে এমনি ধারার খাপখোলা তলোয়ার

কতগুলি ছিল বলিয়াই রাজনীতি ও সমাজ-ব্যাপারে অনেকখানি সত্য কথা তাহারা বলিয়াছে ও বুঝিয়াছে। কোনও রকম স্বার্থের খাতিরে সত্যকে তাহারা খণ্ডিত করিয়া দেখিতে বাধ্য হয় নাই!

১৮

কাজের পরিচয়

সতের পরিচ্ছেদে বিপ্লববাদীদের মতভেদের কথা বলিয়াছি। অনেকে যে ছাড়িয়া গেল, সে সকল কথাও বলিয়াছি। যাহারা রহিল তাহারা কর্মক্ষেত্রে দাঁড়াইল। ১৯১০-১১ সাল হইতে দলগুলিতে ক্রমেই গোপনতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শুধু পুলিশ নহে, যাহারা পুরাতন বন্ধু কিন্তু ছাড়িয়া গিয়াছে—তাহাদের কাছ হইতেও বিপ্লববাদীরা সব গোপন করিয়াই চলিতে লাগিল। বিশেষ ব্যক্তির উপর বিশেষ ভার অর্পিত হইল। দায়িত্ব ও কর্তব্য ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। যে জেলায় যে ভারপ্রাপ্ত সে-ই ঐ জেলার জন্য দায়ী। অবশ্য কোনও গুরুতর কার্য সর্বপ্রধান কেন্দ্রের অনুমতি না হইলে চলিত না। যাহার যাহা ইচ্ছা করিবার উপায় নাই, মীমাংসা প্রধান কেন্দ্রেই হইত। সকল বিপ্লবীদলেই একজন নেতা থাকিতেন, তিনি উপযুক্ত সভ্যদের ডাকিয়া কর্তব্য মীমাংসা ও করণীয় নির্ধারণ করেন। আবার এমন দলও ছিল—যথা অনুশীলন—যেখানে ১৯১০ সাল হইতে কোন ব্যক্তি-বিশেষ নেতা ছিলেন না। পুলিনবাবুর নির্বাসনের পরে ছিলেন আশুতোষ দাসগুপ্ত। পরে ১৯১০ সালে পুলিনবাবু প্রভৃতি কারারুদ্ধ হইলে থাকেন শ্রীমাখন সেন। মাখনবাবু প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিলে—নরেন্দ্র সেন প্রধানরূপে থাকিলেও একনেতৃত্বের বদলে বিশিষ্ট বিপ্লবীদের লইয়া কার্যতঃ নেতৃমণ্ডলী গড়িয়া উঠে। কোন কমিটিও সেখানে ছিল না। কিন্তু বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যে এমনি একটা জমাট নিবিড় ভাব ছিল যে, কে নেতা এ প্রশ্ন কখনই উঠে নাই; প্রত্যেকটি সমস্যা নিজেরা পরামর্শ করিয়া—ভোটের দ্বারা নহে—মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছে। কর্মীদের যোগ্যতাই সেখানে স্বভাবতঃ নেতৃত্ব

করিয়াছে—কোন ধরাবাঁধা নিয়ম সেখানে কাজ করে নাই। সংস্থার প্রয়োজনে যখন যাহার উপর নেতৃত্বের গুরু দায়িত্ব অর্পিত হইত, ছোট বড় নির্বিশেষে সকলেই তাহার নির্দেশ মানিয়া দায়িত্ব পালন সহজ করিয়া দিত। স্বার্থলেশহীন, নাম-যশ-আকাঙ্ক্ষাহীন এই সমস্ত বিশিষ্ট কর্মীদের কে যে কোন বিষয়ে যোগ্যতর প্রত্যেকে নিজের মনেই তাহা বুঝিতে পারিত। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা তাহাদের এমনি অদ্ভুত ছিল যে, কোনদিন মতভেদও হয় নাই, প্রভুত্বের কল্পনাও কাহারও মনে আসে নাই—কে বড়, কে ছোট, এ ভাব কর্মীদের মনেও স্থান পায় নাই। সমস্ত কাজের ভার জনকয়েক বিশিষ্ট কর্মীর উপরই স্বভাবতঃ আসিয়াছিল; কবে কোন্ দিন কোন্ সভায় কোন্ ভোটের জোরে ইহারা এই নেতৃত্বের বা গুরুদায়িত্বের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল—কেহ জানে না। অথচ ডিসিপ্লিন ছিল যথেষ্ট। দেশবন্ধু প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছিলেন—যদিও পুলিন ছিল father of the organization—তবে তাহার নামে দল চলে নাই,—চলিত সমিতিরই নামে—ভাবগত গণতন্ত্রই ছিল। বলা বাহুল্য, অন্যান্য দলের নেতাও নির্বাচিত হইতেন অনুরূপ কর্মদক্ষতায়, এবং ত্যাগ-নিষ্ঠাদ্বারাই তাঁহারা নেতা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ব্যক্তিগত নামে দল চলিলেও তাঁহারা কেহ ডিক্টেটর ছিলেন না—অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমেই কাজ করিয়াছেন।

* * * *

১৯১১ সালের কথা। বিপ্লববাদীরা তাহাদের সংস্থার কার্যাবলীকে কি ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করিত তাহা বলিতেছি। একদিনের কথা। রাত্রি অধিক হইয়াছে। একটি নির্জন মাঠে দুটি লোক বসিয়া আছে। নিঃশব্দে আর একজন একটু এদিক ওদিক চাহিয়া আসিল। মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যে প্রায় দশজন লোক সেখানে আসিয়া জড় হইল। সকলেই পরিচিত। বাহিরের লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য দুই জন রহিল। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা লইয়া আলোচনা চলিল। কাহাকে কোন্ ভার দিতে হইবে তাহাও নির্দিষ্ট হইল। কোথায় কে বসিবে, আর কোথায় কাহার দ্বারা কোন্ সহায়তা মিলিবে তাহার আলোচনা চলিল। কে ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে, কাহাকে ঘর ছাড়ানো যায় তাহারও আলোচনা হইল। অস্ত্রশস্ত্রের হিসাব, সংগ্রহের প্রস্তাব, অর্থাদির কথা বিবেচিত হইল। অস্ত্র নির্মাণের কথা, বিস্ফোরক তৈয়ারীর কথা আলোচিত হইল। কোন্

কোন্ কর্মীর দ্বারা কোন্ কোন্ কাজ হইতে পারে, কাহার কি ক্ষমতা ও দক্ষতা, কাহার উপর কতখানি ত্যাগের আশা করা যায়—সকলই আলোচিত হইল। বাংলার কোন্ গ্রামের কোন্ স্কুলের কোন্ ছেলেটি কেমন ধারার সে খবরও তাহারা লইল। তর্ক-বিতর্ক নাই, সকলেই সকলকে চেনে ও বোঝে, সকলের ত্যাগেই সকলের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রত্যেকে প্রত্যেককে জানে ত্যাগী, নির্ভীক, আদর্শ-লাভে বদ্ধপরিকর—প্রার্থিত বস্তুর জন্য যে-কোন দুঃখ গ্রহণে সম্মত—যে-কোন কর্মে তৎপর। সকলেই সকলকে ভালবাসে। ভাই-আত্মীয়-স্বজন কেহই এতটা প্রিয় নহে, এরা পরস্পরে পরস্পরের প্রিয়তম সুহৃদ, কাহাকেও কিছু অদেয় নাই—একান্ত বন্ধু। কিন্তু তবু লক্ষ্য করিয়াছি, কোথাও একটু অস্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল না। এত যে বন্ধু, এত যে প্রিয়, সেও যদি ঐ পথ ছাড়ে, বা তাহার চরিত্রে যদি একটু দাগ লাগিত, একটু লোভ কি, একটু স্বার্থের পরিচয় মিলিত তবে প্রিয়তমের উপর প্রীতি চলিয়া যাইত, কোমল হৃদয়গুলি তখনই বজ্রের মতো কঠোর হইয়া উঠিত। এক মুহূর্তে বন্ধুকে ছাড়িয়া দেয়—কিন্তু তবু আপশোষ করে না, আশাহত হয় না,—একান্ত আত্মবিশ্বাসে আবারও চলিতে থাকে। এমন দৃঢ়বিশ্বাসী, কর্মী, ত্যাগী কতকগুলি লোকই বিপ্লব-দলকে নানা বাধাবিঘ্ন, বিরুদ্ধতার হাত হইতে বাঁচাইয়া একেবারে শেষ সময় পর্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, এমনই কয়েকজন বিশিষ্ট, বিশ্বস্ত, পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান কর্মী বাংলার সকল বিপ্লবদলেই ছিল।

যাহাই হউক, এমনি নির্জনে কর্মী-সম্মিলনে কোথাও নূতন কর্মীকে একান্তে প্রতিশ্রুতি করানো হইত। সে প্রতিশ্রুতির মর্ম মাত্র আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম।

—সমিতি হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইব না। চরিত্র নির্মল ও পবিত্র রাখিব। যতদিন পর্যন্ত দেশ মুক্ত না হয়, ততদিন সুখভোগ হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিব। দেশের জন্য সর্বপ্রকারের ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিব। মাদকদ্রব্য সর্বতোভাবে বর্জন করিব। দেবতার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিব না—ত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ হইব না। ঘৃণা, লজ্জা, ভয় ত্যাগ করিয়া সমিতির মঙ্গলের জন্য কাজ করিব।—

সর্বত্রই অবশ্য একই রকমের প্রতিজ্ঞাপত্র ছিল না। প্রথম অবস্থায় যে প্রতিজ্ঞা করানো হইত পরে সময় সময় তাহা হইতে ভিন্নতর প্রতিজ্ঞাও করান হইয়াছে—তবে মূলতঃ ভাব প্রায় একই। এই ধরণের প্রতিজ্ঞা করানোর

সার্থকতা সম্বন্ধে বিপ্লববাদীদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন মত বর্তমান ছিল। কেহ কেহ প্রতিজ্ঞা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন না। আবার কেহ কেহ প্রতিজ্ঞা একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার মনে করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে যে জমকালো প্রতিজ্ঞার নমুনা দেখাইয়াছেন, বিপ্লববাদীরাও যে প্রতিজ্ঞাব্যাপারে তাহারই কতকটা অনুকরণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখানে অনুশীলনের গোড়াকার প্রতিজ্ঞা গ্রহণের নমুনা দিতেছি। এই বিষয়ে পুলিন বাবু স্বীয় দীক্ষা বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণের বর্ণনা করিতেছেন—

"পি. মিত্রের আদেশ মতে একদিন (কলিকাতায়) একবেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া সংযমী থাকিয়া পরের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া পি. মিত্রের বাড়ীতে তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লইলাম। ধূপ দীপ নৈবেদ্য পুষ্প চন্দনাদি সাজাইয়া ছান্দোগ্যোপনিষদ হইতে বৈদিকমন্ত্র পাঠ করিয়া পি. মিত্র যজ্ঞ করিলেন, পরে আমি আলীঢ়াসনে বসিলাম,—আমার মস্তকে গীতা স্থাপিত হইল, তদুপরি অসি রাখিয়া উহা ধরিয়া পি. মিত্র আমার দক্ষিণে দণ্ডায়মান হইলেন—উভয়হস্তে ধারণ করিয়া যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে কাগজে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। পরে যজ্ঞাগ্নিকে ও পি. মিত্রকে নমস্কার করিলাম।"…

পুলিন বাবু বলেন: "পি. মিত্র যে পদ্ধতিতে আমাকে দীক্ষা দিয়াছেন গুপ্ত-চক্রের মধ্যে গ্রহণ করিবার পূর্বে আমিও অনুরূপ পদ্ধতিতে আমার বাসায় দীক্ষা দিতাম। একসঙ্গে অনেককে দীক্ষা দিতে হইলে—ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠে পুরাতন ও নির্জন 'সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে' যাইয়া একটু জাঁকজমক করিয়াই দীক্ষা দিতাম। অর্থাৎ সংযম উপবাস হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া শুদ্ধচিত্তে কালীমূর্তির নিকট আলীঢ়াসনে বসিয়া মস্তকে গীতা ও অসি ধারণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করাইতাম।"—

পুলিন বাবু "দীক্ষান্তে প্রত্যেক সভ্যকে পর্যাপ্তরূপে বিশুদ্ধ ঘৃত ও চিনিসংযুক্ত কাঁচা দুগ্ধ সেবন করিতে" দিতেন। এই সকল প্রতিজ্ঞা বা দীক্ষা গ্রহণ যে বঙ্কিমের আনন্দমঠের ঢংএর অনুকরণ ছিল, তাহাই লক্ষ্য করিবার।

সমিতি বা organisation বা সংস্থার দুইটি অঙ্গ ছিল—প্রকাশ্য ও গুপ্ত।

* ১৯০৭ সালে বারীন্দ্র বাবু ও শ্রীঅরবিন্দ সিদ্ধযোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলের নিকট যোগদীক্ষা গ্রহণ করেন—বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বিবৃতি।

'আদ্য প্রতিজ্ঞা' লইয়া মাত্র প্রকাশ্য সমিতির সদস্য থাকা যাইত। ক্রমে কার্যের ভিতর দিয়া যাহারা যোগ্য বিবেচিত হইত—তাহাদের 'অন্ত্য প্রতিজ্ঞা' করাইয়া গুপ্ত সংস্থার সভ্য করা হইত। বলা বাহুল্য, সমিতি বেআইনী না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা ছিল। কিভাবে গুপ্ত বিপ্লব সমিতির বিস্তার সাধিত হইত—'অরগানিজেসন' বা সংস্থা গড়িবার কি পদ্ধতি ছিল—তাহা বিপ্লবসমিতির 'পরিদর্শকের কর্তব্যে' উল্লেখ দেখিতেছি। যে-অঞ্চলে সমিতি স্থাপিত হইবে (বলা বাহুল্য তখনো প্রকাশ্য সমিতি) তথাকার অধিবাসীদের নিকট সমিতির উদ্দেশ্য ক্রমে বুঝাইতে হইবে। এইরূপ আলোচনায় সমিতির প্রতি তাহাদের মন আকৃষ্ট করিবে। গ্রামবাসীরা সহজ বুদ্ধিতে মনে করিবে এই সমিতি তাহাদেরই পল্লীর, এর সঙ্গে তাহাদেরও সম্পর্ক আছে।—আসলে ইহার গোপন দিকটা গোপনই থাকিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও গুপ্ত বিপ্লব সমিতির কর্মীদেরও পল্লীবাসীরা তাহাদেরই কর্মী-সঙ্গীরূপে নিজেদের লোকই মনে করিত। এই ভাবে 'বহিরঙ্গে' থাকিয়াও 'অন্তরঙ্গে' আসিবার সেতু ও সুযোগ ছিল বলিয়াই সমিতি ব্যাপক ও দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারিয়াছিল। মুষ্টিমেয়ের পশ্চাতে এই ভাবে 'বহু'র সংযোগ সাধিত করিবার কর্মনীতি যে সমিতিতে যত অধিক তাহার বিস্তার ও স্থায়িত্ব তত। ইহাই এ-ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। তাহা এই—গোড়ায় বিপ্লববাদীদের পক্ষে একটা সুপরিকল্পিত কর্মনীতি অনুসরণ করা সম্ভবপর হয় নাই। তখন একটা ভাব ছিল, বিদেশী শাসনকে মানিয়া লইতেছি না—সুযোগ পাইলেই বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করিতে হইবে, আঘাত দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করিতে হইবে। এই সমস্ত ভাব হইতেই লাটসাহেবের ট্রেণ উড়ান ও বিশিষ্ট রাজকর্মচারীর জীবনের উপর ষড়যন্ত্র চলিত। একটা ভীতিসঞ্চারও যেমন উদ্দেশ্য ছিল, দেশবাসীর মধ্যে রাজশক্তিকে উপেক্ষার প্রবৃত্তি আনাও তেমনই অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। যাহারা দেশকে মুক্ত করিবে বলিয়া ঘর ছাড়িয়াছে, তাহারা কেবল মানুষ মারিয়া বা সেই চেষ্টায় ঘুরিয়া তো আনন্দ পায় না। তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে ইহা যে মোটেই সহায়ক নহে তাহা কিছুকাল পরেই তাহারা বুঝিল। একজনকে মারিলে দশজন সেখানে যাইবে। এ পন্থায় তাহাদের অভীষ্ট লাভ হইবে না, ইহা বুঝিতে তাহাদের বিলম্ব হয় নাই। তবু কোথাও কোথাও বাহিরে এ সমস্ত demonstration চলিয়াছে এই জন্য যে, বিপ্লবীদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেন

সাধারণ দেশবাসীর সন্দেহ না জন্মে, এবং দেশের স্বাধীনতাকামী দল সজীব ও সক্রিয় রহিয়াছে এই বিশ্বাস ও আশা যেন দেশবাসীর থাকে। কেবল সন্ত্রাস সৃষ্টির দ্বারা যে সফলকাম হওয়া যাইবে না, বিপ্লববাদীরা একথা বুঝিয়া অধিকতর দায়িত্বের দিক হইতে বিপ্লব-কথা ভাবিতে আরম্ভ করিল। এই পথের বিঘ্নস্বরূপ যদি কেহ দাঁড়ায় তবেই তাহাকে সরাইতে হইবে, নতুবা নহে—ইহাই তাহাদের শেষ সিদ্ধান্ত। কিন্তু প্রবল, সংঘবদ্ধ রাজশক্তির প্রতিবন্ধকতায় কোনও একটা নির্দিষ্ট পন্থা ধরিয়া বিপ্লববাদীরা বরাবর চলিতে পারে নাই—নানা অবস্থায় পড়িয়া তাহার পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। পথের বিঘ্ন দূর করিতেই বিপ্লববাদীরা প্রায় সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য একটা অনুষ্ঠান করিয়া এমন ভাবেই জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়াছে যে সে 'আত্মরক্ষা' আরও জটিল, আরও গুরুতর হইয়াছে। এমনি আত্মরক্ষার পর আত্মরক্ষা করিয়াই খুনের জন্য ডাকাতি ও ডাকাতির জন্য খুন করিতে হইয়াছে।

ক্রমশঃ কেমন করিয়া বিপ্লবানুষ্ঠান দ্বারা রাজশক্তির পরিবর্তন ঘটাইতে পারিবে, সে সমস্ত বিষয়ে কেবল আলোচনা নহে, কার্যতঃ চেষ্টা চলিতে লাগিল। ঐ সময়টাতেই দেখি—বিজ্ঞানের ভাল ভাল ছাত্রদের দলে আনিবার জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ঐ সময়ে অনুশীলনের সদস্য হন। ১৯১৩ সালে মেঘনাদ সাহাকে দলে আনিতে চেষ্টা করা হয়—কৃতকার্য হওয়া যায় নাই। বিপ্লববাদীরা যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাতে একটা অরাজকতা দেশে আনা যায় মাত্র, কিন্তু তাহা যে প্রবলপ্রতাপান্বিত সুসংবদ্ধ ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছে ছেলেখেলা—তাহা তাহারা বুঝিয়াছিল। তাহাদের ভরসা—এক দেশীয় সৈন্য আর বিদেশের সাহায্য। কিন্তু তখনও যুদ্ধ বাধিয়া উঠে নাই; সুতরাং বিদেশের সাহায্য অর্থাৎ জার্মানীর সাহায্য যেমন শেষে হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন সে সম্ভাবনা ছিল না। তবে বিদেশে কিছু করিবার চেষ্টা তখন হইতেই বাঙালী বিপ্লবীদের মনে ছিল। ১৯১১।১২ সাল হইতেই বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবদল হইতে বিদেশে লোক প্রেরিত হইতেছিল। অবশ্য ইতিপূর্বেও বিদেশে ভারতীয় বিপ্লববাদীরা ছিল। কিন্তু তাহারা দেশের সঙ্গে যুক্ত না থাকার ফলে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্যক বুঝিত না। যাহা হউক, ভারতের যে সকল জাতি হইতে প্রধানতঃ দেশীয় সৈন্য সংগৃহীত হইত তাহাদের দিকে বাংলার বিপ্লববাদীদের দৃষ্টি গেল। এই দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে

বিপ্লববাদীরা কতটা কাজ করিয়াছিল তাহা পরে জানা যাইবে। ১৯১৪ সালে দেশীয় সৈন্য ও বিদেশী সাহায্য তাহারা কি ভাবে লাভ করে তাহা যথাস্থানে আমরা বলিব। এখানে শুধু এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে বিপ্লববাদীরা এখন হইতেই সেইদিকে নজর রাখিল। আর নিজেরা দলের প্রভাব বৃদ্ধি করিতে men, money and ammunition—মানুষ, টাকা ও হাতিয়ার সংগ্রহে মন দিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল,—তাহাদের দলের demonstration দ্বারা বা বাহিরের কার্য দ্বারা দেশের লোকের মন এমন করিয়া তুলিতে হইবে যে, যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহারা যেন বিপ্লবের মুখে দাঁড়াইতে পারে। বিপ্লববাদীরা এই বিশ্বাসও করিত যে, সে সময় অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিয়া হাতে দিতে পারিলে অনেক সাধারণ লোকও বিপ্লবে যোগ দিবে। তবে বিপ্লবকে আস্তে আস্তে গড়িয়া তুলিতে যে কর্মকুশলতা, তিলে তিলে আত্ম-ত্যাগ ও দুঃখভোগের প্রয়োজন, তাহা কতক লোকের থাকা চাই—তাই বিপ্লববাদীরা সাধারণতঃ তেমন লোক সংগ্রহেই মন দিয়াছিল। এই ধরণের দল গড়িতে যে অর্থের প্রয়োজন, তেমন অর্থ, যে ভাবেই হউক তাহারা সংগ্রহ করিতেছিল। তাহাদের পথে যাহারা অন্তরায় হইত, বিপ্লবীরা নির্মমভাবেই তাহাদের সরাইয়া দিয়াছে।

১৯

গোপন ও অখ্যাত জীবন

১৯১১ সাল হইতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বিপ্লববাদীরা দলবৃদ্ধি, অর্থসংগ্রহ ও যথাসম্ভব অস্ত্রসংগ্রহ করিয়া গিয়াছে। ডাকাতি ও খুনের ব্যাপারেও ক্রমেই বিপ্লববাদীদের সাহসিকতা প্রকাশ পাইতেছিল। পুলিশের চক্ষু এড়াইয়া কাজ করিতে হইত বলিয়া এই সময়টায় অনেক বিপ্লববাদীই একেবারে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতেছিল। যে আজই মাত্র জেল খাটিয়া মুক্ত হইল সেও অমনি বাহির হইয়াই আত্মগোপন করিয়া চলিতে লাগিল।

একটা দৃষ্টান্ত দিব।

সেটা ১৯১২ সালের কথা। দুইজন বিপ্লববাদী জেল খাটিয়া আজ বাহির হইল। জেলের ফটক খুলিয়া গেল। তাহারা বাহির হইয়া একটু এদিক ওদিক চাহিয়া সোজা হাঁটিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, কোন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, বা জনসাধারণ সেখানে উপস্থিত ছিল না। দুইজনে গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে চলিল।

"কোথায় যাবে হে?"

"যাব কোথায়? হরেন্দ্রবাবুর বাসায় যাব না, জায়গা দেবে না; বিনোদের মেসেও যাব না, অনর্থক ছেলেগুলো 'দাগী' হবে।"

"তা' একবার কোথাও উঠে, খোঁজ-খবরটা নিতে হবে তো। চল সরলদের বাসায় যাওয়া যাক্, সেখানে গেলেই খোঁজ-খবর কিছু পাওয়া যাবে, আর ওখানে পুলিশের তেমন ভয়ও নেই।"—তাহাই হইল।

* * * *

সহরের কোন এক প্রকোষ্ঠে এই দুইজন জেলমুক্ত বিপ্লববাদী আরও দুই তিন জন ফেরারী নেতৃস্থানীয় বিপ্লববাদীর সঙ্গে আলাপ করিতেছে। ইতিমধ্যেই তাহাদের ভবিষ্যতের কাজ ঠিক হইয়া গেল। ইহার মধ্যে একজন আর বাড়ী যাইতে চাহে না; সে বলিল, "আমি বাড়ী গেলে সুবিধে হবে না, বাড়ীর লোক বড় অস্থির ক'রবে, বিয়ের চাপও হয়ত দেবে। কোথাও যেতেও দেবে না। আর পুলিশও চোখে চোখে রাখবে। আমার ইচ্ছে এখান থেকেই গা-ঢাকা দিই, এই কিন্তু সুযোগ। কারণ, আজও দেখলাম, পুলিশ পেছনে লাগে নি। ভেবেছে, বাড়ী তো যাবেই, সেখান থেকে খোঁজ নেওয়া আরম্ভ করা যাবে। আর দেশের যা অবস্থা হয়েছে, তাতে প্রকাশ্যে থেকে কোনও কাজ করা তো একরকম অসম্ভবই।"

বন্ধুরা বলিলেন—"না, একবার বাড়ী গিয়ে এসো।" (বাড়ীতে যে বৃদ্ধা মা আছেন, ইঙ্গিতে তাহাই বলা হইল।)

সদ্য জেল-মুক্ত যুবক হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা মা'র সঙ্গে দেখা এক সময় হবে।' পরে তাহাই ঠিক হইল। অপর ব্যক্তি আপাততঃ বাড়ীতেই গেল। প্রকাশ্যে থাকিয়াই গুপ্ত পন্থার পথিকদের সঙ্গী হইয়া রহিল। নেতারাই স্থির করিলেন—প্রকাশ্যে থাকিয়াই সে অধিক সাহায্য করিতে পারিবে।

যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন বিপ্লববাদীদের মধ্যে এ রকম বাড়ী ঘর ছাড়িয়া একেবারে ভিন্ন নামে চলাফেরা করিয়া অনেকে থাকিত। যাহারা পুলিশের পরিচিত তাহারা, ও যাহারা কোন কোন মামলার absconder (ফেরারী) তাহারাও আত্মগোপন করিত। আবার বিশেষভাবে কাজের সুবিধা হইবে বলিয়া, একেবারে পুলিশের নজরে পড়ে নাই এমন সম্পূর্ণ নূতন লোককেও ঘর হইতে বাহির করা হইত। পূর্বেই বলিয়াছি তখন বিপ্লব-আন্দোলন একেবারেই গুপ্ত ধারায় চলিয়াছিল। সুতরাং এ সমস্ত 'অচিহ্নিত' (unmarked) লোকই কাজের হইত বেশী। কারণ 'দাগী'দের বেশী বাহিরে আসিতে হইলে বিপদের সম্ভাবনা ; ইহাদের পক্ষে সে সম্ভাবনা কম। প্রকৃত পক্ষে এই ঘর-ছাড়া লোকগুলিই ছিল বিপ্লববাদীদের প্রধান কর্মী—আর যাহারা ঘরে, আনাগুনা-ভাবে থাকিত তাহারা ছিল সহায়। বিপ্লববাদীরা সাধারণের প্রশংসা চাহিত না বলিয়া নিন্দাকেও গ্রাহ্য করে নাই। গোপনতাকেই আঁকড়াইয়া রহিয়াছিল!

কিন্তু বিপ্লববাদীদের মধ্যে ডাকাতি করা লইয়া সংশয় জাগিয়া উঠিল। দেশের অর্থ এমন করিয়া কাড়িয়া লওয়া যে অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়—এ-বোধ কোথাও কোথাও দেখা দিল। সর্বস্ব পণ করিয়া এত দুঃখ, নির্যাতন মাথায় করিয়া দেশসেবার জন্য আসিয়া শেষে পরের ধন জোর করিয়া গ্রহণ! মানুষ ডাকাত বলিবে! না হয়, বড় জোর 'স্বদেশী ডাকাত' বলিবে। সে-যে আরও দুঃখ। এমন একটা গ্লানি ও সংশয় কোথাও কোথাও দেখা দিল। এ সমস্যার মীমাংসায় বাদানুবাদ প্রভৃতি চলিল। যাহারা ইহাকে তখনও প্রয়োজনবোধে সমর্থন করিতেছিল, তাহাদের মুস্কিল কম নহে। বিপ্লববাদীদের মধ্যে ত্যাগী ছেলের অভাব ছিল না—নীতিগত ও আদর্শগত কথা তাহাদের বড় বেশী বিচলিত করিত। সুতরাং ঐ পথের পথিকেরা নানা যুক্তি-তর্কে তাহাদের নীতিজ্ঞানকে তুষ্ট করিতে লাগিল—নানা নূতন নীতি 'পুরাতন' নীতি হইতেই সংগৃহীত হইল। সেই সমস্যার মুখে তাহাদের যুক্তিতর্কের ধারাগুলি কম রহস্য-জনক নহে ; তাহাও আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যাঁহারা ভাল লোক, দেশের সেবা করিতে চাহেন বা করেন—তাঁহারাও ইহাই চাহেন যে দেশবাসী কাগজে-পত্রে, সভা-সমিতিতে প্রকাশ্যে তাঁহাদের প্রশংসা করুক। অন্ততঃ প্রশংসা যে করিতেছে এই কথা জানিতে পারিলে

তাঁহারা আনন্দ পান, কর্মে তাঁহাদের স্ফূর্তি আসে। মানুষের ইহাই স্বভাব। বিপ্লববাদীরা যে পথে যাত্রা সুরু করিয়াছে, তাহাতে কেহ প্রশংসা করিতে পারে না, অন্ততঃ প্রকাশ্যে সে সম্ভাবনা একেবারেই নাই; অথচ এই লোকগুলির মধ্যে এমন চরিত্র ছিল যাহা বস্তুতঃই প্রশংসার্হ। বিপ্লববাদের যাঁহারা ছিলেন কর্তা তাঁহাদের সকল সময়ই খেয়াল থাকিত যাহাতে তাঁহাদের নূতন কর্মীরা কেহ প্রশংসার লোভে লুব্ধ না হয়—কারণ তাহা হইলে তাহারা প্রকাশ্যেই অন্যান্য 'জনহিতকর' অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিবে, বিপ্লবের দুর্গম, নিষ্ঠুর, নির্জন গুপ্তধারায় আসিবে না।

এ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিলেই বুঝা যাইবে। সেবার যখন বর্ধমানে বন্যা হয় তখন বাংলার যুবকগণ সেখানে বিপন্নের সেবার প্রেরণা লইয়াই গিয়াছিল। বিপ্লবীদের বিভিন্ন দল হইতে সেখানে বহু কর্মী প্রেরিত হইয়াছিল। আর সেখানকার সেই মনুষ্যোচিত কর্মের কৃতিত্ব ইহাদের ছিল অসামান্য। স্কুল-কলেজের বহু ছাত্রও গিয়াছিল। তাহাদের কষ্টসহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, সংঘবদ্ধভাব দেখিয়া শুধু দেশের লোক নহে স্বয়ং লাটসাহেব পর্যন্ত কর্মীদের ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। এই ধন্যবাদ এবং সংবাদপত্রে নানা প্রশংসাবাদ যখন চলিতে লাগিল তখন বিপ্লবীদের পরম হিতৈষী ও উপদেষ্টা 'ব্রহ্মচর্য' গ্রন্থ প্রণেতা আজন্ম-ব্রহ্মচারী রমেশ শর্মা (চক্রবর্ত্তী) রাজাবাজার কেন্দ্রে আসিয়া বলিলেন—'ছেলেগুলিকে বন্যাস্থল হইতে লইয়া আইস। কারণ, যোগী যেমন ঐশ্বর্য লাভ করিয়াই ঐশ্বর্যে আটকাইয়া যায়, শুদ্ধ ভগবানকে পায় না,—এই সমস্ত কর্মীও তেমনই এই প্রশংসা ও বাহবারূপ ঐশ্বর্যেই আটকাইয়া যাইবে—যাহাতে এমনই দেশব্যাপী প্রশংসা আছে তেমন কাজেই লাগিয়া থাকিতে চাহিবে—তাহাতেই আকৃষ্ট হইবে—ইহার উল্টা পথে যাইতে চাহিবে না। ভাবিবে, এই সেবাধর্ম ই চমৎকার কাজ। কতকটা অজ্ঞাতসারে এই প্রশংসার লোভেই ভাল ভাল কর্মীও এই সমস্ত কর্মে ই লিপ্ত থাকিতে চাহিবে। আমাদের অখ্যাত, অজ্ঞাত বর্তমানে নিন্দিত গুপ্তধারায় ইহারা আসিতে চাহিবে না। কিন্তু অখ্যাত, অজ্ঞাত ভাবের সঙ্গেই আমাদের অভ্যস্ত হইতে হইবে,—ঐ সমস্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে আর ছেলেদের পাঠানো সঙ্গত হইবে না। ভবিষ্যতে খুব বিশিষ্ট দুই-চারিজন বিপ্লববাদী এ সমস্ত কাজে যাইতে পারে—কিন্তু সাধারণ ছেলেদের ওদিকে, ঐ প্রলোভনের মধ্যে নেওয়া ঠিক নহে।'

এ পন্থায় প্রশংসা নাই—নিন্দাই পাইতে হইবে, প্রকাশ নাই—গোপনেই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে হইবে—ইহা জানিয়াই, ছেলেরাও যাহাতে গুপ্ত ধারায়ই অভ্যস্ত হয়, প্রকাশের কোন আকর্ষণেই আকৃষ্ট না হয়—সেজন্য এমনই সব যুক্তির কথা ছেলেদের শুনাইতে হইত ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইত। ডাকাতি প্রভৃতি ব্যাপারেও কেমন করিয়া সতর্কতা অবলম্বন করা হইত তাহাও দেখিতে হইবে।

২০

ডাকাতির কথা

বিপ্লববাদীদের মধ্যে ডাকাতি করা লইয়া একটা সংশয় জাগিয়াছিল, বলিয়াছি। কর্মীদের মধ্যে, কাহারও নিজ অন্তর হইতে কাহারও বা বাহিরের নিন্দা চর্চা শুনিয়া এই পন্থার উপর একটা সংশয় আসিয়া দেখা দিল। ডাকাতি করার প্রতি বিপ্লবী দলের কোন বিশিষ্ট নেতারই কোন আকর্ষণ দেখি নাই। তবে বিপ্লব সংস্থার গুপ্ত কর্মধারা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে ইহা পরিত্যাগ করাও সম্ভব হয় নাই। সকল দলই 'ডাকাতি ঘৃণা করিয়া' ও 'অবাঞ্ছিত মনে করিয়া'ও কার্যকালে ডাকাতি করিয়া বসিয়াছেন দেখিতে পাই।

এখানে বলিয়া রাখি, যাঁহারা ডাকাতি প্রভৃতি ছাড়িলেন, তাঁহারা তখনকার মত কার্যতঃ বিপ্লবপন্থাকেই একরকম ত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং যাহাদের মনে সংশয় উঠিত, তাহাদের বিপ্লববাদীরা সহজেই একথা বুঝাইতে লাগিল যে, গুপ্ত বিপ্লবদল বা Revolutionary Party চালু রাখিতে হইলে এ সমস্ত এখন ত্যাগ করিলে চলিবে না। 'দেখিতেছ তো যাহারা এ সমস্ত কার্যের দোষ দেখাইয়া আমাদের ছাড়িয়াছে, তাহারা কার্যতঃ বিপ্লবপন্থাকেই ছাড়িয়াছে; যদি কাজ করিতে না চাও, সে আলাদা কথা, কিন্তু কাজ করিতে চাহিলে, বল তো, অর্থলাভের আর কোনও পথ আছে কি?'—এই প্রকারের নানা ভাবের যুক্তি প্রদর্শিত হইত। কিন্তু বিপ্লববাদীদের কাছে আর একটা মস্ত সমস্যা দেখা দিল—তাহা দেশবাসীর বিরাগ। ডাকাতির উপর দেশবাসীর ক্রম-বর্ধমান অসন্তুষ্টি বিপ্লববাদীরা লক্ষ্য করিল। বিপ্লবের পক্ষে সে অসন্তুষ্টি নিশ্চিতই

মারাত্মক। অবশ্য বিপ্লববাদীরা নিজেরাই বলিয়াছে ও বুঝিয়াছে যে, এ সমস্ত টাকা তাহাদের জমিতে পারে নাই, মোকদ্দমার খরচ যোগাইতে ও ফেরারীদের রক্ষা, প্রয়োজনীয় অস্ত্র ক্রয় এবং 'অরগ্যানিজেসন' প্রভৃতিতে ব্যয় হইয়াছে। সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তাহা জমিতে পারে নাই, অন্য ভাবেও টাকা 'নষ্ট' হইয়াছে। বিপ্লববাদীরা এই ডাকাতি ব্যাপারে যে সমস্ত যুক্তি দিত এবং সে যুক্তিতে যে সমস্ত কর্মী বিশ্বাস করিয়া কাজে অগ্রসর হইত—তাহাতে বুঝা যাইবে, এই কাজটা যতই দূষণীয় হউক যাহারা ইহার অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কত বড় একটা ত্যাগের ভাব বর্তমান ছিল।

'ক' নামক একজন বিশিষ্ট বিপ্লববাদী 'খ' নামক একজন কর্মীকে যুক্তি দিতেছেন। 'খ' ধনীর সন্তান, কলেজের ছাত্র। 'ক' ইহাকে কোন একটা ডাকাতিতে পাঠাইতে চাহেন। ডাকাতি করার জন্য তাহার তেমন প্রয়োজন ছিল না। অর্থাৎ সে না হইলেও চলিত কিন্তু তাহার আজ ডাক পড়িয়াছে, ডাকাতি কর্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাহার এ সংস্কারটি ভাঙিয়া দিবার জন্য।

'খ' বিপ্লবানুষ্ঠানের অপর যে কোন ভার গ্রহণ করিতে সম্মত অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, আনা-নেওয়া রাখা, এমন কি প্রয়োজন হইলে খুন করিতে যাইতেও সে পশ্চাৎপদ নহে! কিন্তু ডাকাতিতে সে নারাজ।

'ক' তাহাকে বুঝাইলেন যে 'খ' এ কাজ তাহার নিজের জন্য করিতেছে না। আর ইহাও তাহাকে জানাইয়া দিলেন যে, সে যে ডাকাতিতে নারাজ তাহার কারণ আর কিছুই নহে শুধু তাহার অভিমান। সে এখনও সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে নাই। নাম যশের আকাঙ্ক্ষা তাহার এখনও আছে। অন্য কোন কাজ করিয়া ধৃত হইলে দেশবাসী বলিবে, দেশের জন্য কাজ করিয়াছে। আর ডাকাতি করিয়া ধরা পড়িলে অনেকে হয়ত বলিবে—'ডাকাত', কেহ হয়ত বিশ্বাস করিবে যে সে অর্থের লোভেই ডাকাতি করিয়াছে; প্রতিবাদ করারও সাধ্য নাই।—তাহার পর বলিলেন,—'কিন্তু ইহা স্থির জানিও, যে কর্মী নিঃস্বার্থ এবং নিষ্কামভাবে নিন্দা চর্চা ও ডাকাতির গ্লানির পশরা মাথায় লইবে, সে-ই আদর্শ কর্মী। দেশের কাজ করিলেও দেশবাসী তাহা না জানিয়া হীনচক্ষেই হয়ত তাহাকে দেখিবে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যে পিছপা হইবে না তাহার শক্তি অনেক বেশী, তাহার ত্যাগই যথার্থ ত্যাগ!'

শুধু ইহাতেও যুক্তি শেষ হইত না, পাপ-পুণ্যের প্রশ্নও উঠিত। পূর্বেই

বলিয়াছি বিপ্লববাদীদের মধ্যে ত্যাগী, চরিত্রবান, সুতরাং কতকটা ধর্মভাবাপন্ন যুবক থাকিত। তাহাদের ধর্মজ্ঞানে যেখানে বাধিত সেইখানে বিশিষ্ট কর্মীরা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদের ধর্মভাবকে তুষ্ট রাখিতেন। ফলে তাহাদের ধর্ম-বোধটাও বিপ্লবের অবিরোধীই হইত।

'খ' এখনও ডাকাতি করাটাকে বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না, আজন্মের সংস্কারে বাধিতেছে। তবে 'ক' বিশিষ্ট কর্মী, সর্বত্যাগী, চরিত্রবান,—দুঃখ কষ্টকেই সানন্দে বরণ করিয়া নিয়াছেন—কোনও প্রকার ভোগ বাসনা যে তাঁহার নাই ইহা সে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সুতরাং 'ক'-এর যুক্তির মধ্যে তাঁহার চরিত্রটি প্রভাব বিস্তার করিয়া যুক্তিটাকে ক্রমেই অপ্রতিহত করিয়া তুলিতে লাগিল। ব্যাপার দাঁড়ায় এই,—যাঁহাকে দেখি আমার অপেক্ষা চরিত্রে, ত্যাগে উন্নত, তিনি যখন কিছু একটা করিতে থাকেন আর বলেন, ইহা করা কর্তব্য, তখন আমি যদি সে কাজটি করিতে না পারি, বা আমার সংস্কারে আটকায় তবে স্বতঃই মনে হয়, দোষ বুঝি আমারই, আমিই বুঝি তেমন শক্তিশালী নহি!

পাপ-পুণ্য সুতরাং স্বর্গ-নরকের কথা উঠিবামাত্র 'ক' 'খ'-কে 'ভক্তমালে'র একটি উপাখ্যান শুনাইতে লাগিলেন।—'জান তো, শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য তেমন যে ভক্ত, সে সানন্দে চুরি করিয়া ঠাকুরের সেবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিল? ভগবানের জন্য যদি ধর্মই ত্যাগ করিতে না পার, তবে ত্যাগ করিলে কি? দেশসেবা যে ভগবৎ-সেবা।' এবার 'খ'-এর চিত্ত নরম হইতে লাগিল। 'ক' বিশিষ্ট কর্মী, তাঁহার জলন্ত বিশ্বাসের কাছে 'খ' নিজেকে যেন স্থির রাখিতে পারিতেছে না। তারপর 'ক' আরও বলিতে লাগিলেন,—'জান এক ভক্ত যখনই শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করিতেন, তখনই পূর্বে তাহা খাইয়া দিতেন। একজন বিবেচক ব্যক্তি বলিল—ও কি করিতেছ, ঠাকুরের ভোগ, যাহার উপর শ্বাস ফেলিতে নাই, দৃষ্টিও দিতে নাই, সেই পবিত্র বস্তু তুমি আগে খাইয়া উচ্ছিষ্ট করিতেছ?—তোমার যে নরকেও স্থান হইবে না। ভক্তটি উত্তর করিল—'আহা, তবু আমার ঠাকুর তো ভাল জিনিস খাইলেন; আমি নরক স্বর্গ চাহি না, আমি চাই আমার ঠাকুরের সেবা। আমি না খাইলে, কেমন করিয়া জানিব,—যদি ঠাকুরের মুখে খারাপ ভোগ যায়! আমাকে নরকে কি করিবে, ঠাকুরের ভোগ হইলেই হইল।' ইহার পর আর কথা চলে না। 'খ'-এরও চলিল না—এপথে

তো ছিলই, এই যুক্তিই সার হইল,—এই বিশ্বাসেই সে এ পন্থায় পা দিল। সত্যই ভাবিল, 'তাইতো আমার অহংকারই তো আমায় বাধা দিতেছে।' বিশিষ্ট কর্মীরা এই ভাবের যুক্তি দিতেন, অনেকের চরিত্রও তেমন নিষ্কামই ছিল। আর কর্মীরাও এতবড় একটা অন্যায় নিন্দা ও পাপকে এমন করিয়াই গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং এ মহা অন্যায় বা ভুলের মধ্যেও উহাদের যে একটা নাম-যশহীন ত্যাগের ভাব ছিল, ইহা না মানিয়া উপায় নাই। তবে এখানে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও বলিতে হইবে। যে বয়সের ছেলেরা এ সমস্ত যুক্তি শুনিত তাহাদের বয়সই ভাব-প্রবণতার বয়স, সুতরাং ধর্মের এ সমস্ত উচ্চাঙ্গের কথা শুনিয়া আর ইহা সাহসিকতার কর্ম বলিয়া এ ব্যাপারে সহজেই মাতিয়া উঠিত। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বয়স বা শক্তি অনেকের ছিল না। ইহার বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি আছে, ঐ উচ্চাঙ্গের কথা সাধকের কোন্ সময় যে প্রযুজ্য, সাধারণ কর্মীর মধ্যে সে সময়টি উপস্থিত হইয়াছিল কিনা, তাহা অনেকেই ভাবে নাই; ভাবে নাই বলিয়া এদিকে অনেক ত্রুটি, এমন কি ব্যভিচারও শেষে ঘটিয়াছে! এমনও জানা গিয়াছে, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই বিপ্লবপন্থা ও বিপ্লবীদলের সংশ্রব ছাড়িয়াও, শেষে দুই-চারিজন ডাকাতি করিয়াছে! বলা বাহুল্য, প্রথম ডাকাতি করিবার ভরসা যখন তাহারা পাইয়াছিল তখন খুব বড় নীতি ও তত্ত্বকথাই আওড়াইয়াছে; আর পরে যখন স্বার্থের জন্য করিয়াছে, তখন যদিও বিবেকে বাধিত তবু নিজের মনে বা সঙ্গীদের কাছে, পূর্বশ্রুত তত্ত্বকথা আওড়াইবার কোন বাধা হয় নাই।

তবে বিপ্লববাদীরা ইহার অপর দিকটা তখনই দেখিতেছিল। সেজন্য বিশিষ্ট কর্মীদের বলিতে শুনা যাইত, 'এসমস্ত ডাকাতি প্রভৃতি তাহারাই করিতে অধিকারী অর্থাৎ তাহাদেরই নৈতিক অবনতি ঘটিবে না যাহারা সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, নিজের সবই আগে দিয়াছে।' পরীক্ষার জন্য কোন কোন কর্মীকে বলাও হইত, 'তুমি, তোমাদের বাড়ী হইতে ডাকাতি করিয়া আনিতে পার কি না? যে না পারে সে ইহার অধিকারী নহে'—আবার ইহাও বলা হইত, 'এপথে আমরা একটি সূত্রের উপর দাঁড়াইয়া আছি। সূত্রটুকু ছিন্ন হইয়া গেলে একেবারে পাতালপুরীতে পড়িয়া যাইব! যদি ছিন্ন না হইয়া সূত্ররূপ নীতি অব্যাহত থাকে—ঠিক দাঁড়াইয়া থাকিব', ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটকথা এসমস্ত কথা বিশ্বাস করিয়া অনেকে এ সমস্ত কাজ করিয়াছে—স্বার্থের নামগন্ধও তাহাতে

ছিল না। সেই জন্যই বিপ্লববাদীদের যুক্তির ধারা ও মনের দিকটা দেখান হইল। ডাকাতি অন্যায় নিশ্চয়, সমর্থন একেবারেই অসম্ভব; তবে যাহারা পরস্বাপহরণ করিয়াছে ও যাহারা দেশের নিন্দার্হ হইয়াছে, তাহাদের মনটি জানা না থাকিলে, তাহাদের উপর একটু অবিচার করা হইবে না কি?

অর্থ ভিন্ন বিপ্লব সংস্থা খাড়া রাখাও সম্ভব নহে—প্রস্তুতিও সম্ভব নহে—বিপ্লব সংঘটনও সম্ভব নহে—সুতরাং অর্থ চাই-ই। চাঁদার দ্বারা অর্থ সংগ্রহের আশা ১৯০৪-৫ সালে বরং ছিল। তখন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি—ধনী জমিদারও—বিপ্লবের জন্য টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আলিপুর বোমার মামলার নরেন গোস্বামীর এক স্বীকারোক্তিতেই উৎসাহদাতারা 'ঘর লইলেন'। প্রকাশ্য সমিতির কাজই চাঁদায় চালানো শক্ত হয়—সুতরাং গুপ্ত-সংস্থার জন্য, প্রকাশের ভয়ও যেখানে প্রবল,—সে-স্থলে প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহ অসাধ্য বিবেচিত হইয়াছে। অর্থসংগ্রহের জন্য (ডাকাতি ছাড়া) অপর চেষ্টাও চলিয়াছে; ১৯১০ সাল হইতেই—জাল-নোট তৈয়ারী ও উহার প্রচলন প্রয়াস চলে। সেই চেষ্টা এক-আধ বার নহে—জানা ঘটনা হইতেই বলিতে পারি—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে কমপক্ষে চারবার সেই চেষ্টা হয়। কিছুটা সাফল্যও ঘটে। শেষবারের চেষ্টা—(প্রবোধ দাশগুপ্ত—সোনারগাঁয়)—অনেকটা সফল হইতেছিল—১০।১৫ হাজার টাকা বোধহয় চলিয়াছিল—শেষে ধরা পড়িয়া যায়। প্রথম যুদ্ধ ঘোষণার সময় ডাকাতি ভিন্ন অর্থ সংগ্রহের অপর বিকল্প প্রয়াসরূপে নোট জাল করিয়া অর্থ সমস্যা মিটাইবার চেষ্টায় মাদারীপুর দলের নায়ক শ্রীপূর্ণ দাস আত্মনিয়োগ করেন। ট্যাঁক-শাল হইতে ছাপ লওয়ার ব্যবস্থাও হয়। কিন্তু যাহাকে বিশ্বাস করিয়া এই কার্যে হাত দেওয়া হইয়াছিল—সেই ব্যক্তিই পুলিশকে খবর দিয়া নিজ বাটীতে আনিয়া মাদারীপুরে পূর্ণবাবুকে ধরাইয়া দেয়। জার্মান ষড়যন্ত্রকালে অর্থের প্রয়োজন এই পথে মিটাইবার চেষ্টা হয়।

এ-ছাড়া কৃত্রিম সোনা তৈয়ারীর প্রক্রিয়ার অধিকতর উৎকর্ষ সাধন করিয়া—তাহা দ্বারা অর্থসমস্যা মিটাইবার আশার কথাও শোনা যায়। এই বিষয়ে পণ্ডিত মোক্ষদা সামাধ্যায়ী কিছুকাল উৎসাহ প্রকাশ করেন। এমন কি হায়দরাবাদের প্রবাসী বাঙালী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর পিতা) ১৯১২ সালে কলিকাতায় ইহা সম্ভব বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করেন।

শ্রীমানী মার্কেটের উপরের একটি গোপন কক্ষে পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা মতো মোক্ষদা সামাধ্যায়ী মহাশয় অঘোরনাথকে লইয়া আসেন, সেখানে বিপ্লবীদলের সঙ্গে (লেখকও উপস্থিত ছিলেন) এই বিষয়ে তিনি উৎসাহের সহিত আলোচনা করেন, এবং অর্থসমস্যা এই পথে মিটিতে পারে বলেন। কিন্তু ইহাও কার্যকরী হয় না। অর্থসমস্যা মিটাইবার জন্য যে কোন ভিন্নপথের প্রস্তাব আসিলে, তাহা আগ্রহ সহকারে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা বিপ্লবীরা করিয়াছে—ডাকাতি পরিহারের জন্যই,—ইহা প্রমাণের উদ্দেশ্যেই নোট তৈয়ারী, টাকা তৈয়ারী, এমন কি সোনা তৈয়ারীর প্রচেষ্টার কথাও এখানে উল্লেখ করিলাম।

গুপ্ত বিপ্লবীসংস্থা গঠন, পরিচালনা এবং বিস্তৃতির জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থ ডাকাতির দ্বারা সংগ্রহের নজির যদিও 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'আনন্দমঠ' হইতে লওয়া হইত এবং 'যুগান্তর' পত্রিকাও ডাকাতি করিয়া অর্থসংগ্রহের উপদেশ দিত, তথাপি ইহার পক্ষে বিপক্ষে গোড়া হইতেই মতামত ছিল, দেখা যায়। এই সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য উক্তি উল্লেখ করিতেছি :—

'একদিন প্রাতে সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে কলিকাতার বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিগণকে লইয়া গুপ্ত-আলোচনা সভা বসিল (১৯০৬-৭ সালে হইবে)। পি. মিত্রই হইলেন সভাপতি। গুপ্ত সমিতি পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন, এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ডাকাতির কথা উঠিল। কেহ কেহ বলিল : দেশের লোকের উপর ডাকাতি না করিয়া গভর্ণমেণ্টের টাকা লুট করাই সঙ্গত। কেহ বলিল : গভর্ণমেণ্টের টাকা লুট করিতে যে শক্তি ও সম্বলের প্রয়োজন এবং তাহা সঞ্চয় করিতে যে অর্থের প্রয়োজন তাহাও দেশের লোকের উপর ডাকাতি না করিয়া পাওয়া যাইবে না; কারণ কোন ধনী ব্যক্তিই এজন্য টাকা দিবে না। পরে শ্রীঅরবিন্দ বুঝাইলেন যে, স্বাধীনতার জন্য ডাকাতি করাতে যে নীতিগত দোষ কল্পনা করা হয় তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। শেষে রংপুরের একজন প্রতিনিধি বলিলেন—"আমরা ডাকাতি করিয়া যাহার যত টাকা আনিব তাহার একটা সঠিক হিসাব রাখিব এবং স্বাধীনতা লাভ করিয়া ঐ সমস্ত লোকদিগকে তাহাদের টাকা ফিরাইয়া দিব।" শ্রীঅরবিন্দ সমর্থন করিলেন এবং এই প্রস্তাবটিই গৃহীত হইল। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলিন বিহারী দাস। ইহা তাঁহারই উক্তি। (স্বাধীনতা সংখ্যা—যুগান্তর)

১৯১৬ সালে কলিকাতার গোপী রায় লেনের ডাকাতি সম্পর্কে বাড়ীর

মালিক বিপ্লবীদলের নিকট হইতে (Bengal Branch of Independent Kingdom of United India) একখানা পত্র পান তাহাতে "আপনার নিকট হইতে ৯৮৯১—৫ পাই ঋণস্বরূপ আমাদের তহবিলে জমা হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমরা আপনার এই টাকা স্থদ সমেত পরিশোধ করিব।"—লিখিত ছিল। এই ডাকাতি অতুল ঘোষ ও পুলিন মুখার্জির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহারাই বোধহয় এই পত্রের লেখক। কুন্তল চক্রবর্তী নামক একজন যুবকের নিকট এই পত্রে ব্যবহৃত ব্লক পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ডাকাতির টাকার পরিমাণ, মালিকের নাম ঠিকানা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার যে কোন্ ব্যবস্থা ছিল,—অথবা ঋণ পরিশোধ করার যে কোন দুশ্চিন্তা ছিল,—ইহার কোন প্রমাণ নাই।

যাহারা অসৎ উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে এবং জনসাধারণের অপ্রীতি-ভাজন, তাহাদের অর্থই ডাকাতি করিয়া লওয়া হইবে—গোড়ায় এই ধরণের প্রস্তাবাদি থাকিলেও—এই নীতিই যে কেবল সর্বত্র অনুসৃত হইয়াছে, তাহা বলা চলে না। অর্থের সন্ধান, সংগ্রহের স্থবিধা ও প্রয়োজন হিসাবে স্থান ও পাত্র বিবেচিত হইয়াছে। তবে স্থানীয় প্রতিক্রিয়ার বিষয় অবশ্যই আলোচিত হইবার কথা।

পুলিনবিহারী দাস নির্বাসিত হইলে এবং ঢাকা অনুশীলন সমিতি নিষিদ্ধ হইলে সমিতির কর্মীরা কলিকাতা অনুশীলন সমিতিতে আসেন। তখনও পি. মিত্র মহাশয় জীবিত এবং সর্বাধিনায়ক। সতীশবাবু (বসু) পরিচালক। ঢাকা সমিতিতে তখনই ঘরছাড়া অনেক সদস্য ছিলেন। সমিতির কাজ চালানো ও সদস্যদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থের প্রয়োজন। অর্থের অভাবে সমিতির সদস্যদের জীবনধারণই অসম্ভব হইয়া উঠিল। দিন দিন একরূপ অর্ধাশন চলিল। মিত্র মহাশয়ের নিকট সমিতির সদস্যগণ—(ইঁহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতে ইতিপূর্বেই সর্বত্যাগী হইয়া বাড়ীঘর ছাড়িয়া সমিতিতে আসিয়াছেন)—গিয়া অর্থাভাবের কথা এবং অনাহারের কথা বলেন। 'খাইবই বা কেমন করিয়া, দলই বা চলিবে কেমন করিয়া' প্রশ্ন করেন। ডাকাতির কথা উঠে। সতীশবাবু ডাকাতিতে আপত্তি করেন, বলেন: ডাকাতি আরম্ভ করিলেই সবাই জড়াইয়া পড়িবে, ধরা পড়িতেই হইবে। পি. মিত্রও সতীশ-বাবুকে প্রথমে সমর্থন করেন। শেষটায় সদস্যগণ বলেন, 'তবে কি সমিতির

কাজকর্ম ছাড়িয়া আমাদের বাড়ীঘরে ফিরিয়া যাইতে বলেন,—আমাদের আজ আধপেটা খাবারও জুটে নাই।' সদস্যদের মধ্যে শিশির গুহরায়, শান্তি মুখার্জি, বীরেন চ্যাটার্জি প্রভৃতি ফেরারীগণ ছিলেন। পি. মিত্র সব কথা বিবেচনা করিয়া তখন "একটা ডাকাতি কর" বলিয়া অনুমতি দিলেন। সমিতির সদস্যগণ প্রধান নেতার এই অনুমতি পাইয়া 'একটা ডাকাতি' করিতে বাহির হইয়া,—অল্প সময়ের মধ্যে দুইটি ডাকাতি করিয়া বসেন।—ইহা অবিকৃত সত্য যে, বাংলার প্রায় প্রত্যেকটি বিপ্লবীসংস্থাই বিপ্লবকার্য পরিচালনার প্রয়োজন বোধে সুযোগ ও সুবিধামত ডাকাতি করিয়াছে।

* * * * *

বাংলায় বিপ্লবদলের সূত্রপাত হওয়ার কিছুকাল পর হইতেই অর্থের প্রয়োজনে ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইতেছিল। ১৯০৬ হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত, কখনও বা প্রবলভাবে কখনও বা মন্দগতিতে ইহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু বন্ধ হয় নাই। সাধারণতঃ জলপথে ও স্থলপথেই ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইত। তবে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মোটর সংযোগে কলিকাতার গার্ডেনরিচ ও বেলিয়াঘাটা প্রভৃতি স্থানে যে ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয় তাহা একটা নূতন অধ্যায়।

* * * *

বিপ্লবীদের অনুষ্ঠিত অনেকগুলি ডাকাতিতেই আশ্চর্য রকম সুশৃংখলা ও কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে। ১৯০৬ সাল হইতে ১৯১৭ সালের অনুষ্ঠিত ডাকাতিগুলি বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের কষ্টসহিষ্ণুতা, নিয়মানুবর্তিতা, ক্ষিপ্রকারিতা, নির্ভীকতা, লোভশূন্য মনোবৃত্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচয়ও পাওয়া যায়। এই ব্যাপারে যে নির্মম নিষ্ঠুরতা ও কোমল মনোবৃত্তি একই সঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

* * * *

ডাকাতি করার পর বিপ্লববাদীরা সকলেরই গাত্রতল্লাস করিত। বহু লোক একত্র হইয়া ডাকাতি করিত। নূতন লোকও হয়ত সময় সময় থাকিত। সুতরাং একেবারে বিশ্বাস করিয়া বা শৈথিল্য করিয়া বসিয়া থাকিত না। তল্লাসির অন্যতম উদ্দেশ্য, কোন কাগজপত্র, কার্তুজ বা অর্থ আছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া। কড়াক্রান্তি হিসাব না করিলে শৈথিল্য হইতে ক্রমে অর্থ আত্মসাৎও

কেহ করিতে পারে। প্রত্যেককে পরীক্ষা করিবার অবসরও হয়ত পূর্বে পাওয়া যায় নাই। তাই ডাকাতি করিতে গিয়া বিপ্লববাদীরা সতর্কতা অবলম্বন করিতে ত্রুটী করে নাই। ডাকাতি যাহারা করিতে যাইত তাহারা সকলেই অর্থ সংগ্রহ করিত না, সেজন্য নির্দিষ্ট লোক থাকিত। ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। অর্থ একত্র করা হইয়াছে। যে সেদিনকার নেতা সেই প্রথম একজনকে ডাকিয়া তাহার গাত্রতল্লাস করিতে বলিল। তল্লাস হইল। পরে প্রত্যেকের গাত্র-তল্লাস করিয়া দেখা গেল, কাহারও কাছে কোন অর্থ বা সন্দেহজনক কিছু নাই। এইভাবে তল্লাস লওয়ার দস্তুর হইয়াছিল। সকলে ইহা মানিত।

* * * *

বিপ্লববাদীরা স্ত্রীলোকদের গায়ে কখনও হাত দেয় নাই। একবার একস্থানে ডাকাতি হইতেছে। অর্থসংগ্রহ চলিতেছে। যে বাড়ীতে ডাকাতি হইতেছিল সেই বাড়ীর একজন স্ত্রীলোকের গলায় একছড়া হার ছিল। উহা দেখিয়া ঐ হার ছড়া লইতে যেই একজন হাত বাড়াইয়াছে অমনই তাহার গণ্ডদেশে এক প্রচণ্ড চড় পড়িল। ঐ আঘাতে বিপ্লববাদী ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। একজন বিপ্লববাদী পিস্তল উঠাইয়া বলিল, "খুন ক'রে ফেলব; তোমাকে হার কেড়ে নিতে কে বলেছে?" বিক্রমপুর গাঁওদিয়া ডাকাতিতে চড় মারিয়াছিল ও শাসন করিয়াছিল রবীন্দ্রমোহন সেন ও বীরেন্দ্র চ্যাটার্জী। ঐ লোকটার ঐ প্রবৃত্তি দেখিয়া বিপ্লববাদীরা তাহাকে হেয় মনে করিতে লাগিল। শাসন তো চলিলই। তাহার উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার আদেশ হইল। যে তাহাকে পাঠাইয়াছে, তাহার কৈফিয়ৎ চাওয়া হইল।

\- \- \- \-

একস্থানে ডাকাতির অনুষ্ঠান হইতেছে। বাড়ীর বাহিরে গ্রামের লোক জড় হইয়াছে, ভিতরে যে যাহার নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে। সময় অধিক নাই, অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত কাজ সারিতে হইবে।

অগণিত অর্থের সন্ধান সেখানে মিলিয়াছে। বিশিষ্ট কর্মীরা ভাবিতেছে, "আর এ সমস্ত কাজ করিবার প্রয়োজন হইবে না।" কিন্তু হঠাৎ গুড়ুম্ করিয়া আওয়াজ হইল। কিসের একটা আঘাত লাগিয়া জনৈক বিপ্লববাদীর হাতের পিস্তল ছুটিয়া গেল,—আর তাহা আঘাত করিয়া বসিল অপর বিপ্লববাদীকে। আঘাত সাংঘাতিক! অর্থ সবই হাতে আসিয়াছে; কিন্তু যাঁহার হাতে

সেদিনকার এ অনুষ্ঠানের ভার তিনি প্রমাদ গণিলেন। অজস্র রক্ত পড়িতেছে। আহত ব্যক্তিকে বহন করিয়া এতদূর লইয়া যাওয়া এক মস্ত সমস্যা। এই অগণিত টাকা, আর এই মানুষ, কেমন করিয়া রক্ষা করা যায়? আহত বিপ্লববাদী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—'এক মুহূর্তও দেরী ক'র না। এত অর্থসংগ্রহ ক'রতে অনেক বেগ পেতে হবে—আমার মাথাটা কেটে নিয়ে যাও—শীঘ্র কর।' যাহা করার কয় সেকেণ্ডেই ঠিক করিতে হইবে। আহত বিপ্লববাদী অবিচলিত চিত্তে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল—'ভাববার সময় নেই—টাকাগুলোই নিয়ে যাও—তবে চেহারা দেখলে চিনতে পারবে—মাথাটা কেটে ফেল।' কিন্তু মীমাংসার ভার যাঁহার মাথায় ছিল, তিনি কাজ বন্ধ করিবার বাঁশী বাজাইলেন। সকলেই হাত গুটাইল। যে টাকার তোড়া ধরিয়াছিল, সে ছাড়িয়া উঠিল। আদেশ হইল 'টাকা নয়, মানুষ;—কাঁধে তোল।'* ব্যাণ্ডেজ করিয়া নিঃশব্দে আহত বিপ্লববাদীকে বহন করিয়া সকলে চলিল। অর্থের কথা কেহ ভাবিল না। রাস্তায় নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আসিয়া সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত সুনিপুণ গোপনতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইল।† যন্ত্রবৎ অর্থসংগ্রহ করিতে যাহারা ছুটিয়াছিল তাহারা যন্ত্রবৎই একটি ইংগিতে অর্থসংগ্রহ ত্যাগ করিয়া ছুটিল। বিপ্লববাদীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অনেক ডাকাতিতেই এমনি সুশৃংখলা প্রকাশ পাইয়াছে।

এ সমস্ত ডাকাতির মধ্যে যে একটা ক্ষীণ ক্ষাত্রভাব লুক্কায়িত ছিল তাহাতেও অনেক যুবককে আকৃষ্ট করিয়াছে। জাতির মধ্যে একটা লুপ্তপ্রায় ক্ষাত্রভাব ছিল। যে শ্রেণীর মধ্যে এই ভাব প্রচুর থাকে, তাহারা সমস্ত সময় খুব বুদ্ধিজীবী নাও হইতে পারে। তাহাদের পরিচালকদের বিদ্যাবুদ্ধিতে নির্ভর করিয়া তাহারা, নেতার আদেশে 'এক পায়ে খাড়া' হইতেই কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। ডাকাতিতে দলবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিতে হইত, সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে একজনের নেতৃত্বাধীনে একটা বিপদের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইত, আদেশ

* বহনকারীদের অন্যতম ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার ক্যাসিয়ার পরলোকগত নির্মল দাশগুপ্ত।

† হলদিয়া ডাকাতি—বিখ্যাত বিপ্লবী অমৃত সরকার আহত হয়। ঢাকার বিখ্যাত চাঁদসীর ডাক্তার মোহিনীমোহন দাস সংগোপনে চিকিৎসা করেন। এমনি গোপনতার মধ্যে আরো চিকিৎসা হয়।

মতই পরিচালিত হইতে হইত—এ সমস্ত ব্যাপার, যুবকদের এই ভীষণ পথের সহযাত্রী হইতে উৎসাহিত করিয়াছে। ইহা নিছক প্রয়োজনীয় ব্যাপার হিসাবেই কেবল নহে, ইহার মধ্যে যে একটা রোমান্সের ভাব ছিল তাহাও ইহাদের কতককে আকৃষ্ট করিয়াছে। ডাকাতি করিতে সমবেত কর্মীরা যেন সৈনিক—নেতা যেন সেনাপতি বা কম্যাণ্ডার। 'ফল্ ইন্' করা হইত। 'এ্যাকশন' করা অর্থাৎ লুণ্ঠন কার্য সমাধা করা হইত। পরে বিউগল বাজাইয়া—মার্চ করিয়া চলিয়া যাইত। টাকা যাইত ভিন্ন পথে—অস্ত্র যাইত ভিন্ন পথে।

* * * *

নৌকাপথে ডাকাতির রকম। নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে পূর্বনির্দিষ্ট নদীর তীরে, নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক আসিয়া নীরবে নৌকায় উঠিল। মাঝিমাল্লা সবই ঠিক। স্থানে স্থানে পূর্বনির্ধারিত স্থানে দুইচারি জন আসিয়া নৌকায় উঠিতে লাগিল। এমনই করিয়া কখনও সোজা, কখনও বক্রগতিতে অবিশ্রান্ত ভাবে মাঝি নৌকা বাহিয়া চলিল। বলা বাহুল্য, মাঝিমাল্লারা সকলেই বিপ্লববাদী। ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি কথার ভংগী মাঝিমাল্লাদেরই মত। জীবনে যে তামাক খায় না, সেও নৌকার মাঝি সাজিয়া সাধারণ মাঝিদের মতই তামাক খাওয়ার নিপুণ অভিনয় করিতেছে। স্থানে স্থানে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর মাঝিমাল্লারাই দিতেছে। উত্তরদাতা ও প্রশ্নকর্তা পূর্বাহ্লেই নির্দিষ্ট হইয়া আছে। আবার বিপ্লববাদীদের মধ্যেই জনকয়েক আরোহী হইয়া বসিয়াছে। নদীতে জল-পুলিশ রহিয়াছে, মোড়ে মোড়ে নৌকায় তাহাদের ঘাঁটি। সেখানে পুলিশের লঞ্চ নিয়ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিদর্শন করিতেছে। মোড়ে মোড়ে নৌকার তল্লাস হইতেছে। নৌকায় স্ত্রীলোক থাকিলেও রেহাই নাই। তারপর কোনও নৌকা মোড়ে না আসিয়া অপর দিক দিয়া যাইতেছে দেখিলে তাহা থামান হইত, তল্লাস করা হইত, নাম ধাম লেখা হইত।—এই সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অস্ত্রশস্ত্র সমেত, আট দশ দিনে (কখন তাহা হইতেও বেশী) ঐ নৌকাপথেই বিপ্লবীরা গন্তব্য স্থলে গিয়া পৌছিত। বিপ্লববাদীরা অনেকে নৌকা পরিচালনায় সুদক্ষ মাঝির মতই ছিল। অবশ্য ইহা রীতিমত অভ্যাস করিতে হইয়াছে। আর সাধারণ বিপ্লববাদী সকলেই রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিতে অভ্যস্ত ছিল। অনেক সময় গন্তব্য স্থানে নানা বিঘ্নবিপত্তির মধ্যেই নির্দিষ্ট সময়ে পৌছিতে হইবে, তাই তীরবেগে নৌকা চালান

হইত, সময়ের অভাবে খাওয়ার হুকুমও মিলিত না। অনেকের বর্ণ রৌদ্র-বৃষ্টি ও সেই পরিশ্রমে একেবারে কাল বিবর্ণ হইয়া যাইত। দেখিলে মনে হইত সত্যই বুঝি কোন 'স্থানবিশেষের' মাঝি। কিন্তু বাধা দিত এক বয়স! অনেকেই যুবক, কাজেই একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে হইত। সেই দিকেও ছদ্মবেশ গ্রহণের ও সাবধানতার ত্রুটি ছিল না। যাহাই হউক, ডাকাতি করিতে যাওয়ার মুখে বরং কষ্ট ছিল কম, কিন্তু ফিরিবার মুখে কষ্ট সহিতে হইত অধিক। কারণ তখন একদিকে যাইত অর্থ, একদিকে যাইত অস্ত্র, আর নদীপথে যাইত বিপ্লববাদীরা। কিন্তু ডাকাতি করার পর, চারিদিকে সতর্ক জল-পুলিশ ও স্থল-পুলিশের সম্মুখে পড়ার আশঙ্কা থাকিত। তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র ও মানুষ নির্বিঘ্নে নির্দিষ্ট স্থানে আনিতে অনেক কৌশল, অনেক শৃংখলার প্রয়োজন হইত। ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া কাজ করার মত কাজ না করিলে, প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাজ প্রত্যেকে না করিলে, ধরা পড়িবার সম্ভাবনা খুবই ছিল।

এখানে কালীচরণ মাঝির কথা উল্লেখ করা চলে। বিখ্যাত বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ)-রই একটি ছদ্মনাম ছিল কালীচরণ। বিশিষ্ট বিপ্লবী আশুতোষ কাহিলী বলেন (১৯১০ সালের কথা): "শ্রীমাখন সেনকে (তিনি তখন ঢাকার দলের নেতা) আমি বিরক্তির সহিত জানাই যে, দেখুন একজন নমঃশূদ্র মাঝি জুটাইয়াছে। তাকে দেখি যথেষ্ট বিশ্বাস করেন (নরেন সেন প্রভৃতি)।" পূর্ববঙ্গের ঘাসী নৌকার মাঝিরা সাধারণত নমঃশূদ্র। ইহাই তাহাদের ব্যবসায়। আশুবাবুর বলিবার কথা—মাঝি বিপ্লবী নয়, ব্যবসায়ী মাঝি। মাখনবাবুর সঙ্গে তখন দলের মতভেদ চলিতেছে। তিনিও নমঃশূদ্র মাঝি জুটাইয়াছে শুনিয়া রাগান্বিত হন। অবশ্য আশুবাবু কিছুকাল পরেই জানিতে পারেন তাঁহার ঐ নমঃশূদ্র মাঝি কালীচরণ আসলে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী। আর একবার থানায় যাওয়ার কথা—ত্রৈলোক্যবাবুর "জেলে ত্রিশ বছর" পুস্তক হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি: "আমাদের পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন নদীতে চলাফিরা করিতে হইত। জল-পুলিশের আড্ডার নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে হইত। সময় সময় পুলিশ-লঞ্চের সহিতও দেখা হইত। বড় ঘাসী নৌকার উপর পুলিশের নজর ছিল অধিক, তাই আমাদিগকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইত। এক যাত্রায় আমাদের নৌকা এক বাজারে লাগাইয়াছি। ঘাসী নৌকা দেখিয়া কিছু লোকের সন্দেহ হইয়াছে—আমাকে থানায় ডাকিয়া লইয়া গেল। আমি

দারোগাবাবুর সকল প্রশ্নের জবাব দিলাম, আমার কথাবার্তা চালচলনে কাহারও কোন সন্দেহ হইল না। দারোগাবাবুর মফঃস্বলে তদন্তে যাওয়ার কথা ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যাইতে রাজী আছি কিনা। আমি বলি, ক্যেরায়া বাই, রাজী হইমু না ক্যান্?—আমার নৌকা ছিল ঘাসী। দারোগার সহিত কনষ্টেবল যাইবে, কয়েকটা বন্দুক থাকিবে। ইচ্ছা করিলে বন্দুকগুলির মালিক আমিও হইতে পারি—আমি রাজী হইলাম। রাজী না হইয়াও উপায় নাই। তৎক্ষণাৎ সন্দেহ করিবে। আমাকে সন্দেহ করিয়া যদি আমার ঘরবাড়ীর অনুসন্ধান নেয়—তবে সেই গ্রামে ঐ নামের লোক পাইবে না—আমার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আমি তখন পলাতক আসামী। আমার নামে পুরস্কার ঘোষণা ছিল। যাই হোক—ঘটনাক্রমে, দারোগাবাবুর একটি বিশেষ কাজ পড়ায় মফঃস্বল যাওয়া হইল না। আমি অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়া বাজার করিয়া গন্তব্য পথে রওনা হইলাম। এক সময়ে আমি কালীচরণ মাঝি নামে খ্যাত ছিলাম। নৌকায় নৌকায় কাটাইয়াছি। বহুদিন নৌকায় থাকিতে থাকিতে চেহারাও মাঝির মত হইয়াছিল। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রং খুব ফর্সা ছিল—দেখিতে রাজপুত্রের মত। কিন্তু রৌদ্রে বৃষ্টিতে তাহার চেহারাও মাঝির মতই কালো হইয়া গিয়াছিল। আমরা মাঝির মত থাকিতাম। মাটির শান্‌কিতে ভাত খাইতাম। কল্কি দিয়া তামাক খাওয়া পর্যন্ত অভ্যাস করিয়াছি। আমি পূর্ববঙ্গের বড় বড় নদীতে নৌকা চালাইয়াছি, বর্ষাকালে, ঝড়বৃষ্টির দিনে পদ্মানদী পাড়ি দিয়াছি, বরিশালে গিয়াছি, নোয়াখালি গিয়াছি—জাহাজের সঙ্গে পাল্লা ধরিয়া নৌকা চালাইয়াছি। পুলিশের হাতে বহুবার আমাকে পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু তাহারা আমাকে সাধারণ গ্রাম্য মাঝি ভাবিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।"

ধূলিনিক্ষেপ। বিপ্লবীরা পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া যাতায়াত করিয়াছে—এমন বহু কাহিনী আছে; গল্প নয়, সত্য ঘটনা।

বিপ্লবী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরও জনকয়েক বড় নৌকায় আসিতেছে। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে। এই সময়টায় জল-পুলিশের ছড়াছড়ি; নৌকা দেখিলেই থামায়—তল্লাস করে। নৌকায় অস্ত্রশস্ত্র ছিল। স্থির হয়, পুলিশকে এড়াইয়া যাইতে পারিলে ভালো, নয়তো অস্ত্র চালাইয়াই নৌকা লইয়া বাহির হইয়া যাইতে হইবে। নৌকা আসিতেছিল বিক্রমপুর রাজবাড়ী হইতে ঢাকায়। বীরেন্দ্রের উর্বর মস্তিষ্কে একটা ফন্দি খেলিল। রাজবাড়ী হাট হইতে চৌদ্দ

আনা দিয়া একটা বড় কাউঠা কিনিয়া লইল। সকলেই নৌকার মাঝি। পুলিশের গ্রীণবোট অদূরে দেখিয়া—ঐ পুলিশের নৌকা লক্ষ্য করিয়াই আগাইয়া যায় এবং ইচ্ছা করিয়াই পুলিশের বোটে নৌকা লাগায়।—বড়কর্তা কই ? অর্থাৎ বড় দারগাকে খুঁজিয়া বীরেন প্রসন্ন মুখে বলে : 'কর্তা এই কাউঠাটা পাইলাম চড়ে। আমরা তো খাই না—ভাবলাম দারোগাবাবুরে দিয়া যাই। তাই আপনাগো বোট দেইখ্যা আইলাম।' দারোগাবাবু এতো বড় একটা কাউঠা পাইয়া বড় খুসী। নৌকা তল্লাস করার প্রশ্নই উঠিল না। ডাকাতির পরে কখনো কখনো নারিকেল বোঝাই করিয়া নারিকেলের চালানী নৌকা বলিয়া পার পাইয়া যাইত। হাট বাজারে বসিয়া নারিকেল বেচিত। এই রকমেরই এক নৌকা ঢাকা সহরের নবাবপুর পোলের নিকট আসে। শ্রীমানরা কেহ কেহ পারে নামিয়া নারিকেল বিক্রী করিতেছিল। এই কার্যে নারায়ণগঞ্জের একটি যুবক রত থাকা কালে তাহার দাদা দেখিয়া ফেলেন। এবং নিকটে গিয়া বলেন : একি, হতভাগা হারামজাদা করিস্ কি ?—বাড়ীর অবস্থা ভালো, সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। বিপ্লবী যুবক দাদাকে বলেন : কারে কি কন্ কর্তা ? আপনার ভ্রেম (ভ্রম) অইচে (হইয়াছে)। দাদা চটিয়া আগুন হন্। একটা জানাজানি হয় আর কি ? এমন সময় সেখানে প্রতুল গাঙ্গুলী উপস্থিত হন। দাদার অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে একান্তে আনিয়া বলেন : এ কি করছেন—এখনই যে পুলিশ এসে পড়বে ? জানেনই তো ভাইটি স্বদেশী করে। আপনি বাড়ী যান—শ্রীমানকে আজই পাঠিয়ে দেব। দাদা অগত্যা নীরবে চলিয়া যান।

একবার স্থলপথের এক ডাকাতির পর বিশিষ্ট একজন বিপ্লববাদী ধৃত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনাকে এড়াইবার জন্য হঠাৎ গতি ফিরাইয়া দেয়। দুই পয়সার ছোলাভাজা পকেটে ফেলিয়া ৮০ মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া এক বন্ধুর বাড়ীতে রাত্রিশেষে উপস্থিত হইয়া নীরবে বহির্বাটীতে এক ভৃত্যের পাশে শয়ন করিয়া থাকে। ভৃত্য প্রভাতে নিদ্রামগ্ন ভদ্রলোককে দেখিয়া অবাক। এ আবার কে ? গোলমাল হইতে বন্ধুর মা আসিয়া দেখেন শ্রীমান কালীচরণ। জানা-শুনা খুবই ছিল। কোথা হইতে আসিয়াছে না জানিলেও, বুঝিলেন, বহুদূর হইতে কোনও একটা জরুরী ব্যাপার উপলক্ষেই আসিয়াছে। বিপ্লববাদীদের মা-বোনেরা (সকলেই অবশ্য নহে) গোপন-ব্যাপারে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে গিয়া উপস্থিত হইলেও জিজ্ঞাসা করিতেন না,

"কোথা হইতে আসিলে?" পুত্রাধিক স্নেহে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া শুধু যত্নই করিতেন; কিন্তু কোথা হইতে কেন আসিতেছে, কোথায় কবে যাইবে, ইহা জিজ্ঞাসা করিতেন না। জানিতেন, অদ্ভুত অস্বাভাবিকই ইহাদের জীবন। কি করিতেছে ইহারা, তাহা হয়ত কাহারও কাহারও মা জানিতেন, অনেকেই জানিতেন না;—তবে এটুকু জানিতেন দেশের জন্য ইহারা সব কিছু করিতেছে!

মা ডাকিলেন, 'এস, ভিতরে এস, অমনি ক'রে শোয়? পাগল, একবার ডাকনি কেন?' বিপ্লববাদী হাসিয়া বলিল, 'একটু জল গরম করুন।' জল গরম হইলে পায়ে একটু সেঁক দেওয়া হইল—মায়ের দেওয়া ভাতও জুটিল। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার রাস্তায় বাহির হইতে হইল।*

একজন বিশিষ্ট বাঙালী বলিয়াছিলেন, বিপ্লববাদীরা 'were driven to dacoities'—কথাটা সত্য। বড় বড় ব্যারিষ্টারের ফি যোগাইতেও তাহাদের অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে। শেষ দিক দিয়া তাহারা আর অর্থব্যয় করিয়া জমকাল মোকদ্দমা করিতে চাহে নাই—করেও নাই।

বাহ্রা ডাকাতি

বাংলার বিপ্লবী ডাকাতির ইতিহাসে বাহ্রা ডাকাতিতেই প্রথম বিশেষত্ব ফুটিয়া ওঠে। বলিতে গেলে বাহ্রা ডাকাতিই প্রথম সংঘবদ্ধ বড় ডাকাতি। এই ডাকাতির রকম-সকম, ডাকাতদলের তিন দিবারাত্রি জলে স্থলে সশস্ত্র সংগ্রাম, পরে বেমালুম অদৃশ্য হইয়া যাওয়া বাংলার জনসাধারণের বিশেষ করিয়া বাংলার যুবজনের চিত্তে এক অভিনব কৌতূহলের উদ্রেক করিল। ইহার অপূর্ব প্রয়াস ও সাফল্য অতি সহজেই ইহাকে ডাকাতির দুর্নাম হইতে মুক্ত করিয়া স্বদেশী ডাকাতির কৌলীন্য দান করিল। ছোট খাটো ডাকাতির প্রয়াসে বা সাফল্যে জনচিত্তের উপর এইরূপ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্ভব হইত না। কিন্তু বাহ্রা ডাকাতির সংবাদ বাংলাদেশের যুবকদের বিপ্লবমুখী মনকে আনন্দমঠের সন্তানগণের ডাকাতির রঙে রাঙাইয়া তোলে। তরুণ যুবকেরা রহস্যাবৃত বলিয়া

* শ্যামগঞ্জের ডাকাতির পর ময়মনসিংহের সন্নিবাবাড়ী হইতে ঢাকা মানিকগঞ্জের তিল্লি গ্রামের ৺যোগেন্দ্র রায়ের বাড়ীতে বাস—ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী।

এই অজানাকে জানিতেই প্রলুব্ধ হইল। এ-যে ডাকাতি মাত্র নয়—ইহা যে বিপ্লবেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, প্রস্তুতি, এই বিশ্বাসে ডাকাতিকে বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখিল। এই কারণে এই ডাকাতির পরিচয় দানের প্রয়োজন আছে। পরবর্তী বহু ডাকাতির অনুষ্ঠান ও ধরণ ধারণ বুঝিবার পক্ষেও ইহা সাহায্য করিবে। ১৯০৮ সালের ২রা জুন। ভোরের দিকে ঢাকা হইতে দুইটি নৌকা ছাড়ে। এই ডাকাতিতে ৩১ জন যুবক অংশ গ্রহণ করে। পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যবস্থামত বিভিন্ন স্থান হইতে বিপ্লবীরা নৌকায় উঠে। নৌকার দাঁড়ি-মাঝি তাহারাই। বিপ্লবীদের সঙ্গে নূতন ধরণের দূর পাল্লার রাইফেল ছিল, পর্যাপ্ত কার্তুজ, তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ছিল। দুপুরের পর নৌকায় রান্না নামিল। তাহা অর্দ্ধসিদ্ধ চাউল বলা চলে। তাহাই যথাসাধ্য খাওয়া হইল। এই ডাকাতির প্ল্যান প্রস্তুত করেন ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিনবিহারী দাস। বাড়ীর (যে সরকার বাড়ীতে ডাকাতি করা হইবে), রাস্তার, নদীর প্ল্যান ছিল, কোথায় কোথায় সশস্ত্র রক্ষী রাখা হইবে তাহাও আঁকিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বাহ্রাতে নৌকা পৌছিল রাত্রি ৮টায়। এই নদীটি ছোট, উদ্দিষ্ট বাড়ীটি এ স্থান হইতে সিকি মাইল দূরে। প্ল্যান অনুযায়ী ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে লোক রাখিয়া কে কোন্ কাজ কখন করিবে বুঝাইয়া দিয়া ও কাজ ভাগ করিয়া তাহারা উদ্দিষ্ট বাড়ীতে পৌছিল। বিপ্লবীগণ বাড়ীটি (বড় পাকা বাড়ী) ঘিরিয়া ফেলিয়াই অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ করিল। রাত্রি ছিল অন্ধকার। বিপ্লবীদের সঙ্গে ছিল বোতলের মশাল। বাড়ীর মালিক অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া লোহার সিন্দুকের চাবি দিয়া দিল। অর্থ সংগ্রহের জন্য যাহারা ভারপ্রাপ্ত কেবলমাত্র তাহারাই অর্থ সংগ্রহ করিল। এদিকে বন্দুকের ভীতিজনক শব্দে—এত অধিক শব্দ গ্রামবাসী কোনদিন শোনে নাই—এবং ডাকাতির সংবাদে গ্রামের বহু মুসলমান ও হিন্দু আসিয়া পড়িল। সময়টা বৈশাখ মাস। বিপ্লবীরা অর্থ লইয়া যখন ফিরিতেছিল—ঝোপ জঙ্গলের মধ্য দিয়াই রাস্তা—তখন গ্রামের লোক অথবা সরকারদেরই কোন লোক বিপ্লববাদীদের লক্ষ্য করিয়া কোঁচ্ বা টেঁটা (দূর হইতে মৎস্য শিকারের অস্ত্র বিশেষ) নিক্ষেপ করে। একজন বিপ্লবীর (রাজেন্দ্র দত্ত) বাহুতে টেঁটা বিদ্ধ হয়। বিপ্লবীরা অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। অন্ধকারে স্থানীয় লোকজনও যে কিছু আহত হয় উহাদের কথায় ও চিৎকারে তাহা বুঝা যায়। সিকি মাইল পদব্রজে

আসিয়া বিপ্লবীরা দুই নৌকায় উঠিয়া নৌকা চালায়। কিন্তু ইতিমধ্যে নদীর দুই পার ধরিয়াই লোক ছুটিয়াছে, আবার দৌড়াইয়া সম্মুখের গ্রামে গিয়া ডাকাত ধরিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতেছে। জানাজানি হইয়া গিয়াছে, লোকের ডাকাত ধরিবার উৎসাহ বাড়িয়া গেল। কেবল স্থলপথে নয়, বহু সংখ্যক নৌকা করিয়া লোক পশ্চাতে পশ্চাতে অনুসরণ করিতেছে। বিপ্লবীগণ অনুসরণের রকম দেখিয়া ঢাকার দিকে না গিয়া অন্য দিকে চলিল। ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়া সাভার থানার দারোগা আসিয়াছেন, কনষ্টেবলগণসহ বন্দুক ছুঁড়িয়া নৌকার অনুসরণ করিতেছেন। তখন বিপ্লবীরা বড় নদী হইতে আর একটি ছোট নদীতে পড়িয়াছে। কিন্তু পুলিশ-বাহিনী, জনতা এবং নৌকা সমানেই অনুসরণ করিতেছে। পুলিশও গুলি ছুঁড়িতেছে, বিপ্লবীরাও নৌকা হইতে গুলি বর্ষণ করিতেছে। প্রথমটায় বিপ্লবীরা নৌকার ভিতরে থাকিয়াই গুলি ছুঁড়িতেছিল, এবার আশু দাসগুপ্ত ও শান্তি মুখোপাধ্যায় (পরে সন্ন্যাসী হয়), এবং শিশির গুহরায় নৌকার উপর উঠিয়াই গুলি ছুঁড়িতে থাকে। পুলিশ যথাসম্ভব রাইফেলের পাল্লার বাহিরে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছে। তখন দ্বিতীয় দিন। দুইজন বিপ্লবী নৌকার জল সেচিতেছিল (গুলি লাগিয়া নৌকা ছিদ্র হইয়াছিল)। ইহারই একজনের (গোপাল সেন) মাথায় পুলিশের গুলি আসিয়া লাগিল। গোপালের আঘাত মারাত্মক হয়। গোপাল 'বন্দে মাতরম' বলিতে বলিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। এই সময় নৌকা ধামরাই নামক গ্রামের দিকে আসিয়াছে। গোপালের এই মৃত্যু বিপ্লবীদের মধ্যে এক নূতন প্রেরণা আনিয়া দিল। তাহা সম্মুখ সংগ্রামে মৃত্যু বরণের সংকল্প। গোপালের 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি, গোপালের মৃতদেহ সম্মুখে, বিপ্লবীরা সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি তুলিল 'বন্দে মাতরম'। অমৃত হাজরা (পরবর্তীকালে রাজাবাজার বোমার কারখানার শশাঙ্ক) সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাহু উত্থিত করিয়া অনাবৃত দেহে উচ্চকণ্ঠে বলিল 'বন্দে মাতরম'। অমৃত হাজরার গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ দেহ। এই সময়েই ধামরাইর ঐ জনতার একাংশ হইতে ধ্বনি আসিল "বন্দে মাতরম"। গোপালের মৃত্যুর পর উভয় পক্ষ হইতেই গুলি চলিতেছিল। বিপ্লবীদের তরফ হইতে বেশী। কিন্তু জনতার মধ্য হইতে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি উত্থিত হওয়ায় এই প্রথম বিপ্লবীরা বুঝিল, জনতার মধ্যে তাহাদের সমর্থক আছে। তাহারা তখনই গুলিবর্ষণ বন্ধ করিয়া দিল। নৌকা তীরে লাগাইয়া বিপ্লবীরা সংগ্রামের জন্যই প্রস্তুত হইয়া নামিল। কিন্তু দেখা

গেল জনতা হ্রাস পাইয়াছে, এবং অনেকে হাত তুলিয়া বিপ্লবীদের অভিনন্দন জানাইতে জানাইতে চলিয়া যাইতেছে। জনতার একাংশ স্পষ্ট বুঝিল ইহারা বিপ্লবী স্বদেশী। তাহারা আর অনুসরণের চেষ্টা করিল না। কিন্তু কতক মুসলমান তখনও রহিয়া গেল। পশ্চাদনুসরণের ও অবস্থানের কারণ—ডাকাতি হইয়াছে, সরকার বাড়ীর বহু অর্থ ঐ নৌকায় আছে (তখন নৌকা ছিল একটি, অপর নৌকা ডুবাইয়া দিয়া, সংগ্রামের সুবিধার জন্য সকলে এক নৌকায়ই আসে); ইহাদের ধরিতে পারিলে বহু অর্থ মিলিবে, ইহাই অনুসরণকারীদের প্রধান প্রেরণা ছিল। পুলিশ রাইফেলের পাল্লার বাহিরে আছে। লোকসংখ্যা তখন অনেক কম। বিপ্লবীরা অনুসরণকারীদের সঙ্গে একটা আপোষ করিবার জন্য তাহাদের ডাকে। জনতা প্রথম একটু ইতস্ততঃ করে, পরে কয়েকজন মুসলমান নিকটে আসে। তাহাদের সব বুঝাইয়া বলা হইল। বলা হইল, তোমাদের প্রত্যেককে ২৫৲ টাকা করিয়া দিতেছি, চলিয়া যাও, আর পিছু লইও না। তাহারাও রাজী হইয়া বলিল, আর অনুসরণ করিবে না। তাহাদের ৩।৪ জন নৌকায় উঠিল, কিন্তু নৌকায় বহু অর্থ দেখিয়া ২৫৲ টাকায় রাজী হইল না; বলিল আরও টাকা দিতে হইবে। বলিয়া তাহারা নৌকা হইতে নামিয়া গেল এবং বেয়াড়াভাব দেখাইতে লাগিল। নৌকা আক্রমণ করিবে বলিয়া ভয়ও দেখাইল। তখন বিপ্লবীরা একসঙ্গে তাহাদের প্রচণ্ড আক্রমণ করে, এই আক্রমণের পরেই তাহারা চলিয়া যায়। অমৃত হাজরার কাপড় একজন ধরিয়া ফেলে, কতকটা দূরেও নিয়া যায়, শিশিরের চোখে আঘাত লাগে। পূর্বে বলিয়াছি, তখন দিবাভাগ। দূরে একটা ধোঁয়া দেখা দিল। তখন ধোঁয়ার দিকে দূরবীণ লাগাইয়া দেখা গেল, একটা পুলিশের লঞ্চ। বিপ্লবীরা আরও দূরে সরিয়া যায়। কিন্তু পুলিশের লঞ্চটা এদিকে না আসিয়া বরাবর চলিয়া গেল। বিপ্লবীরা এবার স্থির করিল গুন টানিয়া নৌকা লইয়া যাইবে। সশস্ত্র রক্ষীরূপে দুইজন বিপ্লবী সঙ্গে চলিল—নৌকা তখন গুনে চলিয়াছে। ক্রমে রাত্রি হইল,—দ্বিতীয় রাত্রি। তখনও পুলিশ এবং কতক লোক দূরে দূরে অনুসরণ করিতেছে; পুরাতন লোকের স্থানে নূতন লোক আসিতেছে। এমন সময় আরম্ভ হইল কালবৈশাখীর ঝড়, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, অন্ধকার রাত্রি, প্রবল ঝটিকাবেগ;—বিপ্লবীরা কিন্তু উহারই মধ্যে আশার আলো দেখিল। নৌকা তখন বড় নদী ধরিয়া যাইতেছিল। এই কালবৈশাখী ঝড়ের সুযোগ লইতেই হইবে। নৌকায়

মুখ পাল্টাইয়া ঝড়ের গতির দিকেই পাল টাঙানো হইল। পুলিশ জানিত বিপ্লবীরা পশ্চিম দিকেই যাইতেছে। এবার নৌকা চলিল উত্তর-পূর্ব দিকে। বিপ্লবীরা এতক্ষণ যে পথ অতিক্রম করিয়া আসিতেছিল সেই পথেই ফিরিতে লাগিল। পুলিশ ইহা কল্পনা করে নাই। ঝড়ের দরুণ নৌকার পালে অসম্ভব জোর ধরিল। চার ঘণ্টার রাস্তা মাত্র এক ঘণ্টায় আসিল। তাহার পর একটা বাঁকে পড়িয়া নৌকা একেবারে ভাওয়াল জঙ্গলে আসিয়া গেল। পুলিশ ও অনুসরণকারীরা বুঝিতে পারিল না নৌকা কোথায় গেল। সেখানে নৌকা ত্যাগ করিয়া (তখনো রাত্রি আছে) বিপ্লবীগণ জঙ্গল ভেদ করিয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিল। তখন ভোর হইয়াছে। তৃতীয় দিন। ভাগ ভাগ হইয়া অর্থ গেল একদিকে—অস্ত্র গেল একদিকে; অপর কর্মীরাও ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিয়া গেল। প্রথম দিন অর্ধসিদ্ধ চাল খাওয়ার পর এই দুইদিন তাহাদের আর আহার জোটে নাই। দ্বিতীয় দিনের রাত্রে নৌকায় বিপ্লবীদের পরামর্শ সভা বসে। পুলিশ ও অনুসরণকারীরা ভীষণভাবে অনুসরণ করিতেছে; ইতিমধ্যে ঢাকায় খবর যাওয়ায় গবর্ণমেণ্টের লঞ্চ লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ ও সশস্ত্রবাহিনী লইয়া নিশ্চয়ই আসিবে—এখন কিংকর্তব্য? স্থির হইল, (আশু দাসগুপ্তের উপরই ছিল নেতৃত্বের ভার) ধরা দেওয়া হইবে না, শেষ গুলি পর্যন্ত তাহারা সংগ্রাম করিবে। এখানে উল্লেখযোগ্য, পুলিনবাবু বন্দুকের ব্যবহারের জন্য প্রচুর রসদ অর্থাৎ কার্তুজ দিয়াছিলেন। তিন দিনের প্রভূত গুলিবর্ষণেও বিপ্লবীদের গুলি নিঃশেষিত হয় নাই। পরিকল্পনার বিপদ অনুমান করিয়া যে ভাবে অস্ত্র ও গুলি সরবরাহ আবশ্যক তাহা দেওয়া হইয়াছিল। যাহাই হউক, পরামর্শ হইল শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করিব। এরপর যদি কেহ বাঁচি এবং ধরা পড়ি, বলিব, "আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য, দেশের দরিদ্রের উপকারের জন্য ধনীর সঞ্চিত ধন গ্রহণ করিয়াছি।" বাহ্রা ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বর্তমানে এক আইন পরিষদের সদস্য—এই প্রসঙ্গে বলেন:—"ঐ নৌকাতেই প্রথম আমি সোশ্যালিজম্ শব্দটি শুনি। তবে তখন মার্ক্স্-এর সোশ্যালিজমের কথা আমাদের কানে আসে নাই। তাহার ধারণা করি নাই; সোশ্যালিজম্ বলিতে সেই সময় ঐ নৌকায় রবিনহুডের ধনসাম্যের কথাই আমরা বুঝিয়াছি। সোশ্যালিজম্ শব্দটি বাহ্রা ডাকাতির নৌকায় মরণ-সম্ভাবনার সময়ে প্রথম শুনি।"

পুলিন বাবুর মন্ত্রগুপ্তি-সাধনা এবং উহার প্রতিপালনের ব্যবস্থা ছিল অনেকটা আদর্শস্থানীয়। সমিতির কর্মীরাও সেইভাবে গড়িয়া ওঠেন। এই বাহ্রা ডাকাতি যে কাহারা করিয়াছে পুলিশ তাহা জানিতেই পারে নাই। ইহা যে ঢাকা দলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাই তাহারা বহুকাল পর্যন্ত জানিতে পারে নাই। পূর্ববঙ্গের সুযোগ্য পুলিশ কর্মচারী চন্দ্রকান্ত দাস ডাকাতির তদন্ত করিয়া কার্তিক দত্ত ও অন্যান্যদের চালান দেয়। কিন্তু পরে ইহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়। বাহ্রা ডাকাতির কোন কর্মীই ধৃত হয় নাই।

ট্যাক্সি ডাকাতি—গার্ডেনরীচ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে—বিপ্লবকার্যের বিবিধ প্রয়োজনে অর্থের অভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হওয়ায় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী গার্ডেনরীচ ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। সাউথ ইণ্ডিয়া জুটমিলের কুলিদিগকে বেতন ও বোনাস দিবার জন্য কোম্পানীর হেড্ অফিস হইতে কোম্পানীর সরকার এবং দুইজন দারোয়ান একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া ১৮০০০৲ টাকা লইয়া বদরতলা অভিমুখে রওনা হয়। ১৯১৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী। বিপ্লবীগণ টাকা লইয়া গাড়ী কখন রওনা হইবে এই সংবাদ পূর্বাহ্লেই সংগ্রহ করে। তদনুযায়ী হিসাব করিয়া হাওড়া ষ্টেশনে যায়। সেখানে পাঞ্জাবী ড্রাইভারের ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশন হইয়া অনুমান দিবা আড়াইটার সময় গার্ডেনরীচ সার্কুলার রোড ও গার্ডেনরীচ রোডের মোড়ে উপস্থিত হয়। ১৮০০০৲ টাকা সমেত যে ঘোড়ার গাড়ী পূর্বেই রওনা হইয়াছিল—সেই গাড়ী কিছুকাল পরেই ঐ স্থানে আসিয়া পৌঁছায়। ট্যাক্সি ঘোড়ার গাড়ীর সম্মুখে আনিয়াই—ট্যাক্সি হইতে বিপ্লবীগণ নামিয়া পড়ে। (এই ডাকাতির স্থান নির্বাচণ ও পরিকল্পনা কলিকাতা দলের বিশিষ্ট কর্মী অতুলকৃষ্ণ ঘোষের; যতীন মুখার্জির সম্মতি ও নির্দেশে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, অতুল ঘোষ, মাদারীপুর দলের চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন, পতিতপাবন ঘোষ প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন বলিয়া জানা যায়।)

ঘোড়ার গাড়ীখানাকে থামিতে 'হুকুম' দিয়াই বিপ্লবীরা আরোহীদের জোর করিয়া নামাইয়া দেয় এবং টাকার তোড়া লইয়া ট্যাক্সিতে আসিয়া উঠে। এই সময়ে রাস্তায় লোক জমায়েত হইলেও—বিপ্লবীগণের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়া কেহ নিকটে আসিতে সাহসী হয় না। কিন্তু এবার সমস্যা হইল ট্যাক্সি চালানো লইয়া। ট্যাক্সির পাঞ্জাবী ড্রাইভার তাহার ট্যাক্সির আরোহীদের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া উহাদের লইয়া ট্যাক্সি চালাইতে কিছুতেই রাজী হইল না। বিপ্লবীগণ আর কালবিলম্ব করা বিপজ্জনক মনে করিয়া ড্রাইভারকে ভীষণভাবে প্রহার করে এবং ট্যাক্সি হইতে ফেলিয়া দেয়। এইবার মাদারীপুরের পতিতপাবন ঘোষ উক্ত ট্যাক্সি চালাইয়া দ্রুত গতিতে বারুইপুর চলিয়া আসে। বারুইপুর গিয়া আর এক বিপদ। ট্যাক্সির টায়ার ফাটিয়া গেল। তাহারা তখন সেখানকার জনৈক লোকের জিম্মায় ট্যাক্সি রাখিয়া (টায়ার লইয়া আসিতেছি বলিয়া) ঘোড়ার গাড়ী করিয়া জয়নগর আসে। পরে উত্তর ভাগ আসিয়া নৌকা করিয়া টাকী আসে। ইতিমধ্যে দুইটি ট্রাঙ্ক ক্রয় করা হইয়াছিল এবং টাকাগুলি উহাতে স্থান পাইয়াছিল। হাসনাবাদে আসিয়া বিপ্লবীরা ছোট মার্টিন লাইনে পাতিপুকুর আসিয়া নামে। সেখানে নামিয়া ঘোড়ার গাড়ী করিয়া ২০ নম্বর ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটে—তখনকার অন্যতম বিপ্লবী আড্ডায় উপস্থিত হয়। এই খানেই পরে রাধাচরণ ধৃত হয়। পাঞ্জাবী ড্রাইভারের নিকট হইতে পুলিশ তাহার ট্যাক্সির নম্বর পায়। সংবাদপত্রে ট্যাক্সির নম্বর দিয়া (A34) বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। বারুইপুরের যে লোকের জিম্মায় ট্যাক্সি ছিল তিনি সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেখিয়া প্রমাদ গণেন এবং পুলিশে সংবাদ দেন। এবার পুলিশ বিভিন্ন সূত্র ধরিয়া খোঁজ করিতে করিতে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান লইয়া একেবারে ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটে হাজির হয়। গাড়োয়ানকেই পুলিশ নির্দেশ দেয় 'বাবুদের' ডাকিতে। গাড়োয়ান ডাকাডাকি আরম্ভ করিলে রাধাচরণ পরামাণিক যে-ই জানালা দিয়া দেখিবার জন্য মুখ বাড়াইয়াছে অমনি গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া উঠে, 'ঐ বাবু ঐ বাবু'। এই ডাকাতিতে পতিতপাবন ও রাধারমণের ৭ বৎসর কারাদণ্ড হয়। রাধারমণ ও হীরালাল বিশ্বাসের অস্ত্র আইনেও দুই বৎসর কারাদণ্ড হয়। ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটের বাড়ীতে পুলিশ রিভলবার পায়। এই ডাকাতি সম্পর্কে অতুল ঘোষ ও নরেন্দ্র ভট্টাচার্য ধৃত হইয়া কি ভাবে মুক্ত হন স্থানান্তরে তাহা লিপিবদ্ধ হইল।

এই ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইবার (১৯১৫, ১২ই ফেব্রুয়ারী) কিছুদিন পরেই, ১৯১৫,২২শে ফেব্রুয়ারী বেলেঘাটার এই দলের দ্বারাই জনৈক ধনী ব্যবসায়ীর গদীর ৩২ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। এই বেলেঘাটা ডাকাতিতেও ট্যাক্সি ব্যবহৃত হইয়াছিল। ট্যাক্সি-চালক ডাকাতির পরে ট্যাক্সি চালাইতে অসম্মত হওয়ায় বিপ্লবীগণ তাহাকে ঐখানেই হত্যা করিয়া ট্যাক্সি লইয়া উধাও হয়। ডাকাতির অর্থ—স্বতন্ত্র পথে লইয়া যাওয়া হয়।

খুনের কথা

বিপ্লববাদীরা ১৯১৪ সালের শেষ ভাগ হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইতেই—কি ভাবে অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভারতব্যাপী রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করে তাহা বলিবার পূর্বে আমরা তাহাদের ডাকাতির কথা কিছু বলিলাম। এবার রাজনৈতিক খুনের কথাও কিছু বলিব।

বিপ্লববাদীদের যাহারা ক্ষতি করিয়াছে, তাহাদের পিছন তাহারা সহজে ছাড়ে নাই। ১৯০৮ সালের ৯ই নভেম্বর কলিকাতা সার্পেন্‌টাইন্‌ লেনে নন্দলাল ব্যানার্জিকে বিপ্লবীরা হত্যা করে। নন্দলাল প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেফ্‌তার করিয়াছিল। ১৯০৮ সালের জের ১৯১২-১৪ সাল পর্যন্ত গড়াইয়াছে। কোন কোন পুলিশ কর্মচারী বলিয়াছেন, এই দলের খাতায় নাম উঠিলে, একদিন না একদিন চিত্রগুপ্তের খাতায় আর একটি অংক বসাইয়া দিবে। ব্যক্তিগত প্রতি-হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে না হউক, সমষ্টিগত হিসাবে এই সমস্ত খুনের মধ্যে কতকটা প্রতিশোধ বাসনা চরিতার্থ করিবার ভাব যে ছিল না—একথা জোর করিয়া বলা যায় না। যে সমস্ত লোক বিপ্লববাদীদের অনেক ক্ষতি করিয়াছে, যাহারা, বিপ্লববাদীদের মতে, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তাহাদের শাস্তি দিবার একটা প্রবৃত্তি বিপ্লববাদীদের মধ্যে প্রবলভাবে দেখা দিত। আত্মরক্ষার জন্যও বটে, ইহারা বাঁচিয়া না থাকিলে আর ক্ষতি করিতে পারিবে না এই জন্যও বটে, আবার কঠোর শাস্তি দিয়া একটা আতংক সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেও বটে, বিপ্লববাদীরা একার্যে হস্তক্ষেপ করিত। ব্যক্তিগত হিসাবে কোন বিপ্লববাদী

কোন শত্রুর উপরে এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে পারে নাই। দলের হিসাবে গ্রাহ্য না হইলে ব্যক্তির কথা উঠানো সম্ভব ছিল না। 'আমাকে অমুক পুলিশ কর্মচারী কষ্ট দিয়াছে সুতরাং একটা কিছু করিতে হইবে' একথা বলার প্রবৃত্তি বা সাহস কাহারো ছিল না।

'সমুচিত শিক্ষা' দেওয়ার ভাব হইতে অনেক সময় তাহারা এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছে। 'এতটা ক্ষতি করিয়া সরিয়া গেল, বিপ্লববাদীরা কিছু করিতে পারিল না'—এইরূপ কথা দেশে প্রচারিত না হয়, বিপ্লববাদীদের সেদিকে তীব্র-দৃষ্টি থাকিত। তাহারা মনে করিত, যেমন একদল দেশবাসীকে দেশাত্মবোধের আদর্শে দলে রাখিতে হইবে, তেমনই অন্য একদল লোককে, ভয় দেখাইয়া দলের বিরুদ্ধে যাহাতে তাহারা না যায় সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। একদল যে সরকারের সহায়তা করিবেই তাহা তাহারা জানিত, তবে এইরকম ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থায় অনেকে, ইচ্ছা থাকিলেও, সরকারের সাহায্য করিবে না—ইহা তাহারা মনে করিত। তাহাদের এইরূপ প্রচেষ্টায় সরকার লোক পান নাই, তাহা নহে, তবে অনেক ক্ষেত্রে সরকারকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে। সাধারণ লোক যেমন সরকারকে ঘাঁটাইতে চাহে নাই, বিপ্লববাদীদেরও তেমনই ঘাঁটাইতে চাহে নাই। কারণ জাতি হিসাবে আমরা কতকটা শান্তিপ্রিয়—ঝামেলায় যাইতে চাহিনা—সুতরাং যেদিক হইতেই হউক, ভয়ের কারণ থাকিলে, আমরা ভালমানুষের মত চুপ করিয়া থাকি। দলের ক্ষতি করিয়া কেহ বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে, ইহা যেন বিপ্লববাদীরা তাহাদের কলঙ্ক বলিয়াই মনে করিত। তাই দেখা যায়, এই বিষয়ে তাহারা দলের গণ্ডি ছাড়িয়া গিয়াছে। কোন এক ব্যক্তি ভিন্ন একটি দলের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে, অথচ তাহার কিছুই এখনও হইল না, ইহার প্রতিকারের জন্যই অপর দল সেই ব্যক্তিকে নিঃশেষ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। আট বছর পূর্বে যে ব্যক্তি ক্ষতি করিয়াছিল, যে ব্যক্তি হয়তো এখন আর বিশেষ কোনও ক্ষতিও করে না, তাহারও নিস্তার নাই; তাহাকেও শাস্তি দিতে হইবে, কারণ, তাহা হইলেই সাধারণ লোক বিরুদ্ধে যাইতে ভয় পাইবে, ইহাই ছিল তাহাদের ভাব। বিপ্লববাদীদের এই ব্যবস্থায়, পরিণামে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টিরই সহায়তা করিয়াছিল, কিন্তু সরকারের লোকের অভাব হয় নাই,—বিপ্লববাদীরা সেকথা নিশ্চিতই বুঝিয়াছিল। রাষ্ট্র-শক্তিকে পরিবর্তিত করিবার পক্ষে ইহা যে মোটেই কার্যকারী নহে তাহা বুঝিতে তাহাদের বেশী দেরী হয় নাই।

এই 'শাস্তি' দেওয়া সম্বন্ধে একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, এই যে খুন, ইহাকেই বিপ্লববাদীরা মনে করিত, তাহারা অপরাধী শত্রুর উপর শাস্তিবিধান করিতেছে। সময় সময় এই প্রশ্ন উঠিয়াছে,—যাহারা দলের ক্ষতি করে তাহাদের সকলের অপরাধই সমান নহে, কিন্তু তাহাদের উপরও এই একই ব্যবস্থা কেন? বিপ্লববাদীদের ক্ষতির দিকটা বিবেচনা করিলে, মিঃ গর্ডন হয়ত কোনই ক্ষতি করে নাই। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা হয় কেন? পুলিশ কর্মচারী বা অপর কোন ব্যক্তিও এই হিসাবে কেহ কম, কেহ বেশী ক্ষতি করিয়াছে। কিন্তু শাস্তির ব্যবস্থা ঐ এক। জীবনে না মারিয়া, দলের ক্ষতির অনুপাতে অন্যবিধ, তথা লঘু-গুরু ব্যবস্থা যে তাহারা করিতে পারে নাই, তাহাও বিপ্লববাদীরা তলাইয়া দেখিয়াছে। যে রকম সুসম্বদ্ধ বিরাট শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান থাকিলে, ছোট বড় নানাপ্রকার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা বিপ্লববাদীদের ছিল না। তাহাদের পক্ষে শত্রুকে মারিয়া ফেলা সোজা, কিন্তু দুই ঘা মারিয়া ছাড়িয়া দেওয়া ভয়ের কারণ। যতীন্দ্রনাথ নীরদ হালদারকে প্রাণে মারেন নাই, তাহার ফলে নীরদের সূত্র ধরিয়া পুলিশ যতীন্দ্রনাথেরই সংবাদ বাহির করিতে সক্ষম হয়।

১৯০৮-০৯ সালে যে ব্যক্তি কোন এক মামলায় পুলিশের সাহায্য করিয়াছিল, তাহাকে মারিয়া ফেলিবার ইচ্ছা বিপ্লববাদীদের ১৯১৪ সাল পর্যন্তও সমভাবেই ছিল। এতদিন পুলিশের নানা সাহায্যে সে ব্যক্তি কতকটা নির্ভয়ে ছিল। সে যাহাদের ক্ষতি করিয়াছে তাহারা প্রায় সকলেই এখন জেলে, কেহ বা পরলোকে—তাহাকে ঠিক চিনিবার লোকও হয়ত বেশী নাই। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি কতকটা নিশ্চিন্তই; কিন্তু বিপ্লববাদীরা নিশ্চিন্ত নহে—চট্টগ্রামে তাহার সন্ধান পাইয়াছে। তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া আর একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতে বিপ্লববাদীদের প্রচেষ্টা চলিল। Sedition Committe Report হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—"The murder in Chittagong was effected in public street, the victim was one who was suspected of giving information to an officer of the Criminal Investigation Department. A person who narrowly escaped murder and was in company of the victim had been a witness in the Dacca Conspiracy Case."—অর্থাৎ চট্টগ্রামে প্রকাশ্য

রাজপথেই হত্যা করা হয়। যাহাকে হত্যা করা হয়, সে পুলিশে সংবাদ দেয় বলিয়া বিপ্লববাদীদের সন্দেহ উদ্রেক করে। এই মৃত ব্যক্তির সংগের অপর ব্যক্তি মৃত্যু এড়ায়—এই ব্যক্তি ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল। এই গুপ্তচরদ্বয়ই (নগেন্দ্র-হেমেন্দ্র ব্রাদার্স) ঢাকা যাইবার জন্য নৌকা আনে, পরে পুলিশে মিথ্যা সংবাদ দিয়া তিনজন বিপ্লবী যুবককে নৌকার মধ্যে গ্রেফ্‌তার করায়। ডাকাতি উদ্দেশ্যে নৌকাচুরির মিথ্যা মামলায় ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর ১৯০৮ সালে প্রথম কারাদণ্ড হয়। চট্টগ্রামে নগেন্দ্র আক্রান্ত হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয় সাত বৎসর পরেও বিপ্লবীদের দৃষ্টিতে অপরাধীর দণ্ডদান ব্যবস্থা বাতিল হয় নাই।

অন্যত্র Sedition Committee Reportএ আছে—

"Deputy Superintendent Basanta Chatterji was murdered in the year 1916 in broad daylight in Calcutta." অর্থাৎ ১৯১৬ সালে ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বসন্ত চাটার্জিকে কলিকাতায় দিনে দুপুরে হত্যা করা হয়।

পুলিশের এই সুযোগ্য কর্মচারীকে বিপ্লববাদীরা ১৯১৬ সালে কলিকাতার রাজপথে পিস্তলের গুলিতে খুন করিয়াছে। কিন্তু এই তাহাদের প্রথম চেষ্টা নহে। রামদাস গোড়ায় বিপ্লববাদী ছিল, পরে বসন্তবাবুর সহায়তা করিয়া বিপ্লবীদলের ধ্বংসকার্যে লিপ্ত হয়। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে রামদাসকে ঢাকার জনাকীর্ণ করোনেশন পার্কের (বাক্‌ল্যাণ্ডবাণ্ডে) মারিয়া ফেলা হয়। বসন্তবাবুও সেখানে ছিলেন, কিন্তু সে যাত্রা তিনি রক্ষা পান কারণ বিপ্লবীরা সেদিন তাঁহাকে চিনে নাই। ঠিক এই বৎসরই নভেম্বর মাসে বিপ্লববাদীরা বোমা পিস্তলে সুসজ্জিত হইয়া বসন্তবাবুর কলিকাতার মুসলমানপাড়া লেনের বাড়ী আক্রমণ করে। পরিকল্পনা ছিল—প্রথম ব্যাচ্ বসন্তবাবুর বৈঠকখানায় বোমা নিক্ষেপ করিলে সংবাদ পাইয়াই টেগার্ট লোম্যান প্রভৃতি আসিবে, তখন নির্দিষ্ট দ্বিতীয় ব্যাচ্ টেগার্টাদির নিধনে অগ্রসর হইবে। নগেন্দ্র ও কালী আহত হওয়ায় দ্বিতীয় অংশ পরিত্যক্ত হয়।

১৯১৩-১৪ সাল হইতেই বিপ্লববাদীদেরর কর্মপ্রচেষ্টা অধিকতর উগ্র হইয়া উঠিতেছিল। সে কর্মপ্রচেষ্টা যেমন দুঃসাহসিক তেমনি ভয়ংকর ছিল। একটা ঘটনা Sedition Committee Reportএর ভাষায় দিতেছি—

"During 1913 the revolutionaries continued their activities with increased ferocity. Two police officers were murdered. On the evening of Sept. 29th Head Constable Haripada Deb was shot dead by three young Bengalis on the edge of the lake in College Square, Calcutta......The Head Constable was assassinated in the middle of the throng, his assailants disappeared into the crowd, no arrest was made and no evidence was forthcoming. The murdered officer had succeeded in getting into touch with a revolutionary section and it is clear that they had seen through him and decided to put him out of the way."

ইহার মর্ম—"১৯১৩ সালে বিপ্লববাদীদের কার্য অত্যন্ত ভীষণ ভাবে চলিতে থাকে। দুইজন পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করা হয়। হেড্ কনষ্টেবল হরিপদ দেবকে তিনজন বাঙালী যুবক কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারের জনাকীর্ণ স্থানে ২৯এ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় গুলি করিয়া মারে এবং হত্যাকারীরা জনতার মধ্যে মিশিয়া যায়। এই সম্পর্কে কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না, কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় না। মৃত পুলিশ কর্মচারীটি বিপ্লবীদের এক দলের সন্ধান পাইয়াছিল (এই দল বলিতে ঢাকা অনুশীলনকে বুঝাইতেছে)—বিপ্লবীরা ইহা টের পাইয়াই যে তাহাকে মারিয়া ফেলে ইহাতে সন্দেহ নাই।"—কিন্তু আসলে ঐ দিন ইন্‌স্পেক্টর নৃপেন ঘোষকেই বিপ্লববাদীরা আক্রমণ করিতে চাহিয়াছিল। হরিপদ নৃপেনের সহকারী ছিল।

এই ঘটনার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাংলার অপর প্রান্তে "...... a picric acid bomb was thrown into the house of Inspector Bankim Chandra Chaudhury in Mymensingh town. He was instantly killed. The Inspector had been a prominent worker against the Dacca Anusilan Samiti at the time of the Dacca conspiracy case and there is no doubt that the Samiti brought about his death."

অর্থাৎ পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্‌টর বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরীর ময়মনসিংহের বাসায় একটি পিক্‌রিক্ এসিড বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে ইন্‌স্‌পেক্‌টর তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই পুলিশ কর্মচারীটি ঢাকা অনুশীলন সমিতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলার সময়ে বিশেষভাবে কার্য করিয়াছিলেন। এই সমিতিই যে তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই।—

ইন্‌স্‌পেক্‌টর সুরেশচন্দ্র মুখার্জির মৃত্যু সম্বন্ধে Sedition Committe লিখিয়াছেন—

" ....in Cornwallis Street, Inspector Sureshchandra Mukherji, while on duty, noticed an absconding anarchist in the street and approached to arrest him, when he was fired at by the anarchist..... The Inspector was killed."

ইহার মর্ম:—কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্‌টর সুরেশচন্দ্র মুখার্জি একজন ফেরারী বিপ্লবীকে দেখিতে পাইয়া যেই তাহাকে গ্রেফ্‌তার করিতে অগ্রসর হয়—অমনি উক্ত এনার্কিষ্ট তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়ে—ইন্‌স্‌পেক্‌টর মৃত্যুমুখে পতিত হয়।—মাদারীপুর দলের চিত্তপ্রিয় দ্বারা ইহা অনুষ্ঠিত হয়।

সি. আই. ডি. কর্মচারী মধুসূদন ভট্টাচার্যকেও মেডিক্যাল কলেজের গেটের সামনে দিবালোকে, বহুলোকের সমক্ষে মারিয়া ফেলা হয়। এই সম্পর্কে বরিশাল হইতে ১৯১৫ সালে আগত দলের নেতাকে মসার পিস্তল সমেত পরে গ্রেফ্‌তার করা হয়। এইরূপ অনেক দুঃসাহসিক খুন একপ্রকার প্রকাশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

১৯১৫ সালের ২১শে অক্টোবর পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্‌টর সতীশচন্দ্র ব্যানার্জিকে হত্যা করার জন্য তাঁহার মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বিপ্লবীরা আক্রমণ চালায়। সতীশ ব্যানার্জি নীচের তলার কোঠায় আরো তিনজন পুলিশ সাবইন্‌স্‌পেক্‌টরের সংগে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় খোলা দরজা দিয়া ঢুকিয়াই একজন বিপ্লবী গুলি চালায়। পুলিশ ভয়ে আঙিনায় দৌড়াইয়া যায়। তখন আরো তিনজন বিপ্লবী পূর্বোক্ত বিপ্লবীর সংগে মিলিত হইয়া আঙিনায় নামিয়া গুলি করিতে থাকে, পুলিশের কর্মচারীগণ সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া পলাইতে চেষ্টা করে—

আক্রমণকারীরা সিঁড়ির কয়েক পা উঠিয়াও গুলি চালায়। যদিও আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য সতীশ ব্যানার্জি বাঁচিয়া যান, কিন্তু অপর একজন সাবইন্‌স্‌পেক্‌টর নিহত হন—এবং একজন পায়ে ও হাতে গুলি বিদ্ধ হন।

অপরদিকে বাংলারই এক প্রান্ত সীমায় সিলেটে সিভিলিয়ান মিঃ গর্ডনের উদ্দেশ্যে বোমা ও পিস্তলে সুসজ্জিত হইয়া মিঃ গর্ডনেরই বাগানে বিপ্লববাদীরা উপস্থিত হইয়াছিল। মিঃ গর্ডনের আয়ু ছিল—বাঁচিয়া গেলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে বিপ্লববাদীদেরই একজন মৃত্যুকে আলিংগন করিল। কেমন করিয়া (বসিতে কি উঠিতে) বোমা হঠাৎ ফাটিয়া গেল। মিঃ গর্ডনের বাড়ীতেই একজনের শবদেহ পড়িয়া রহিল। তাহার পকেটের গুলিভরা পিস্তলও পুলিশের হস্তগত হইল। যোগেন্দ্র চক্রবর্তী মারা গেল। অপর দুইজন আহত (তারাপ্রসন্ন বল ও অমৃত সরকার) বিপ্লবীকে স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মী লালমোহন দে সংগোপনে সিলেট হইতে নৌকাপথে ঢাকায় নির্বিঘ্নে লইয়া আসে। অতিশয় গোপনে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়।

অরুণাচল আশ্রমের হাংগামায় মিঃ গর্ডন সংযুক্ত ছিলেন। শ্রীহট্টে অরুণাচল আশ্রমের সংগে তথাকার ইংরাজ সিভিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও অন্যান্যের সংঘর্ষ হয়। আশ্রমের সাধু সন্ন্যাসীর উপর অত্যাচার চলে। বিপ্লববাদীদের সংগে সাক্ষাৎ সম্পর্কে মিঃ গর্ডনের কোনও বিরোধ ছিল না। তবে বিপ্লববাদীরা এমনই ধারার আরও দুই একটা কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, দেশের লোকের সহানুভূতি লাভ করা, এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবার লোক যে দেশে আছে তাহা দেশবাসীকে জানাইয়া দেওয়া।

এইখানে একটা কথা অপ্রাসংগিক হইলেও বলিয়া রাখি। যাহারা তাহাদের ক্ষতি করিয়াছে, তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছে, শত্রু মনে করিয়া বিপ্লববাদীরা যাহাদের একেবারে মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে তাহাদের মধ্যে ইংরেজও ছিল, দেশীয় লোকও ছিল। কিন্তু ইংরাজের বেলায় প্রায় কোন প্রচেষ্টাই সফল হয় নাই। আশ্চর্য রকমেই তাহারা বাঁচিয়া গিয়াছে। দেশীয় অনেকেই কিন্তু মারা গিয়াছে। ইংরেজদের মধ্যে এক ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ এলেনের বুকে গুলি লাগিয়াছিল—কিন্তু তিনিও বাঁচিয়া গিয়াছেন। মজঃফরপুরে যাহাকে মারিতে ইচ্ছা ছিল সে তো মরিলই না, মরিল এমন দুইটি প্রাণী, যাহাদের জন্য

বিপ্লববাদীরাও কেবল দুঃখই করিয়াছে। মিঃ গর্ডনকে একবার সিলেটে, একবার বাংলার বাহিরে মারার চেষ্টা হয়, কিন্তু চেষ্টা সফল হয় নাই। সিলেটে বিপ্লববাদীরাই আশ্চর্য্যরকমে প্রাণ দিয়াছে। সেখানে সেদিন আরও একজন জবরদস্ত সাহেব নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবেন, কথা ছিল। তারপর ছোটলাট, বড়লাট (লর্ড হার্ডিঞ্জ আহত হন) প্রভৃতির উপর যে চেষ্টা হয় তাহাও এই ভাবেই বিফল হইয়াছে। আরও কয়েকক্ষেত্রে এরকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। বিপ্লববাদীরা এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। যাহাদের কোন প্রকারের কুসংস্কার ছিল, তাহারা এমনও বলিয়াছে—ভগবান যেন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতেছেন, ওরা বিদেশী, ওরা ওদের সাম্রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করিবে, ওদের দোষ কি? অবশ্য পরবর্ত্তী কালে—১৯৩০ হইতে '৩৩ সালে—কতকগুলি শ্বেতাংগ রাজকর্মচারী বিপ্লবীদের হস্তে নিহত হন। যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে।

খুন সম্পর্কে আর একটা কথা বলা দরকার; বিপ্লবসংস্থাকে রক্ষা করিবার জন্য, বিপ্লবীরা অধিকতর সতর্ক হইবার প্রয়োজন বোধ করে। কোন্ দিক হইতে কোন্ বিপদ আসে সেইসকল চিন্তা করিয়া ক্রমেই তাহারা কর্ম্মবিভাগ করিয়া দিয়াছিল। বিপ্লববাদীদের জংগী বিভাগ (Violence Department) হইতে লোক নিযুক্ত হইয়া কোনও লোককে খুন করিতে হয়ত নিযুক্ত হইল। কিন্তু খুন করিবার হুকুম লইতে হইত পরিচালক বিভাগ হইতে। পরিচালকেরা হুকুম দিয়াই সরিয়া থাকিত—যাহাতে ধরা না পড়ে। কারণ পরিচালকেরা ধরা পড়িলে দলের ক্ষতি হইত বেশী। পরলোকগত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের খুন-ব্যাপারে সিডিশন কমিটি রিপোর্টে লিখিতেছে যে, পাঁচজন ব্যক্তি মসার পিস্তল ও রিভলভারে সুসজ্জিত হইয়া……"led by the chief of the Violence Department, carried out their attack on their victim under the orders of the three organisers who, in accordance with the rules of the Society, withdrew themselves before the actual commission of the crime, in order that the society might not be crippled by their arrest." এই হত্যাকাণ্ড ঢাকা সমিতির লোকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে মসার পিস্তল ব্যবহৃত হইতে দেখা যাইতেছে। মসার পিস্তল কলিকাতার একটি দল কর্তৃক

(রডা আর্মস্ কেস্) অপহৃত হয়। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে—পিস্তলগুলি বিভিন্ন দলে বণ্টিত হইয়াছিল অথবা অস্ত্রের লেনদেনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তবে অন্ততঃ একটা মসার পিস্তল পূর্বেই অনুশীলনের ছিল দেখা যায়। কারণ ইহার পূর্বেই কুমিল্লার একটা ব্যাপারে আদালতে মসার পিস্তলের উল্লেখ করা হইয়াছে।

সংস্থা বিস্তার

যাহাই হউক, বাংলার বিপ্লববাদীদের অরগ্যানিজেসনও এ সময়ে—১৯১০ হইতে ১৯১৪ সালের মধ্যে—অনেকটা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বাংলার নানা দিকে দলের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা চলিল। অস্ত্র অভ্যাসের প্রয়োজন হওয়ায় সেদিকেও সুবন্দোবস্ত হইল। অস্ত্রনির্মাণের চেষ্টাও চলিল।

Sedition Committee লিখিয়াছেন :—"The members of the Anusilan Samity had two farms (Belonia and Udaipur) at Hill Tipperah. The farms were ostensibly agricultural ventures, but really places for the furtherance of the revolutionary organisation. The members of the Samity used to practise shooting in these farms." অর্থাৎ সমিতির (অনুশীলন) লোকেরা পার্বত্য ত্রিপুরায় বেলোনিয়া এবং উদয়পুরে দুইটি কৃষিক্ষেত্র করিয়াছিল। 'ফার্ম বাহ্যতঃ কৃষিক্ষেত্রই ছিল কিন্তু আসলে বিপ্লববাদীরা এখানে অস্ত্রচালনা শিক্ষা করিত।' এখানে বিপ্লবী শুধু অস্ত্রচালনাই শিক্ষা করিত না; কঠোর পরিশ্রম, সামরিক নিয়মানুবর্তিতায় জীবন গঠন করিত। প্রত্যেককেই সর্বপ্রথম ৪৫ মাইল পায়ে হাঁটিয়া গিয়া ফার্মে থাকিবার যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হইত। দিনমানে কর্মিগণ কুলি মজুর রূপেই থাকিত; লাঙ্গল ও কাস্তে স্বহস্তে চালাইতে হইত। ইক্ষু ও ধান চাষ হইত। রাত্রিতে দূরবর্তী পাহাড়ে গিয়া অস্ত্র চালনা অভ্যাস করিতে হইত।

বাংলার বাহিরেও বাংলার বিপ্লববাদীরা ১৯১০ সাল হইতে তাহাদের কর্মক্ষেত্র বিস্তার করিয়াছিল। ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত

বিপ্লবসংস্থার বিস্তারের প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছিল। বোমা তৈয়ারীর বিশেষ বিশেষ প্রণালী আছে। বিশেষ একটা প্রণালী অনুসরণ করিয়া বাংলার কোনও একস্থানে যে ধরণের বোমা তৈয়ারী হইত—তাহা ঐ স্থানের সহিত [illegible] হইয়া অন্যত্র তৈয়ারী হওয়ার সম্ভাবনা তেমন ছিল না। গবর্ণমেণ্টের বিশেষজ্ঞদের মতে মোটের উপর তিন প্রকার বোমা এদেশে ব্যবহৃত হইয়াছে। পুণাতে এবং আলিপুরের বাগানে একই রকমের বোমার 'ফরমুলা' পাওয়া গিয়াছিল। রাজাবাজার বোমার মামলায় জানা যায়—আসামী ঢাকা সমিতির অমৃত হাজরা, দীনেশ দাশগুপ্ত, খগেন চৌধুরী—যে বোমার নমুনা রাজাবাজারে মিলিয়াছে, সেই বিশেষ প্রণালীর বোমাই আরও কয়েক স্থানে দৃষ্ট হইয়াছে। এই একই প্রকারের বিশিষ্টতাযুক্ত বোমা লাহোরে দৃষ্ট হইয়াছে, দিল্লীতে বড়লাটের উপর এবং সিলেটে মিঃ গর্ডনের বাগানে ফাটিয়াছে। ময়মনসিংহে পুলিশ ইনসপেক্টর খুনে ও মেদিনীপুরে সর্দার সেখ সমিরের বাগান-বাড়ীতে এই রকমের বোমা ফাটিয়াছে। এই ধরণের বোমা চন্দননগরে তৈয়ারী হইত। কলিকাতা রাজাবাজারে ঢাকা সমিতির অমৃত হাজরার কামরায় টিনের কৌটা পাওয়া যায়। তাহাই বোমার খোলরূপে ব্যবহৃত হইত। এই শক্তিশালী বোমা—বিনা লেবরেটরীতে, অতি সহজে তৈয়ারী হইতে পারিত। বাংলার বিপ্লববাদীরা যে উত্তর ভারতের বিপ্লববাদীদের সংগে যুক্ত ছিল তাহা এই বোমার আদান-প্রদান ব্যাপারেও সম্যক বুঝা যায়। তাহার পর বিপ্লব-সংঘের বিস্তৃতি ও বাঙালী সংস্থার সহিত যোগাযোগ হইতেও ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

Sedition Committee বিপ্লববাদীদের Organisation-এর ব্যাপকতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমরা এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি :— "It must not be supposed that the various organisations were necessarily small. The Dacca Anusilan Samity and the bodies which we call the West Bengal and Northern Bengal parties were widely extended and overlapped each other's territory. The Dacca Samity was throughout the whole period the most powerful of these associations. The existence of this body alone, even if there had been

no other, would have constituted a public danger."—অর্থাৎ সবগুলি সমিতিই যে ছোট ছিল তাহা মনে করা ভুল। ঢাকা অনুশীলন সমিতি এবং পশ্চিমবংগে ও উত্তরবংগের দল বলিয়া যাহা বলা হয়, তাহা একে অপরের সীমা অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত হইয়াছিল। বিপ্লবী সমিতির মধ্যে ঢাকা সমিতি বরাবরই খুব শক্তিশালী ছিল। যদি অপর কোন দল নাও থাকিত, এই একটি দলের অস্তিত্বই বিপজ্জনক বলিয়া গণ্য হইতে পারিত।

১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতেই এই সমিতি অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। Sedition Committee এ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"In after years it spread itself over all Bengal and extended its operations to other provinces. While its organisation was most compact in Mymensingh and Dacca, it was active from Dinajpur in the north-west to Chittagong in the south-east and from Cooch-Behar on the north-east to Midnapur on the south-west. Outside Bengal we find its members working in Assam, Bihar, the Punjab, the United Provinces, the Central Provinces and at Poona."—অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে এই ঢাকা অনুশীলন সমিতি সমগ্র বাংলায় বিস্তৃত হয় এবং ইহার কার্যক্ষেত্র অপর প্রদেশে বিস্তার লাভ করে। ময়মনসিংহে ও ঢাকায় এই সমিতি খুব জমাট ছিল। উত্তর-পশ্চিমে দিনাজপুর হইতে দক্ষিণ-পূর্বে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং উত্তর-পূর্ব কুচবিহার হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর পর্যন্ত ইহার কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। বাংলার বাহিরে এই দলের লোক আসাম, বিহার, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও পুণায় কার্য করিতেছিল।

এই তো গেল এক অনুশীলন দলের বিস্তৃতির কথা। ইহা ছাড়া, পশ্চিমবংগের ও কলিকাতার দল ছিল, মাদারীপুরের দল, বরিশালের দল, উত্তরবংগের দল, ময়মনসিংহের দল ছিল। প্রত্যেক দলই কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি করিতেছিল। বাংলার চন্দননগরের দলের সংগে ঢাকার দল (অনুশীলন) সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল—যথাস্থানে বাংলার বিপ্লববাদীদের সংঘের কথা বলা হইবে।

অনেক সময় বিপ্লববাদীদের প্যাম্ফলেট একই নির্দিষ্ট দিনে চট্টগ্রামের প্রান্তভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাবের প্রান্তদেশ পর্যন্ত বিতরিত হইত।

'Liberty' ও 'স্বাধীন ভারত'—অনুশীলনের ইংরাজী ও বাংলা ইস্তাহার। 'যুগান্তর' ইস্তাহার অন্যান্য দল কর্তৃক বাহির হইত। বলা বাহুল্য, গভর্ণমেণ্ট এই বিস্তৃত সংবদ্ধ (connected) সংঘ দেখিয়া ইহার প্রতিকারের সুবন্দোবস্তও সংগে সংগেই করিতেছিলেন। অনেক পুলিশ কর্মচারী এদিকে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শত্রু মনে করিলেও ঐ কৃতিত্বের জন্য বিপ্লববাদীরা তাহাদের বাহবা দিয়াছে। পুলিশের কৃতিত্বের পরিচয় উল্লেখযোগ্য।

পুলিশী তৎপরতা

বাংলার বিপ্লববাদীরা তাহাদের কর্মশক্তি শুধু বাংলায়ই আবদ্ধ রাখে নাই, বাংলার বাহিরেও তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাহাদের শাখা যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতিতেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল একথা বলিয়াছি। পরে ইহার পরিচয় দিব।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার বিপ্লববাদীরা নূতনভাবে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। বাংলার বিভিন্ন দিকে ছোট-বড় বিভিন্ন সমিতি কাজ করিতেছিল। স্বদেশী আন্দোলন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১৪ সাল পর্যন্ত সমস্ত সমিতিই সমান কার্যক্ষমতা দেখায় নাই। বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল বলিয়াই অনেকে তেমন সুযোগ করিয়াও উঠিতে পারে নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বলিয়াও সকলে সমান কাজ করিতে পারে নাই। কিন্তু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজের সংগে জার্মানীর যুদ্ধ বাধিয়া গেল তখন বাংলার অধিকাংশ সমিতিই সম্মিলিত হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। স্থানে স্থানে বিপ্লববাদীদের শলা-পরামর্শ চলিল,—'এবার বড় সুযোগ আসিয়াছে, এ সুযোগ ছাড়িব না।' কেহ কেহ এমন আফশোসও করিলেন, 'যদি পূর্ব হইতে চেষ্টা করিতাম, তবে এ অবসরে নিশ্চিতই অভীষ্ট সিদ্ধ হইত।' এমন একটা সুযোগ এত শীঘ্র আসিবে, একথা যদি নিশ্চিত জানা থাকিত, আর বাংলার বিপ্লববাদীদের সকল সমিতিই যদি সম্মিলিত হইয়া সমানভাবে সেজন্য গোড়া হইতে প্রস্তুত হইতে থাকিত, তবে অবস্থা সঙীন হইয়া উঠিত তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব হইতে লোক-সংগ্রহ এবং সংস্থার ভারতব্যাপী বিস্তার সাধিত হইলে—যুদ্ধ বাধিতে যে সুযোগ আসিয়া পড়ে—তাহা ষোল আনা

গ্রহণ করা যাইত। ১৯১৫ সালে বিপ্লব-চেষ্টা প্রশমিত করিতে ভারত গভর্ণমেণ্টের খুব বেশী বেগ পাইতে হয় নাই, কিন্তু চারিদিকে অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছিল, যে ভাবে অল্পসংখ্যক সৈন্যের হস্তে গভর্ণমেণ্টকে নির্ভর করিয়া থাকিতে হইয়াছিল, ইংরাজ সৈন্য যেভাবে ভারতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, ভারতের সাধারণ লোকের মনোভাব যেভাবে পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছিল, ভুলবশতঃই হউক বা যে কারণেই হউক ইংরাজের শক্তিসামর্থ্য বিষয়ে ভারতবাসীর মনোভাব যে ভাবে বদলাইয়া গিয়াছিল, তাহাতে একথা মনে করা অসংগত নহে যে, বিপ্লববাদীদের চেষ্টা আরও পূর্বে আরম্ভ হইলে, ভারতের বিপ্লববাদীদের দমন করা সহজসাধ্য হইত না। ইহার জন্য ইংরাজকে অনেকখানি বেগ পাইতে হইত। যথাকালে অরগ্যানিজেসন বিস্তৃত না হইলে, যথেষ্ট লোকবল না থাকিলে—সুযোগ আসিলেও সেই সুযোগ সম্যক গ্রহণ করা যায় না।

বলিয়াছি, বাংলার বিপ্লববাদীরা সকলেই ১৯১৪ সাল হইতে নবোৎসাহে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া পড়িল। বন্দুক পিস্তল সংগ্রহের প্রবল চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই সময়ে রডা (Roda) কোম্পানীর পঞ্চাশটি মসার পিস্তল কলিকাতার বিপ্লববাদীদের চেষ্টায় বিপ্লববাদীরা করায়ত্ত করেন। বিপ্লববাদীরা তখন যে-সমস্ত কাজ করিত, তাহার পক্ষে এই পঞ্চাশটি মসার পিস্তল কম নহে। কিন্তু পিস্তলগুলি সবই বিপ্লববাদীরা লুকাইয়া রাখিতে পারিল না। কার্তুজ অনেকগুলিই পুলিশ অল্পদিনের মধ্যে হস্তগত করিয়া ফেলিল, পিস্তলও ধরা পড়িতে লাগিল।

রডার বন্দুক চুরির সংগে সংগে পুলিশের কাজও খুব বাড়িয়া গেল। বিপ্লববাদীরা ইতিপূর্বেই যেরকম বেপরোয়া ভাবে তাহাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া চলিয়াছিল, তাহাতে এই রকম পঞ্চাশটা পিস্তল যদি একসংগে পায় তবে যে একটা শক্ত গোলমাল বাধাইয়া তুলিতে তাহাদের বেশীক্ষণ লাগিবে না, তাহা পুলিশ বুঝিল। ধর-পাকড়ের ধূম পড়িয়া গেল। গুপ্তচরে গুপ্তচরে কলিকাতা, ঢাকা ও অন্যান্য কেন্দ্রগুলি ছাইয়া গেল। কলিকাতায় আমরাও এমনি সময়ে ধৃত হইলাম। গভীর রাত্রিতে কাহাকেও না জাগাইয়াই কলেজ স্কোয়ারের মেস ও প্রেস-বাড়ীতে পুলিশ প্রবেশ করিল। সাহেবদের কথা কানে যাইতেই নিদ্রা ভাঙিল। সেখানে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার ফেরারী সন্ন্যাসী বা সাধু ওরফে শিশিরকুমার গুহের সংগে গ্রেফ্‌তার হইলাম। এই ঘটনা ১৯১৪ সালের

আগষ্ট মাসে ঘটে। এই শিকারে টেগার্ট, লোম্যান, কলসন সাহেব প্রভৃতি ছিলেন। শিশিরকুমার ঢাকা সমিতি হইতে ১৯০৮ সালেই উধাও হইয়া ফেরারী। সন্ন্যাসী যে মেকী এই বিষয়ে টেগার্ট নিঃসন্দেহ। কিন্তু সাধুর 'বৃত্তান্ত' যে কি তাহার কোন ধারণা করিতে পারিতেছিলেন না।

সাধু গৈরিক বসন পরিহিত, মস্তকে উষ্ণীষ। সাধুর কোমরে দড়ি দেখিয়া রাস্তার একজন লোক বলিল, 'শালা সাধু চোর'। সাধু এবং আমি একসংগেই হাঁটিয়া যাইতেছিলাম, সাধু ঐ উক্তি শুনিয়া আমাকে ঠেলিয়া বলিলেন, 'ছিলাম ডাকাত হ'লাম চোর, মান আর থাকে না।' লালবাজারে গিয়া আর সাধুসংগ মিলিল না, সাধু রহিলেন এক ঘরে, আমি আর এক ঘরে। রডার বন্দুক অপহরণ ব্যাপারেও জনকয়েক গ্রেফ্‌তার হইয়া ওখানে আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। রাত্রিতে আমার ঘরে (ঘরে আমি একা ছিলাম) একটি শিক্ষিত মাড়োয়ারী যুবক আসিলেন। তিনি কতক্ষণ পরে আলাপ আরম্ভ করিলেন। তিনি যে 'স্বদেশী' হাংগামায় আসিয়াছেন, তাহাই আমাকে বুঝাইতে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। মাড়োয়ারী বিপ্লববাদী হইয়াছে, একথা সহজে বিশ্বাস করা গেল না। পরে জানিলাম, "রডা-কেসে" তাঁহাকে সন্দেহে গ্রেফ্‌তার করিয়াছে। নির্দোষী বেচারী (প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা) এটর্নী হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন,—মুক্ত হইয়া গেলেন।

আমাদের বিপ্লববাদীদের হাজতবাসে বা জেলবাসে বাপ মা, বা ভাই বন্ধু কেহ বড় একটা খাবার দিয়া যাইত না, ইহাই দস্তুর। মাড়োয়ারীর বাপ মস্ত ধনী, মেলাই খাবার দিয়া গেলেন, সাহেব ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিলেন। পরের দিন বৈকালে মাড়োয়ারী যুবক ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ হইতে যখন ফিরিয়া আসেন, তখন এক মেম-সাহেব নাকি রাস্তায় তাঁহাকে চোর মনে করিয়া সংগী সার্জেন্টকে কি বলিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল। শিক্ষিত ধনী মাড়োয়ারী যুবক তাহাতে সত্যই বড় মনঃক্ষুন্ন হইয়াছিল। আসিয়া একেবারে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন—'কি লজ্জা দেখুন, আমাকে চোর বলিল!' মুখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া, মনে মনে সেকালে বিপ্লববাদীরা যে সমস্ত বিশেষণে দেশবাসী ও পুলিশ কর্তৃক বিশেষিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলাম, আর নিজের মনে নিজে বলিলাম, 'লোকের কথায় কিবা আসে যায়।'

লালবাজারে দুইদিন ছিলাম। খাওয়ার সময় খাইতে গিয়া দেখি, সেখানে

শুধু সাধুই নহে, পরিচিত আরো কয়েকটি গ্রেফ্‌তার হইয়া আসিয়াছে। অনেক দিনের ফেরারী শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গাংগুলীর সংগে ভ্রাতা শ্রীমান্ তারকেশ্বরকেও দেখিলাম, গ্রেফ্‌তার হইয়া আসিয়াছে। বুঝিলাম, 'কেহ না রহিবে বংশে দিতে বাতি'। কালের হাত পড়িয়াছে, নতুবা শুধু পুলিশের চেষ্টায় এতদিনের absconder তো ধরা পড়ে না!

এই ধর-পাকড়ের ব্যাপার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যাহারা ঘর-ছাড়া লোক তাহাদেরও নিষ্কৃতি নাই—অচেনা যাহারা তাহারাও ক্রমে চেনা হইতে লাগিল। এই ঘর-ছাড়াদের মধ্যে মামলার ফেরারী আসামীও ছিল, আর বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া একেবারে নূতন নাম গ্রহণ করিয়া কাজ করিবার লোকও জুটিয়াছিল বিস্তর। ১৯১০ সালের পর বাড়ী-ঘরে থাকিয়া কাজ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। বিপ্লববাদীদের অনেকের পিছনে ১৯১৩-১৪ সালে দশবারো জন পর্যন্ত গুপ্তচর লাগিয়া থাকিত। দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টাই তাহারা ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিত। তবু বিপ্লববাদীরা গুপ্তচরদের ফাঁকি দিয়াই সময় সময় অদৃশ্য হইয়াছে। গুপ্তচর চাক্‌রী বজায় রাখিতে যা-হোক্ একটা রিপোর্ট দিয়া কর্তব্য শেষ করিয়াছে।

এত অনুসরণ করিলে কাজ করা অসম্ভব, সুতরাং ইহারা খুব বেশী কাজ করিতে পারিত না। কিন্তু যাহারা ঘর-ছাড়া তাহারা অনেকটা নিরাপদ। যে দুইচারি জন পুলিশ কর্মচারী তাহাদের চিনিত, তাহাদের চোখ এড়াইয়া চলিতে পারিলেই হইল। অনেকে ১৯০৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১৪ সাল পর্যন্ত আত্মগোপন করিয়া পুলিশের দৃষ্টি সমভাবেই এড়াইয়া চলিয়াছে। অথচ বাংলার প্রত্যেক জেলায়, সবডিভিসনে, অসংখ্য গ্রামে, ইহারা নিয়ত যাতায়াত করিয়াছে। ইহাদের কাহারও নামে হয়ত পুরস্কার ঘোষিত আছে। ষ্টেশনে ষ্টেশনে, নদীর মুখে মুখে তখন সন্দেহ হইলেই তল্লাস করা হইত। ভদ্রযুবক হইলে তো কথাই নাই। এই সমস্ত ঘর-ছাড়া লোকেরা এই বিপদের মধ্য দিয়াই যাতায়াত করিয়াছে; সংগে আবার অনেক সময় অস্ত্র-শস্ত্রও থাকিত। মোট কথা, এ সমস্ত ঘর-ছাড়া বিপ্লববাদীদের—যাহাদের প্রত্যেকেই তখন ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছে, যাহাদের প্রত্যেককেই পুলিশ ধরিতে চাহিতেছে, যাহাদের অনেককে আবার পুলিশ নামে মাত্র জানে কিন্তু আকৃতিতে চেনে না—তাহাদের ধরা, পুলিশের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হইত, যদি না

এই ঘর-ছাড়া লোকদের ঘরের লোকেই তাহাদের ধরাইয়া দিতে সাহায্য করিত। কখনও বা বিপ্লবীদের ভুল-ভ্রান্তি (অনিচ্ছাকৃত) হইতেও পুলিশ কৃতিত্ব দেখাইবার স্থযোগ পাইয়াছে।

বিপ্লববাদীদের ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও তাহাদের এই গোপনতার মধ্যে, এই পলাতক জীবনের মধ্যে যে দুঃখ কষ্ট, ধৈর্য, নিষ্ঠা ও ত্যাগ রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিপ্লববাদীর একদল এমনই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দলের শক্তি-বৃদ্ধির চেষ্টা করিত,—কিন্তু, আবার দেখি, তাহাদেরই কেহ কেহ দুঃখ-কষ্টের ও নির্যাতনের হাত এড়াইতে, বা অন্য কোনও প্রলোভনে পুলিশকে সংবাদ সরবরাহ করিয়াছে। ১৯১৫-১৬ সালের পর হইতে দলের বাঁধুনি কতকটা কমিয়া যায়। তখন কেহ কেহ মনে করে, বিপ্লবের এই শেষ হইল। সবই গিয়াছে, আর কেন, পুলিশের হাত এড়াইতে, জেল হইতে বাঁচিতে, সব, অথবা যতটা না বলিলে নয় বলিয়া দিই। প্রধানতঃ এই সমস্ত কারণে আর অমানুষিক অত্যাচার ও অত্যাচারের ভয়ে, পুলিশের চেষ্টায়ও কতকটা, ফেরারীরাও ধরা পড়িতে লাগিল। অচেনা যাহারা তাহারাও চেনা হইল।

১৯১৪ সালের শেষ ভাগের একটা কথাই বলি। তখন ধর-পাকড় খুব আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত চালকেরা অনেকে তখনও ধরা পড়েন নাই। এদিকে যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে, পুলিশের দৃষ্টি খরতর হইয়াছে।

একদিকে যুদ্ধপরিস্থিতি-জনিত নূতনতর আশা আকাঙ্ক্ষা, একদিকে নূতন নূতন বিপদ, আর একদিকে নব নব দায়িত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়া, এ সমস্ত চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি তখন বিপ্লববাদীদের চিত্ত আলোড়িত করিতেছে।

কলিকাতায় গ্রীয়ার পার্কে এখন যেখানে মহিলা উদ্যান, সেখানে নানা কেন্দ্র হইতে বিশিষ্ট বিপ্লববাদীরা আসিয়া কর্তব্য নির্ধারণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে একত্র হইয়াছে, আরও দুইচারিজনের আসিবার কথা। ইহার মধ্যে আটদশ বছরের ফেরারীও আছে। অনেককে ধরিবার জন্য পুলিশের কর্তারা বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছেন। সেদিন পুলিশেরই সুপ্রভাত। তাহার কারণ পুলিশের কার্য-কুশলতা নহে; তাহার কারণ পূর্বে ধৃত এবং নিপীড়িত বিপ্লববাদীদেরই একজনের বিশ্বাসঘাতকতা। পুলিশ ঠিক খবরই পাইয়াছে। তাহারা সদলবলে, সমস্তটা পার্ক ঘিরিয়া ফেলিল। কোন প্রকারে বিপ্লববাদীরা না পলাইতে পারে, সেই ভাবে আট-ঘাট বাঁধিয়াই আসিল। পার্কে ঢুকিতেই

বিপ্লববাদীরা অবস্থা বুঝিতে পারিল। পুলিশ আগাইতেই কতক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি হইল। হাত খালি, সুতরাং কেবল হাতাহাতিই চলিল। কেহ কেহ রেলিং ডিঙাইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, অসংখ্য পুলিশ কর্মচারী পূর্ব হইতেই সজ্জিত ছিল। শ্রীমান বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পলাইয়া পার্শিবাগান মোড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। সেখান হইতে সে দেখিল, বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা নরেন সেনকে পুলিশ প্রহার করিতেছে। নরেন সেনও যতদূর সম্ভব হাত চালাইতেছে। শ্রীমানের পলায়ন করা হইল না, ফিরিয়া দাঁড়াইল—'মরতে হয় তো সকলে মরিব, একলা বাঁচিব না;' ফিরিয়া আসিল। পুলিশ কর্মচারীরা অগ্রসর হইয়া আসিতেই শ্রীমান বীরেন্দ্র দুইজনের গলা দুই হাতে টিপিয়া ধরিয়াছে—এমন সময় জন কয়েক সাহেব কর্মচারী আসিয়া পৌছিল। লোম্যান সাহেব, ম্যাকলিওর, প্রভৃতি নামজাদা সি, আই, ডি'র কর্তারাও সেদিনকার এই মস্ত শিকার কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। চারিদিক হইতে শ্রীমানকে যখন চাপিয়া ধরিয়া হাতখানা ভাংগিয়া ফেলার যোগাড় করিয়াছে তখন শ্রীমান অগত্যা একটি যুযুৎসুর কৌশলে লোম্যান সাহেবের দক্ষিণ হস্তখানি কিঞ্চিৎ ভাংগিয়া দিল। লোম্যান সাহেব বীরেন সম্পর্কে পরে জেলে আমাদের বলেন: "He is a dangerous man. If he could have arms, he would have killed all of us."

শুধু এই গ্রেফ্‌তারই নহে, ইহার দুইচারি দিনের মধ্যেই আর একজন বিপ্লববাদীকে স্নানের ঘাটে গ্রেফ্‌তার করা হয়। তিনি শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্তী। যক্ষ্মা ও হাঁপানী রোগে ভুগিতেছিলেন। এক সন্ন্যাসীর ব্যবস্থামতে রোজ গংগাস্নান করিতেন। কলিকাতা দলের বিশিষ্ট বিপ্লবী অতুলকৃষ্ণ ঘোষই সাধুর সংগে প্রথম পরিচয় করাইয়া দেন। একজন পুরাতন কর্মী—তখনই তিনি 'ভূতপূর্ব'—দলের সম্পর্কিত ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীকে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতে দেখেন, এবং আলাপে বুঝিয়া লন, যে, গঙ্গাস্নান করিতে ত্রৈলোক্য বাবু রোজই আসেন। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীকে দেখিয়া চিনিতে পারে এমন একজন ঢাকার আই-বি অফিসারই এই সূত্রে সংবাদ পাইয়া স্নানের পথেই বহুকালের ফেরারী ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী বা মহারাজকে গ্রেফ্‌তার করিতে সক্ষম হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতে বিপ্লবপ্রয়াস

(১৯১৪-১৯১৫)

১৯১৪ সালের শেষ ভাগ হইতেই বাংলার বিপ্লববাদীরা আশু সশস্ত্র বিদ্রোহের কল্পনা লইয়া নূতন শক্তিতে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধ তখন বাধিয়া উঠিয়াছে। বিপ্লববাদীরা সত্যই নূতন আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিপ্লবের যোগাড়-যন্ত্র চলিতে লাগিল। বিভিন্ন দলের একত্র হইয়া কাজ করিবার প্রস্তাব উঠিল। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, সমগ্র বাংলার বিপ্লববাদীরা একযোগে কাজ করিতে পারে নাই।

এই সময়টায়-ই বিপ্লববাদীরা আর এক পা অগ্রসর হইয়া গেল। একটা কিছু করিতে পারিবে এই ভরসায় তাহারা এখন কতকটা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইতে উদ্যত হইল। ধরিতে আসিলে শুধু ধরাই দিত না, স্থানে স্থানে খণ্ডযুদ্ধ হইতে লাগিল।

এদিকে বজবজে কোমাগাটা মারুর যাত্রীরা নামিয়া দাংগাহাংগামা করিল। পাঞ্জাবেও ঐ সময়ে অশান্তির শিখা জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিতেছিল। সমগ্র ভারতব্যাপী বিদ্রোহ ঘোষণার চেষ্টা চলিল। বিদেশস্থ বিপ্লববাদীরা সজ্জিত হইল। ইংরাজ এখন নানাদিকে ব্যতিব্যস্ত। ভারতের সৈন্যবল অনেক কমিয়াছে, এখন একটা চেষ্টা করিতেই হইবে। বিপ্লববাদীরা সুযোগের অপেক্ষায় রহিল। বিদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর চেষ্টা চলিল। বিদেশস্থ বিপ্লববাদীরা কেহ কেহ ভারতের দিকে রওনা হইল। জার্মানীর জাহাজ অস্ত্র বহন করিয়া বংগোপসাগরের মুখে পৌছাইয়া দিবে, এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

১৯১৪-১৫ সালে বাঙালী বিপ্লবী সংস্থাগুলির সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা ও অভ্যুত্থানের কথা আলোচনার পূর্বে বাংলা ও ভারতের তদানীন্তন অবস্থা অনু-ধাবন করা আবশ্যক।

চন্দননগরের রাসবিহারী বসু দেরাদুনে থাকার সময় হইতেই উত্তর-ভারতে বিপ্লবীদল গড়িতে সচেষ্ট ছিলেন। সৈন্যদলের মধ্যে কাজ করার দিকেই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। ১৯১২ সালে ঢাকা-অনুশীলনের ফেরারী অমৃত ওরফে

শশাংক হাজরার মাধ্যমে চন্দননগরের দলের সহিত অনুশীলন-সংস্থার সংযোগ সাধিত হয়। সংযোগসাধনে চন্দননগরের শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, মনীন্দ্র নায়েক, রাসবিহারীর বিশেষ অন্তরঙ্গ প্রবর্ত্তক-আচার্য মতিলাল রায় এবং স্বয়ং রাসবিহারী বসুর আগ্রহ এবং অন্যদিকে নরেন সেন, অমৃত হাজরা, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাংগুলি প্রভৃতির ঐকান্তিক বাসনাই পরিশেষে মিলন ঘটায়। অনুশীলনের কলিকাতার রাজাবাজারের কেন্দ্রে তখন রাসবিহারী ও মতিলাল এবং শ্রীশঘোষ নিজেদের সংস্থারূপেই যাওয়া আসা করিতেন। অনুশীলনের কতক কর্মী ইতিপূর্বেই বিহার ও যুক্তপ্রদেশে বিপ্লবীদল গড়ার কার্যে রত ছিল। রাসবিহারীর পরিকল্পনা অনুযায়ী অতঃপর তাহাদের কর্মনীতি নির্ধারিত হইল।

এমনই সময়ে ১৯১৩ সালের প্রথম ভাগে কাশীর শচীন সান্যাল কলিকাতায় আসিয়া অনুশীলনের কর্মীদের সন্ধান করেন। কাশীতে শচীন সান্যাল তথাকার যুবকদের লইয়া একটি বিপ্লবীদল গঠন করেন। উহার নাম রাখেন "অনুশীলন সমিতি"। ইহা ঢাকা অনুশীলন সমিতির শাখা বলিয়া সরকারী বে-সরকারী মহলে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু আসলে শচীন্দ্র নিজেই যুবকদের লইয়া এই সমিতি গঠন করেন। সেই সময় ঢাকা অনুশীলন সমিতিই কর্মক্ষেত্রে জোর কাজ করিয়া চলিয়াছিল। উৎসাহিত করিবার জন্যই অনুশীলনের শাখা রূপে উহার কথা বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু আসলে ঢাকা-সমিতির সহিত গোড়ায় শচীনের এই বেনারস সমিতির সম্পর্ক ছিল না। তবে ঢাকা অনুশীলন সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইলে শচীন তাঁহার সমিতির নাম বদলাইয়া ইয়ংম্যান্স্ এসোশিয়েশন রাখেন। কিন্তু বাংলার সংগে যোগাযোগ না থাকায় শচীন যেন পথ পাইতেছিলেন না। যে করিয়া হউক, সম্পর্ক স্থাপন করিয়া বাংলা হইতে বোমা পিস্তল পাইতে বাসনা করিলেন। কলিকাতায় আসেন। শ্রীযুক্ত মাখন সেন কিছুদিন পূর্বেও অনুশীলন (ঢাকা) দলের প্রধান নেতা ছিলেন। শচীন কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তাঁহার সংগে দেখা করেন। শচীন স্বয়ং বলেন: মাখনবাবুর সংগে আলাপ করিয়া শচীন তৃপ্ত হন নাই। মাখনবাবু তখন ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক প্রচেষ্টার যে সকল কথা বলিতেন, তাহা শচীনের বিপ্লবী মনকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। একজন তাঁহাকে অনুশীলনের তখনকার নেতাদের খোঁজ দেয়। ১৯১৩ সালে শচীন্দ্রনাথ অনুশীলনের রাজাবাজার আড্ডায় যান। শচীন্দ্র সম্পর্কে প্রবীসেন

বলেন : "শচীন্দ্র সান্যাল যখন প্রথম রাজাবাজার এলেন, তখন দেখি, মাথায় মোটা টিকি, একটা কোট্ গায়। বাঙালী বলিয়া মনেই হইল না।" এই রাজাবাজার আড্ডায়ই প্রতুলবাবু (গাংগুলি) চন্দননগরের অন্যতম প্রধান নেতা শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সংগে পরিচয় করাইয়া দেন। রাসবিহারীর সংগে বাহিরের কাহাকেও আলাপ করাইতে হইলে শ্রীশবাবুর মাধ্যমে হইত। প্রতুলবাবু তখন ফেরারীরূপে ছিলেন। তিনিই শ্রীশবাবুসহ শচীন্দ্রকে সংগে করিয়া চন্দননগরে রাসবিহারীর সংগে পরিচয় করাইয়া দেন। রাসবিহারী শচীনের সংগে আলাপ করেন। গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করেন। শচীন্দ্র ছিলেন যেন বারুদভরা তুবড়ী। সে-কারণেই চঞ্চল। শচীনের এই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া রাসবিহারী শচীনের নাম রাখেন—লাট্টু। লাট্টুর মত ঘোরে বলিয়াই রাসবিহারী তাঁহার লাট্টু নাম রাখেন। শচীন্দ্রের ছিল অসাধারণ 'এনার্জি' (উদ্দীপনা-শক্তি), সারল্য ও সাধুতা (honesty)। তাঁহার মধ্যে কর্মশক্তি যেন নিয়ত 'টগ্‌বগ্' করিতেছে। রাসবিহারী শচীনের এই অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য দেখিয়া বলেন "এর গ্রুপের সংগে মেশা বিপজ্জনক হবে না তো, যে-রকম অস্থির দেখচি। আমি 'আর্মির' মধ্যে কাজ কচ্চি, কি গোলমাল বাধাবে ঠিক কি?'* স্থির হয়, প্রতুল গাংগুলি কাশী গিয়া শচীন্দ্রের দল ও কাজকর্ম সম্পর্কে সাক্ষাৎভাবে পরিজ্ঞাত হইবেন। প্রতুল বাবুর রিপোর্টের পরে শেষ-সিদ্ধান্ত হইবে,—শচীনের দলের সংগে চন্দননগর ও অনুশীলন দলের মিলন হইবে কি না। প্রতুলবাবু তদনুযায়ী কাশী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান শচীন্দ্রসহ ভ্রমণ করেন। শচীন্দ্রের কোথায় কোথায় কর্মকেন্দ্র আছে দেখিলেন। কাশীতে শচীন্দ্রের ভাল অর্গ্যানিজেশন বা সংস্থা ছিল। অন্যত্র সংস্থা হিসাবে তেমন বড় কিছু না থাকিলেও, প্রায় সর্বত্রই কিছু কিছু উৎসাহী কর্মী ছিল। প্রতুলবাবু বাংলায় আসিয়া রাসবিহারীকে জানান : শচীনের গপের কিছুটা কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত আছে; বেশ ভাল (possibility)-সম্ভাবনা আছে যদি সুযোগ সুবিধা করিয়া দেওয়া যায়।—অতঃপর যোগাযোগ সাধনই সাব্যস্ত হয়।

উত্তর ভারতে শচীন্দ্র রাসবিহারীর অন্যতম প্রধান সহকর্মীরূপে বিপ্লব-কর্মে নিষ্ঠার পরিচয় দেন। শচীন্দ্রের মূল্য সম্যক হৃদয়ংগম করিতে রাসবিহারীর বিলম্ব হয় নাই।

* শচীনের এই চাঞ্চল্য তাঁহার পরবর্তী কর্মজীবনেও লক্ষ্য করা গিয়াছে।

গদর দলের বিপ্লব প্রয়াস

রাসবিহারীর নেতৃত্বে ১৯১৩ সাল হইতেই উত্তর ভারতে সৈন্য দলে ও পাঞ্জাবীদের মধ্যে প্রচার-কার্য চলিতে থাকে। বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা—লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা—দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণী হইতে সংস্থার বিস্তৃতির ও কর্মানুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যাইবে। (স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে)।

১৯১৪ সালের জুলাই মাসে যুদ্ধ ঘোষণা হয়। রাসবিহারী তখন আসন্ন অভ্যুত্থানের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইলেন। রাসবিহারীর বিশ্বস্ত সহকর্মীরূপে কার্য করিতে থাকেন—শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও ঢাকা অনুশীলনের কর্মী নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজাবাবু। প্রিয়নাথ, বিভূতি হালদার, নরেন ব্যানার্জি, নলিনী মুখার্জী; মহারাষ্ট্রীয় পিংলে, বিনায়ক রাও কাপ্‌লে, দামোদর স্বরূপ, প্রতাপসিংহ, আউধ-বিহারী, বালমুকুন্দ; বাচ্চা সিং, কর্তার সিং প্রভৃতিও পূর্ণ উদ্যমের সহিত বিপ্লব আন্দোলনের আয়োজনে আত্ম-নিয়োগ করেন। উত্তর ভারতে রাসবিহারীর প্রয়াসের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। আমেরিকায় 'গদর দল' পাঞ্জাবীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছিল। আমেরিকায় গদর দলের ৭২টি শাখা ছিল। তাহারা দলে দলে বিদ্রোহের জন্য ভারতের দিকে রওনা হইল; অনেকে আসিয়া পৌঁছাইল। আমেরিকা হইতে গদর দলের বিশিষ্ট কর্মীরা এবং ত্যাগনিষ্ঠ স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীরা আসিয়া সত্ত্ব সশস্ত্র বিদ্রোহ সফল করিবার জন্য রাসবিহারীর সংগেই মিলিত হইল। তাহারা আসিয়া জানায় বিশসহস্র শিখ বিদ্রোহের জন্য আসিতেছে। সে যাহাই হউক, এই সময়ে বিখ্যাত বিপ্লবী পিংলে, বিনায়করাও কাপ্‌লে, কর্তার সিং (হরদয়ালের সংগে সানফ্রানসিস্কোতে গদর দলের বিপ্লবাত্মক কার্যে লিপ্ত ছিলেন—মেধাবী, সাহসী ও ত্যাগনিষ্ঠ আদর্শ বিপ্লবী যুবক) প্রভৃতি ভারতে আসিয়া রাসবিহারীকে নেতৃপদে বরণ করেন। তাঁহারা বিদেশ হইতে রাসবিহারীর গুণ-মুগ্ধ হইয়াই আসিয়াছিলেন। ১৯১৪ সালের শেষ দিকে পিংলে আসেন। রাসবিহারী এলাহাবাদের সৈন্যদলের মধ্যে কাজ করার জন্য দামোদর স্বরূপকে প্রেরণ করেন। বেনারসের সৈন্যদলে বিভূতি হালদার ও প্রিয়নাথ কাজ করিতে থাকে। রামনগর-সিক্রোল-এর সৈন্যদলের ভার অর্পিত হয় যথাক্রমে বিশ্বনাথ পাঁড়ে ও মংগল পাঁড়ে এবং দিল্লা সিং-এর উপর। জব্বলপুরের সৈন্যদের মধ্যে কাজ করিতে থাকে

নলিনী প্রভৃতি। এ দিকে কর্তার সিং, পিংলে প্রভৃতি লাহোর—আম্বালা—ফিরোজপুর—রাওয়ালপিণ্ডি, মীরাট প্রভৃতি সেনাবারিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৈন্যদের বুঝাইল—বৃটিশরাজত্বের অবসান সুনিশ্চিত, যুদ্ধে বৃটিশ নিশ্চয় হারিবে—ভারত স্বাধীন করার এই স্বুবর্ণ সুযোগ। সেনাবারিকে সর্বত্রই বিদ্রোহের বাণী পৌঁছিল। সৈন্যরা সশস্ত্র-অভ্যুত্থানে সম্মত হইল। তাহারা নিজেদের ছাউনির অস্ত্র লইবে—প্রচুর বোমা বাংলা হইতে সরবরাহ হইবে—লাহোরে, কাশীতে বোমা নিক্ষেপের ব্যবস্থাও চলিবে। রাসবিহারী অমৃতসরে প্রথম 'ভারত হোটেলে' পরে 'মহারাষ্ট্র লজে' পিংলে সহ গোপনে অবস্থান করেন। সৈন্যরা প্রস্তুত—অভ্যুত্থানের দিন স্থির হইল—১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী। এই অভ্যুত্থান কি কেবল সৈন্যদলেরই? তাহা নহে, বাংলার বিপ্লবীদলের কর্মীগণ এবং তাহাদের সমর্থক ও প্রভাবিত জনগণ এক সময়েই বিদ্রোহ করিবে। বাংলার বাহিরেও যেখানে বাংলার বিপ্লবীদের শাখা প্রশাখা আছে, সেখানেই বিদ্রোহ ঘোষিত হইবে। সাঁওতালদের মধ্যেও উত্থানের বাণী লইয়া যাওয়া হয়। কেবলমাত্র পূর্ববাংলার সীমান্ত হইতে পঞ্চনদ পর্যন্ত একই সময়ে বিদ্রোহ ঘোষিত হইবে না, সেই সংগে সিংগাপুর ব্রহ্মদেশস্থ সৈন্যেরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে। ব্রহ্মদেশে সেই সময়ে পনের হাজার শিখ সৈন্য ছিল।

এই সময়ে বাংলার প্রয়াসের কথা শ্রীসতীশচন্দ্র পাকড়াশীর জবানীতেই উল্লেখ করিতেছি। শ্রীসতীশচন্দ্র পাকড়াশী বর্তমানে কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী এবং কম্যুনিষ্ট দলের বিশিষ্ট নেতা। তিনি ঢাকা-অনুশীলনের ত্যাগনিষ্ঠ কর্মী। ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত আত্মগোপন করিয়া সর্বক্ষণ বিপ্লব কার্যেই নিযুক্ত ছিলেন; তিনি ঐ সময়কার কথা (১৯১৪-১৫ সালের) বলিতেছেন:—'জার্মানীর আক্রমণে দিনের পর দিন বৃটেন ও ফ্রান্সের পরাজয়ের খবর এসে আমাদের দেশের সর্বসাধারণকে আশান্বিত ক'রে তুলেছিল। ভারত মহাসাগরে জার্মাণ ডুবো জাহাজের দৌরাত্ম্য বেড়েই চললো। শোনা গেল, ডায়মণ্ডহারবার এবং পুরীতেও টর্পেডোর আঘাত।......আমাদের দেশ-জোড়া চাঞ্চল্য আর কাণাকাণি। এবার আর ইংরেজ রাজত্ব থাকবে না—জনসাধারণের মনে এমনি ধারণা হ'ল। আমরাও ব্যস্ত। এক ধনীর বাড়ীর অর্থ লুণ্ঠন করতে আমাকে অনতিবিলম্বে ময়মনসিংহ যেতে হয়; তখন প্রচুর অর্থের দরকার। ঢাকা এবং কলকাতা হয়ে রাজসাহী ফিরে যাই। মফঃস্বলের সর্বত্র লোকের এই

বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, ইংরেজ আর এদেশে থাকবে না। আমার ঠাকুর্দা—ঢাকার প্রবীণ উকিল আনন্দ পাকড়াশী বলেছিলেন, 'ইংরেজ দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে—এবার তোমরা কিছু চেষ্টা করলে সহজেই সাফল্য লাভ করতে পার।' অন্য একজন উকীল বলেন—'মাহেন্দ্রক্ষণ বয়ে যাচ্ছে, এ সময় আপনারা নীরব কেন ?' আমরা যে ভিতরে ভিতরে কিছু করার চেষ্টায় আছি তা তখন প্রকাশ করা যায় না। আমাকে মালদহ জেলার ভার দেওয়া হয়। প্রতিদিন যুবকদের কাজে অগ্রসর হওয়ার জন্যে উদ্দীপনা যোগাতাম, কাজ ভালই চলছিলো, এমনি সময়ে এল কলকাতা যাওয়ার আহ্বান! চঞ্চল কৌতূহলী মন নিয়ে রওনা হলাম। কলকাতার নেতারা চুপিচুপি বলে দিলেন, "শীঘ্রই ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত অবধি বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠ্‌বে—প্রস্তুত হ'য়ে থাকুন।" "…কতকগুলি খবর সংগ্রহ ক'রে অবিলম্বে লোক মারফত এখানে পাঠিয়ে দিন।"—সমগ্র জেলায় ক'টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক ও রিভলবার আছে, কোথায় আছে ? ক'টি বন্দুক রিভলবার এ মাসের মধ্যেই ছিনিয়ে আনা সম্ভব ? ক'টি থানা ? কোন থানায় ক'টি রাইফেল ? কতজন বিপ্লবীর পক্ষে পুলিশ লাইন ও ট্রেজারী দখল করা সম্ভব ? রেল লাইন ছাড়া যাতায়াতের কি ব্যবস্থা আছে ? বিদ্রোহে সাঁওতালদের সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব কিনা ? ইত্যাদি বহু রকমেব সংবাদ সংগৃহীত হ'ল। বিভিন্ন জেলার জন্য চিঠিপত্র নিয়ে কলকাতা থেকে রওনা হলাম। রাজসাহী, কুচবিহার, দিনাজপুর ও কাটিহার হ'য়ে মালদহ ফিরে এলাম।

"ঢাকা থেকে লাহোর অবধি বিদ্রোহের বিপুল আয়োজনে নেতারা ব্যস্ত। ঢাকা সশস্ত্র সেনা বাহিনীতে তখন শিখ ছিল। লাহোরের ষড়যন্ত্রকারী শিখ সেনারা ঢাকার শিখদের সংগে সংযোগ স্থাপনের জন্য পরিচয়পত্র পাঠিয়ে দেয়। ঢাকার বিপ্লবী নেতা (অনুকূল চক্রবর্তী) ঐ চিঠি নিয়ে শিখ সেনাদের সংগে সাক্ষাৎ করেন। ওদের নেতৃস্থানীয় দুজন সমস্ত খবর শুনে বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠে। ময়মনসিংহ ও রাজসাহীর স্কুলের জংগলে যুবকেরা সন্ধ্যার পর কুচকাওয়াজ অভ্যাস করত। আক্রমণ ও রণকৌশল শেখার জন্য বিপ্লবী যুবকেরা মনোযোগী হয়ে উঠেছিল। বন্দুক চুরির হিড়িক-পড়ে যায় জেলায় জেলায়।…সর্বত্র গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে এবার আর ম্যাট্রিকুলেশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কোন পরীক্ষাই হবে না।…বিদ্রোহ

প্রচেষ্টার আসল খবর আমরা তখন বেশী জানতাম না। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র হয়। বাঙালী বিপ্লবীদের উপরই বাঙলায় বিদ্রোহের একমাত্র ভরসা। পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের মত বাংলায় সেনা-বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল না।" (সতীশচন্দ্র পাকড়াশী লিখিত 'অগ্নিদিনের কথা' হইতে উদ্ধৃত)

গদর পার্টি ও কোমাগাটামারু

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দেশীয় সৈন্যদের সাহায্যে ভারতব্যাপী বিপ্লব প্রয়াস, এবং বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লব প্রয়াস 'জার্মাণ-ষড়যন্ত্র' সম্বন্ধে বলিতে হইলে 'গদর পার্টি' সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী হরদয়াল আমেরিকায় 'গদর' (গদরের অর্থ 'বিদ্রোহ') নামে একটি সংবাদপত্র বাহির করেন। ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটানোই ছিল 'গদর' পত্রের উদ্দেশ্য। দিনের পর দিন এই বিদ্রোহ-মন্ত্রই প্রচারিত হইত। এবং এই ইংরেজী 'গদর' হিন্দি, উর্দু ও গুরুমুখী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া আমেরিকা—ইউরোপ—আফ্রিকা ও এসিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে এবং ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে ছড়ানো হইতো। হরদয়াল উচ্চশিক্ষিত। সংবাদপত্রে ও বক্তৃতায় ইনি ইংরেজ বিদ্বেষই কেবল ছড়ান না; জার্মানীর সংগে বৃটিশের যুদ্ধ আগত,—জার্মানীর সাহায্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে হইবে, ইহাই তিনি ও তাঁহার দলের লোকেরা প্রচার করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে বিদেশে কাজ করিবার জন্য যে দল গঠিত হয়, তাহা গদর পত্রের নামানুযায়ী 'গদর' রাখা হয়। হরদয়ালের 'গদর দলে'র বিখ্যাত কর্মীদের মধ্যে রামচন্দ্র ও বরকতুল্লাহ্ ছিলেন। পরবর্তী কালে, জার্মান যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে, বহু ভারতীয় এই 'গদর' দলের পুষ্টিসাধন করেন।

১৯১৪ সালের ১৬ই মার্চ আমেরিকায় বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করার অপরাধে মার্কিন গবর্ণমেন্ট হরদয়ালকে গ্রেপ্তার করেন। জামীনে মুক্ত হইয়া হরদয়াল সুইজারল্যাণ্ডে চলিয়া যান, এবং জার্মান গবর্ণমেন্টের

সংগে সেইখানে সাক্ষাৎভাবে সংযোগ স্থাপন করেন। 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল পার্টি' গঠিত হয়। বলা চলে ডিপ্লোম্যাটিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই প্রথম কমিটিতে থাকেন হরদয়াল, তারকনাথ দাশ, বরকতুল্লাহ্, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী ও হেরম্বলাল গুপ্ত। জার্মান-ভারত ষড়যন্ত্র মামলায় শেষোক্ত দুইজনের সানফ্রানসিস্কোতে বিচার হয়। 'গদর' দলের কতকগুলি কেন্দ্র ছিল। তন্মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া ও সানফ্রানসিস্কো বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার 'যুগান্তর' কাগজের নামানুকরণেই সম্ভবতঃ তথায় 'যুগান্তর আশ্রম'ও প্রতিষ্ঠিত হয়। হরদয়ালের অবর্তমানে রামচন্দ্র আশ্রম ও 'গদর' পত্র পরিচালনা করিতেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, গদর দলের আহ্বানে অনেকে উৎসাহিত হইয়া উঠে। বিশেষ করিয়া গদর দলের প্রচারকার্য প্রবাসী শিখদের মধ্যে অধিক কার্যকরী হয়। জার্মানীর সংগে ইংরেজের যুদ্ধ বাধিবেই। তখনই ভারতীয়দের পক্ষে ইংরেজ বিতাড়নের স্বর্ণ সুযোগ। এই সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। "ভয় নাই,—অস্ত্র ও অর্থ কিছুরই অভাব হইবে না।" দিনের পর দিন ইহাই 'গদর' পত্রে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এবং দলের প্রচারকগণ গোপনে এবং প্রকাশ্যে এই প্রকারের প্রচারকার্য চালাইতে লাগিলেন।

১৯১৩ সাল হইতেই ক্যানাডা-প্রবাসী শিখদের ও অন্যান্য ভারতীয়দের মধ্যে অসন্তোষ সঞ্চিত হইতেছিল। ক্যানাডার নূতন 'এমিগ্রেশন' আইনে এশিয়া-বাসীদের ক্যানাডায় যাইতে হইলে ২০০ ডলার দেখাইতে হইবে এবং ক্যানাডায় যাইতে হইবে বরাবর তাহাদের নিজ নিজ জন্মভূমি হইতে। এই ব্যবস্থায় শিখদের অসুবিধা দেখা দিল। শিখদের এই অসুবিধা ও অসন্তোষ 'গদর দল' কাজে লাগাইতে লাগিল। ক্যানাডায় তখন প্রায় চার সহস্র পাঞ্জাবী শ্রমিক ছিল। ইহাদের মধ্যে কতক হরদয়ালের গদর দলের সংগে যুক্ত ছিল, অনেকে শুধু উপার্জন করিতেই আমেরিকা হইতে গিয়াছিল। তখনো যুদ্ধ বাধিয়া উঠে নাই, কিন্তু বাধিবার মুখে।

এমনই সময়ে আর একটি ঘটনায় আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। ধনী শিখ ব্যবসায়ী গুরুদিৎ সিং সিংগাপুরে ও মালয়ে বড় রকমের ব্যবসায় করিতেন। পাঞ্জাবীদের ক্যানাডায় লইয়া যাইতে পারিলে তাহারা সেখানে বহু অর্থ উপার্জন করিতে পারিবে—মনে হয় কতকটা এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাহাদের সকলের হইয়া একটি জাহাজ ভাড়া করিতে চেষ্টা করেন। গুরুদিৎ সিং হংকং বন্দরের

জার্মাণ এজেন্টের মাধ্যমে জাপানী জাহাজ 'কোমাগাটামারু' ভাড়া লইবার (চার্টার) ব্যবস্থা করেন, এবং হংকং, সাংহাই, ইয়োকোহামা এবং অন্যান্য বন্দর হইতে পূর্ব ব্যবস্থা মতো তিনি শিখদের নিকট যথারীতি টিকিট বিক্রয় করিয়া আরোহীরূপে জাহাজে উঠাইয়া লন। অবশ্য কেহ কেহ বলেন যে, গুরুদিৎ সিং জানিতেন এবং শিখেরাও জানিত যে, ক্যানাডায় অবতরণ করিবার পক্ষে বাধা আছে। তবে তাহারা মনে করিয়াছিল,—একবার সেখানে গিয়া পড়িতে পারিলে তখন জনমতের চাপে তাহাদের নামিতে না দিয়া পারিবে না। কেহ কেহ বলেন, গুরুদিৎ সিং-এর উদ্দেশ্য ছিল—এই ব্যাপার লইয়া একটা সংকট সৃষ্টি করা। কারণ একজন শিখ, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষ্যদানকালে বলিয়াছেন যে, গুরুদিৎ সিং শিখ আরোহীদের নিকট বলেন: "যদি নামিতে না দেয়, আমরা ভারতে ফিরিয়া গিয়া বৃটিশকে তাড়াইয়া দিব।" যাহাই হউক, ইহা সত্য, বহু শিখ জীবিকা অর্জনের আশায়ই ঘটি-বাটি বিক্রয় করিয়া এই 'যাত্রা' করিয়াছিল। ১৯১৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল হংকং হইতে 'কোমাগাটামারু' যাত্রা করে। উহাতে ৩৭২ জন যাত্রী ছিল। ইয়োকোহামায় এবং অন্যান্য মধ্যবর্তী বন্দরে ভারতীয় বিপ্লবীরা কোমাগাটামারুতে আসিয়া 'গদর' পত্রিকা বিলি করিয়া যাইত। বন্দরে বন্দরে বিপ্লবীরা আসিয়া যাত্রীদের মধ্যে বিপ্লববীজ বপন করিতে লাগিল। কিন্তু তখন পর্যন্তও ইহারা শ্রমিক ও ছোটখাট ব্যবসায়ী শিখ মাত্র, বিপ্লবদলভুক্ত নয়। মে মাসের শেষ ভাগে কোমাগাটামারু ভ্যাংকোবারে আসিয়া পৌঁছে। ক্যানাডার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জাহাজ হইতে শিখদের নামিতে দিল না। ইহা লইয়া এসিয়ায় প্রবল উত্তেজনা ও আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। জাহাজে গদর দলের উত্তেজক ইস্তাহার বিলি চলিতে লাগিল। জাহাজ যাহাতে অবিলম্বে বন্দর ত্যাগ করে, সেজন্য ক্যানাডার পুলিশ জোর তাড়া দিতে থাকে। বলপ্রয়োগ ও হাতাহাতি আরম্ভ হইয়া যায়; আরোহীরা বন্দুক ছুঁড়িয়া পুলিশ তাড়াইয়া দেয়। শিখ আরোহীরা জাহাজের কাপ্তানকে জাহাজ ছাড়িতে বাধা দেয়। এবারে ক্যানাডার নৌবহর ও সৈন্য আসিয়া শিখ যাত্রীদের বন্দর ত্যাগ করিতে বাধ্য করে। আবার 'কোমাগাটামারু' ৩৭২ জন শিখকে বহন করিয়া (এবারে তাহারা অধিকতর ক্ষুধার্ত—অধিকতর বৃটিশ-বিদ্বেষী) ফিরিতে থাকে। জাহাজের যাত্রীদের মানসিক অবস্থা অনুমেয়। তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছে। আশা ছিল,—তাহারা বৃটিশ প্রজা, ক্যানাডার

ভারতীয় বিদ্বেষী অন্যায় আইন হইতে বৃটিশই তাহাদের রক্ষা করিবে, কিন্তু তাহা হইল না; ব্যর্থতার রোষে তাহাদের চিত্ত গুমরাইতে লাগিল। সেই সময়ই তাহাদের মধ্যে গদর দলের বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা আসিয়া পড়িতে লাগিল। আবার এই সময়েই তাহারা শুনিতে পাইল—জার্মানীর সংগে বৃটিশের যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। তাহারা তখন যে কায়মনোবাক্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস কামনা করিতেছিল—ইহাতে সন্দেহ কি? জাহাজ হংকং-এ আসিল। কিন্তু হংকং-এও জাহাজ হইতে তাহাদের নামিতে দেওয়া হইল না। গুরুদিৎ সিং হংকং-এর কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন:—"আমাদের খাদ্য পানীয় সরবরাহ করিলে ভারতের যে কোন বন্দরে যাইতে আমরা প্রস্তুত আছি।" কিন্তু ইয়োকোহামায় বৃটিশ দূত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিতে রাজী হইলেন না। অতঃপর জাপান হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট বৃটিশ দূতের টেলিগ্রাম আসে, 'কি করা যায়?' ভারত গবর্ণমেণ্টের নির্দেশে কিছুটা খাদ্য লইয়া কোমাগাটামারু কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। যাত্রীরা অনেকেই কলিকাতায় বা ভারতে ফিরিতে ইচ্ছুক ছিল না। তাহারা অনেকেই হংকং কি সিংগাপুরে নামিতে চাহে। কিন্তু তাহাদের সেখানে নামিতে দেওয়া হইল না। ইহার ফলে আরোহীদের উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। কোমাগাটামারু ১৯১৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার দক্ষিণে 'বজ্‌বজ্‌' জেটিতে আসিয়া পৌঁছে। ঐ সময়ে আমরা এবং রডা-বন্দুক চুরির মামলার আসামীরা (অনুকূল মুখার্জ্জী প্রভৃতি) কলিকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলাম। রডা মামলার আসামীরা কোর্ট হইতে একদিন ফিরিয়া আসিয়া জানান যে, কোর্টে শোনা গেল, বহু শিখ আসিয়া পড়িয়াছে, কলিকাতা হইতে সৈন্যদল গিয়াছে তাহাদের ঠেকাইতে, তাহাদের সংগে জোর লড়াই হইয়াছে। উভয়পক্ষে বহু হতাহত হইয়াছে, শিখেরা অনেকে পালাইতে সক্ষম হইয়াছে। জেলে সঠিক ব্যাপার বুঝিতে পারি নাই; মনে হইয়াছিল,—বিপ্লব বুঝি সমাগত, তবে বুঝি বাঙালীর বিপ্লব চেষ্টার সংগে শিখ নওজোয়ানেরাও যোগ দিয়াছে। রাসবিহারীর কথা সেলে বসিয়া স্মরণ করিলাম। জানিতাম, রাসবিহারী শিখ-সৈন্যদের মধ্যে কাজ করিতেছিলেন। তবে কি ইহারা তাহাদেরই এক অংশ? একদা কি তবে আমাদের এই দুর্ভেদ্য কারাপ্রাচীর ভাংগিয়া পড়িবে? —আমরা সংবাদ-পত্র পাইতাম না। ছিটে ফোঁটা সংবাদ মাত্র পাইতাম। তাহাতে সম্যক ব্যাপার বোঝা যাইত না। বাকিটা অনুমান করিতাম। বজবজের ঘটনায়

দিন আমাদের জেলেও একটু কড়া পাহারার ব্যবস্থা হয়—তখন কারণ বুঝি নাই। সাহেবদের মুখ থম্‌থমে। আসলে ব্যাপার হইয়াছিল এই :—গবর্ণমেণ্ট স্থির করেন শিখদের বজবজের গাড়ীতে তুলিয়া পাঞ্জাবে পাঠাইয়া দিবে। যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনে যে কোন ব্যক্তির গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ করার আইন তখন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল। সেই আইনের দোহাই দিয়া শিখদের গাড়ীতে উঠিতে বলা হয়। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে একখানা স্পেশ্যাল ট্রেন বজবজ লইয়া গিয়া পূর্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়। গুরুদিৎ সিং এবং তাঁহার সংগী যাত্রীরা তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন। জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহারা ট্রেনে না উঠিয়া সম্মুখের রাস্তা ধরিয়া কলিকাতা অভিমুখে পদব্রজে রওনা হন। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার ফ্রেডারিক, এবং ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ডোনাল্ড পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী লইয়া কোমাগাটামারুর আরোহীদের পদব্রজে অগ্রসর হইতে বাধা দান করিলেই দাংগা আরম্ভ হইয়া যায়। আরোহীদের অনেকের নিকট আমেরিকান পিস্তল ছিল। উভয়পক্ষে গুলি চলিল। সৈন্যদের ছিল বন্দুক—পাঞ্জাবী শিখদের ছিল পিস্তল। সুতরাং শিখেরাই বেশী আহত হইল। এই হাংগামায় শিখ নিহত হয় ১৮ জন। অনেকে আহতও হইয়াছিল। এই হাংগামায় স্যার ফ্রেডারিক আহত হন, মিঃ হাম্ফরীর আঘাত হয় গুরুতর। একজন—মিঃ লোমেক্স—নিহত হন। আরো অনেকে আহত হয়। এই দলে যে ১৭ জন পাঞ্জাবী মুসলমান ছিল তাহাদের এবং অপর ৪৩ জন শিখকে ট্রেণে উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়। বাকি সবাই পলাইয়া যায়। তবে অনেকেই পরে ধৃত হয়। তন্মধ্যে ৩১ জনকে 'ইন্‌টার্ণ' করিয়া রাখা হয়। গুরুদিৎ সিং এবং আরো ২৮ জন শিখ শেষ পর্যন্ত পলাইয়া যাইতে সক্ষম হন।

'কোমাগাটামারু'র ব্যাপারটা যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইবার প্রয়াসের ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব অত্যধিক। 'বিদ্রোহ আসন্ন' বলিয়া 'গদর দল' পাঞ্জাবী শিখদের বিদেশ হইতে ভারতে আসিতে উৎসাহিত করিতেছিল। এইরূপ অনেকে ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে আসিয়াও পৌঁছিল। কোমাগাটামারুর শিখদের উপর অত্যাচার বৃটিশের অনুষ্ঠিত অত্যাচার বলিয়াই বিবেচিত হয়। ক্যানাডার অবিচারের জন্য তাহারা বৃটিশকেই দায়ী করিতেছিল। বৃটিশের উপর শুধু বিপ্লবীরাই নহে, সাধারণ শিখরাও বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিল। ফলে বৃটিশের চক্ষে পাঞ্জাবের তখনকার পরিস্থিতি

অত্যন্ত মারাত্মক বিবেচিত হইতেছিল। বাংলার বিপ্লবপ্রয়াস হইতেও পাঞ্জাবের এই অসন্তোষ-বহ্নি বৃটিশের নিকট, বিশেষতঃ ঐ যুদ্ধকালে, অধিকতর সংকটজনক মনে হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কারণ, পাঞ্জাব শুধু সৈন্যই জোগাইতেছিল না—যে-শ্রেণীর লোক এই বিদ্রোহের মালমশলারূপে পরিগণিত হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবার মত প্রচুর দাহ্য পদার্থও ছিল।

শুধু কোমাগাটামারুই নয়, ইহার কিছু পরেই অর্থাৎ ১৯১৪ সালের ২৯শে অক্টোবর 'টোসামারু' নামক এক জাহাজ আমেরিকা, মেনিলা, চীন, সাংহাই, হংকং হইতে বহু ভারতীয়দের বহন করিয়া কলিকাতায় আগমন করে। আরোহীদের মধ্যে অধিকাংশই শিখ। এই দলে খাঁটি বিপ্লবী কর্মী অনেক ছিলেন। এই সময়েই আমেরিকা হইতে S. S. Salamir জাহাজে অন্যান্য শিখদের সংগে বিশিষ্ট বিপ্লবীও কতক আসেন। তাঁহারা রাসবিহারীর সংগে মিলিত হন। ইহারা প্রায় সকলেই ভারতে গিয়া পাঞ্জাবের শিখ-বাসিন্দা ও শিখ সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের বাণী ছড়াইবেন—ইহাই নির্ধারিত ছিল। 'টোসামারু'র ১০৭ জন ভারতীয় আরোহীর মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ১০০ জনকেই জেলে অন্তরীণ করেন। এ-ছাড়া অন্যান্য জাহাজেও অনেকে ভারতে আসিতে থাকে। এদিকে পাঞ্জাবে বিপ্লবাত্মক লুণ্ঠন ও খুন-জখমও এই সময় আরম্ভ হয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারেন যে, এসিয়ার বিভিন্ন বন্দর হইতে এবং আমেরিকা ও ক্যানাডা হইতে ভারতে বিদ্রোহের জন্য বহু শিখ ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে; ব্রহ্মদেশে ও সিংগাপুরে বহু শিখ বিপ্লব ঘোষণার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। পাঞ্জাবে ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ হইয়া গেল। প্রায় দুই সহস্র শিখকে সন্দেহে ধৃত করা হইল। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ভারত বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, ভারতে অশান্তির আগুন জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এইরূপ সংবাদের উপর অনেকখানি আস্থা স্থাপন করিয়াই বিদেশ হইতে শিখগণ ভারতে আসে। বিদ্রোহ আসন্ন হইয়া উঠিলে—তাহাতে সাগ্রহে সকলেই অংশ গ্রহণ করিত; কিন্তু সাফল্যজনক-ভাবে বিপ্লব ঘটাইবার জন্য দীর্ঘ সাধনা, তিলে তিলে দুঃখ বরণ ও ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করার বৈপ্লবিক নিষ্ঠা অনেকেরই ছিল না। ভারতের বিপ্লব-প্রয়াসের আকাশে এ-যেন একটা জ্বলন্ত উল্কার মতো সহসা নিজে জ্বলিয়া ও দিঙ্মণ্ডল জ্বালাইয়া সহসাই আকাশে বিলীন হইয়া গেল।

যথাস্থানে পাঞ্জাবের বিপ্লব-প্রয়াস এবং এই বিপ্লব-প্রয়াসের সংগে রাসবিহারী বসুর ও তাঁহার সহকর্মীদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধের কথা—লাহোর ও দিল্লীর ষড়যন্ত্রের কথা, উল্লেখ করা হইয়াছে।

* * * * *

জার্মান যুদ্ধকালীন (১৯১৪-১৫) উত্তম ও রাসবিহারীর প্রয়াস সম্পর্কে—শ্রীকেদারেশ্বর গুহের প্রদত্ত বিবৃতি হইতে ঐ সময়কার বিচিত্র কর্মচেষ্টার কতকটা নির্ভুল ধারণা হইবে। তাঁহার নিজের উক্তিই নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"১৯১২ সালে আমাকে সমিতি বিদেশ পাঠাইতে মনস্থ করে। সেপ্টেম্বর ঢাকাতে নরেন বাবুর (সেন) নারিন্দা বাড়ীতে আমাদের বিপ্লবের প্রচেষ্টায় বৈদেশিক সাহায্য, বিশেষ করিয়া জার্মান সাহায্য গ্রহণের বিষয়ে অনুশীলন সমিতির পক্ষ হইতে বিদেশে যাওয়া সম্পর্কে নরেন বাবুর সংগে শেষ কথা হয়। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ হইয়া কলম্বো যাই। কলম্বো হইতে যাই লণ্ডন। লণ্ডন হইতে ম্যাঞ্চেষ্টার যাই। দাদা (আশুতোষ গুহ) তখন ম্যাঞ্চেষ্টারে ছিলেন। তাঁহাকে বলি, জার্মানীতে কেমিষ্ট্রি শিখিতে যাইতেছি। গুপ্ত উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করি না। আমাদের নেশন্যাল কলেজের সহপাঠী জ্ঞান দাসকে লণ্ডন হইতে আমার যাওয়ার কথা জানাইয়া পত্র দেই—বার্লিনে। সে কেমিষ্ট্রির ছাত্র। তাহার ঠিকানা ঢাকাতে নরেন সেন দিয়াছিলেন। জ্ঞান দাস চিঠি অনুযায়ী বার্লিন ষ্টেশনে আসে। তাহার বাসায় যাই। এই বাসায় অধ্যাপক বিনয় সরকারের ভাই ধীরেন সরকার থাকিতেন। তিনিও ছিলেন নেশন্যাল কলেজের সহপাঠী। কুমিল্লার অবিনাশ ভট্টাচার্য (তিনিও নেশন্যাল কলেজের ছাত্র) থাকিতেন 'হালে'। অবিনাশ বাবুর নিকট 'হালে' থাকি। প্রথম তাঁহাকেও গোপন উদ্দেশ্য জানাই না। পরে তাঁহাকে সব জানাই এবং ঢাকাতে পত্র দেওয়ার (গোপনে) প্রয়োজনের কথা বলি। তিনি Phenolphthaleine solution দ্বারা গোপন চিঠি লেখার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তদনুযায়ী ঢাকার গোপন ঠিকানায় পত্র দেই। ১৯১৩ সালের এপ্রিল-মে মাসে প্যারীর রুয়ে-দি-পন্থিওতে গিয়া মাডাম কামার সংগে দেখা করি। তিনি থাকিতেন বোর্ডিং-এ। যাইতেই হাত জোড় করিয়া বলেন: 'বন্দে মাতরম্'। আমাকে একটি ছোট কোঠায় নিয়া যান,—বলেন, 'এইখানে থাকতো সাভারকর।'

আমি আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলি—কি করিয়া অস্ত্র পাইতে পারি। আমার কথা শুনিয়া তিনি উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন : বলিলেন,—'আমাকে বড্ড ওয়াচ কচ্ছে।—অস্ত্র আমি তোমাকে দিতে পারিব। ভালো প্যাকিং করিয়া (বিশেষ ধরণের প্যাকিংয়ের কথা বলিলেন) পাঠাইতে হইবে। অবশ্য প্যাকিং খরচ পড়িবে অনেক। আর চন্দননগরে (ফরাসী রাজ্য) পাঠাইতে পারা যাইতে পারে।' এ-সময়ে ম্যাডাম কামা তাঁহার চেয়ার আমার কাছে নিয়া আসিয়া সন্তর্পণে ও সস্নেহে কথা বলিতেছিলেন। আমি একবার সম্বোধনে 'সিষ্টার' বলিয়াছিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন—"না ছেলে, আমি তোমার মা, তুমি আমার ছেলে।" জার্মানীতে আসিয়া অবিনাশ বাবুকে সব বলি—এবং পূর্বোক্ত গোপন ঠিকানায় ঢাকায় পত্র দেই। ২।৩ খানা পত্র পাঠাই কিন্তু—উত্তর পাইনা। যদিও পত্র পাওয়ার ও পত্র পাইয়া টাকা পাঠানো হইয়াছিল—সংবাদ পাই।* যাই হোক, টাকা আসিতে দেরী দেখিয়া আমি ১৯১৪ সালে ফেব্রুয়ারীতে আমেরিকা চলিয়া যাই। নিউ-ইয়র্কে কয়দিন থাকিয়া যাই সিকাগো। সেখানে কস্‌মোপলিটান হোষ্টেলে বন্ধু প্রমথ সাহা ছিলেন। তিনিও আইও-তে গিয়া সুধীন বাবুর (বসু) সংগে দেখা করিতে বলেন। এই সময়ে ১৯১৪ জুলাই মাসে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে। আইও-তে ষ্টেট্ ইউনিভার্সিটিতে পড়ি ও বাহিরে কাজও করি। অক্টোবরের কথা। সহসা একদিন পুরাতন সহপাঠী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার জার্মানী হইতে আমার নিকটে আসেন। নিউইয়র্কে আমার খোঁজ করেন এবং আমার খোঁজে এখানে আসেন। আসিয়াই একান্তে ডাকিয়া নিয়া বলেন :—'এবার জার্মাণ গবর্ণমেণ্ট রাজী হইয়াছেন, আমাদের ভারতে রিভলিউশনের জন্য প্রচুর সাহায্য পাঠাইবেন স্থল এবং সমুদ্রপথে। সব ব্যবস্থা পাকাপাকি হইয়াছে। আমিও এ-কাজে লাগিয়া গিয়াছি। আপনি ভারতে চলিয়া যান। সেখানে গিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য বিপ্লবী নেতাদের ব্যবস্থা করার কথা বলুন এবং organisation করিতে থাকুন যেন বিদ্রোহ সফল করা যায়।' ধীরেন বাবু আমাকে ভারতে আসার জন্য কিছু অর্থ দিলেন। আমি

* অনুশীলনের বিশিষ্ট কর্মী সুরেন বসুর ১২নং নবদ্বীপ ওস্তাগর লেনের গোপন ঠিকানায়। এই ঠিকানায় 'স্বাধীন ভারত' গোপনে ছাপা হইত—Liberty-ও ছাপা হইত। নরেন সেন সেই পত্র পান বটে—তবে পত্র পুলিশ খুলিয়াছিল, বলিয়া নরেন বাবুর সন্দেহ হয়।

তৎক্ষণাৎ ভারতে ফিরিতে রাজী হইলাম। একটা সশস্ত্র বিদ্রোহে লাগিতে পারিব ভাবিয়া উৎসাহিতও হইলাম। সহজে নেওয়া যায় এইরূপ সামান্য জিনিষপত্র লইয়া পরের দিনই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সানফ্রান্‌সিস্কোতে তারক দাসের সংগে দেখা করিলাম—এবং সব বলিলাম। তারক দাস খুব উৎসাহ দিলেন, এবং বলিলেন—"আপনার এই ষ্টীমারেই (তখন টিকিট কিনিয়াছি) গদর পার্টির লোকও অনেক যাইতেছে।"—জাপানী ষ্টীমার। সেকেণ্ড ক্লাশে যাইতেছি। ষ্টীমারে আসিয়া দেখি আইওয়া হইতে শ্রীভূপেন মুখার্জি যাইতেছেন। আর একটি মহারাষ্ট্রীয় যুবক—নাম নারায়ণ রাও—বার্লিন হইতে আসিতেছে। পরে জানি আমরা একই উদ্দেশ্যে চলিয়াছি। ক্যানাডা হইতে অনেক শিখ সানফ্রানসিস্কোতে আসিয়াছিল। তাহারাও এই ষ্টীমারে চলিয়াছে—ভারতে বিপ্লব করিতেই। আমরা এক ষ্টীমারেই আসিলাম বটে—কিন্তু পরিচিত হইলাম না। তাহারাও অগ্রবর্তী হইয়া আসিল না। পূর্ব হইতে সমিতির মন্ত্রগুপ্তিতে অভ্যস্ত থাকায়, 'প্রয়োজন ভিন্ন' কোন কথা বলিতাম না। যাই হোক, জাপানে আসিয়া ইয়োকোহামায় হোটেলে থাকি, এবং পরবর্তী ষ্টীমারেই (ইউরোপীয় লাইনে) কলম্বো পৌছাই। জার্মাণীর সাহায্য পাওয়া যাইবে, অস্ত্র এবং অর্থের অভাব হইবে না—বিদ্রোহ সংঘটনের জন্য সংস্থা গড়িয়া তুলুন—এই message বহন করিয়াই আমি ও ভূপেন মুখার্জি কলিকাতায় আসিয়া পৌছি। তখন একেবারে 'ট্যাঁস' সাজিয়াছি। ভূপেন ও আমি পরস্পরের ঠিকানা নিলাম। কলিকাতায় আসিয়া ক্রমে ক্রমে জানিলাম, আমাদের অনুশীলন দলের প্রধান নেতারা সবাই arrest হইয়াছেন। অথচ আমার কারো না কারো সংগে দেখা করাই চাই। পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তবু আশা হইল—অনুশীলনের এতো কর্মী, কারো না কারো সংগে নিশ্চয়ই দেখা হইবে। আমাকে বাবা জিজ্ঞাসা করেন—"কি ডিপ্লোমা নিয়া আসিয়াছ?" আমি বলি—Practical শিখিয়া আসিয়াছি। যাই হোক, আশা লইয়া রোজ রাস্তায় ঘুরি ও বিভিন্ন পার্কে যাই। হঠাৎ হেদোর নিকট অনুশীলনের পরিচিত বিপ্লবী বন্ধু 'ঠাকুরে'র সংগে (অনুকূল চক্রবর্তী) দেখা হইয়া গেল। তিনি বলিলেন: "বড়রা সবই arrest হইয়াছেন—আমরা ছেলে ছোকরারা আছি। তবে দল ভালই চলিতেছে।" আমি জার্মাণীর সংগে যোগাযোগের কথা—সাহায্য গ্রহণের কথা—organisation সেই উদ্দেশ্যে চালাইবার কথা, সবই তাঁহাকে

বলিলাম। তিনি সব শুনিয়া বলেন—"এঁরা সব ধরা পড়িলেও আমাদের দল রাসবিহারী বাবুর সংগে মিশিয়া কাজ করিতেছে। তিনিই এখন আমাদের নেতা। তিনি বর্তমানে বেনারসে আছেন। সেখানেই আমাদের বর্তমানের প্রধান সেণ্টার বা কেন্দ্র। কাজেই আপনারা আজই বেনারস চলিয়া যান। রাসবিহারীর গোপন ঠিকানা লইয়া আমি ও ভূপেন ঐদিনই বেনারস যাত্রা করিলাম। অনুকূল চক্রবর্তী রাসবিহারী বাবুর নিকট আমার একখানা পরিচয়পত্র দিলেন। তাতে লেখা ছিল: "আমাদের বিশ্বস্তবন্ধু। ১৯১২ সালে বিদেশে পাঠানো হইয়াছিল। তাঁহার কাছেই সব শুনিবেন।" রাসবিহারীর ঠিকানা সরাসরি ছিল না। গোটা দুই ঠিকানা ছিল মাঝখানে। রাসবিহারীর নিকট আমাদের একজন লইয়া গেল। তিনি চিঠি দেখিয়া সামান্য দুই একটা কথা বলিয়াই বলিলেন—"আমরা অত্যন্ত watched, এখানে আর আলাপ করিব না। আপনি সন্ধ্যায় বিশ্বনাথের মন্দিরের গলির মোড়ে আসিবেন। পরে যথাস্থানে আপনাকে লইয়া যাইবে।"—যথসময়ে সেই 'গাইড' আমাকে ও ভূপেনকে গংগাতীরে আনিয়া একটি ছোট বোটে উঠাইল। পরে একটি বড় নৌকায় উঠিতেই—নৌকা দূরে নদীবক্ষে লইয়া গেল। রাসবিহারী আমাদের জন্যই নৌকায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। মাঝিরা ধীরে ধীরে নৌকা বাহিতে লাগিল। মাঝিরা বিশ্বস্ত—জানাশোনাই মনে হইল। নৌকার ছাদে গিয়া বসিতেই রাসবিহারী বলিলেন: "আচ্ছা, এবার বলুন।" আমরা, বার্লিনে যে পার্টি গঠিত হইয়াছে এবং ধীরেন সরকার যাহা বলিয়াছিলেন—সব বলিলাম। জার্মাণীর সাহায্য আসিবে—তাহা সংগ্রহ এবং উহা কাজে লাগানোর বিষয় বলিলাম। স্থলপথে আফগান সীমান্ত দিয়া এবং সমুদ্রপথে অস্ত্র প্রেরণের যে সকল কথা শুনিয়া আসিয়াছিলাম—বলিলাম। রাসবিহারী সকল কথা নীরবে শুনিলেন—দুই একটি প্রশ্নও করিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—এ বেশ ভালোই হইয়াছে। আপনারা বিদেশে যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে জার্মানীর সাহায্য কবে আসিবে, কার্যতঃ কবে আসিয়া পৌছাইবে, কিছু নিশ্চিত বলা যায় না—আমরা এই অনিশ্চিত আশায় বসিয়া থাকিব না। একটু থামিয়া বলিলেন:—"শুনুন, আমরা একটি নির্দিষ্ট দিনে ভারতব্যাপী armed revolution (সশস্ত্র বিদ্রোহ) আরম্ভ করিব। আমরা সৈন্য হাত করিবার কাজে অনেকদূর আগাইয়াছি। আপনারা

সত্বরই পূর্ববংগে গিয়া organisation বাড়াইতে থাকুন। অথবা ওখানে যদি পুলিশের দৃষ্টি পড়ায়, অসুবিধা থাকে, 'নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া'তে (উত্তর ভারতে) কাজ করিতে পারেন।" আমরা পূর্ববংগে গিয়াই কাজে লিপ্ত হইবার সংকল্প জানাই—এবং বিদায় লই। মনটা উৎফুল্ল হইল। সৈন্য আমাদের হইয়া দাঁড়াইবে? আমি কলিকাতায় আসিয়া অনুকূল চক্রবর্তীর সংগে তাঁর গোপন আড্ডায় দেখা করি। কলিকাতা হইতে বিক্রমপুর-বজ্রযোগিনী গেলাম সেখানে পূর্বপরিচিতের সন্ধান করিয়া প্রাপ্ত ঠিকানা মতো ঢাকা কেন্দ্রে গেলাম। কিছুকাল ঢাকা ও চট্টগ্রামে আত্মগোপন করিয়া থাকি। ট্যাঁস-ফিরিংগির মতোই থাকিতাম। ঢাকা গিয়া দেখিলাম: পূর্বেই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংবাদ পৌঁছিয়াছে, এবং বড় ও ছোট সহরে ও পল্লী কেন্দ্রে ছেলেরা সব তৈয়ারী হইতেছে। অভ্যুত্থান ব্যাপারের অধিকতর পরিণতির কোন সংবাদ থাকিলে—তাহার আদান প্রদান চলিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে ঢাকা, ঢাকা হইতে বিভিন্ন কেন্দ্রে; আবার বেনারস হইতে আসিত কলিকাতা। এমনি নিয়মিত সংবাদবাহক আসা যাওয়া করিত। ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জে যাই। সেখানে মা থাকিতেন। পুলিশ ভয়ানক খুঁজিতেছে। অবস্থা ভাল বুঝিনা। তাই শেষ রাত্রিতে রওনা হইয়া ১৭ মাইল পায়ে হাঁটিয়া একটা ষ্টেশনে আসিয়া ঢাকা চলিয়া আসি। তিনদিন পরে ঢাকার আড্ডায় থাকিয়াই খবর পাই:—সশস্ত্র বিদ্রোহের প্ল্যান বিফল হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট উত্তর ভারতের বহু সৈন্য এবং বিদ্রোহের নেতাদের ধরিয়া ফেলিয়াছে। এই দুঃসংবাদের পরে ভগ্নদেহ-মনে কলিকাতা আসি। ট্যাঁস সাজিয়াই রহিয়াছি। এদিকে সমুদ্রপথে অস্ত্র আমদানীর যে প্ল্যান ছিল—তাহাও গবর্ণমেণ্ট জানিয়া ফেলে—আয়োজন ব্যর্থ হয়। দুই রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। এখানে থাকিলে গ্রেফ্‌তার হইতে হইবে। পরামর্শ-ক্রমে জাপানে যাওয়াই স্থির করিলাম। কলিকাতা হইতে বাহিরে কোথাও যাওয়া ভয়ানক বিপদ। চট্টগ্রাম হইয়া যাওয়াই স্থির করি। এবং ট্যাঁস-ফিরিংগি হইয়াই আছি। ঢাকা কেন্দ্র হইতে চট্টগ্রামের গোপন ঠিকানা দেয়। গোপনে সেখানেই আছি। চট্টগ্রাম হইতে কোষ্টাল ষ্টীমারে সিংগাপুরে আসিয়া—ঐ দিনই জাপান-গামী ষ্টীমারে উঠি। পুলিশ-পাশ লইতে হইবে। একটা পুলিশকে কিছু টাকা দিয়া পাশ সংগ্রহ করিয়া ষ্টীমারে উঠার পরক্ষণেই ষ্টীমার ছাড়ে—আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ি। টোকিও হইতে সানফ্রানসিস্কোয়

গেলাম।—পরে রাসবিহারীর সংগে একবার দেখা হয়—টোকিওতে। আমাদের প্রয়াস সফল হয় নাই। জীবনও সফল হয় নাই। কিন্তু আজ পরিণত বয়সেও কয়েকটি স্মৃতি অনড় হইয়া আছে। (১) নরেন সেনের ১৯১২ সালেই বিদেশে লোক পাঠাইবার প্রয়োজন বোধ ও সুদিন আসিবে বলিয়া তাঁহার জলন্ত বিশ্বাস; (২) ম্যাডাম্ কামার মধ্যে বন্দিনী ভারত মাতার জন্য অকৃত্রিম বেদনা বোধ; তিনি যেন ভারতমাতারই প্রতিচ্ছবি; (৩) বারাণসীর গংগাবক্ষে রাসবিহারীর মধ্যে বিপ্লবীর দৃঢ় প্রত্যয়। অন্তরের আগুন এমন করিয়া চাপিয়া রাখা—বাহিরে মুখচ্ছবিতে সংযত প্রশান্তি—শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীতেই সম্ভব।—ইহা ভুলিবার নয়। আর ভুলিবার নয়—বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের ভারত স্বাধীন করিবার জন্য সেই সময়কার উৎসাহ। ভারতীয় ছাত্রগণ সবাই যে পূর্ব হইতে কোন বিপ্লবীদলভুক্ত ছিল—তাহা নহে। কিন্তু বাংলার নেশন্যাল কলেজের ছাত্রগণ সবাই এবং অন্যান্য ছাত্রগণ জার্মান যুদ্ধ বাধিলে,—ভারতে যাও, বিদ্রোহের কথা প্রচার কর, এই আহ্বানে সাড়া দিল। ইহাতে সর্বত্র মন্ত্রগুপ্তি (যাহা সাফল্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন) রক্ষিত হয় নাই, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক অনেককেই চঞ্চল করিয়াছিল। তবে পূর্ব হইতে সুসম্বদ্ধ কেন্দ্রীয়শক্তিসম্পন্ন সংস্থা না থাকায় অনেক শক্তির অপচয় হইয়াছে—সাফল্যলাভ সম্ভব হয় নাই। তথাপি প্রবাসী ভারতীয় যুবক ছাত্রদের সেই দিনের দেশের ডাকে ফিরিবার চাঞ্চল্য ভুলিতে পারি না।"—শান্তিনিকেতনের কৃষিবিভাগের শ্রীকেদারেশ্বর গুহের বিবৃতি।

জাপানে রাসবিহারী

১৯১৫ সালে রাসবিহারী জাপানে চলিয়া যান। রাসবিহারী জাপানে আছেন জানিয়াই—টোকিওস্থ বৃটিশদূত জাপ-গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন রাসবিহারীকে গ্রেফ্তার করিয়া দিতে। সেই সময় জাপান বৃটিশের মিত্র। রাসবিহারীর সংগে এই সময়েই জাপানের Black Dragon Societyর Prof. Toyamaর পরিচয় হয়। তিনি রাসবিহারীকে আশ্রয় দেন—এবং রক্ষা করিবেন, বলেন। একদা—রাসবিহারীর অনুসন্ধানে পুলিশ ঐ বাড়ীতে

গেলে—বাড়ীর পশ্চাৎ-দ্বার দিয়া তাঁহাকে সরাইয়া দেন। জাপান গবর্ণমেণ্টকে এই Black Dragon Societyই চাপ দেন—যেন রাসবিহারীকে পুলিশ গ্রেফ্‌তার না করে। পুলিশও আর বেশী আগ্রহ লইয়া তাঁহার সন্ধান করে না। ইতিমধ্যে রাসবিহারী Prof. Toyamaর কন্যাকে বিবাহ করিয়া জাপানী নাগরিকের অধিকার পান। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা যে বাকী তাহা কখনো ভোলেন না।

২৫ বৎসর পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ আসিতেই রাসবিহারী জাপানী war officeএ গমন করিয়া Marshal Sugiyamaর সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং ভারতবর্ষ বৃটিশের হস্তগত থাকিতে প্রাচ্যে বৃটিশকে পরাজিত করা যাইবে না—সেই হেতু জাপানের উচিত হইবে—ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজ বিতাড়নের ব্যাপারে ভারতবাসীকে অস্ত্র সরবরাহ করিয়া সাহায্য করা। মার্শাল প্রথম রাসবিহারীর প্রস্তাবে সম্মত হন না—ভারতের যুদ্ধে লিপ্ত হইতে চাহেন না। কিন্তু war officeএর কোন কোন সদস্য রাসবিহারীর প্রস্তাব সমর্থন করেন। তারপর টোজো সমর্থন করিলে—জাপ-গবর্ণমেণ্ট রাসবিহারীর প্রস্তাবই সমর্থন করেন। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে রাসবিহারী টোকিওতে প্রাণত্যাগ করেন। দুইটি ছেলে আছে—স্ত্রী পূর্বেই মারা যান।

* * * *

বস্তুতঃই বাংলার বিপ্লবী দলের কর্মীরা অভ্যুত্থানের দিনটির (১৯১৫-২১শে ফেব্রুয়ারী) আগমনের জন্য তৈয়ারী হইয়া থাকে। খাকী প্যাণ্ট জামা তৈরী হইয়া গেল—থানাগুলি একই সংগে দখল করিয়া লইবার প্ল্যান হইল। সেই শুভদিনের আশায় প্রহর গণিতে লাগিল সবাই।—সেই কামনার দিন ২১শে ফেব্রুয়ারী। কৃপাল সিং নামক একটি সৈনিককে গবর্ণমেণ্ট হাত করে। সে-ই ২১শে তারিখের সংবাদটি পুলিশে দেয়। পুলিশ সন্ধান পাইয়াছে বলিয়া রাসবিহারী—তারিখটি ২ দিন আগাইয়া দেন—১৯শে ফেব্রুয়ারী। ২১শে তারিখের পরিবর্তে ১৯শে দিন ধার্য করা হইল বলিয়া সকলকে জানাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু কৃপাল সিং এই পরিবর্তিত তারিখটিও জানে এবং কালবিলম্ব না করিয়া গোপনে গিয়া সংবাদটি বলিয়া দেয়। কৃপাল সিং সেনাবারিকেই ছিল। তাহার সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহের উদ্রেক হইলেও—সেনাবারিকে তাহাকে হত্যা করিলে সব প্রয়াসই পণ্ড হইবে বলিয়া তাহা করা হয় নাই—তবে তাহাকে

চোখে চোখে রাখা হইত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এক সুযোগে সে সংবাদটি যথাস্থানে পাঠাইতে সক্ষম হয়। (এই ঘটনার প্রায় ২৫ বৎসর পরে কৃপাল সিংকে হত্যা করা হইয়াছিল।) ঐ দিনই পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট সৈন্যদের স্থানান্তরিত করিতে আরম্ভ করেন। পাঞ্জাবের সর্বত্র দোষী-নির্দোষী-নির্বিশেষে ধর-পাকড় আরম্ভ হইল। তখনো রাসবিহারী লাহোরে। কিন্তু পাঞ্জাবে থাকা আর সম্ভব নয় বলিয়া বিনায়ক রাও কাপলেকে লইয়া রাসবিহারী কাশীতে চলিয়া আসেন।' শচীন সান্যাল ও কৈলাসপতিকে তিনি বাংলায় পাঠাইলেন। রাসবিহারী ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে কাশীতে আসেন। সেখান হইতে চন্দননগর হইয়া কলিকাতা এবং কলিকাতা হইতে তখনকার চন্দননগর-অনুশীলন মিলিত দলের গোপন আশ্রয়স্থল নদীয়ার বাসায় আসেন। নদীয়ায় 'ঠাকুর' অনুকূল চক্রবর্তী ছিলেন। নদীয়া হইতে ঢাকা কেন্দ্রে অর্থের জন্য লোক প্রেরণ করেন। যথাসময়ে লোক ও অর্থ আসে। রাসবিহারী অতঃপর সহকর্মীদের পরামর্শক্রমে জাপান চলিয়া যাওয়াই স্থির করেন। বিদেশে যাইবার জন্য শচীন-গিরিজা প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে অনুরোধ করেন।

রাসবিহারীকে রক্ষা করাই তখন দলের নিকট প্রধান প্রশ্ন হইল। তিনি যদি বিদেশে গিয়া বিদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন—তাহা হইলে এখনো বিদ্রোহ সম্ভব করা যায়। উত্তর ভারতের সৈন্যশ্রেণীর উপর কঠোর নিগ্রহের ফলে আপাততঃ সৈন্যদের সাহায্য তেমন সম্ভব হইবে না। তাই জাপান যাওয়াই স্থির হইল, কারণ জার্মানীর সাহায্য জাপান ও পূর্ব এসিয়া হইতেই গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। রাসবিহারী ভারত ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পূর্বে বলিয়া গেলেন: সংস্থা রক্ষা করুন। ছেলেদের দলভুক্ত করিতে থাকুন। সৈন্যদের মধ্যেও সংযোগ রক্ষার চেষ্টা রাখিবেন—খুব সন্তর্পণে। গোপন ঠিকানাগুলি ঠিক করিয়া লইলেন—কিছু কিছু নূতন ঠিকানাও লইলেন। অতঃপর 'ঠাকুর' পরিবারের (P. Tagore) লোকের পরিচয়ে—শচীন্দ্র ও গিরিজা দত্ত তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। যে-জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য তাঁহার দেহ-মন অর্পিত ছিল—সেই জন্মভূমি হইতে সেই তাঁহার শেষ বিদায়। তাঁহার অবশিষ্ট জীবন যদিও ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দানের সুমহান কার্যেই ব্যয়িত হইয়াছে, তথাপি আর তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি ভারতে ফিরিয়া আসা সম্ভব হয় নাই।

রাসবিহারী তাঁহার আত্মকথায় 'ঠাকুর' অর্থাৎ অনুকূল চক্রবর্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কাশী হইতে চন্দননগর আসেন। বলেন—আমাদের দলের বাড়ী ছিল নবদ্বীপে। সেখানে ঠাকুরের (এই ঠাকুর ঢাকা অনুশীলনের অনুকূল চক্রবর্তী) বাসায় থাকিলেন। ঠাকুরকে রাসবিহারী ঢাকা গিয়া টাকা লইয়া আসিতে বলিলেন। ঠাকুর ঢাকা চলিয়া গেল এবং গিরিজাকে (রাসবিহারী কথিত স্নেহের গিরিজাকে) রাসবিহারীর আগমন সংবাদ দিয়া নবদ্বীপ পাঠাইল। প্রতাপ সিংহও ঐখানে আসে। প্রতাপ সিং মারা গিয়াছে। পরে কি ভাবে শচীন ও গিরিজার সাহায্যে তিনি টাগোর নামে পরিচয় দিয়া জাপান যান, 'আত্মকথায়' তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। বিদেশ হইতে প্রভূত অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া সাফল্যজনকভাবে বিপ্লব সংঘটনই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। একটা জীবন অপেক্ষা যে একটা রিভলবারের মূল্য বেশী ইহাই তিনি মনে করিতেন; রাসবিহারী তাহারই উল্লেখ করিয়া 'আত্মকথায়' বলেন :—"এই অস্ত্রের অভাবেই তো আয়োজন ব্যর্থ হইয়াছে। সিপাহীদের অস্ত্রই ছিল আমাদের ভরসা। সিপাহীদের লইয়া অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইলেও,—অস্ত্র থাকিলে আমরা অসামরিক জনগণের দ্বারা বিপ্লব ঘটাইতে পারিতাম। কারণ আমাদের সংহতি ছিল, প্রভূত লোকবল ছিল। ছিল না অস্ত্র। এরপর অভ্যুত্থানের উদ্যোগে অসামরিক জনগণের হাতে হাতে অস্ত্র দিব।"—রাসবিহারীকে তুলিয়া দিতে শচীন ও গিরিজাবাবু দুইটি পিস্তল সংগে নিয়াছিলেন। যাত্রার সময় রাসবিহারী বলেন—উহা রাখিয়া যাও। কিন্তু তাঁহারা বলেন—তোমাকে বাঁচাইবার জন্য ইহা লইয়াছি। রাসবিহারী বলেন,—"আমার জীবন রক্ষার জন্য ও-দুইটা রিভলবার খোয়ানো যায় না।" অস্ত্রের অভাব যে রাসবিহারী কিরূপ তীব্রভাবে বোধ করিতেছিলেন—এই উক্তি তাহারই প্রমাণ। ইহারই জন্য ইহার উল্লেখ করা হইল।

১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভারতে যেমন বিদ্রোহ ঘোষণার পরিকল্পনা হয়—তেমনি কাবুলে এক ষড়যন্ত্র হয়। জার্মানীর সাহায্যে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, সুফী অম্বাপ্রসাদ, এবং অজিত সিং বার্লিন হইতে তুরস্কে আসেন। তুরস্ক হইতে তাঁহারা কাবুলের আমীরের নিকট পরিচয় পত্র লইয়া আসেন। আমীর কোন সাহায্য-দানে সম্মত হন না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সহানুভূতি ছিল, তাই তাঁহাদের ধরিয়া দিয়া ইংরেজকে খুসী করেন নাই। সেখানেও তাঁহারা একটা অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট খাড়া করেন। স্থির হয় ১৯শে ফেব্রুয়ারী ভারতের সিপাহীরা

যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে তখন পশ্চিম দিক হইতে তাঁহারাও আক্রমণ করিবেন। ভারতের অভ্যুত্থান-প্রয়াস ব্যর্থ হয়, বহু ধরপাকড় চলে। তখন আমীরও ভারতীয় বিপ্লবীদের গ্রেফ্‌তার করা প্রয়োজন বোধ করেন। মহেন্দ্রপ্রতাপ ও অজিত সিং তখন বাধ্য হইয়া পারস্যে চলিয়া যান। সুফী অম্বাপ্রসাদকে কাবুল গবর্ণমেন্ট গ্রেফ্‌তার করেন। অম্বাপ্রসাদের কারাগারেই মৃত্যু হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য রাসবিহারী লাহোর ধর-পাকড়ের পরেও একেবারেই আশা ত্যাগ করেন নাই। ধর-পাকড়ের পরিণাম লক্ষ্য করিবার জন্য অপেক্ষা করেন এবং সন্ধান লইবার জন্য কাশী হইতে লাহোরে লোক প্রেরণ করেন। কর্তার সিং ও হরনাম সিং রাসবিহারীকে বলেন—একবার কাবুলে গিয়া সংবাদ লইয়া আসা যাক। তাঁহাদের তখনো আশা ছিল বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে মৃতজাতির প্রাণ উদ্দীপ্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহারা সিপাহীদের মধ্যে যখন বিপ্লব প্রচার করিতেছিলেন—তখন সিপাহীদেরই কেহ তাঁহাদের ধরাইয়া দেয়। সীমান্ত অতিক্রম করিবার পূর্বেই তাঁহারা ধৃত হন। রাসবিহারী প্রথমটায় দ্বিধা করিতেছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের একান্ত নির্বন্ধাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত অনুমতি দেন :—যাও, কিন্তু খুব সাবধানে।—পিংলে লাহোরে তখনো বিপ্লব-কার্যে রত ছিলেন। কর্তার সিংয়ের গ্রেফ্‌তারের পর পিংলে প্রত্যাবর্তন করেন। লাহোর হইতে কাশী ফিরিবার পথে পিংলে মীরাট কেল্লার সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লব-বীজ ছড়াইতেছিলেন।—সেই কেল্লার মধ্যেই এক বাক্স মারাত্মক বোমা সমেত পিংলে ধৃত হন। একজন বিশ্বাসঘাতক মুসলমান সৈনিক—আগ্রহ করিয়া তাহাদের ব্যারাকে ডাকিয়া নিয়া—মহাপ্রাণ মহারাষ্ট্রীয় যুবক গণেশ দত্ত পিংলেকে ধরাইয়া দেয়। এই এক বাক্স বোমাসম্পর্কে ভারতগবর্ণমেণ্টের অভিমত—"Sufficient to annihilate half a regiment."

জার্মান ষড়যন্ত্র অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর জার্মান গবর্ণমেণ্ট ভারতে বৃটিশ শক্তিকে আঘাত হানিবার জন্য ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্যে তৎপর হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, বিদেশস্থ ভারতীয়দের নিকট ভারতে বিপ্লব প্রয়াস সম্পর্কে নানা কথা শুনিয়া এবং সংবাদপত্রে বাংলার বিপ্লবীদলের বিপ্লবাত্মক কাজকর্মের সংবাদ পাঠ করিয়া জার্মান গবর্ণমেণ্টও মনে করেন—বিপ্লবীদের দ্বারা বৃটিশ শক্তির অন্যতম মূল উৎস নষ্ট করা যাইবে।—স্থির হইল, একদিকে সানফ্রান্সিস্কোয় গদরদল কাজ করিবে। উহার কেন্দ্র হইল—ব্যাংককে। গদরদলের শিখদের লইয়া এই কেন্দ্র কাজ চালাইবে। ব্যাটাভিয়াতে হইল আর একটি কেন্দ্র। এই কেন্দ্র বাংলার বিপ্লবীদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করিবে। এই দুই কেন্দ্রের ভার ছিল সাংহাইস্থ কন্সাল জেনারেলের উপর। ওয়াশিংটনের জার্মান এম্বেসীর নির্দেশে কাজ হইত। আবার ওয়াশিংটনের জার্মান এম্বেসী বার্লিন কর্তৃপক্ষের (ভারতে বিপ্লবী দলকে সাহায্য প্রেরণ ও আনুষংগিক কাজের জন্য বিশেষ অফিসার নিযুক্ত হয়) নির্দেশে কাজ করিত। জার্মানরা অস্ত্র সাহায্য পাঠাইবে—প্রায় একই সময়ে অনেকে ভারতে এই সংবাদ লইয়া আসে। জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ইউরোপ হইতে ১৯১৫ সালে বোম্বাই পৌছান। তাঁহার সংগে পূর্ব হইতেই বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির সংযোগ ছিল। তিনি আসিয়া তাঁহাকে জানান যে জার্মান অস্ত্র-সাহায্য পাওয়া যাইবে।—এই জন্য ব্যাটাভিয়াতে বাংলার বিপ্লবীদলের একজন প্রতিনিধির অবিলম্বে যাওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে নরেন্দ্র ভট্টাচার্যকে (মানবেন্দ্র রায়) ব্যাটাভিয়ায় পাঠানো হয়। এবং অস্ত্র আসিলে উহা গ্রহণ করার জন্য নায়ক যতীন্দ্রনাথ তাঁহার নেতৃত্বাধীন দলবল লইয়া উদ্যোগী হন। এই সকল কার্য ও যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনবোধ হইতে—যতীন মুখার্জীর নির্দেশে ১২ই জানুয়ারী ও ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯১৫ সাল) গার্ডেনরীচ ও বেলেঘাটায় ডাকাতি করিয়া মোট ৪০০০০৲ টাকা সংগৃহীত হয়।[১] ভোলানাথ

১ অতুলকৃষ্ণ ঘোষ বলেন :—যতীন্দ্রনাথ তাঁহাদের ডাকিয়া নির্দেশ দেন—'সাত দিনের মধ্যে আমার এক লক্ষ টাকা চাই।' প্রথম ডাকাতির চেষ্টা (গড়বেতায়) ব্যর্থ হয়। পরে 'গার্ডেনরীচ,' এবং তাহার পর বেলেঘাটায় ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়।

চ্যাটার্জি পূর্বেই শ্যাম দেশে ছিলেন। অন্যসূত্রে ঐ একই সময়ে ১৯১৫ এপ্রিলে অবনী মুখার্জিও জাপানে গমন করেন। পূর্বোক্ত গার্ডেনরীচ ও বেলেঘাটার ডাকাতির সূত্র ধরিয়াই ধরপাকড় আরম্ভ হয়। এই সময়ই যতীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশ্বস্ত সহকর্মী চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, রাধাচরণ পরামাণিক প্রভৃতির সঙ্গে পাথুরিয়াঘাটার বাড়ীতে আত্মগোপন করিয়া ছিলেন। পূর্ব-পরিচিত জনৈক নীরদ হালদার ঐ বাড়ীতে সহসা উপস্থিত হইয়া 'যতীনদা' বলিতেই যতীন মুখার্জি হুকুম দেন 'shoot'—গুলি কর। প্রকাশ, মাদারীপুরের রাধাচরণই তৎক্ষণাৎ গুলি করে। নীরদ গুলির আঘাতে দিন কয় পরে হাঁসপাতালে মারা যায়। যাই হোক—নীরদের হত্যা বা গুলিমারার পরে যতীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশ্বস্ত সংগীদের লইয়া ঐ রাত্রেই অন্যত্র সরিয়া পড়েন। 'জার্মান-প্লট' কার্যকরী করার দায়িত্ব তখন তাঁহার উপর। জার্মানী হইতে অস্ত্র আসিলে সেই সকল অস্ত্র গ্রহণ ও বণ্টন (বণ্টন ও অস্ত্র রক্ষা করার সমস্যা সামান্য নয়। দেখা গিয়াছে, রডার পঞ্চাশটা মাত্র বন্দুক—মসার পিস্তল, লুকাইয়া রাখাই সম্ভব হয় নাই। যাহা লুকাইয়া রাখা গিয়াছিল, তাহাও বাংলার বিভিন্ন দলের নিকট পাঠাইতে হইয়াছে।)—প্রভৃতি গুরুতর কার্য পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন করার গুরুদায়িত্ব লইয়াই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কলিকাতার সন্নিকটে বাগনান—(অতুলচন্দ্র সেন বাগনান স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন, তাঁহার আশ্রয়ে বাগনান যান) পরে মহিষাদল (মহিষাদলে থাকাও সম্ভব হয় নাই) এবং তৎপর অপেক্ষাকৃত নির্জন পল্লী কাপ্তিপোদায় গমন করেন। বালেশ্বরে Universal Emporium নামে সাইকেলের দোকানটি, কলিকাতায় Harri & Sons-এর মতো বিপ্লব কার্য সাধনের জন্যই পূর্ব হইতে বিদ্যমান ছিল।

১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে এস, এস, ম্যাভারিক জাহাজ ক্যালিফোর্ণিয়ার সানপেড্রো বন্দর হইতে যাত্রা করিল। এদিকে নরেন্দ্রনাথ ব্যাটাভিয়াতে পৌঁছিয়া জার্মান কন্সাল থিওডর হেলফেরিকের সংগে সাক্ষাৎ করেন। হেলফেরিক নরেন্দ্রনাথকে জানান যে ম্যাভারিক জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রওনা হইয়াছে—করাচী যাইবে। করাচী হইতে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করা এবং বাংলায় আনা সম্ভব নহে, সেখানে কোন সংস্থাও ছিল না, তাই নরেন্দ্রনাথ হেলফেরিককে বলেন—জাহাজ করাচীতে না পাঠাইয়া বাংলায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন। এই প্রস্তাব সাংহাইস্থিত জার্মান কন্সালকে জানাইলে তিনি সম্মত হন এবং

তদনুযায়ী ব্যবস্থা হয়। নরেন্দ্রনাথ ওরফে মার্টিন সুন্দরবনের অন্তর্গত রায়-মংগলে জাহাজ ভিড়িবার প্রস্তাব করিয়া আসেন। মার্টিন জুনমাসে ভারতে ফিরিয়া জাহাজ রায়মংগলে আসিবে বলিয়া যতীন্দ্রনাথকে জানান। ম্যাভারিক জাহাজ ৩০ হাজার রাইফেল এবং উহার উপযোগী ৬০ লক্ষ কার্তুজ এবং ২ লক্ষ টাকা লইয়া আসিতেছে সংবাদ পাওয়া গেল। যতীন্দ্রনাথ, যাদুগোপাল মুখার্জি, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, ভোলানাথ চ্যাটার্জি, অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী জাহাজ হইতে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করার আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেন। পরামর্শে স্থির হয়, হাতিয়াদ্বীপে কতক অস্ত্র যাইবে—কতক থাকিবে কলিকাতায়—কতক বালেশ্বরে।

সিডিশান কমিটির মতে এইরূপ পরামর্শও হইল যে—'তিনটি প্রধান রেল লাইনের নির্দিষ্ট স্থানের সেতু উড়াইয়া দেওয়া হইবে। যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর হইতে মাদ্রাজ লাইনের, ভোলানাথ চ্যাটার্জি চক্রধরপুরে থাকিয়া বেংগল নাগপুর লাইনের, সতীশ চক্রবর্তী অজয় হইতে ই আই রেল লাইনের সেতু উড়াইয়া দিয়া বা ভাংগিয়া দিয়া সংযোগপথ ছিন্ন করিয়া দিবেন যাহাতে বাংলার বাহির হইতে কোন সৈন্য না আসিতে পারে। কলিকাতার দল নরেন ভট্টাচার্য ও বিপিন গাংগুলির নেতৃত্বে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী স্থানের অস্ত্রগুলি কাড়িয়া লইবে পরে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করিয়া লইবে। ম্যাভারিক জাহাজে যে সকল জার্মান সেনানায়ক আসিবেন—তাঁহারা পূর্ববংগে থাকিয়া সেখানে সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিবেন—এবং তাহাদের সামরিক শিক্ষাদান করিবেন। যাদুগোপাল মুখার্জি রায়মংগলের এক জমিদারের সংগে বন্দোবস্ত করেন। (কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, খুলনার বিপ্লবী নেতা সতীশ চক্রবর্তীই সুন্দরবন রায়মংগলে যোগাযোগ স্থাপন করেন। কারণ ঐ অঞ্চল তাঁহারই বিশেষ জানা ছিল।) জমিদার লোকজন ও আলো দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। ম্যাভারিক রাত্রে আসিবে।' ম্যাভারিক নির্দিষ্ট রকমে বাতি জ্বালাইবে—যাহাতে বিপ্লবীরা বুঝিতে পারে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত, বহু বিনিদ্র রজনীর কামনার ধন ম্যাভারিক আসিয়াছে। বিপ্লবীগণ রায়মংগলে নৌকা লইয়া দশদিন অপেক্ষা করিল। কিন্তু সকল কল্পনা কল্পনাই থাকিয়া গেল—ম্যাভারিকই আসিল না। আসিল তো নাই, কেন আসিল না, কেন আনুমানিক সময়ও উত্তীর্ণ হইয়া গেল—(তখন জুনের শেষ) কিছুই জানা গেল না।

পরে ৩রা জুলাই ১৯১৫ সালে ব্যাংকক্ হইতে একজন বাঙালী আসিয়া খবর দেয় যে শ্যামের জার্মান কন্‌সাল একটি 'বোটে' ৫০০০ রাইফেল বাংলায় পাঠাইতেছে। বাংলার বিপ্লবীরা এই সংবাদে মনে করিল এই জাহাজ ম্যাভারিকের পরিবর্ত্তে আসিতেছে। যাহাতে পূর্বপরিকল্পনা মতই জাহাজটি আসে তাহা হেলফেরিককে জানাইবার জন্য বাঙালী দূতটিকে ব্যাটাভিয়া হইয়া ব্যাংককে ফিরিয়া যাইতে বলা হইল। এই দূতটি প্রকৃতপক্ষে ব্যাংককের উকিল কুমুদনাথ বলিয়া মনে হয়। এই কুমুদনাথই বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে জাহাজ সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ সরবরাহ করেন। এই জুলাই মাসেই গবর্ণমেণ্ট জার্মান অস্ত্র গ্রহণের উত্তমের বিষয়ে সব জানিতে পারেন, এবং সংগে সংগেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করিয়া ফেলেন। ৭ই আগষ্ট কলিকাতায় হ্যারি এণ্ড সন্‌স্ তল্লাস হইল। এই ঠিকানায় জার্মান কন্‌সাল সাংহাই হইতে কয়েক কিস্তিতে ৪৩ হাজার টাকা (draft=ড্রাফ্‌ট) প্রেরণ করেন। এই টাকার মধ্যে মাত্র শেষ কিস্তি ১২ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্ট আটক করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ৩১ হাজার টাকা বিপ্লবীদের হস্তগত হয়। বলা বাহুল্য, এই ফার্মটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানরূপে কাজে লাগাইবার জন্য হরিকুমার চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানে বিপ্লবীরাই খুলিয়াছিলেন। হ্যারি এণ্ড সন্‌সেরই যেন একটি শাখা এই রূপে বালেশ্বরে ইউনিভার্সাল এম্‌পোরিয়ম খোলা হইয়াছিল। ৺শৈলেশ্বর বসু ও গোপাল নামক একটি যুবক ওখানে ছিলেন। পুলিশ ষড়যন্ত্রের খবর জানিয়া ফেলিয়াছে—তাই অন্যতম বিশিষ্ট বিপ্লবী ভোলানাথ ১৩ই আগষ্ট বোম্বাই হইতে হেলফেরিককে জাভার ঠিকানায় টেলিগ্রামে 'সাবধান' করিয়া দেন। এবং নূতন অবস্থায় কি করা যায়—সেই বিষয়ে হেলফেরিকের সংগে পরামর্শ করার জন্য ১৫ই আগষ্ট নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ব্যাটাভিয়ায় রওনা হইয়া যান। যতীন্দ্রনাথ সন্ধান লইবার জন্য ভূপতি মজুমদারকেও পাঠান। ভূপতি বাবুকে সিংগাপুরে জাহাজের মধ্যেই গ্রেফ্‌তার করা হয়। ভূপতিবাবুর সংগে ফণী চক্রবর্ত্তী ছিলেন। ভূপতিবাবু এই সম্পর্কে বলেন, 'ষড়যন্ত্রের কথা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সবই জানিয়া ফেলিয়াছিল ; এবং জাল বিছাইয়া রাখিয়াছিল। আমরা গিয়া সেই জালে ধরা পড়িয়াছি মাত্র।'

ইহারই মাত্র ১৮ দিন পরে ৪ঠা সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে ইউনিভার্সাল এম্‌-পোরিয়ম কলিকাতার পুলিশ তল্লাস করে এবং কতিপয় বিপ্লবী নিকটেই

আছেন সন্দেহ করিয়া অনুসন্ধান কার্য চালায়; ফলে ৬ই সেপ্টেম্বর কাপ্তিপোদায় যে বাড়ীতে যতীন্দ্রনাথ, নীরেন প্রভৃতি আত্মগোপন করিয়াছিলেন তাহা তল্লাস করা হয়।* এই গৃহে পুলিশ সুন্দরবনের ম্যাপ ও পেনাংএর একটি সংবাদপত্রের 'কাটিং' পায়—ইহাতে 'ম্যাভারিকে'র সংবাদ ছিল। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন ও নীরেন্দ্রসহ পূর্বেই সরিয়া গিয়াছিলেন। তিনি চিত্তপ্রিয় এবং জ্যোতিষকে সংগে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাদের গোপন আশ্রয় তহিলদার দিকে গেলেন। এখন পাঁচজন (যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন, জ্যোতিষ) একত্র হইয়া চলিতে লাগিলেন। গ্রামবাসীরা পিছন লইল। তাহাদের ছত্রভংগ করার জন্য বিপ্লবীরা কেহ পিস্তল ছোঁড়েন, একজন আহত হয়। কিন্তু অনুসরণকারীদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। অতঃপর বুড়িবালাম তীরে ৯ই সেপ্টেম্বর আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন পুলিশবাহিনী এবং পল্লীবাসীদল দুইদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। পলায়ন অসম্ভব দেখিয়া অতঃপর সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুবরণ করার সংকল্প লইয়াই যতীন্দ্রনাথ সংগিগণসহ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিলেন।[১] যতীন্দ্রনাথের এই সংগ্রাম ও মৃত্যুবরণের সংবাদ সংগে সংগেই বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে সংগ্রাম করিয়া মরিবার প্রেরণাদান করিল। এখানেও লক্ষ্য করা যাইতেছে, ৪ঠা হইতে ৯ই—এই ৫।৬ দিন, তাঁহারা যথেষ্ট সময় পাইলেও ঐ অঞ্চলে বিপ্লবী সংস্থার কেন্দ্র, কর্মী ও সমর্থক যথেষ্ট না থাকায়—তাঁহারা পাঁচজন সশস্ত্র হইয়াও ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে পৌছিতে পারেন নাই। যে অঞ্চলে তাঁহারা ছিলেন, ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরাই

* যতীন্দ্রনাথের একান্ত অন্তরঙ্গ, ঐ সময়কার অক্লান্ত বিপ্লব-নিষ্ঠ কর্মী শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষ এই সম্পর্কে বলেন : 'হ্যারি এণ্ড সন্স-এর নামে যে ড্রাফ্‌ট আসে তাহা একজন বিশিষ্ট বিপ্লবী ব্যাঙ্ক হইতে ভাঙ্গাইবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ড্রাফ্‌ট ভাঙ্গাইয়া হাজার টাকার নোট লইয়া আসেন। হাজার টাকার নোটে নম্বর আছে—বিপদ ঘটিতে পারে বুঝিয়া বদলাইয়া আনেন একশত টাকার নোট। ঐ সময়ের একশত টাকার নোটেও নম্বর ছিল। ঐ নোটের নম্বর হইতেই পুলিশ হ্যারি এণ্ড সনস্ ও বালেশ্বরের ইউনিভার্সাল এমপোরিয়াম-এর যোগাযোগ ধরিয়া ফেলিতে সক্ষম হয়। বালেশ্বরের গোপন কেন্দ্র অতিশয় সংগোপনে রক্ষা করা হইয়াছিল। নোটের সূত্র না থাকিলে পুলিশের পক্ষে এতো সহজে উহার সন্ধান পাওয়া সম্ভব ছিল না। এই নোট আনার ভুল ও অনভিজ্ঞতার দরুনই যতীনদার মত একটা মহান্ জীবনের অবসান ঘটিয়া গেল।'

১ এই সংঘর্ষ ও মামলার বিবরণ স্থানান্তরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

তাঁহাদের 'ডাকাত' মনে করিয়া বা জার্মান চর মনে করিয়া অথবা কৌতূহলে পিছু লইয়াছে, পুলিসকে সাহায্য করিয়াছে।

এদিকে নরেন্দ্রনাথের (মার্টিনের) কোন সংবাদ নাই। ভোলানাথ চ্যাটার্জি (B. Chatterton) গোয়াতে গিয়া ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯১৫, মার্টিনের ব্যাটাভিয়ার ঠিকানায় নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করেন: কেমন আছ—কোন সংবাদ নাই,—অত্যন্ত চিন্তিত। "How doing—no news; very anxious—B. Chatterton." এই তার হইতেই পুলিশ গোয়াতে অনুসন্ধান চালায় এবং তাহার ফলে দুইটি বাঙালীকে গ্রেফ্‌তার করে—তন্মধ্যে একজন ভোলানাথ চ্যাটার্জি। ভোলানাথ পুণাজেলে সপ্তাহ দুই কি তিন থাকিয়া তথায় ২৭শে জানুয়ারী, ১৯১৬, আত্মহত্যা করেন।

প্রকৃতপক্ষে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী হইতে তাহাদের তৈলবাহী জাহাজ 'ম্যাভারিক' সানফ্রানসিস্কোর একটি জার্মান ফার্ম (এফ. জেবসন এণ্ড কোং) ক্রয় করিয়া লয়। ম্যাভারিক কোনপ্রকার মালপত্র না লইয়া খালিই যাত্রা করে। উহার খালাসী সব ভারতীয়ই ছিল। গদর দলের লোকও বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকাসহ (বিপ্লবী হরি সিংও ছিলেন) এই জাহাজে আসে। কথা ছিল ম্যাভারিক 'এ্যানিলারসেন' নামক জাহাজ হইতে নির্দিষ্টস্থানে অস্ত্র লইবে। এ্যানিলারসেন হইতে বন্দুকাদি তুলিয়া লইয়া ম্যাভারিকের কাপ্তান অস্ত্রগুলি কেরোসিন-ট্যাংকে ডুবাইয়া রাখিবে। কিন্তু ম্যাভারিকের সংগে এই এ্যানিলার-সেনের দেখাই হইল না। ম্যাভারিক এইভাবে বৃথা ঘুরিয়া কয়েক সপ্তাহ পরে জাভা আসে। জাভাতে ডাচ্‌ কর্তৃপক্ষ ম্যাভারিক তল্লাস করেন—কিন্তু পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, ঐ জাহাজ খালিই ছিল।—এ্যানিলারসেন জাহাজের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যদিও ঐ জাহাজেরও অস্ত্র লইয়া এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে মেক্সিকোতে উপস্থিত থাকিবার কথা—কিন্তু দেখা গেল ঐ জাহাজ ১৯১৫ সালের শেষভাগে আমেরিকার ওয়াশিংটন এলাকায় আসিয়া পৌছে। সেখানে আসিতেই মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট উহাকে আটকায়। অবশ্য ওয়াশিংটনস্থ জার্মান দূত এই ষ্টীমারের উপর দাবী উপস্থিত করেন। কিন্তু মার্কিন গবর্ণমেণ্ট ঐ দাবী গ্রাহ্য করেন না। এ্যানিলারসেনে কি পরিমাণ অস্ত্র ছিল তাহা জানা যায় নাই। ম্যাভারিকের দূরবস্থা হৃদয়ংগম করিয়া হেলফেরিক ব্যাটাভিয়াতে ঐ জাহাজের খালাসীদের বাঁচাইবার চেষ্টা করেন, এবং তাহাদের আমেরিকায়

পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। হরি সিং নামক একজন শিখ ম্যাভারিকের যাত্রীদের তালিকায় ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ (মার্টিন) হরি সিংএর পরিবর্তে ঐ নামের যাত্রী হন। হরি সিং ব্যাটাভিয়ায় থাকিয়া যান। অবশ্য মার্টিন আমেরিকায় পৌছাইলে—তাঁহাকেও গ্রেফ্‌তার করা হয়। ম্যাভারিকের অস্ত্র আমদানীপর্বের এইখানেই সমাপ্তি ঘটে। বিপ্লবীদলের উক্ত প্রয়াসে আপাততঃ যবনিকা পড়ে।

অপর একটি জাহাজ 'হেনরী এস্'-এর কাহিনী এইরূপ। ম্যানিলা হইতে এই জাহাজ অস্ত্র লইয়া সাংহাই অভিমুখে রওয়ানা হইবে কথা ছিল। সিকাগো হইতে গদর দলের হেরম্ব গুপ্ত ম্যানিলাতে জার্মান-আমেরিকান বোহেম ও উইদিকে সংবাদ পাঠান যে তাঁহারা যেন 'হেনরী এস্' জাহাজের আরোহী হন। উদ্দেশ্য ছিল 'হেনরী এস্' ব্যাংককে কিছু অস্ত্র নামাইয়া দিবে এবং শ্যাম-ব্রহ্ম সীমান্তে বোহেম ভারত আক্রমণের জন্য বিদ্রোহীদের অস্ত্রশিক্ষা দিবেন। বোহেমকে ম্যানিলায় জার্মান দূত এইরূপ নির্দেশও দেন যে—'হেনরী এস্'-এর অবশিষ্ট ৪৫০০ মসার পিস্তল চট্টগ্রামে পাঠাইতে হইবে। কিন্তু ব্যাটাভিয়ায় যাইবার পথেই বোহেম সিংগাপুরে ধৃত হন। বোহেম, হেরম্ব গুপ্ত, উইদি প্রভৃতির বিরুদ্ধে সিকাগোতে এক ষড়যন্ত্রের মামলা চলে এবং তাঁহারা দণ্ডিত হন। এই জার্মান ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় পরে হেলফেরিকের সাহায্যে পুনরায় অস্ত্র প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। স্পষ্টতঃই দেখা যায় এই ব্যবস্থায় রাসবিহারীর যোগাযোগ রহিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, রাসবিহারী ১৯১৫ সালের মে মাসেই জাপান পৌছান। সাংহাইতে তিনি জুন-জুলাই মাসে ছিলেন। এই সময়ে অবনী মুখার্জি যে তাঁহার সংগে সাক্ষাৎ করেন এবং বিপ্লব-চেষ্টা চালান—তাহার বিবরণ অবনীর বিবৃতি হইতেও পাওয়া যায়।

ম্যাভারিকের প্রয়াস ব্যর্থ হইলে পর যে আরো জার্মান অস্ত্র বোঝাই জাহাজ প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা এইরূপ :—একখানা জাহাজ সাংহাই হইতে বরাবর হাতিয়া আসিয়া পৌছিবে—১৯১৫ সালের ডিসেম্বরের শেষভাগে। ডাচ্ বন্দরে একটি মালবাহী জার্মান জাহাজ ছিল সেটিও বাংলায় আসিবে। তৃতীয় একটি ষ্টীমার (যুদ্ধজাহাজ) অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই মালবাহী জাহাজ লইয়া আন্দামানের

দিকে আসিয়া পোর্টব্লেয়ার আক্রমণ করিবে—তথাকার জেলখানা হইতে বিপ্লবী বন্দীদের মুক্ত করিয়া আনিবে, সেখান হইতে রেংগুনে পৌছিয়া রেংগুন আক্রমণ করিবে।

রাসবিহারী সাংহাইয়ে জার্মান নিলসনের বাড়ীতে ছিলেন। দুইজন চীনাম্যানকে তিনি নিয়োগ করেন। কলিকাতার শ্রমজীবী সমবায়ের অমরেন্দ্র চ্যাটার্জির ঠিকানায় কতগুলি রিভলবার এবং কতক টাকা পাঠাইবারও ব্যবস্থা হইয়াছিল, মনে হয়। কারণ, নিলসন ও চীনাম্যানদের শ্রমজীবী সমবায়ের নাম জানার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এই ঠিকানা যে রাসবিহারী দিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অবনীকে রাসবিহারী কলিকাতা, ঢাকা, কুমিল্লা ও চন্দননগরের ঠিকানা দিয়াছিলেন। রাসবিহারীর বিশ্বস্ত সহকর্মী ঢাকা সমিতির নগেন্দ্র দত্ত (ওরফে গিরিজাবাবু) তখনও ধৃত হন নাই—তাঁহারও নাম উক্ত নোট বই-য়ে ছিল। নিলসনের ৩২নং ইয়াংসিপু রোড-এর ঠিকানা দিয়াছিলেন (উহাই তখন রাসবিহারীরও ঠিকানা)। অবনীর নোট বই-য়ে পাকো শ্যাম-এর ইঞ্জিনিয়ার অমর সিং-এর নামও ছিল। এই পাকো-শ্যামেই 'হেনরী এস্' জাহাজের অস্ত্র পৌছাইয়া দিয়া যাইবার কথা ছিল। এই অমর সিং মান্দালয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। রাসবিহারী সাংহাই হইতে যে ভারতে অস্ত্র-প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য অবনীকে যাবতীয় নির্দেশ দান করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, এবং ভারতের বিপ্লবীদের সংগে জার্মানীর যোগাযোগ স্থাপন করেন, তথা জার্মান গবর্ণমেণ্টের সংগে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অবনীর ঐ মারাত্মক নোটবই সহ সিংগাপুরে গ্রেফ্‌তার হওয়ার ফলে জার্মান অস্ত্র আমদানী করিয়া বিপ্লব ঘটাইবার দ্বিতীয় প্রয়াসে চূড়ান্ত যবনিকা পড়িল।

সিডিশন কমিটি এই জার্মান ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বলিতেছেন:—'এই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও কর্মনীতি অনুধাবন করিলে এই সিদ্ধান্তই হইবে যে, বিপ্লবীরা জার্মান সাহায্য প্রাপ্তি ও তাহার সুযোগ গ্রহণ সম্বন্ধে খুবই আশান্বিত ছিল—আর জার্মান গবর্ণমেণ্ট বিপ্লবীদলের সংস্থা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া যুদ্ধকালে তাহাদের সুযোগ লইতে গিয়াছিলেন।'

এই সম্পর্কে অবনী মুখার্জির উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

অবনী মুখার্জি লিখিত বৈদেশিক অংশ*

বাংলার বিপ্লববাদীদের কর্মপ্রচেষ্টার একটা অংশ আমাদের দেশে গোপনই আছে: অবশ্য সে অংশের সকলখানি কথাই ভারত গভর্ণমেণ্ট জানেন। বিদেশের সেই চেষ্টার পরিচয় সংক্ষেপে দিলাম।

মাণিকতলা বোমার মামলার চার বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯১০ সালেই বাংলার বিপ্লববাদীরা বিশেষরূপে ভাবিতে লাগিল যে বোমার দ্বারা আর যাহা হউক না কেন দেশকে সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের কবল হইতে মুক্ত করা সম্ভব হইবে না। স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে তাহার জন্য লোকবল ও বর্তমান যুদ্ধের উপকরণ বিশেষ দরকার। এই কারণে তাহারা ইংরাজবিরোধী বিদেশীয় অন্যান্য জাতির নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া সম্ভবপর কিনা তাহার জন্য সচেষ্ট হয়।

জনকয় বিপ্লববাদী বিপ্লবের জন্য টাকা, যুদ্ধের উপকরণ এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে বিদেশে কর্মরত থাকেন। তন্মধ্যে হরদয়াল, বীরেন চ্যাটার্জি, বরকতুল্লা, ডাঃ ভূপেন দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ কর ও অবনী মুখার্জি প্রভৃতি ছিলেন। ইহাই বিপ্লব সংগ্রামে এক নূতন (ডিপ্লোম্যাটিক) যুগের সূচনা করিল। অবশ্য ইঁহাদের আগে ম্যাডাম কামা, তারকনাথ দাস প্রভৃতি ভারতের স্বাধীনতার কথা চারিদিকে প্রচার করিতেছিলেন কিন্তু তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের সহিত সাক্ষাৎভাবে কোন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষরূপে স্থাপন করিতে পারেন নাই।

"জগতের জাতিসমূহের মধ্যে ভারতেরও একটি স্থান ও কর্তব্য আছে। তাই তাহার স্বাধীনতা অপহৃত হওয়ায় জাগতিক ব্যাপারের উন্নতির পক্ষে সে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"—এই কথাটা বুঝাইতে, বিদেশের স্বার্থ-বুদ্ধিকে জাগ্রত করিতে বিপ্লববাদীরা চেষ্টা করিল।

* অবনী মুখার্জি ১৯২২ সালে পুনরায় ভারতে আসিয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বাংলায় বিপ্লববাদ দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য তাঁহার জানিত বৈদেশিক অংশ লেখক তাঁহাকে লিখিতে বলেন ; এই অংশ অবনীরই স্বহস্তে লিখিত। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা সংযোজিত হইল।

—গ্রন্থকার

আমেরিকায় পৌঁছিয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র করের মুখ্য কর্তব্য হইল তথাকার জনসাধারণের মধ্যে ভারতের কথা প্রচার এবং 'গদর' সমিতির সহিত 'হাতে হেতেড়ে' কাজ করা। বিগত মহাযুদ্ধের সময় যখন প্রেসিডেণ্ট উইলসন 'চৌদ্দ দফা সর্তের' সৃষ্টি করেন সেই সময় এই সুরেন্দ্র করই তাহার মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার দাবীর উল্লেখ করিবার জন্য প্রেসিডেণ্টকে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায়ই (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টির) 'গদর' সমিতি ভারতে বিপ্লব সাধনের জন্য তিন লক্ষেরও অধিক টাকা এবং বহু লোক পাঠাইতে পারিয়াছিল। এই চেষ্টায় শ্রীযুক্ত করের প্রেরণা ছিল। অপর দিকে বিশ্ব শক্তির সাহায্যে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মরক্কোতে অশান্তির আগুন (Agadir ব্যাপার) লক্ষ্য করিয়া এবং জার্মানীর সহিত ইংরাজ ও ফরাসীর যুদ্ধের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া অবনী মুখার্জি এবং অপর কোন কোন বিপ্লবী বিদ্যার্থীরূপে বার্লিনে চলিয়া যান—উদ্দেশ্য, ভারতে বিপ্লবের জন্য এই ঘটনা-চক্রের সুযোগ গ্রহণ। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি জার্মানীর রয়াল হাউসের তদানীন্তন Chamberlain Count Von Wehdeর সহিত পরিচিত হন এবং জার্মান গবর্ণমেণ্টের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ভারতীয় বিপ্লববাদীদের জন্য অর্থ ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হন।[১] কিন্তু ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের প্রকৃতি—তা সে জার্মান, ফরাসী, ইংরাজ, মার্কিন, জাপানী যে কোনও জাতিরই হউক না কেন, চায় অন্য ইম্পিরিয়ালিজ্‌মকে বিতাড়িত করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা। কেবলমাত্র কোন পতিত জাতির স্বাধীনতার জন্য তাহারা মাথা ঘামাইতে চায় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ভারতে জার্মানীর অধিকার বিস্তারের কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া জার্মান গবর্ণমেণ্ট বাঙালী বিপ্লবী মুখার্জির কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অধিকন্তু যে জার্মানী ইংরাজের ভয়ানক শত্রুরূপেই পরিচিত সেই জার্মানীই মুখার্জীকে বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িল না এবং অবশেষে তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। এইরূপে বাংলার বিপ্লববাদের 'ডিপ্লোম্যাটিক' যুগের প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

তারপর আসিল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ইউরোপীয় মহাসমর। ইহার প্রারম্ভ ভাগে কতিপয় বাঙালী বিপ্লববাদী, যুগান্তরের প্রথম সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের

---

১ অবনী 'অপর কোন কোন বিপ্লবী'র নামোল্লেখ গোপনতার জন্য অথবা কেন করেন নাই তাহা স্পষ্ট নহে।

নেতৃত্বাধীনে বার্লিনে ছিলেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মুক্তির জন্য ভূপেন্দ্রনাথ, অবনী প্রভৃতি বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া যুদ্ধ ঘোষিত হইবার সংগে সংগেই জার্মান গবর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ হইলেন। কিন্তু জার্মান গবর্ণমেণ্টের দৃঢ় বিশ্বাস এ যুদ্ধে পশ্চিম সীমান্তে তাঁহাদের জয় অবশ্যম্ভাবী এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষ ইংরাজের কবলমুক্ত হইয়া তাঁহাদের হাতে আসিয়া পড়িবে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া এবারেও বিপ্লববাদীদের প্রস্তাব তাঁহারা উপেক্ষা করেন। কিন্তু "মার্ণে"র পরাজয় দুর্ধর্ষ জার্মান যোদ্ধ্‌গণের চক্ষে 'জ্ঞানাঞ্জন' পরাইয়া দিল। কেন্দ্রীকৃত বৃটিশ শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য এইবার তাঁহারা বংগীয় বিপ্লববাদীদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য তাঁহাদিগকে সর্বপ্রকার সহায়তা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কিন্তু প্রচুর অর্থদ্বারা সাহায্য করা সত্ত্বেও নানাকারণে, ও জার্মানীর আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার অভাবে সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইল এবং আন্দোলন পর্যন্ত ধ্বংস হইয়া গেল।

জার্মান গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করিবার প্রস্তাবে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইল, ভূপেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বিদেশস্থ সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় তাহা শুধু বাংলার বা বাঙালীর আন্দোলন রহিল না—তাহা সমগ্র ভারতের জন্য সর্বভারতীয় আন্দোলন হইয়া পড়িল। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার মনসুর, হরদয়াল, ধীরেন্দ্র সরকার প্রভৃতি স্বনামখ্যাত বিপ্লববাদীদিগকে একত্র করিয়া সুচারুরূপে কার্য পরিচালন উদ্দেশ্যে একটি কার্যকরী সভা 'বার্লিন কমিটি' গঠিত হইল। বার্লিনস্থিত ভারতীয় ছাত্রগণের মধ্য হইতে কর্মী সংগৃহীত হইতে লাগিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবাসী মাত্রকেই উত্তেজিত করিবার জন্য যথোপযুক্ত অর্থসহ তাঁহাদিগকে দুনিয়ার সকল মুল্লুকেই পাঠান হইল, যাহাতে আসন্ন বিপ্লবে যোগ দিতে সকলে ভারতে চলিয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে কতক ১৯১৫ সালের জানুয়ারীতে ভারতে পৌঁছিলেন। এই জাতীয় দূতদিগের মধ্যে যিনি ১৯১৪ সালের শেষ দিকে ভারতে আসিলেন তিনি (কেদারেশ্বর গুহ—১৯১৪ অক্টোবর) রাসবিহারীর সহিত দেখা করিলেন।* রাসবিহারীর সংগে তখন অনুশীলন সমিতির ব্যাপক সংস্থা ও শিখ সৈন্য, শিখ বিপ্লববাদী প্রভৃতি বিপুল জনবল ছিল; বিপ্লবকে প্রকট করিবার জন্য প্রাণে তখন তাঁহার অর্থ ও

* স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

অস্ত্রশস্ত্রের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অন্যদিকে যতীন্দ্রনাথও (বালেশ্বরের খণ্ড যুদ্ধে নিহত) তাঁহার নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বিপ্লবীদল লইয়া জার্মান অস্ত্র গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

দেশীয় সৈন্যদের সহায়তায় বাংলার বিপ্লববাদীরা মহারাষ্ট্রীয় পিংলে প্রভৃতির সহযোগে যে ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহের চেষ্টা করিয়াছিল—তাহা ১৯১৫ সালের প্রথমভাগেই পণ্ড হয়। সমগ্র উত্তর ভারতের সেনাবারিকে বিপ্লবকথা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। লাহোরের ধরপাকড়ের পর সৈন্যদের মধ্যে একটা ভয়ের সঞ্চার হয়। বিপ্লববাদীদের কৃতকার্যতা সম্বন্ধে তখন তাহাদের নৈরাশ্য আসিয়া পড়িয়াছে। বহু শিখ সৈন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। তখন আর সৈন্যদের মধ্যে তেমন সুবিধা করা যাইবে না মনে করিয়া রাসবিহারী এ সময় জাপান গমন করেন। নরেন্দ্রনাথ যায় ১৯১৫ এপ্রিলে বাটাভিয়ায়, আর অবনী মুখার্জি এপ্রিলে জাপান যায়।

রাসবিহারী ১৯১৫ সালে ভারতের উপকূল পরিত্যাগ করেন। (এপ্রিলের শেষদিকে অথবা মে'র প্রথম দিকেই রাসবিহারী ভারতের উপকূল পরিত্যাগ করেন। শচীন্দ্র সান্যাল লেখেন, 'এপ্রিলে' ষ্টীমারে তুলিয়া দেন। 'রাসবিহারী ১৯২২ সালে আত্মজীবনীতে লেখেন, ১২ মে ষ্টীমারে উঠেন। শচীনের 'এপ্রিল' মাস ভুল হইতে পারে, রাসবিহারীরও ভুল হইতে পারে। তবে নির্দিষ্ট '১২' তারিখ উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় রাসবিহারী জাপানে পৌছিয়াই নোট রাখিতেন। সুতরাং ইহাই নির্ভুল।) অবশ্য বিপ্লববাদীরা তখনও ভরসা একেবারে ছাড়ে নাই। বিদেশের দিকে সকলে তাকাইয়া রহিল। দুইমাস অতীত হইয়াছে, রাসবিহারীর কোন খবর আসিল না। তিনি নিরাপদে পৌছিয়াছেন এই সামান্য খবরটুকু যাঁহারা জানিলেন তাঁহারাও তাহা অপ্রকাশ রাখিলেন। অবনী জাপানে পৌছিয়া রাসবিহারী ও ভগবান সিং প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন।

পূর্বেই স্থির হইয়াছিল, অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ তিনখানি জাহাজ ও কতিপয় জার্মান Expert ভারতে প্রেরিত হইবে। এই নির্ধারণ অনুসারে Maverick, Henry S এবং অপর একখানি জাহাজ যুদ্ধসম্ভারপূর্ণ হইয়া ভারতে বিপ্লবাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য আমেরিকা হইতে যাত্রা করিবে। এই সংবাদ লইয়া ভারতে লোক চলিয়া গেল। জার্মানীর সাহায্যলাভের সংবাদ পাইবামাত্র বৈদেশিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ভারতীয় বিপ্লববাদীগণ বুঝিয়া বসিলেন, তাঁহাদের

সোনার স্বপন একেবারে বাঞ্ছিত বাস্তবে পরিণত হইবে—এই চিন্তায় তাঁহাদের মাথা যেন গুলাইয়া গেল। তাঁহারা যথা-তথা নির্বিচারে কর্মী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইভাবে এই আন্দোলনে প্রবেশ করিল একদল অর্থলিপ্সু লোক। ব্যাংককের উকীল কুমুদনাথ মুখার্জী এইভাবে এই দলে আসিয়া পড়ে। শুধু টাকার খাতিরেই জাহাজ সম্বন্ধীয় কয়েকটি খবর সে ভারতে পৌছাইয়া দিতে স্বীকৃত হয়। যতীন্দ্রনাথ কিন্তু কুমুদনাথ কর্তৃক আনীত সামান্য খবরে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। অধিকন্তু টাকা আসিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া তিনি নরেন্দ্রকে জাভায় পাঠাইয়া দিলেন। নরেন্দ্র তথায় পৌছিয়া জার্মানীর তদানীন্তন অর্থসচিবের ভ্রাতা Helfferic-এর সংগে পরিচিত হন। তিনি নরেন্দ্রকে রাসবিহারীর পঞ্চাশ হাজার গিল্ডার্স (পঁয়ষট্টি হাজার টাকা) দেন। সে সময় রাসবিহারী সাংহাইএ। নরেন্দ্র টাকা ও জাহাজ পৌছিবার তারিখের সংবাদ লইয়া বাংলায় ফিরিয়া আসিলেন। যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ গ্রহণের বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু এ আয়োজনের সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়ায় বিপ্লববাদীদের কার্যপ্রণালী বদলাইতে হইল এবং সে সংবাদ লইয়া নরেন্দ্র পুনরায় জাভায় গেলেন। (ইতিমধ্যে যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর যুদ্ধে ১৯১৫-র ৯ই সেপ্টেম্বর সঙ্গীদের সহিত নিহত হইয়াছেন।)

পূর্বোক্ত কুমুদনাথের সঙ্গে নরেন্দ্রের বিরোধই ১৯১৬ সালের সর্বধ্বংসের কারণ।* নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় যাত্রায় জাভা আসার পর কুমুদনাথের সংগে টাকা পয়সা লইয়া কলহ হয়। এবং এই জন্যই কুমুদনাথ সিঙ্গাপুরে গিয়া যুদ্ধের উপকরণপূর্ণ জাহাজের খবরসহ অন্যান্য সকল কথাই ইংরাজকে বলিয়া দেয়। গুপ্ত সংবাদ সব বাহির হইয়া পড়ায় বৃটিশ সিংহ জাভার ক্ষুদ্র ডাচ্ গবর্ণমেণ্টের উপর এমন চাপ দিলেন যে তাহার ফলে তথায় জার্মান ষড়যন্ত্র অসম্ভব হইয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ নানা অছিলায় প্রথমে চীনদেশে চলিয়া গেলেন। তারপর আমেরিকায় গিয়া মেক্সিকোর বাসিন্দা হইলেন। এইরূপে বঙ্গীয় বিপ্লববাদীদের যুদ্ধসংক্রান্ত কর্মপ্রচেষ্টার একটা দিকের অবসান হইল।

কিন্তু আবারও চেষ্টা চলিল। রাসবিহারীর অনুসন্ধানে অবনী টোকিওতে

* কুমুদনাথকে তখন কলিকাতা লীড্ স্ট্রীটের পুলিশ হেপাজতে ১৯১৬ সালে বড় বড় পুলিশ অফিসারের সংগে দহরম মহরম করিতেও দেখা যায়। বিখ্যাত বিপ্লবী যোগেশ চাটার্জী ইহা দেখিয়াছেন, বলেন।

গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহা ছাড়া ম্যানিলা হইতে পলায়িত 'গদর' সমিতির পাঞ্জাবী নেতা ভগবান সিংএর সহিতও দেখা হইল। সাবরওয়াল প্রভৃতির ন্যায় আরও কয়েকজন পাঞ্জাবী ও বাঙালী বিপ্লবের জন্য কৃতসংকল্প হইয়া এই সময়ে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। জাপানে পৌঁছিয়া অবনী রাসবিহারীর নেতৃত্বে সকলকে সংঘবদ্ধ করিলেন এবং চীনদেশস্থিত জার্মানদিগকে জানাইলেন যে তাঁহারা তাহাদের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছুক। এই সংবাদ পাইয়া পিকিংএর জার্মান রাজদূত তাঁহার কতিপয় সহকর্মী ও Expert লইয়া এক ভোজ সভার আয়োজন করিলেন এবং জাপানে অবনী, রাসবিহারী ও ভগবান সিংকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ভগবান সিং ও রাসবিহারীর পক্ষে তখন চীনভ্রমণ নিরাপদ নহে, কারণ তত্রত্য ইংরাজ কর্তৃপক্ষ সন্ধান পাইবামাত্র ইঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতেন—Extra-territorial ক্ষমতা দ্বারা তাঁহারা ইচ্ছামাত্রেই এরূপ গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন। তজ্জন্য, এবং যদি চেষ্টা করিয়াও ঠিক সময় পৌঁছিতে না পারেন এই আশঙ্কায় তাঁহারা জনৈক ভারতীয়কে পূর্বেই তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে উক্ত ভোজসভায় প্রেরণ করেন। পিকিংএ ইঁহারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বেই জাপান হইতে অবনী ও ভগবান সিং সহ রাসবিহারী সাংহাই পৌঁছিলেন এবং তত্রত্য জার্মান কন্সাল কর্তৃক অভ্যর্থিত হইলেন। ইহার পরেই এক কনফারেন্স আহূত হইল। তাহাতে উপস্থিত থাকিলেন রাসবিহারী প্রভৃতি ভারতীয় বিপ্লববাদী, একাধিক জার্মান রাজদূত (Ambassador) ও কতিপয় Expert এবং এই সভাতেই অস্ত্রপূর্ণ জাহাজের এবং অর্থসমস্যার মীমাংসা হইল। কিন্তু বোধনেই বিসর্জনের বাজনাও বাজিয়া উঠিল—অবনী ভারতবর্ষে ফিরিবার পথে সিঙ্গাপুরে তাঁহার মারাত্মক নোটবুক সহ ধরা পড়িলেন। বঙ্গোপসাগরে বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ টহল দিতে থাকিল আর বাংলায় গৃহতল্লাসের ধুম পড়িয়া গেল।

অস্ত্রপূর্ণ যে তিনখানা জাহাজ বাংলার দিকে আসিতেছিল সেই জাহাজ গেল কোথায়? ব্যাপার হইয়াছিল এই :—"যে তিনখানা অস্ত্রপূর্ণ জাহাজের ভারতের দিকে আসিবার কথা ছিল তাহার মধ্যে যেখানি সত্যই এ পথে আসিতেছিল, ইংরাজ ক্রুজার H. M. S. Cornwall আন্দামানের নিকট সেখানি ডুবাইয়া দিল। অপর দুইখানি অর্থাৎ Henry 'S' ও Maverick এর কর্তারা মতলব আঁটিয়া সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতির দক্ষিণস্থ দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপে গিয়া অস্ত্রশস্ত্র

মেক্সিকোর প্রসিদ্ধ বোয়েটিয়া ভিলার নিকট বিক্রয় করিয়া টাকা পয়সা পকেটস্থ করিলেন। তারপর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে Helfferic জাহাজ দুইখানিকে আমেরিকান্ ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় ভারত ও জার্মানীর মধ্যে যে সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল, এইরূপেই তাহা নিঃশেষ হইল। এই সম্পর্কে জার্মানীর ইম্পিরিয়ালিষ্ট গবর্ণমেণ্ট নাকি তিন মিলিয়ন ডলারেরও অধিক (প্রায় এক কোটি টাকা) ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহা অবিকৃত সত্য যে এই টাকার কিয়দংশ কয়েকজন স্বার্থপর ভারতীয় তথাকথিত বিপ্লববাদী আত্মসাৎ করিয়াছে, তন্মধ্যে ধৃত চন্দ্র চ্যাটার্জীর নাম অনেকে বলেন, কিন্তু ইহার বেশীর ভাগটাই Helfferic Ruddemeer প্রভৃতি যে সমস্ত জার্মান এ সম্পর্কে আসিয়াছিল তাহাদের পকেটেই ফিরিয়া গিয়াছে।”

বিদেশে যে সকল বাংলার ও ভারতের বিপ্লবী ছিল তাহারা অনেকে অতঃপর বিদেশের mass movementএর দিকে আকৃষ্ট হয়। যে কারণেই হউক, বিদেশস্থ বাংলার বিপ্লববাদীদের কেহ কেহ রুশিয়ার সোভিয়েট দলে যোগ দেয়। কেহ কেহ সেখানে বিবাহ করিয়াছেন।—নরেন্দ্র ওরফে মানবেন্দ্র বা ‘মার্টিন’ ইংরাজকন্যাকে (বর্তমান নাম শান্তি দেবী) বিবাহ করিয়াছেন। অবনী এক রুষীয় রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন। সিঙ্গাপুর কেল্লার বন্দীনিবাস হইতে পলায়ন করিয়া অবনী জাভায় আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সোভিয়েট ভাবের ভাবুক হইয়া তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য অবনী মুখার্জি জাভা পরিত্যাগের সংকল্প করেন। বিশেষতঃ জাভা গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অবস্থানের কথা জানিতে পারিয়া এরূপ ব্যবস্থা করিতেছিলেন যে আর তথায় থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। পলায়নের কোন উপায় না দেখিয়া ইউরোপ-যাত্রী জনৈক ধনবান ব্যক্তির ভৃত্যরূপে তিনি মস্কো চলিয়া যান। অবনী মস্কোতে পূর্ব হইতে আগত নরেন্দ্র ও অন্যান্য কয়েকজন বিপ্লববাদীর সঙ্গে মিলিত হন। অবনী এবং নরেন্দ্র কতিপয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন।

এই ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারীতেই রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে সুফী অম্বাপ্রসাদ ও অজিৎ সিংহকে লইয়া কাবুলে একটি অস্থায়ী ভারত গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়। এবং তাঁহারা স্থির করেন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ ভারতীয়

সিপাহীদের উত্থান দিবসে পশ্চিম সীমান্তের বন্দীদের সাহায্যে অভিযান আরম্ভ করিয়া ভারতে প্রবেশ করিবেন।

অবনী সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। তাহা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তবে ১৯২২ সালেও অবনী ও নরেন্দ্রনাথ সহকর্মীরূপে ছিলেন। একত্র পুস্তক প্রণয়ন করেন। পরে অবশ্য রুশিয়ার নিকট প্রতিপত্তি লইয়া উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। তাহা আমাদের আলোচ্য নহে।

বিপ্লব কর্মের ক্রমপরিণতি

১৯০৪-৫ সাল হইতে ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত গোপন প্রস্তুতির কাল। প্রস্তুত হইতেছি তাহা না জানান বা জানিতে না দেওয়াই ছিল রীতি। দৈবাৎ বাহিরের কেহ কিছুটা জানিয়া ফেলিলে তাহার ঐ জ্ঞান লুপ্ত করিয়া দেওয়াই ছিল নিয়ম।

প্রথম (১৯০৮) মাণিকতলা মুরারিপুকুর বাগানে পুলিস তল্লাস করিয়া কেবল বিপ্লবীদের গ্রেফ্‌তারই করে না—বন্দুক-পিস্তল-বোমা এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রও পায়। বিপ্লবীরা ধৃত হয়, বাধা দেয় না—সংগ্রাম করে না। তবে, গ্রেফ্‌তারের পরে মামলায় পক্ষ সমর্থন করে। বড় বড় ব্যারিষ্টার ধৃত ব্যক্তিদের নির্দোষ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। আসামীদের স্বীকারোক্তি না থাকিলে তাহাদের কাহারো কাহারো অস্ত্র আইনে হয়ত সাজা হইত। কিন্তু অনেকে মুক্ত হইতেও পারিত।

হাওড়ার ষড়যন্ত্র মামলায় বহু ব্যক্তিকে (তাহাতে কলিকাতার 'যুগান্তর', 'অনুশীলন' প্রভৃতি দলের নেতা ও কর্মী ছিলেন) গ্রেফ্‌তার করে। গ্রেফ্‌তারে বাধা দেওয়া হয় নাই, মামলায় আসামীদের নির্দোষিতা প্রমাণেরই প্রয়াস হয়। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায়ও আসামী গ্রেফ্‌তার কালে কেহ বাধা দেয় না। তবে দীর্ঘকাল মামলা চালায়। সেই বিপ্লবীরাই কিন্তু ১৯১৪ সালে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের জন্যই প্রস্তুত থাকিত, পুলিশকে বাধা দিত, দুই পক্ষেই গুলি চলিত। ইহা লক্ষ্য করিবার। প্রস্তুতির অধ্যায় অতিক্রম করিয়া বিপ্লবীরা যেন বিদ্রোহ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অধ্যায়ে পদক্ষেপ করিয়াছে বা করিতেছে। বালেশ্বরে, গৌহাটিতে,

সিরাজগঞ্জে, ঢাকার কলতা বাজারে, পাথুরিয়াঘাটায় এবং আরো অন্যত্র ইহার পরিচয় মিলিয়াছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইতেই বিপ্লবীরা প্রস্তুতি কালের গোপনতা পরিহার করিয়া 'আমরা বিদ্রোহী', 'বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছি',—এই ভাবে হৃদয় ভরিয়া লইয়া প্রস্তুত থাকিতেন। ধরিতে আসিলে পলাইবার পথ না থাকিলে ধরা না দিয়া, অস্ত্র থাকিলে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়াই তখন কর্মনীতি বলিয়া গণ্য হইল। তাই বলা চলে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিপ্লবীদের প্রথম শহীদ বালেশ্বরে নিহত চিত্তপ্রিয় ও যতীন্দ্রনাথ (নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জনের ফাঁসি হয়); এবং এই প্রথম যুদ্ধ কালেরই শেষ শহীদ হইল ঢাকা কলতা বাজারে পুলিসের সঙ্গে লড়াইয়ে (১৯১৮ সাল জুন মাস) নিহত নলিনী বাগচী ও তারিণী মজুমদার। ১৯১৫-১৯১৮ সাল পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধকালীন বিপ্লবী-উগ্রপ্রয়াসের প্রথম অঙ্ক বালেশ্বরের যুদ্ধ, প্রাণদান; দ্বিতীয় অঙ্ক গৌহাটির কুঠি-বাড়ীর যুদ্ধে বিপ্লবীদের জয়, পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করিয়া সশস্ত্র বিপ্লবীগণের অন্তর্ধান। ঐ অঙ্কেরই গর্ভাঙ্ক কামাখ্যাপাহাড়ে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবীদের সম্মুখ সংগ্রাম। ঐ সংগ্রামেও বিপ্লবীদের আংশিক জয় হয়। নলিনী বাগচী ও প্রবোধ দাশগুপ্ত শত্রু-বেষ্টনী ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে সমর্থ হয়। ইহা ছাড়া আরো সম্মুখ যুদ্ধ হইয়াছে। এমন কি, আগ্নেয়াস্ত্র না থাকিলে, লাঠিসোটা যাহা পাইয়াছে তাহা লইয়াই পুলিশ পক্ষকে আক্রমণ করিয়াছে। এই ধরণের প্রয়াস তখন বাংলার মতো বাংলার বাহিরেও চলিতেছিল। ক্ষেত্র সিংহ, জিতেশ লাহিড়ী, দীনেশ বিশ্বাস (১৯১৭) মজঃফরপুরে লড়াই করিয়াছে। আংশিক জয়লাভ করিয়াছে। ইহার পরবর্তী কালে ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩৪ পর্যন্ত সংঘর্ষ ও লড়াই অনেক হইয়াছে; তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

ভয়ভাঙা

বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম আবির্ভাব কালে পুলিশের নিপীড়ন দেশবাসীকে সন্ত্রস্ত করে, সন্দেহ নাই। সংবাদপত্রগুলিরও সাধ্য হইত না বিপ্লবীদের প্রশংসা করা, বা প্রশংসা বলিয়া গণ্য হইতে পারে এমন কিছু লেখা। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন যদিও অহিংস তথাপি উহাতে ছিল সংগ্রামশীলতা—ছিল ভয়ভাঙার প্রেরণা। সংবাদপত্রগুলিও অহিংসার নীতি রক্ষা করিয়া দেশের জন্য ত্যাগ ও বীরত্ব প্রভৃতিকে প্রশংসা করিতে অগ্রসর হইল। যাহা গোপনে লিখিত ও কথিত হইত এখন তাহা প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে (অবশ্য যথাসম্ভব আইন বাঁচাইয়া) লিখিত হইত। কখনো কখনো আইন লঙ্ঘিতও হইত। মহাত্মাজীর অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলন, যখন প্রবল এবং পরীক্ষিত সত্যরূপে স্বীকৃত, তখন দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির দিন প্রত্যূষে কলিকাতার ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রে এই শিরোনামা যখন দেখি—"Dauntless Dinesh Dies at Dawn", তখন এই সত্যই মনে হয়, "মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনবো বরাভয়"—বিপ্লবীদের এই আশা মিথ্যা হয় নাই।

এই ভয়ভাঙানো কার্যে ব্যাপক সাফল্য আনিয়া দেন শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিপ্লবী মহাত্মা গান্ধী, ভিন্ন পথে।

উগ্রতম প্রয়াস

বিপ্লবীদলের কার্যকলাপ একবার বৃদ্ধি পায় ১৯১৪ সালে, প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হইলে। একদিকে যেমন পুলিশের অত্যাচার, ধরপাকড় প্রভৃতি চলে, তেমনি চলে বিপ্লবীদের দুঃসাহসিক কার্যকলাপ, খুন-জখম, অর্থ সংগ্রহের দুঃসাহসিক প্রয়াস।

১৯১৫ সালের পরে বাংলার বিপ্লবীরা যেমন একদিকে মরিয়া হইয়া মরণ-মারণের পথে আগাইয়াছে তেমনি ইহারই মধ্যে Organisation বা সংস্থার

প্রসারে মন দিয়াছে। আশ্চর্য এই—এই সময়কার ভাঙাহাটেও দুর্গম পথযাত্রীদের অভাব ঘটে নাই। এই অবস্থা চলে ১৯১৮-১৯ সাল পর্যন্ত। আবার বিপ্লবীদের কর্মধারার প্রচণ্ডতা দেখা দেয় ১৯৩০ সাল হইতে। ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩১-৩২-৩৩-৩৪ সাল পর্যন্ত ইংরেজ রাজশক্তির মূলস্তম্ভগুলির উপর আঘাতের পর আঘাত পড়িতে থাকে। এই সময়কার কতগুলি কাজই অনেকটা ইংরেজের দ্বারা সন্ত্রাস-সৃষ্টির পাণ্টা হিসাবে বিপ্লবীদের সন্ত্রাসমূলক কার্য। 'অত্যাচার চালাও তো আমরাও জবাব দেবো',—অনেকটা এই ভাব। দেশে জবাব দিবার লোক আছে—দেশবাসীকে এবং ইংরেজকে ইহা জানানো।

১৯৩০ ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামের পর আরম্ভ হয় চট্টগ্রামের জের। তাহাও গুরুতর ব্যাপার। চট্টগ্রামের ঘটনার পরে—গবর্ণমেণ্ট আন্তঃপ্রাদেশিক মামলার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া জোর ধরপাকড় আরম্ভ করেন। ২৫০ জনের উপরে গ্রেফ্‌তার করা হয়। এই মামলায় মান্দ্রাজ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশ হইতে বহু কর্মীকে গ্রেফ্‌তার করিয়া আসামীভুক্ত করা হয়। গবর্ণমেণ্ট বহু সাক্ষী হাজির করেন।

পুরানো বিপ্লবী নেতাগণ প্রায় সকলেই ধৃত হইয়াছেন। অপেক্ষাকৃত নূতন কর্মিগণ এই সময়টাতে বিপ্লবদলের শক্তিবৃদ্ধি ও দলের প্রচারকার্যে অগ্রসর হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয় নেতাদের অবর্তমানে তরুণ কর্মীরা 'ঘর লইল' না, পথে পথেই বাসা বাঁধিল। এই সময়েই পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত, সীতানাথ দে প্রভৃতি আলীপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে পলায়ন (১৯৩১) করেন এবং অচিরেই কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হন। অন্তঃপ্রাদেশিক ও টিটাগড় মামলা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ

সরকারী প্রচণ্ডতম দমননীতির বিরুদ্ধে বিপ্লবীগণের অদম্য সাহসিকতার তথা দমননীতির পাণ্টা জবাব, সরকারী সন্ত্রাসের উত্তরে সন্ত্রাস সৃষ্টি, আঘাতের উত্তরে প্রত্যাঘাত লক্ষ্য করিবার। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় কঠোর ও অমানুষিক দমন নীতি চলিল। ইহার উত্তর দিতে হইবে—এই সংকল্প লইয়াই যেন বিপ্লব দলের যুবকেরা মরিয়া হইয়া প্রতিশোধের পথে আগাইয়া চলিল। পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিকারের আর কোন পথ না পাইয়াই যেন তাহারা পাণ্টা সন্ত্রাস সৃষ্টি করিতে চলিল। পুলিশী জুলুমের প্রধান পুরুষ টেগার্ট-এর উপর আক্রমণ হইল, যদিও আক্রমণ ব্যর্থ হয়। ঢাকায়

লোম্যান সাহেব নিহত হইলেন। মিঃ হড্‌সন্ গুরুতর আহত হইয়াও আশ্চর্যরকমে বাঁচিয়া যান। জেলের আই, জি সিমসন নিহত হইলেন। মেদিনীপুরে একে একে তিনজন ম্যাজিষ্ট্রেট নিহত হন। ঢাকা ও চট্টগ্রামে সৈন্য আমদানী করা হইল। নামে না হইলেও, কার্যতঃ একপ্রকার সামরিক আইনই চলিতে লাগিল। সরকারী জুলুমনীতিতে বিপ্লব-কর্মের উগ্রতা হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে—ইহাই দেখা গেল। এমনই সময়ে, যেন সুযোগ বুঝিয়াই পূর্ববাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সঙ্গে বিপ্লবীদের কোন সম্পর্ক না থাকিলেও, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা দ্বারা বৈপ্লবিক গতিপথে বিঘ্ন সৃষ্টি সম্ভব বলিয়া রাজশক্তি উহার প্রশ্রয় দিতেন। মুসলমান গুণ্ডাগণ হিন্দুপল্লী আক্রমণ করিলে হিন্দু যুবকগণ যখন বাধা দিতে, আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে তখন শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্ট-পুলিশ হিন্দু যুবকগণকেই গ্রেফ্‌তার করিয়াছে—নিগ্রহ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া ঢাকায় এবং অন্যত্রও ইহা দেখা গিয়াছে। তরুণ চিত্তে ইহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী রূপেই দেখা দেয়।

বীণা দাস বাংলার গবর্ণর জ্যাকসন সাহেবকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে পিস্তল লইয়া আক্রমণ করেন সরকারী দমন নীতিরই প্রতিবাদে। বীণা যে পরিবারের মেয়ে তাঁহাদের পক্ষে এই ধরণের কাজ কল্পনার বিষয়ও ছিল না। উজ্জ্বলা মজুমদার বাংলার গবর্ণর স্যার জন্ এণ্ডারসনকে দার্জিলিংএ খেলার মাঠে গুলি করার সহায়তা করার জন্য ধৃত হইল। কুমিল্লার শান্তি ও সুনীতি তখনকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টীফেন্‌সকে গুলি করিয়া হত্যা করে।

এদিকে প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারলুণ্ঠন মামলার আসামীদের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া চট্টগ্রামের সাহেবদের ক্লাব আগ্নেয় অস্ত্রদ্বারা আক্রমণ করিতে গিয়া মৃত্যু বরণ করে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারলুণ্ঠন মামলায় কল্পনা দত্তের কঠোর দণ্ড হয়। এ ছাড়া বহু বিপ্লবী মেয়ে কর্মীও অন্তরীণে আবদ্ধ থাকে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বাংলার উপর পুলিশের প্রচণ্ড দমন নীতির ফলে যুবকগণ তো মরিয়া হইয়া উঠিলই, বাংলার মেয়েরাও সেই সময়ে বিপ্লবী ভাইদের পশ্চাতে পড়িয়া থাকে নাই। মেয়েদের মধ্যে যাঁহারা বিপ্লব-বাদ প্রচার করেন তন্মধ্যে ঢাকার শ্রীসংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী লীলা নাগ (রায়) ও রেণুকা সেনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের সহকর্মিণীগণও অনেকে ধৃত হইয়া অন্তরীণে আবদ্ধ

থাকেন। ইহা ছাড়া কুমিল্লার বিপ্লবী কর্মী অমূল্য মুখার্জীর বোন পারুল মুখার্জী (টিটাগড় মামলায় ৫ বৎসর সাজা হয়), এবং সরোজ আভা নাগ, সাধনা বসু, বনলতা সেন, প্রতিভা ভদ্র, মায়া নাগ প্রভৃতি অন্তরীণে অবদ্ধ হন।

বিপ্লবী বি-ভি দলের প্রচণ্ডতম প্রয়াস

১৯৩০ সাল হইতে ৩১-৩২-৩৩-৩৪ সাল পর্যন্ত কতকগুলি বড় রকমের হত্যাকাণ্ড ও হত্যা প্রয়াস ঢাকার বি, ভি (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার) দলের নেতৃত্বে হয়। এই ব্যাপারে বিনয় বসু, বাদল ও দীনেশের সাহসিকতা বিপ্লব ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়।

ঢাকার বি, ভি (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার) দলভুক্ত বিনয় বসু ঢাকা মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ১৯৩০ সালের ২৯শে আগষ্ট ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে পুলিশের বিখ্যাত ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যান ও তাঁহার সঙ্গী ঢাকার পুলিশ সাহেব মিঃ হড্‌সনকে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের সম্মুখেই বিনয় রিভলভার হস্তে আক্রমণ করে। মিঃ লোম্যান নিহত হন—মিঃ হড্‌সন মারাত্মক রূপে আহত হন। বিনয় গুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে অদৃশ্য হইয়া যায়।[১] পলাতক হইয়াও বিনয় পুনরায় বৃটিশ শাসন শক্তির স্তম্ভগুলির উপর আঘাত হানিবার জন্য মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্প লইয়া অগ্রসর হয়। এবার বিনয়ের নেতৃত্বে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার দলেরই অপর দুইটি তরুণ দীনেশ গুপ্ত ও সুধীর গুপ্ত

১। ১৯৩০ সালে লোম্যানের হত্যার পর ঢাকার ছাত্রাবাসগুলি বিশেষ করিয়া মেডিক্যাল ছাত্রাবাসগুলিতে পুলিশী তাণ্ডব চলে। সেই অত্যাচার অবর্ণনীয়। অত্যাচারের ফলে ৫৩ জন মেডিক্যাল-ছাত্রকে ঢাকা হাসপাতালে ভর্তি হইতে হয়। বহু খানাতল্লাস ও তল্লাসের নামে পীড়ন চলে। ১৯৩১ সালে ২৮ অক্টোবর ম্যাজিষ্ট্রেট ডুর্ণোকে হত্যা করার জন্য গুলি বর্ষিত হয়। ডুর্ণো গুরুতররূপে আহত হন। কিন্তু এই উপলক্ষে ঢাকাতে যে ব্যাপক গৃহতল্লাস ও গৃহ-তল্লাসের নামে অকথ্য পুলিশী অত্যাচার ঘটে—বিশিষ্ট নাগরিকদের বহু গৃহে অত্যাচার হয়; ছাত্রাবাসের যুবকমাত্রকে মারধোর করে, খানাতল্লাস করিতে গিয়া লুণ্ঠনাদি অনুষ্ঠিত হয়—তাহার তুলনা নাই।

(বাদল) ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংস্‌এ দিনের বেলায় (মধ্যাহ্নে) হানা দেয়। এই বিপ্লবীত্রয় জেলের ইন্সপেক্টর-জেনারেল কর্ণেল সিমসনকেই তাঁহার অফিসে সর্বপ্রথম গুলির আঘাতে নিহত করে। পুলিশ বাহিনী ছুটিয়া আসে—উভয় পক্ষে গুলি চলে। কিন্তু যুবকত্রয় অতঃপর রাইটার্স বিল্ডিংস্‌এর বিভিন্ন অফিস কামরায় ঢুকিয়া আক্রমণ চালায়। জুডিশিয়াল সেক্রেটারী মিঃ নেলসন, মিঃ টাইসন প্রভৃতি আই-সি-এস অফিসারগণ বিপ্লবীদের গুলিতে আহত হন। এই সময় পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিংস্‌এর বারান্দায় পুলিশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল মিঃ ক্রেগ ও মিঃ টেগার্ট সদলবলে উপস্থিত হইয়া আক্রমণ চালায়। দীনেশের বাহুতে গুলি বিদ্ধ হইলেও দীনেশ গুলি চালাইতে থাকে। এই সম্মুখ যুদ্ধে বিপ্লবীদের গুলি নিঃশেষ-প্রায় হইলে বিনয় মৃত্যুবরণের নির্দেশ দেয়। সুধীর গুপ্ত (বাদল) পটাসিয়াম সায়নাইড গ্রহণ করিয়া পুলিশ আসিয়া ধরিবার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে। বিনয় ও দীনেশ (তাহারাও পটাসিয়াম সায়নাইড গ্রহণ করিয়াছিল) শেষ গুলিতে নিজেদের মাথার খুলি উড়াইয়া দিবার জন্য নিজ নিজ মস্তকে গুলি বিদ্ধ করে। তখন অচৈতন্য অবস্থায় তাহাদের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে লইয়া গিয়া বাঁচাইবার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করা হয়। দীনেশ চিকিৎসায় বাঁচিয়া যায়। কিন্তু বিনয় চাহিয়াছিল বিদেশী শাসনযন্ত্র তাহাকে ফাঁসি দিতে না পারে। তাই চিকিৎসার প্রয়াস ব্যর্থ করিবার জন্য ব্যাণ্ডেজ হইবামাত্রই বিনয় মস্তকের ক্ষত স্থানটি আঙুল দিয়া ঘাঁটিয়া সেপ্‌টিক করিয়া দেয়। পাঁচদিন পরে বিনয়ের মহামৃত্যু ঘটে। বিনয়ের বাবা রেবতী বসু ও মা ক্ষীরোদবাসিনী যখন বিনয়ের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া পৌছেন, তখন বিনয়ের জ্ঞান ছিল না।

হিন্দু যুবকগণের উপর সৈন্য ও পুলিশের অত্যাচারের ফলে তরুণ যুবক কত সহজে বিপ্লব-দলে যোগ দেয় এবং সর্বনাশা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মরণ-মারণের পথে আগাইয়া যায়, বিনয়ের পিতা রেবতীমোহন বসুর নিম্নোক্ত বিবৃতি তাহার প্রমাণ।

আমার দ্বিতীয় ছেলে বিনয়কৃষ্ণ বসু

"আমাদের দেশের বাড়ী, বিক্রমপুর রাউৎভোগ গ্রামে ১৩১৫ ২৬শে ভাদ্র রাত্রি ১২টার পর বিনয় জন্মগ্রহণ করে। তাহার স্বাস্থ্য বরাবরই বেশ ভাল ছিল,

এবং চেহারাও খুব সুন্দর ছিল। তাহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল যে সে কখনও কাহারও সহিত ঝগড়া-বিবাদ করিত না। কাজেই তাহার নাম "বিনয়" রাখায় আমি গর্ব অনুভব করিতাম। আমি শুধু জানিতাম যে সে নেতাজী সুভাষ বসুর অনুরাগী ছিল।

১৯৩০ সালে যখন ঢাকাতে বড়রকম Riot (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা) হয় তাহার অব্যবহিত পূর্বে শ্রীমান বিনয় গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার নিকট কটকে আসে। তাহার বিশেষ প্রিয় খাদ্য ছিল শিকার-লব্ধ মাংস। একটা D. B. Breach Loading Gun প্রায় ২০ বৎসর আমার ব্যবহারে ছিল। B. N. Rlyতে চাকুরী নেওয়ার পর আমার All India License ছিল। আমাকে বিশেষ অনুরোধ করায় আমি শ্রীমান বিনয় ও শ্রীমান বিমল ও কারখানার একটি কুলী সর্দার নিয়া মহানদীর অপর পারে শিকার করিতে যাই, যদিও তখন খুব গরম ছিল এবং শিকারের উপযুক্ত কোন পাখী পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। রেলওয়ে সাইড পিটে ২।৩টা পিপি শিকার করিবার পর আমি একটা পোলের নীচে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়ি এবং নিকটবর্তী গ্রাম হইতে জল আনিবার জন্য কুলী সর্দারকে পাঠাইয়া দিই। ইতিমধ্যে শ্রীমান বিমলকৃষ্ণ আসিয়া বলে যে নিকটে একটা পুকুর আছে, তাহাতে দুইটি পিপি আছে। শ্রীমান বিনয়কে বলিলাম—আমি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছি, কাজেই তুমি গিয়া দেখ শিকার করিতে পার কিনা। তাহাকে তখন বন্দুক ও ১নং ছড়া দিলাম। কিন্তু সে ৫০।৬০ ফুট দূরের পিপি শিকার করিতে পারিল না। আমি পরে আরও দুইবার আমার বন্দুকটি ব্যবহার করিতে দিয়াছিলাম। কিন্তু কোন খানেই সে কৃতকার্য হয় নাই। তাই আমি যখন জানিতে পারিলাম যে ইহার দুইমাস পরে মিটফোর্ড হাসপাতালে তাহার রিভল্ভার সট প্রত্যেকটি কৃতকার্য হইয়াছিল তখন আমি বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম।

শ্রীমান বিনয় তাহার হাসপাতালে ডিউটি আছে বলিয়া ১৯৩০ সালে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢাকা যাইবার জন্য আমাকে তাগিদ দেয়। তাহার দুইদিন পরে খবরের কাগজে ঢাকায় ভীষণ Riotএর খবর পাই। বিনয়এর স্থানীয় 'গার্ডিয়ান' ডাঃ সতীশচন্দ্র ঘোষ আমাকে জানাইলেন, তাঁহার দ্বিতীয় চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত যেন আমি শ্রীমান বিনয়কে না পাঠাই। পরে তাঁহার চিঠি পাইয়া ১৯৩০ সালের ১০ই জুলাই তাহাকে ঢাকা পাঠাইয়া দেই। তখন

বিনয় জানিয়া গিয়াছিল যে আমি Reductionএ পড়িয়াছি, কারণ টাকার অভাবে B. N. Rএর কটক কারখানায় সব কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যাইতেছে।

কটক জিলা স্কুল এবং গার্লস স্কুল আমার বাসা হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে ছিল। সেইজন্য ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাইবার জন্য আমি একখানা ঘোড়ার গাড়ী খরিদ করি। শ্রীমান বিনয় ঢাকা যাইবার পূর্বে জানিয়া যায় যে আমরা গাড়ীখানা বিক্রি করিবার চেষ্টা করিতেছি। তখন সে তাহার মাকে বলে—কেন তোমারা গাড়ী বিক্রি করিতেছ? আমি ডাক্তার হইয়া বাহির হইলে আমার একখানা গাড়ী লাগিবে। তোমরা যেখানে যাইবে তথায় বিনা পয়সায় গাড়ীখানা লইয়া যাইতে পারিবে। তখন তাহার মা বলিয়াছিল যে সে ডাক্তার হইয়া Practice করিতে চাহিলে, তখন কি আমরা তাহাকে একখানা গাড়ী কিনিয়া দিতে পারিব না। শ্রীমান বিনয় আরও বলে—তোমরা একবৎসর কোন রকমে চালাও; আমি ডাক্তার হইয়া বাহির হইলে বাবার আর চাকুরী করিতে হইবে না। ইহা জানিতে পারিয়া আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। এইরূপ মনোভাব থাকা সত্ত্বেও ঢাকা গিয়া বিপ্লবী দলের সহিত সে কি করিয়া যোগদান করিয়াছিল তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর।

ঢাকায় ঘোরতর Riot চলিবার সময় যখন একদিন শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু গুহ ও আমার ভ্রাতা শ্রীমান সূর্যকুমার বসু তাহাদের অফিসের কেরানীবাবুগণ সহ তাঁহাদের হেড অফিস হইতে ভয়ে বাদামতলী ষ্টীমার ঘাটে পালাইয়া আসিতেছিলেন তখন সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাদল কর্তৃক অখিলবাবু ও শ্রীমান সূর্য গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছিলেন এবং একজন কেরাণী সেইখানেই খুন হইয়াছিলেন। এই সংবাদ এবং অন্যান্য বহু গুরুতর অভিযোগের সংবাদ ঢাকায় গিয়া জানিতে পারাই হয়ত শ্রীমান বিনয়ের উত্তেজিত হওয়ার সত্য কারণ হইতে পারে। পুলিশের বড় কর্তাদের প্ররোচনায়ই এইসব সাম্প্রদায়িক খুন, জখম, লুট ও অগ্নি-সংযোগ হইয়াছিল বলিয়া ঢাকার হিন্দুদের বিশ্বাস। কাজেই আমার মনে হয় অন্যায় অত্যাচারের দরুণ বিপ্লবী দল পুলিশের বড় কর্তাদের উপরই প্রতিশোধ নেওয়ার পথ বাছিয়া লইয়াছিল। * * * *

আমরা যখন সকলে শ্রীমান বিনয়ের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া হাজির হই, তখন শ্রীমান অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। আমরা সকলে একে একে বহুবার ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও সে কোনরূপ সাড়া দেয় নাই। প্রায় ১৫।২০ মিনিট পরে যখন তাহার মা

তাহাকে ডাকিতেছিল, তখন আমাদের মনে হইল, সে বুঝিতে পারিয়াছে যে আমরা তাহাকে দেখিতে আসিয়াছি। কারণ তখন সে তাহার ডানহাতখানা উঠাইয়াছিল এবং রাখিতে না পারায় তৎক্ষণাৎ হাতখানা পড়িয়া যায়। কাজেই আমরা ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হই।

পরের দিন ১২-১২-৩০ তারিখে তাহাকে আবার আমরা দেখিতে যাই। সেদিনও শ্রীমান বিনয় অজ্ঞান অবস্থায়ই ছিল। বহু ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও তাহার কোন সাড়া-শব্দ পাই নাই। ডাঃ In charge আমাকে জানাইলেন, He is determined to die, as he did not take a single dose of medicine nor a single dose of diet. সেদিনও আমরা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হই।

যখন শ্রীমান বিনয়কে Writers Buildings হইতে Medical College Hospital-এ আনা হয় তখন তাহার জ্ঞান ছিল। তখন কয়েকজন C. I. D. পুলিশ আসিয়া বিনয়কে নানারূপ প্রশ্ন করিতে থাকে—যথা, সে কলিকাতায় কোথায় থাকিত, ঢাকার ঘটনার পর সে কোথায় কোথায় ছিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। শ্রীমান বিনয় তখন বিশেষ উত্তেজিত হইয়া বলে, "I have saved your five thousand rupees (বিনয়ের জন্য ৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত ছিল) and what more do you expect from me ?"

শ্রীমান বিনয় Medical College হাসপাতালে ১৩-১২-৩০ তারিখে অতি প্রত্যুষে (৬টার সময়) ভবলীলা শেষ করিয়া অমরধামে চলিয়া যায়। তাহার মৃতদেহ পাওয়ার জন্য শ্রীমান বিজয় Chief Presidency Magistrate-কে দরখাস্ত করিলে তিনি Order দেন যে রাত্রি ৮টার সময় মর্গ হইতে মৃতদেহ পাওয়া যাইবে, এবং আমার ছেলে বিজয়কে গ্যারাণ্টী দিতে হয় যে রাস্তায় আমরা কোনরূপ Demonstration করিতে পারিব না।

আমরা আমাদের লোকজন সহ রাত্রি ৮টার সময় মর্গে গিয়া উপস্থিত হই। কিন্তু পুলিশ রাত্রি ১০টা ১৫মি-এর পূর্বে আমাদিগকে মৃতদেহ দেন নাই। আমরা কোন রকম Demonstration না করা সত্ত্বেও যখন আমরা বিনয়ের মৃতদেহ নিয়া নিমতলা ঘাটের দিকে যাইতে থাকি তখন অসংখ্য লোক আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হয় এবং "বিনয় বসু কি জয়" বলিয়া চীৎকার করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে; আমাদের সঙ্গে যে সমস্ত পুলিশ ইনসপেক্টার ও পুলিশ কনেষ্টবল ছিল

তাহারা কোনও বাধা দেয় নাই। আমরা নিমতলা ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হওয়ার পর নিমতলা ঘাট লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন Nationalityর বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ ছিলেন। সকলের মুখেই এক কথা—"বিনয় বসু ও তাহার পিতামাতাকে দেখিতে চাই।"

একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—শ্রীমান দীনেশ গুপ্ত নিজেকে গুলি করিয়াছিল, কিন্তু গুলি তাহার মাথার skull-এর ভিতর ছিল। হাসপাতালে সেই গুলি অপারেসন্ করিয়া বাহির করা হয়। সে তখন বাঁচিয়া যায় এবং পরে তাহার ফাঁসী হয়। আমরা যে দিন শ্রীমান বিনয়কে দেখিবার জন্য হাসপাতালে যাই, তখন শ্রীমান দীনেশকে তাহার পাশের বেড-এ রাখা হইয়াছিল এবং সে আমাদের সকলকে দেখিতেছিল। কিন্তু তাহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ আমাদিগকে দেওয়া হয় নাই। ইতি—

শ্রীরেবতী মোহন বসু

জামসেদপুর, ১৯৫০ সালের ২০ অক্টোবর

* * *

দীনেশের পর মেদিনীপুর

মেদিনীপুরে দীনেশ গুপ্ত ছাত্ররূপে গমন করে, এবং তথাকার তরুণ ছাত্রগণের মধ্যে বিপ্লবমন্ত্র প্রচার করিতে থাকে। সেই বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই কতিপয় যুবক মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্প লইয়া মরণ-মারণের পথে পদক্ষেপ করে। ফলে ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল সরকারী বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে এক সভায় মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ প্যাডী বিপ্লবীর গুলির আঘাতে নিহত হন। গুলিবর্ষণের পর আক্রমণকারী যুবকগণ নির্বিঘ্নে সরিয়া পড়ে। কাহাকেও ধরা সম্ভব হয় নাই। কেবলমাত্র জনৈক ব্যক্তি বিমল দাশগুপ্তকে চিনিয়া ফেলে এবং বিমলের নাম পুলিশের কানেও উঠে। বিমলকে গ্রেফ্তারের জন্য হুলিয়া বাহির হয়। পুরস্কার ঘোষিত হয়। বিমল তখন ফেরারী। এই হত্যাকাণ্ডের উদ্যোক্তা—বি-ভি সংস্থার মুখপাত্রগণের বিবরণী হইতে নিশ্চিত ভাবে পরে জানা গিয়াছে, বিমল ও জ্যোতিজীবন ঘোষই রিভলবার হস্তে মিঃ প্যাডিকে আক্রমণ করে। জ্যোতিজীবনের নাম অপ্রকাশই রহিয়া যায়। বিমলকে গ্রেফ্তার করিবার পুলিশী সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। এই অকুতোভয় বিমলই ১৯৩১ সালের ২৯শে অক্টোবর ইউরোপীয় য়্যাশোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্সকে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের

গিল্যাণ্ডার্স হাউসে প্রবেশ করিয়া গুলির আঘাতে আহত করে। এ-যাত্রায় বিমলকে বন্দী হইতে হয়। বিচারে প্যাডি-হত্যা মামলায় সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে বিমল মুক্তি পায় ; কিন্তু ভিলিয়ার্স হত্যা চেষ্টার মামলায় বিমলের প্রতি দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়।

১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল মেদিনীপুরের আর একজন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগ্‌লাস দীনেশ গুপ্তের রিক্রুট বি-ভি দলভুক্ত তরুণ বিপ্লবীগণের দ্বারা নিহত হন। এই ঘটনা ঘটে জেলাবোর্ডের এক জনসভায়। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য তাহার সঙ্গীসহ যখন পলায়ন করিতেছিলেন, তখন সিপাহী শান্ত্রীগণ তাহাদের অনুসরণ করে। প্রদ্যোৎ ধরাপড়া অনিবার্য দেখিয়া তাহার সঙ্গীকে পলায়নের সুযোগ দিয়া ধরা দিবার জন্যই পিস্তল হস্তে রুখিয়া দাঁড়ায়। পরে জানা গিয়াছে প্রদ্যোতের সঙ্গীর নাম প্রভাংশু পাল। প্রদ্যোতের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলিলেও একটি গোপন কথাও পুলিশ পায় নাই। প্রদ্যোতের সঙ্গীর সন্ধান বাহির করিতে না পারিয়া পুলিশ প্রদ্যোতের অপর একটি (এ ব্যাপারে নির্দোষী) বন্ধুকে (ফণী দাস) গ্রেফ্‌তার করে, এবং তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। বিচারে প্রদ্যোতের ফাঁসী হয়—১৯৩৩ ১২ই জানুয়ারী। ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্জ নিহত হন। পুলিশ গ্রাউণ্ডে (ফুটবল খেলার মাঠে) বহু সিপাহী শান্ত্রীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপরোক্ত বি-ভি দলের মেদিনীপুরের কর্মী অনাথ পাঞ্জা সঙ্গীগণ সহ এই অসমসাহসিক কর্ম অনুষ্ঠান করে। মিঃ বার্জ চারজন ইংরেজ সঙ্গীসহ যখন মোটর গাড়ী হইতে নামিতেছিলেন—তখনই রিভলবার হস্তে অনাথ পাঞ্জা তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাহার অপর সঙ্গীরাও গুলি ছুঁড়িতে থাকে। মিঃ বার্জ নিহত হন। জোন্স সাহেব গুরুতর রূপে আহত হন। ততঃপর উপস্থিত শান্ত্রী-সিপাহীদের সঙ্গে আরম্ভ হইল বিপ্লবীগণের খণ্ড যুদ্ধ। অনাথ পাঞ্জা এবং মৃগেন দত্ত পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। তাহাদের অপর সঙ্গীরা শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া তখনকার মত পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেও, ঘণ্টা কয়েক পরেই ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মলজীবন ঘোষ, নন্দদুলাল সিংহ পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়। ধৃত এই সকল বিপ্লবীগণের উপরই কেবল অত্যাচার চলে না, মেদিনীপুর সহর জুড়িয়া চলে পুলিশী অত্যাচার। প্রকাশ নির্মলজীবনের ছোট ভাই নবজীবন পুলিশী অত্যাচারের ফলে মারা যায়।

স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে ব্রজকিশোর, রামকৃষ্ণ ও নির্মলজীবনের ফাঁসীর হুকুম হয় এবং নন্দদুলাল, কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেন, সনাতন রায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই ব্যাপারেরই সাপ্লিমেণ্টারী মামলায় শান্তি সেনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে ১৯৩৪ সালের ২৫শে অক্টোবর ব্রজকিশোর ও রামকৃষ্ণের এবং ২৬শে অক্টোবর নির্মলজীবনের ফাঁসী হইয়া যায়।

বিপ্লব প্রচেষ্টার দ্বিতীয় পর্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত খতিয়ান

১৯১৫-র পরে ১৯১৬ সালে খুব ধরপাকড় হয়। আবার ১৯১৭ হইতে '১৮ সাল পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত নূতন কর্মিগণকে অধিকতর সাহসের সঙ্গে বিপ্লব কর্ম পরিচালনা করিতে দেখা যায়। এই অবস্থায়ও কর্মক্ষেত্র যথেষ্ট বিস্তৃত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কর্মিগণ ছড়াইয়া পড়ে। তবে ১৯১৮ সালের পরে বাংলার বিপ্লববাদীদের আর বড় একটা অস্তিত্ব প্রকাশ পায় নাই। কর্মী অনেকেই ধৃত, দণ্ডিত; অনেকেই অন্তরীণে আবদ্ধ, অনেকেই ষ্টেট্ প্রিজনার, অনেকে খণ্ডযুদ্ধে মৃত—অবশ্য এর পরও জন কয় ফেরারী ছিলেন। তাঁহারা—যথা, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সতীশ চক্রবর্তী, নলিনী কর, অতুলচন্দ্র ঘোষ, চন্দননগরের শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়কে মধ্যস্থ করিয়া সি, আই, ডি, বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে সর্ত সাব্যস্ত করিয়া ১৯২১ সালে আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯২০ সালে রিফর্ম এ্যাক্টের সঙ্গে সম্রাটের ঘোষণাবাণী প্রচারিত হয়। তাহারই ফলে অনেক অন্তরীণ ও রাজবন্দী মুক্ত হন। মুক্ত রাজবন্দীদের নানাভাবে সাহায্য করিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে স্বর্গীয় দেশবন্ধু দাশ, মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জী, মিঃ আই, বি সেন, কুমার কৃষ্ণ দত্ত, ওয়াই, এম, সি,-এ'র ভারতীয় বিভাগের মিঃ আর, ও, রাহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইহার পরই কলিকাতা স্পেশাল কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ মন্ত্র প্রথম ঘোষিত হয়। অসহযোগ-খিলাফৎ সমগ্র ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত করে। বহির্মুখীন খিলাফৎ আন্দোলনের অযৌক্তিকতা

বাংলার বহু রাজনীতিক, চিন্তাশীল ব্যক্তি ও বিশেষ ভাবে বহু বিপ্লববাদী বহু স্থানে বলিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সবখানি তত্ত্ব বাংলার বিপ্লববাদীরা গ্রহণ করিতে না পারিলেও এই আন্দোলনের মধ্যে যে স্বাদেশিকতা ছিল, এবং এই আন্দোলনের মধ্যে জনগণের সঙ্গে মিলিত হইবার যে সুযোগ ছিল তাহাতে অনেক বিপ্লববাদী আকৃষ্ট হন, এবং নব উদ্যমে নাগপুর কংগ্রেসের পরে ইহাতে যোগ দেন।

বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কিত নর-হত্যা, ডাকাতি প্রভৃতি কোন কর্ম আর বাংলায় অনেক দিন প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু কলিকাতা শাঁকারিটোলা পোষ্ট মাষ্টারের হত্যাকাণ্ডে বরেন ঘোষ ধৃত হইলে (১৯২৩), একদল লোকের পুরাতন পদ্ধতিক্রমে কর্মপ্রচেষ্টার কথা প্রকাশ পায়। কলিকাতা দলের (জ্যোতিষ ঘোষের দল) সন্তোষ মিত্র প্রভৃতি ঐ সম্পর্কে ধৃত হয়; দ্বিতীয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা চলে, কিন্তু মামলা টিকে না। মাণিকতলায় বোমা আবিষ্কৃত হয়, যশোদা ও অবনী দণ্ডিত হয়। যশোদা যক্ষ্মায় মারা যায়। গৌহাটি খণ্ডযুদ্ধের অন্যতম যোদ্ধা প্রবোধ দাশগুপ্ত এই সময়েই নোট তৈরীর চেষ্টা চালায়। কিছুটা কৃতকার্যও হয়। কিন্তু পরে ধৃত হয়।

তারপর মিঃ টেগার্টকে হত্যা করিতে গিয়া ভুল ক্রমে মিঃ ডে নামক একজন ইংরাজকে হত্যা করায় কলিকাতা দলের গোপীনাথ সাহা ধৃত হয়, এবং নিজে স্বীকার করে যে, সে মিঃ ডে'কে ভুলবশতঃ হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া দুঃখিত, মিঃ টেগার্টকেই সে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল। গোপীনাথের ফাঁসি হয়।

১৯২৩ সালে দিল্লীর স্পেশাল কংগ্রেস হইতে বাংলায় না ফিরিতেই বাংলার বহু মুক্ত ভূতপূর্ব বিপ্লবী নেতাকে পুলিশ রেগুলেশন আইনে ধৃত করে। তাঁহারা বাহির হইয়া অপরাধজনক কোন কার্য করিয়াছেন বলিয়া দেশের কেহ মনে করে না। পাছে কিছু করেন, এই অতি সাবধানতায়ই তাঁহাদের পুলিশের কর্তারা ধরিয়া আটক করে। নরেন সেনের নিকট আই-বির কর্তা ভূপেন্দ্র চ্যাটার্জীও স্বীকার করেন, nipped in the bud—মূলে আঘাতের জন্যই এইসব arrest। ইহারই এক বছর পরে বাংলার আরও কয়েকটি মুক্ত রাজবন্দীকে পুনরায় আটক করা হয়। নূতন লোককেও আটক করা হয়। তন্মধ্যে তদানীন্তন কলিকাতা করপোরেশনের চীফ্ একজিকিউটিভ্ অফিসার সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন।

এই অর্ডিন্যান্স ও তিন আইনে যদিও এবার অনেক ভূতপূর্ব রাজবন্দীকেই

আটক করা হইয়াছিল (দেশেও এই অন্যায় ধরপাকড়ের জবরদস্তির জন্য যথেষ্ট আন্দোলন হয়), তবু ইহা সত্য যে ধৃত অনেকেই অশান্তিকর কিছু করেন নাই। কেহ করিয়াছেন, এমন কোন প্রমাণই গবর্ণমেণ্ট দিতে পারেন নাই।

তারপর দেখা দিল কাকোরী ট্রেন ডাকাতি, দক্ষিণেশ্বরে বোমা আবিষ্কার। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় যাহাদের সাজা হইয়াছিল, তাহারাই আলিপুর জেলে সি, আই, ডি বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হত্যা করে ; এই হত্যাকাণ্ডের ফলে প্রমোদরঞ্জন ও অনন্তহরি চরম দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

কাকোরী ট্রেন ডাকাতির সম্পর্কে আর একটি ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত হয়। পূর্বে কাশী ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত এবং তখন মুক্ত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ১৯২৫ সালের প্রথম ভাগে কলিকাতায়ই ধৃত হন, এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্রের মামলার আসামী হন। এই মামলা সম্পর্কে পঁয়তাল্লিশ জনকে গ্রেপ্তার এবং দেড় শত বাড়ী খানাতল্লাস করা হয়। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার স্থান যদিও উত্তর ভারত, এবং ষড়যন্ত্রে যদিও যুক্তপ্রদেশের অবাঙালী কয়েকজন ছিলেন, তবু মামলায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, ঐ বিপ্লব-ষড়যন্ত্রের প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন বাঙালী যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী প্রভৃতিই।

এই মামলায় শাস্তি অত্যন্ত কঠোর হইয়াছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। ইতিপূর্বে কোন ষড়যন্ত্র মামলায়ই এতো কঠোর সাজা হয় নাই। দণ্ডিত আসামীদের আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে কিছু না বলিয়াও, তাঁহাদের কর্মফল, তাঁহাদের কর্মের শুভাশুভ, দুঃখকষ্ট প্রভৃতি তাঁহারা যে শেষ পর্যন্ত একনিষ্ঠ দৃঢ়তার সহিত এবং অবিচলিত ভাবে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছেন ইহাও বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের আর একটা দিক। এই মামলায় রাজেন্দ্র লাহিড়ীর ফাঁসী হয়। গ্রেপ্তারের সময় সে এম, এ, পড়িত, বয়স ২১।২২ হইবে।

সাজাহানপুরে পণ্ডিত রামপ্রসাদের ফাঁসি হয়। আসফক্ উল্লারও (সাজাহানপুর নিবাসী) ফাঁসি হয়। আসফক্ উল্লা জাতিতে পাঠান ছিলেন। (কাকোরী অতিরিক্ত মামলায় আসফক্ উল্লার ফাঁসি হয়। কাকোরী মামলার ফেরারীরূপে পূর্ববঙ্গে আসেন, এবং অনুশীলনের সদস্যকর্মী সুধীর সরকারের বাড়ীতে (রাজসাহী) গোপনে থাকেন। বাংলা বলিতে, এমনকি বাংলা গান করিতে পারিতেন। অতি সুশ্রী ছিল তাঁহার চেহারা।)

ঠাকুর রোশন সিংহেরও ফাঁসি হয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁহার প্রথম সাজা হয়। প্রকাশ বেরেলী জেলে তিনি বিপ্লবীদের কাছে বিপ্লবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁহার বাড়ীও সাজাহানপুর।

যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, গোবিন্দ কর, মুকুন্দীলাল গুপ্তা, এবং শচীন্দ্রনাথ বক্সী যাবজ্জীবন দীপান্তরবাসের হুকুম পান। মন্মথ গুপ্ত ১৪ বছর, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১০ বছর, বিষ্ণুশরণ ডুব্লিস ১০ বছর, রামকৃষ্ণ ক্ষেত্রী ১০ বছর, রাজকুমার সিংহ ১০ বছর এবং আরও কয়েক জন সাজা পান। কাকোরী মামলার পর দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলা হয়। দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার ভারতব্যাপী বিরাট ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনেন; ফলে এলাহাবাদের ডাঃ শৈলেন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি দশ জনের কারাদণ্ড হয়। ব্যারিষ্টার এস. এ হালদার ও ঢাকার মনোরঞ্জন ব্যানার্জী আসামী পক্ষে ছিলেন।

বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের ধারা বাংলায় ও বাংলার বাহিরে পুনরায় এইভাবে স্থানে স্থানে আত্মপ্রকাশ করে। কাকোরীর অন্যতম কর্মী চন্দ্রশেখর আজাদ absconder ছিল। পরে এলাহাবাদের আলফ্রেড্ পার্কে পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম করিয়া গুলিতে নিহত হন (২৭-২-১৯৩১)। বীরভদ্র তেওয়ারীই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দেয় বলিয়া বিপ্লবীরা মনে করে। বীরভদ্রকে হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগে রমেশ গুপ্তের (কানপুরে) দশ বৎসর কারাদণ্ড হয়। ১৯২৮ সালের পরে মেছুয়াবাজার বোমার মামলা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারলুণ্ঠন মামলা, আন্তঃপ্রাদেশিক ও টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। সেই কারণে স্বতন্ত্র অধ্যায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাংলার বাহিরের অর্থাৎ লাহোর, দিল্লী, বেনারস ষড়যন্ত্র মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণও যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এখানে সমগ্র বাংলায় বিভিন্ন স্থলে উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত মামলা হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইতেছে। বাংলায় গুপ্ত বিপ্লব আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯০৪ সাল হইতে বারীন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিদের দ্বারা। ঐ সময় (১৯০৫) বঙ্গ বিভাগ রদ আন্দোলনও আরম্ভ হয়, একথা বলা হইয়াছে। বারীনবাবুদের দলের কর্মীরাই ১৯০৮ সালে মুরারীপুকুর বাগান বাড়ীতে ধৃত হন। বারীন্দ্র স্বীয় জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, ১৯০৭ হইতে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত চৌদ্দ পনের জন ত্যাগী যুবক তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তিনি এবং উপেন্দ্র প্রভৃতি তাহাদের

ধর্ম ও রাজনীতি শিক্ষা দিতেন। ভবিষ্যৎ বিপ্লবের আয়োজনের জন্য তাঁহারা কেবল প্রস্তুত হইতেছিলেন। সে জন্য সামান্য অস্ত্রশস্ত্রই মাত্র তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বারীন্দ্র বলেন "আমি এগারটি পিস্তল, চারিটি বন্দুক, একটি কামান সংগ্রহ করিয়াছিলাম।" উল্লাসকর দত্ত বোমা তৈয়ারী করিতে নিজেই শিখিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র দাস নিজ সম্পত্তির অংশ বিক্রয় করিয়া প্যারীতে গিয়া বোমা তৈয়ারী শিখিয়া আসেন এবং উভয়ে বোমা তৈয়ারী কার্যে লিপ্ত হন—একথা বারীন্দ্রের জবানবন্দীতে প্রকাশ। এই মামলার আসামী নরেন গোঁসাই এপ্রুভার হইয়া যে জবানবন্দী দেয় তাহাতে বাংলার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জড়ায়। ফলে শ্রীঅরবিন্দ, দেবব্রত বসু, চারুচন্দ্র রায়, যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সন্ন্যাসী) প্রভৃতি অনেকে ধৃত হন এবং আসামী হন।

আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা—১৯০৮ সালে এই মামলা আরম্ভ হয়। বাংলায় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের মামলা এই প্রথম। বার জনের সাজা হয়। এই দলের মুখপত্র 'যুগান্তর' বাংলায় বিপ্লব প্রচার করিত। মুরারীপুকুরে বোমা পাওয়া যায়, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে বোমা আবিষ্কৃত হয়। এখানে হেমচন্দ্র দাস বোমা প্রস্তুত করিত। অন্যান্য স্থলেও অস্ত্রশস্ত্র রাখা হইত। দেওঘরের শীল লজে'ও বিপ্লবীদের আড্ডা ছিল। প্রধান বিচারপতি রায়ে বলেন, এ দলে শিক্ষিত ও প্রবল ধর্মবিশ্বাসী লোকদের লওয়া হইত ("Men of education and of strong religious convictions")।

ঐ ষড়যন্ত্রে যদিও শেষ পর্যন্ত বহু লোক দণ্ডিত হয় নাই, তবু নানাদিক দিয়া এই ষড়যন্ত্র মামলাটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাই বিপ্লব ষড়যন্ত্রের প্রথম মামলা। ষড়যন্ত্রকারীরা যথেষ্ট উদ্যম, নির্ভীকতা, কৌশল ও বুদ্ধি দেখাইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট এই মামলায় আটত্রিশ জনকে সেশনে সোপর্দ করেন। বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, উপেন্দ্র, উল্লাসকর, অবিনাশ, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, বীরেন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রলাল বক্সী, বিভূতি সরকার, সুধীর সরকার, ইন্দুভূষণ রায় (আন্দামানে আত্মহত্যা করে) প্রভৃতির এই মামলায় সাজা হয়। সাংবাদিক পূর্ণ সেনও ধৃত ও দণ্ডিত হন। মজঃফরপুর হত্যাকাণ্ডকে এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়ান হয়।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা—১৯১০ সালে ননী গুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, সুরেশ মজুমদার প্রভৃতি ৪৬ জনকে ১২১ ক (রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র) অভিযুক্ত করা হয়। ৪৬ জনের মধ্যে সাত জনের বিরুদ্ধে মামলা চলে না।

ষড়যন্ত্রের স্থান শিবপুর (হাওড়া) এবং ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য অংশ। আসামীদের কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয় ; যথা—(১) শিবপুর দল, (২) কুরচী দল, (৩) খিদিরপুর দল, (৪) চিংড়িপোতা দল, (৫) মজিলপুর দল, (৬) হলুদবাড়ী, (৭) কৃষ্ণনগর, (৮) নাটোর, (৯) ঝাউগাছা, (১০) যুগান্তর, (১১) ছাত্রভাণ্ডার, (১২) রাজসাহী (রামপুর বোয়ালিয়ার দল)। এই ষড়যন্ত্র মামলা টিকে না। বিচারকগণ রায়ে বলেন, যদিও বিভিন্ন দল নানা অপরাধজনক কার্য করিয়াছে নিশ্চিত, তবু বিভিন্ন দলকে এই একটি ষড়যন্ত্রের মধ্যে আনা যায় না বা তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। শুধু এই কারণেই, এই আইনের ফাঁকেই বহু আসামীকে ষড়যন্ত্রের মামলায় খালাস দেওয়া হয়। কেবল আসামীদের মধ্যে ছয় জনকে সাজা দেওয়া হয়। তাহারা হলুদবাড়ী ডাকাতিতে লিপ্ত ছিল। অর্থাৎ কার্যতঃ হলুদবাড়ী ডাকাতির মামলায়ই ইহা পর্যবসিত হয়।

উপরোক্ত বিভিন্ন 'গ্রুপ' হইতে রায়তা, নেত্রা, হলুদবাড়ী প্রভৃতি বহু ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ।

খুলনা ষড়যন্ত্র মামলা—খুলনা জেলার নাংলা ডাকাতির পর পুলিশের তদন্তের ফলে এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে। বিধুভূষণ দে প্রভৃতি ধৃত হয়। হাইকোর্টের বিচারে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অপরাধে এগার জনের সাজা হয়। এই মামলা সম্পর্কে জোড়াবাগান ও আহিরীটোলায় খানাতল্লাস করিয়া 'মুক্তি কোন্ পথে' প্রভৃতি বহু রাজদ্রোহমূলক কাগজপত্র পুলিশ হস্তগত করে। অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর কথাও প্রকাশ হয়।

ঢাকা-ষড়যন্ত্র মামলা—১৯১০ সালে সাতচল্লিশ জনের নামে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের মামলা আনা হয়। তন্মধ্যে—চুয়াল্লিশ জনকে দায়রায় সোপর্দ করা হয়। এক বছরের উপরে মামলা চলে, ১৯১১ সালের আগষ্ট মাসে সেশন জজ ছত্রিশ জনকে দ্বীপান্তর ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। হাইকোর্টে আপীল করা হয়, ফলে চৌদ্দ জনের সাজা হ্রাস পায়, বাকি বাইশ জন মুক্তিলাভ করে।

এই মামলা ঢাকা অনুশীলন সমিতির উপরেই চলে। এই সমিতির 'প্রতিজ্ঞাপত্র', উহার আদ্য ও অন্ত্য অংশ, 'পরিদর্শকের কর্তব্য', 'সম্পাদকের কর্তব্য' প্রভৃতি আলোচনা করিয়া বিচারপতি মুখার্জী (স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়) বলেন যে, সমিতি তাহাদের "Unnamed Secret" রক্ষা করার জন্য, নেতার

আদেশ নির্বিচারে মানার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিল। প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রথম অংশ অতি সাধারণ। শেষাংশে মন্ত্রগুপ্তির দিকে অত্যন্ত জোর দেওয়া হইয়াছে। সমিতির সেই "Unnamed Secret" লইয়া যাহাতে সমিতির সভ্যগণও পরস্পর আলাপ না করে ; সমিতি হইতে যাহাতে কেহ বিচ্ছিন্ন হইতে না পারে সেদিকে পরিচালকের ও নেতার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। 'পরিদর্শকের কর্তব্যে'র মধ্যে গ্রাম্য সংবাদ সংগ্রহের (Village notes) উপদেশ ছিল, গ্রামের রাস্তাঘাট নদনদী ইত্যাদির অবস্থান সংবাদ এবং অন্যান্য সংবাদ—যথা, লোকসংখ্যা, তাহাদের বিভাগ, তাহাদের মতিগতি, গ্রামে ব্যবসায়-বাণিজ্য-মেলা ইত্যাদির সংবাদ পরিদর্শককে সংগ্রহ করিতে হইত। স্থানীয় মানচিত্র তৈয়ারী করিতে হইত।

এই মামলায় সরকার পক্ষের বহু লোক সাক্ষ্যদান করিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অপরাধের যোগাযোগ তেমন প্রমাণিত হয় নাই ; এবং উপরোক্ত কাগজপত্র না পাইলে হাইকোর্টের বিচারে যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্র প্রমাণ করা হয়ত শক্ত হইত। হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত করেন :—সমিতির সভ্যদের নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মাবলী ছিল। এই সকল নিয়মাবলী হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সমিতি তাহার মন্ত্রগুপ্তি "Unnamed Secret" রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিল ; এই জন্য সভ্যদের মধ্যেও অনাবশ্যক আলোচনা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল ; তাহারা আত্মীয় ও বন্ধুর কাছেও পরিচালকের বিনা অনুমতিতে পত্র লিখিতে পারিত না, এবং বাহির হইতে পত্র আসিলেও পরিচালককে দেখাইতে হইত, পত্র লিখিলেও দেখাইতে হইত। এইসব ঠিক ঠিক অনুসৃত হইত কিনা তাহা দেখাও সমিতির বিশিষ্ট সদস্যদের অন্যতম কর্তব্য ছিল ; সদস্যদের আত্মীয় স্বজন হইতে সম্পূর্ণ-বিচ্ছিন্ন হইতে হইত। কোন সদস্যের কোন অর্থ আসিলে (আত্মীয় স্বজন কর্তৃক প্রেরিত) তাহা সমিতির সাধারণ অর্থ বলিয়া গণ্য হইত।

হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত করেন—

(১) সমিতি গোপনতা অত্যন্ত কড়াভাবে রক্ষা করিত (jealously guarded secret), মন্ত্রগুপ্তি প্রকাশ না হয় এ নিমিত্ত সর্ববিধ উপায় অবলম্বন করিত। মন্ত্রগুপ্তিটি এমন যে তাহা নিজেদের মধ্যেও আলোচ্য নহে।

(২) সদস্যেরা মন্ত্রগুপ্তির প্রতিশ্রুতি 'ব্রত' গ্রহণ করিত এবং কতকটা সামরিক নিয়মানুবর্তিতায় জীবন যাপন করিত।

(৩) ঢাকা সমিতি ছিল কেন্দ্র, তাহার অধীনে এই ধরণের অন্যান্য শাখা সমিতিগুলি কাজ করিত।

(৪) সদস্যদের মধ্যে যাহারা 'অন্তরঙ্গ' হইত, তাহাদের কালীমূর্তির সম্মুখে অত্যন্ত কঠোর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতে হইত।

(৫) কোন বাহিরের লোক প্রতিশ্রুতি গ্রহণ না করিয়া যদি সমিতিতে ঢুকিত তবে সে যে সকল কথা জানিয়াছিল তাহা নষ্ট করা হইত (his knowledge was to be destroyed)।

(৬) সমগ্র বাংলাব্যাপী সমিতির ক্ষেত্র বিস্তৃত করাই ছিল উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি গ্রাম ও নগরের যাবতীয় সংবাদ সংগৃহীত হইত, মানচিত্রে ভৌগোলিক অবস্থান লিপিবদ্ধ হইত।

(৭) পুলিনবিহারী দাসের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল একটি imperium in imperio স্থাপন এবং নিজে তাহার নেতা হওয়া।

(৮) নেতার উপর সর্ববিধ পূর্ণ কর্তৃত্ব ন্যস্ত ছিল।

(৯) এই সমিতির অনেক সদস্যই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর বিদ্বিষ্ট ছিল।

(১০) বাহিরে লাঠি ছোরা ড্রিল প্রভৃতি খেলার পরে সভ্যগণ পরিদর্শকের কর্তব্যে উল্লিখিত 'গুপ্ত' ব্যাপার লইয়া ভিতরে আলোচনা করিত। এই সমিতি একটি বিপ্লব সমিতি।

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা—১৯১৩ সালে নরেন্দ্রমোহন সেন, রমেশচন্দ্র আচার্য প্রভৃতি চুয়াল্লিশ জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অভিযোগে শমন জারী করা হয়। তন্মধ্যে সাঁইত্রিশ জনকে গ্রেফ্‌তার করা সম্ভব হয়। রজনীকান্ত দাস ও গিরিন্দ্র দাস সরকারী সাক্ষী হয়। গিরিন্দ্রের পিতা এ্যাডিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ছিলেন। সাত জনকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ও দুই জনকে সেশন জজ খালাস দেন। বার জন—রমেশ, যতীন ওরফে ফেগুরায় প্রভৃতি—সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অভিযোগ স্বীকার করে এবং অবশিষ্টদের বিরুদ্ধে সরকার মামলা তুলিয়া লন। এই মামলায় সরকারের সহিত আসামীদের সর্ত হয়।* সেই সর্তানুযায়ী বার জন

* এই সর্তানুযায়ী মামলার ফেরারী আসামীগণ মুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে কী না—এই প্রশ্ন নরেন সেন তোলেন। মিঃ চ্যাটার্জী বলেন—নিশ্চয় এই সর্তানুযায়ী তাহারাও মুক্ত। কিন্তু ফেরারী মদন ভৌমিককে কলিকাতায় গ্রেফ্‌তার করা হয়। ফেরারীকে আশ্রয়দানের অপরাধে লালমোহন, প্রফুল্ল ভট্টশালী ও লেখক দণ্ডিত হন। মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জী এই মামলায় 'ব্রীফ্‌' ছাড়িয়া সাক্ষ্য

অপরাধ স্বীকার করে। ফলে অবশিষ্টের বিরুদ্ধে সরকার মামলা তুলিয়া লন এবং সর্তানুযায়ী যাহারা দোষ স্বীকার করে তাহাদেরও সর্তানুযায়ী নির্দিষ্টকাল জেলবাসের পরই মুক্তি দেওয়া হয়। মামলার রায়ে বলা হয়—

(১) আসামীরা সকলেই অল্পবয়স্ক (১৯—২৯)।

(২) তাহারা যন্ত্রবৎ অপরের আদেশে চলিয়াছে। সেই পরিচালকদের গ্রেফ্‌তার করা সম্ভব হয় নাই, এবং তাহাদের পরিচয়ও পুলিশ জানে না।

(৩) বার বছর যাবৎ এই আন্দোলন চলিয়াছে।

(৪) District organisation scheme-এ ছাত্রদের মধ্যে কি ভাবে কাজ করিতে হইবে, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কি ভাবে করিতে হইবে তাহার নির্দেশ ছিল।

(৫) অল্পবয়স্ক যুবক ও ছাত্রই এই আন্দোলনের পরিচালক। বরিশালে এই দলের নেতা রমেশ আচার্যের বয়স মাত্র একুশ বছর।

বরিশাল ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় পর্যায়। পূর্ব মামলায় যাহারা ফেরারী ছিল, তাহাদের বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে ধৃত করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে (১) মদনমোহন ভৌমিক ওরফে মদনচন্দ্র ভৌমিক ওরফে কুলদাপ্রসাদ রায়, (২) ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ওরফে কালীধর চক্রবর্তী ওরফে বিরজাকান্ত চক্রবর্তী ওরফে মহারাজ, (৩) খগেন্দ্র চৌধুরী ওরফে সুরেশ চক্রবর্তী, (৪) প্রতুল গাঙ্গুলী, (৫) রমেশচন্দ্র চৌধুরী ওরফে রমেশচন্দ্র দত্ত ওরফে পরিতোষ ধৃত হয়। এই ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের সাজা হয়। সাব্যস্ত হয়, বরিশাল সমিতি ঢাকা সমিতিরই অঙ্গ। এই সংঘের প্রধান আড্ডা সোনারঙ্গ জাতীয় বিদ্যালয়। শিক্ষকগণ ও ছাত্রগণ সমিতির কার্য করার উদ্দেশ্যেই ওখানে থাকিত। (১) বরিশাল মামলার 'কর্ম' overt acts বলিয়া নিম্নের ঘটনাগুলি বিচারে সাব্যস্ত হয় :—

ঢাকা জেলা—হলদিয়া হাট ডাকাতি—কালাগাঁও—দাদপুর—পণ্ডিতসর—গাঁওদিয়া ডাকাতি—সুকইর ডাকাতি—গোলকপুর বন্দুকচুরি—কাওয়াকুরী ডাকাতি—বিরঙ্গল ডাকাতি—পানাম (ঢাকা) ডাকাতি [এই ডাকাতিতে

দিতে উঠেন। সাক্ষ্যে বলেন যে, মদন আমার সঙ্গে ফেরারী অবস্থায় দেখা করিয়াছিল—আমি তাহাকে বলি, বরিশাল মামলায় সর্তানুযায়ী তুমি মুক্ত। মদন তদনুযায়ী মুক্তব্যক্তিরূপে রহিয়াছে, নলিনী প্রভৃতিও তাহাকে মুক্ত জানিয়াই আশ্রয় দিয়া থাকিবে। সর্তকালে ফেরারীর কথা লিপিবদ্ধ না করায় গবর্ণমেণ্ট অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিতেছে, ইহা বলিয়া বিপ্লবীগণের পরমবন্ধু মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জী তখন অনুশোচনা প্রকাশ করেন। সর্তের অভিপ্রায় ইংরেজ সরকার সুযোগ-মত ভঙ্গ করিয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্যই ইহার উল্লেখ করিলাম।—গ্রন্থকার

নগরের (পানাম একটি নগর বিশেষ) অধিবাসীরা বন্দুক ব্যবহার করে]—সারদা চক্রবর্তী হত্যা—কুমিল্লা ডাকাতি—লাঙ্গলবন্দ (ঢাকা) ডাকাতি। গোয়েন্দার চর রতিলাল রায়ের হত্যা, বরিশালে ইন্‌স্‌পেক্টর হত্যা, রাজকুমার রায় (ময়মনসিংহের ইন্‌স্‌পেক্টর) হত্যা, মৌলবীবাজার বোমা বিস্ফোরণ, সোনারঙ্গে হত্যা, রাউতভোগে হত্যা প্রভৃতিও যে এই মামলার overt acts তাহা এপ্রুভার প্রিয়নাথ আচার্যের বর্ণনায় প্রকাশ পায়।

রাজাবাজার বোমার মামলা। মৌলবীবাজার বোমা-বিভ্রাটের পরে সিলেটের ডেপুটি কমিশনারের পরোয়ানা বলে কলিকাতা পুলিশ রাজাবাজার-আপার সারকুলার রোডের একটি বাটি খানাতল্লাস করিয়া অমৃত হাজরা ওরফে শশাঙ্ক হাজরা প্রভৃতি চার জনকে গ্রেফ্‌তার করে। পরে আরো দুইজন ধৃত হয়। সেখানে বোমা তৈয়ারীর সাজ-সরঞ্জাম পাওয়া যায়। এই বোমার ধরণ ড্যালহাউসি স্কোয়ার, মেদিনীপুর (এপ্রুভারের বাটিতে ১৯০৯ সালে ফেলা হয়), দিল্লী (যাহা বড়লাটের উপর ফেলা হয়), মৌলবীবাজার, লাহোর (১৯১৩), ময়মনসিংহ (১৯১৩) এবং ভদ্রেশ্বরের (১৯১৩) বোমারই মতন বলিয়া বিচারকগণ সিদ্ধান্ত করেন। শশাঙ্ক ওরফে অমৃত হাজরার ঘরে এই বোমা পাওয়া যায় বলিয়া বিচারকগণ মনে করেন যে, সে বিপ্লব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অন্য আসামীদের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করা যায় না। শশাঙ্কের কঠোর শাস্তি হয়। ইহারা ঢাকা অনুশীলনেরই লোক বলিয়া মামলায় সাব্যস্ত হয়।

ফরিদপুর মামলা। ফরিদপুর (মাদারীপুর) ষড়যন্ত্র মামলায় পূর্ণচন্দ্র দাস প্রভৃতি অনেকে গ্রেফ্‌তার হন। কিন্তু পুলিশ শেষ পর্যন্ত মামলা চালায় না, ছয় মাস চালাইয়া সরকার পক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব হেতু মামলা তুলিয়া লয়। সরকার পক্ষের কৌন্সলী মিঃ এন্ গুপ্ত বলেন, সাক্ষীরা ভয়ে সাক্ষ্য দিতে চাহে না, সুতরাং মামলা চালান অসম্ভব বলিয়া সরকার মামলা তুলিয়া লইলেন। এই সম্পর্কে সাক্ষীকে ভীতিপ্রদর্শন করার অভিযোগে বামনচন্দ্র চক্রবর্তীর পরে সাজা হয়।

যে কয়েকটি প্রধান প্রধান ষড়যন্ত্রমূলক মামলার বিবরণ সরকারী বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা এখানে দেওয়া হইল ; ইহা ছাড়া বহু মামলা হইয়াছে। কোথাও আসামীদের সাজা হইয়াছে, কোথাও তাহারা খালাস পাইয়াছে।

ঘটনাবলীর দিনপঞ্জী

১৯০৬ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সমগ্র বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী দলের অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী :—

১৯০৬ সাল—রংপুরের মহিপুর গ্রামে এবং ঢাকা জেলা শেখরনগর গ্রামে ডাকাতির চেষ্টা হয়, বিপ্লবীরা অকৃতকার্য হয়।

১৯০৭ সাল—নিতাইগঞ্জে (নারায়ণগঞ্জ) একজন লোককে (কুলি) ছোরা মারিয়া টাকা ছিনাইয়া লওয়ার চেষ্টা হয়। কয়েক সহস্র টাকা লইয়া কুলিটি যাইতেছিল। টাকা ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া যাওয়ায় বিপ্লবীদের হাতে আসে নাই। ফরাসী চন্দননগরে গাড়ী উল্টাইবার ব্যর্থ চেষ্টা হয়। মেদিনীপুর নারায়ণগড়েও তেমনি ব্যর্থ চেষ্টা হয়। ২৩শে ডিসেম্বরে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এলেনের উপর গোয়ালন্দে গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। আঘাত গুরুতর হইলেও তিনি নিপুণ চিকিৎসায় রক্ষা পান।

১৯০৮ সাল—হাওড়া জেলার হরিণপাড়ায় (থানা শিবপুর) ডাকাতি হয়। ফরাসী চন্দননগরে তথাকার মেয়রের বাটীতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। মেয়র আহত হন নাই। ৩০শে এপ্রিল বিহারের মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে কিংস্‌ফোর্ড ভ্রমে মিসেস্ ও মিস্ কেনেডি নিহত হন; অপর একব্যক্তি আহত হয়। এই বোমা নিক্ষেপের অপরাধে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। প্রফুল্ল চাকী ধৃত হওয়ার মুখেই পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করে।

এই ১৯০৮ সালেই (২রা মে) প্রথম আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। ১৯১০ সালে মামলা শেষ হয়। ১৯১০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী আপীলের শেষ রায় বাহির হয়। তিন জনের সাত বৎসর, এবং চার জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, চার জনের সাত বৎসর, এবং তিন জনের পাঁচ বৎসর সাজা হয়।

১৫ই মে কলিকাতা গ্রে ষ্ট্রীটে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। তাহাতে চার জন লোক জখম হয়। ঐ সালের জুন হইতে ডিসেম্বরের মধ্যে কলিকাতার নিকটবর্তী কাঁকিনাড়া, শ্যামনগর, সোদপুর প্রভৃতি ষ্টেশনে গাড়ীতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। মারাত্মক কিছু হয় নাই। একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক গুরুতর রূপে জখম হইয়াছিলেন।

১৯০৮—২রা জুন, ঢাকা জেলার বাহ্রাতে ভীষণ ডাকাতি হয়। রাজনীতিক ডাকাতির মধ্যে ইহাই সর্বপ্রথম বড় ডাকাতি। এই ডাকাতিতে চার জন নিহত হয়। বহু জখম হয়। গ্রামবাসী ও পুলিশ সমবেত হইয়া বন্দুক লইয়া বিপ্লবীদের আক্রমণ করে। একজন বিপ্লবী নিহত হয়। ২৫,৮৩৭৲ লুন্ঠিত হয়।

১৪ই আগষ্ট ঢাকা সাটিরপাড়ায় নৌকা চুরি হয়। বিপ্লবী তিন জনের জেল হয়। (নৌকাচুরির মামলা মিথ্যা।)

ময়মনসিংহ বাজিতপুরে ১৫০০৲ ডাকাতি হয়। এক জনের দেড় বৎসর ও এক জনের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

১লা সেপ্টেম্বরে আলিপুর জেলে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার এপ্রুভার নরেন গোঁসাই যখন সব কথা বলিয়া দিতেছিল, সেই সময়ে ষড়যন্ত্র মামলার অন্য দুই জন আসামী কানাই দত্ত ও সত্যেন্দ্র বসু তাহাকে জেল হাঁসপাতালে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করে। কানাই ও সত্যেন্দ্রের ফাঁসি হয়।

১৬ই সেপ্টেম্বর হুগলী জেলায় বিঘাতিতে (ভদ্রেশ্বর থানায়) ৫৩৬৲ ডাকাতি হয়। পণ্ডিত মোক্ষদা সামাধ্যায়ী সহ তিন জনের সাজা হয়।

৩০শে অক্টোবর ফরিদপুর জেলার নরিয়া (পালং) হাট লুট হয়। ৬৭০৲ পাওয়া যায়। ক্ষতি হয় ৬,৪০০৲। দুই জন লোক খুন হয়। কেহই ধৃত হয় না।

৭ই নভেম্বর কলিকাতা ওভারটুন হলে স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের উপর জিতেন রায় পিস্তলের গুলি ছোঁড়ে। স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার আহত হন না। জিতেনকে অকুস্থলেই ধরা হয় এবং তাহার দশ বৎসর কারাদণ্ড হয়।

৯ই নভেম্বর সারপেনটাইন লেনে সাব-ইন্স্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জীকে হত্যা করা হয়। কেহ ধৃত হয় না। সুধীর নামক জনৈক যুবক বিপ্লবী নেতা প্রিয়শঙ্কর সেন কর্তৃক প্রেরিত হইয়া এ কাজ করে বলিয়া কাহারো অনুমান।

১৪ই নভেম্বর ঢাকার রমনাতে যুবক সুকুমার চক্রবর্তীকে সন্দেহে খুন করা হয়। ঐ নভেম্বরেই হাওড়াতে কেশব চন্দ্র দেকে ও ঢাকা রমনাতে অন্নদা ঘোষকে খুন করা হয়। শেষোক্ত তিনটি হত্যায় কেহ ধৃত হয় নাই বা কোন মামলা হয় নাই। তবে পুলিশের ইহাই বিশ্বাস যে, এই তিন জনই সমিতির বিরুদ্ধে খবর বা সাক্ষ্য দিবে এই আশঙ্কায় তাহাদের হত্যা করা হয়।

২রা ডিসেম্বর হুগলী জেলার মোরিহালে ১৩০৲ লুন্ঠিত হয়। একজন জখম হয়। মামলায় একজনের সাত বছর সাজা হয়।

এই ১৯০৮ সালের নভেম্বরেই প্রথম নয় জনকে তিন আইনে আটক করা হয়। ১১ই ডিসেম্বর ১৯০৮ সালে নূতন আইন পাশ হয় (Criminal Law Amendment Act XIV, 1908) এই আইনের বলে কতকগুলি মামলা জুরী বাদ দিয়াই তিনজন হাইকোর্টের বিচারপতি দ্বারা তৈরী স্পেশাল বেঞ্চে হইতে পারিবে নির্দিষ্ট হয় এবং এই আইনের বলেই সপারিষদ বড়লাট কতগুলি সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার লাভ করেন। এই আইনের বলেই ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে পূর্ব বাংলায় ঢাকা অনুশীলন সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ্ সমিতি, সাধনা সমিতি, বরিশালের বান্ধব বা স্বদেশ-বান্ধব সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়।

১৯০৯ সাল—১লা জানুয়ারী কুমিল্লায় অস্ত্র অপহরণ করা হয়। ঢাকার নবাবেরও তিনটি রাইফেল চুরি যায়।

১০ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় পাবলিক প্রসিকিউটার আশুতোষ বিশ্বাসকে (ইনিই নরেন গোঁসায়ের খুনের মামলায় সরকার পক্ষে ছিলেন) হত্যা করা হয়। হত্যাকারী চারুচন্দ্র বসুর ফাঁসি হয়। ঐ সময়েই সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় যে চারুর ডান হাত ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত। রিভলভার হাতে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অপূর্ব বিপ্লব-নিষ্ঠ, মৃত্যুঞ্জয় চারু অপর হস্তে পিস্তলের ঘোড়া টিপিয়া পিস্তল ছোঁড়ে।

১০ই ফেব্রুয়ারী এবং ৫ই এপ্রিল যথাক্রমে বেলঘরিয়া ও আগড়পাড়ায় নারিকেল খোলের বোমা বিস্ফোরণ হয়। দুইজন আহত হয়।

২৭এ ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার হরিপাল থানার মাগুপুর গ্রামে ৫০০৲ ডাকাতি হয়। দশ বার জন যুবক ডাকাতিতে ছিল। কোন মামলা হয় নাই।

২৩এ এপ্রিল ২৪ পরগণার নেত্রায় (থানা ডায়মণ্ড-হারবার) ২,৪০০৲ ডাকাতি হয়। ডাকাতদের সঙ্গে বন্দুক ছিল।

৩রা জুন ফরিদপুর জেলার ফতেজংপুরে প্রিয়নাথ চ্যাটার্জী পিস্তলের গুলিতে নিহত হয়। তাহার ভ্রাতা গণেশকে হত্যা করিতে গিয়া ভুলক্রমে তাহাকে হত্যা করা হয় বলিয়া প্রকাশ পায়। মামলায় ধৃত আসামীর সাজা হয় না।

১৬ই আগষ্ট খুলনা জেলার নাংলায় ১,০৭০৲ ডাকাতি হয়। মামলায় একজনের সাত বৎসর সাজা হয়।

১৬ই হইতে ৩০এ আগষ্ট পর্যন্ত বাংলা ষড়যন্ত্র মামলা চলে। ছয় জনের সাত বৎসরের দ্বীপান্তর বাস হয়। তিনজনের পাঁচ বৎসর এবং দুই জনের তিন বৎসরের সাজা হয়।

২৪শে সেপ্টেম্বর খুলনা জেলার হোগুলবুনিয়ায় ডাকাতি হয়। লুণ্ঠিত টাকার পরিমাণ ৫০৲, একজন লোক আহত হয়। এই ডাকাতিতে বন্দুক ও পিস্তল ব্যবহৃত হইয়াছিল।

১১ই অক্টোবর ঢাকা রাজেন্দ্রপুরে ২৩,০০০৲ ট্রেন ডাকাতি হয়। একজন দারোয়ান নিহত হয়, একজন আহত হয়। এই মামলায় একজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। পাট-ব্যাপারী সাহেব কোম্পানীর টাকা নারায়ণগঞ্জ হইতে দারোয়ান মারফৎ যাইতেছিল। চলতি ট্রেনে দারোয়ানদের নিহত ও আহত করিয়া ২৩,০০০ টাকা নেওয়া হয়। রাস্তায় অনেক টাকা পড়িয়া যায়। ১১,৮৬৪ টাকা রাস্তায় পাওয়া যায়।

১৬ই অক্টোবর ফরিদপুর জেলার দরিয়াপুরে (২,৬০০৲) ডাকাতি হয়। এখানে পিস্তল ব্যবহৃত হইয়াছিল।

২৮এ অক্টোবর নদীয়া জেলার হলুদবাড়িতে (১,৪০০৲) ডাকাতি হয়। এই ডাকাতি মামলায় পাঁচ জনের আট বৎসর, একজনের সাত বৎসর, একজনের পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হয়।

১০ই নভেম্বর ঢাকার রাজনগরে ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না। অর্থের পরিমাণ (২৭,৮২৭৲)।

১১ই নভেম্বর ত্রিপুরা জেলার মতলব থানার মোহনপুরে (১৬,৪০০৲) ডাকাতি হয়। একজন লোক আহত হয়। কেহ ধৃত হয় না। পর পর এই দুইটি ডাকাতিই ঢাকা সমিতির সোনারঙ্গ স্কুল কেন্দ্র হইতে পরিচালিত হয় বলিয়া সিডিশন কমিটি তাঁহাদের বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২৭এ ডিসেম্বর যশোহর বাইকারা (৮১৪৲) ডাকাতি হয়। এই খানেও পিস্তল ব্যবহৃত হইয়াছিল। কেহ ধৃত হয় নাই।

১৯১০ সাল—২৪এ জানুয়ারী কলিকাতা হাইকোর্টে পুলিসের ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট সামশুল আলমকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করা হয়। হত্যাকারীর ফাঁসি হয়।

৭ই ফেব্রুয়ারী খুলনার সোলেগাঁতিতে (২০০৲) ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত

হয় না। ১১ই ফেব্রুয়ারী যশোহরের খুল গ্রামে (৬,১৭৫৲) ডাকাতি হয়। কোন মামলা হয় না। মার্চে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত হয়। ৫ই জুলাই যশোহরের মহিষায় (থানা মহম্মদপুর) ২,২০৪৲ ডাকাতি হয়। এই ডাকাতিতে একজনের ছয় বৎসর, একজনের পাঁচ বৎসর, তিন জনের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

২১এ জুলাই ময়মনসিংহ জেলায় গোলকপুরে জমিদারদের বন্দুক অপহৃত হয়। ২৯এ জুলাই ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকা হলদিয়াহাট (থানা লোহজং) ১,৫০০৲ ডাকাতি হয়। একজন লোক নিহত হয়, এবং অনেকে আহত হয়। কেহ ধৃত হয় না।

৭ই নভেম্বর ফরিদপুর জেলার কালারগাঁয় (থানা ভেদরগঞ্জ) ডাকাতি হয় (১২,৬৬০৲)। কেহ ধৃত হয় না।

৩০এ নভেম্বর বাখরগঞ্জ জেলার দাদপুর (থানা মেহেন্দীগঞ্জ) ডাকাতি হয় (৪৯,৩৬৮৲)। পাঁচ জন লোক আহত হয়। কোন মামলা হয় না। শেষোক্ত তিনটি ডাকাতি ঢাকা সমিতির সোনারঙ্গ স্কুল কেন্দ্র হইতে পরিচালিত এবং সংগৃহীত অর্থের কতকটা অংশ ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনে ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া সিডিশন কমিটির রিপোর্টে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১৯১১ সাল—২১এ জানুয়ারী ঢাকা সোনারঙ্গে পিয়নকে মারধর করার জন্য সোনারঙ্গ স্কুলের ছয় জনের সাজা হয়। ৫ই ফেব্রুয়ারী ফরিদপুর জেলার পণ্ডিত-চরে (৫,৫০০৲) ডাকাতি হয়। মামলা হয় না। কেহ ধৃত হয় নাই।

২০এ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় গাঁওদিয়া গ্রামে (থানা লোহজং) ডাকাতি হয়। টাকার পরিমাণ ৭,৪৫৭৲। মামলা হয় না, কেহ ধৃতও হয় নাই।

৩১শে মার্চ ময়মনসিংহ সুয়াকৈরে ১,২০০৲ ডাকাতি হয়। একজন লোক আহত হয়।

১০ই এপ্রিল ঢাকা রাউৎভোগে মনোমোহন দে নিহত হয়। কেহ ধৃত হয় না। মনোমোহন ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় ও মুন্সীগঞ্জ বোমার মামলায় সাক্ষ্য দেয়। ২২এ এপ্রিল বাখরগঞ্জের লক্ষ্মণকাটিতে ১০,২০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না। ৩০এ এপ্রিল ময়মনসিংহ জেলার চরশলায় ২,১৫০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না। ত্রিপুরা জেলার বারকাণ্ডায় ২৬০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

১৯এ জুন ময়মনসিংহ সহরে পুলিশ সাবইন্‌স্পেক্টর রাজকুমার নিহত হয়।

১১ই জুলাই ঢাকা সোনারঙ্গে তিন জন লোককে হত্যা করা হয়। কেহ ধৃত হয় না।

২৭শে জুলাই ময়মনসিংহ সারাচরে ডাকাতি হয়। কোন টাকা লুণ্ঠিত হইতে পারে না। একজন যুবকের পাঁচ বৎসরের সাজা হয় (জিতেন লাহিড়ী)।

৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকা সিঙ্গইর বাজার লুট হয়।

৩রা অক্টোবর কুলিয়াচর বাজারে (৩,১২০৲) ডাকাতি হয়। একজন লোক আহত হয়।

৬ই নভেম্বর রংপুরের বালিয়া গ্রামে (১,২১৮৲) ডাকাতি হয়।

১১ই ডিসেম্বর বরিশালে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর মনোমোহন ঘোষকে 'Royal Proclamation'এর দিনেই হত্যা করা হয়। ইন্‌স্পেক্টর ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় একজন সাক্ষী ছিলেন।

৩১এ ডিসেম্বর নোয়াখালির চাউলপট্টিতে ১,৯৭৭৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

এই বৎসর যদিও অধিকাংশ ঘটনা পূর্ববঙ্গে ঘটে, কিন্তু দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কলিকাতার রাস্তায় অনুষ্ঠিত হয়।

গোয়েন্দা বিভাগের হেড কনেষ্টবল শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তীকে ২১এ ফেব্রুয়ারী হত্যা করা হয়। এই ঘটনার একপক্ষ মধ্যে ২রা মার্চ সন্ধ্যার সময় ১৬ বছরের একটি বালক কর্তৃক মিঃ কাউলি নামক একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোকের গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমাটি ফাটে না। কিন্তু নিক্ষেপকারী তখনই ধৃত হয়। পরে জানা যায় যে বোমাটি গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্মচারী ডেন্‌হাম সাহেবের উদ্দেশ্যেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

১৯১২ সাল—২৩এ জানুয়ারী ঢাকা বাইগুন টেওয়ারী (৩,৪৭০৲) ডাকাতি হয়।

২১এ ফেব্রুয়ারী ঢাকা আইনপুর (ঘিয়র থানা) ৭,৫৯৩৲ ডাকাতি হয়।

১৭ই এপ্রিল বাখরগঞ্জের কুসঙ্গসে ডাকাতি হয়। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় প্রকাশ, এই ডাকাতির উদ্দেশ্য ছিল একটি সরকারী বন্দুক, তাহা পাওয়া গিয়াছিল। ১৯এ কাকুরিয়া ডাকাতি হয়। কেহ ধরা পড়ে না।

জুন মাসে ফেণীতে সারদা চক্রবর্তীকে হত্যা করা হয়। ঢাকা সমিতির

বিরুদ্ধে সে অপরাধ করিয়াছিল বলিয়াই নাকি সাজা হিসাবে (disciplinary) এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া সিডিশন কমিটিতে উল্লেখ করিয়াছে।

১১ই জুলাই ঢাকায় পানামে (২০,০০০৲) ডাকাতি হয়। একজন লোক গুলিতে আহত হয়। গ্রামবাসীরাও বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল।

১৫ই জুলাই বাখরগঞ্জ জেলার প্রতাপপুরে ৭,৫৯৫৲ ডাকাতি হয়। দুই জন লোক আহত হয়।

২৪এ সেপ্টেম্বর ঢাকা গোয়ালনগরে হেড কন্‌ষ্টেবল রতিলাল রায়কে হত্যা করা হয়। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। এই সম্পর্কে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীকে পরে গ্রেপ্তার করা হয়।

২৭এ অক্টোবর কুমিল্লায় ডাকাতির উদ্যোগ করার অপরাধে রমেশ ব্যানার্জী (এই রমেশ ব্যানার্জী কুমিল্লায় জন্মাষ্টমী মিছিল উপলক্ষে আক্রমণকারী মুসলমান জনতার বিরুদ্ধে একাই বড় লাঠি লইয়া লড়াই করিয়া নিহত হয়), রমেশ দাশগুপ্ত, দেবেন বণিক, হরিদাশ দাস প্রভৃতি দশজনের সাত বৎসর করিয়া সাজা হয়।

১৪ই নভেম্বর ঢাকা লাঙ্গলবন্দে (১৬,০০০৲) ডাকাতি হয়। প্রায় দুইশত গ্রামবাসী ডাকাতদের বাধা দিতে সমবেত হইলে তাহারা (বিপ্লবীরা) চার জনে গুলি ছুঁড়িয়া তাহাদের দূরে রাখে।

২৮শে নভেম্বর ঢাকা ওয়ারীতে গিরীন্দ্র দাসের বাক্সে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। কতকগুলি বন্দুক, রিভলবার, কার্টিজ, গুলি বারুদ ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র এবং লাঙ্গলবন্দ ডাকাতির গহনাপত্র পাওয়া যায়। গিরীন্দ্রের পিতা ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট। পুত্র বিপ্লবী দলে মিশিয়াছে সন্দেহে তিনি পুত্রের বাক্স খোলেন—পুলিশকে ডাকিয়া পুত্রকে এবং অস্ত্রশস্ত্র ধরাইয়া দেন। গিরীন্দ্র অবশেষে একরার করে। অস্ত্র আইনে তাহার আঠার মাস সাজা হয়। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায়ও সে এপ্রুভার হয়।

১৩ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর বোমার মামলার সাক্ষী আবদার রহিমকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাহার গৃহে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমা বিস্ফোরিত হয়। কিন্তু আবদার রহিম সে ঘরে সে রাত্রে ছিল না, তাহার কন্যাও আশ্চর্য রকমে বাঁচিয়া যায়।

১৯১৩ সাল—৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা ভরাকরে (থানা টঙ্গীবাড়ী) ৩,৪০০৲ ডাকাতি হয়। একজনের দুই বৎসরের সাজা হয়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহ ধুলদিয়ায় (থানা কৈঠাদি) ৯,০৪৬৲ ডাকাতি হয়। একজন লোক নিহত হয়—তিনজন আহত হয়। পিস্তলের বোমাও ব্যবহৃত হইয়াছিল।

২৭এ মার্চ সিলেট মৌলবীবাজারে গর্ডন সাহেবকে বোমা মারিয়া হত্যা করার উদ্দেশ্যে দুইজন বিপ্লবী সমবেত হয়। হঠাৎ বোমা ফাটিয়া একজন বিপ্লবী যোগেন্দ্র ঐ বাগানেই মারা যায়।

৩রা এপ্রিল গোপালপুরে ৬,০৪৫৲ ডাকাতি হয়। একজন লোক আহত হয়।

১৯শে মে ফরিদপুর কাওয়াকুরীতে (মাদারীপুর থানায়) ৫,১৩০৲ ডাকাতি হয়। কেহই ধরা পড়ে না।

১৬ই আগষ্ট ময়মনসিংহ কেদারপুরে ১৯,৮০০৲ ডাকাতি হয়। একজন ভৃত্য হত হয় এবং পাঁচজন লোক আহত হয়। কেহই ধরা পড়ে না।

২৯এ সেপ্টেম্বর কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে হেড কন্‌ষ্টেবল হরিপদ দেবকে গুলির আঘাতে নিহত করা হয়।

৩০এ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহে পুলিশ ইন্সপেক্টর বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরীকে বোমা নিক্ষেপে হত্যা করা হয়।

৭ই নভেম্বর ২৪পরগণা ছত্রবাড়িয়ায় ৮৬৮৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধরা পড়ে না।

২৪এ নভেম্বর ময়মনসিংহ সারাচরে ৪,৩৯০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধরা পড়ে না।

৩০এ নভেম্বর ত্রিপুরা জেলার খরোমপুরে (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ৬,০০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধরা পড়ে না।

১৯এ ডিসেম্বর কুমিল্লা পশ্চিমসিংহে ৩,১০০৲ ডাকাতি হয়। একজন লোক আহত হয়। কেহ ধরা পড়ে না।

৩০এ ডিসেম্বর ভদ্রেশ্বরে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

নভেম্বর মাসে কলিকাতা রাজাবাজারে বোমা নির্মাণের সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হয়।

এই সালের মে মাসে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত হয়। এই

মে মাসেই লাহোরের রাস্তায় একটি বোমা বিস্ফোরণ হয়। ফলে একজন চাপরাশি নিহত হয়। একজন বাঙালী ইহা রাখিয়াছিল বলিয়া সিডিশন কমিটি লিপিবদ্ধ করিয়াছে। লক্ষ্য ছিল সিলেটের মিঃ গর্ডন।

১৯১৪ সাল—এই সালের ঘটনাবলী গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে পূর্ববঙ্গ, হুগলী ও ২৪পরগণা জেলা এবং খাস কলিকাতা। আমরাও সেই বিভাগ অনুযায়ীই ঘটনার হিসাব দিতেছি।

৮ই মে ত্রিপুরা জেলার গোঁসাইপুরে (নবীনগর থানা) ৫,৫০০৲ ডাকাতি হয়। একজন গ্রামবাসী আহত হয়।

১৯এ মে চট্টগ্রাম সহরে সত্যেন্দ্র সেনকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। নিহত ব্যক্তি পুলিশে খবর যোগাইত বলিয়া বিপ্লবীরা সন্দেহ করিত। কেহ ধৃত হয় নাই।

১৯এ জুলাই ঢাকা সহরে রামদাসকে (উমেশ দে) গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। রামদাস ডেপুটি সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী বিপ্লবীদলের বিরুদ্ধে কার্য করিতেছিল। কেহ ধৃত হয় নাই।

২৮এ আগষ্ট ময়মনসিংহ বিতাই (নেত্রকোণা থানা) ১৭,৭০০৲ ডাকাতি হয়। এক ব্যক্তি নিহত হয়, একজন আহত হয়। কেহই ধৃত হয় না।

১৩ই নভেম্বর ময়মনসিংহ কৈঠিয়াদি থানার উকারাশালে ৪,৮০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

২৩এ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ দারিকপুরে (ফুলপুর থানা) ডাকাতি হয়। টাকার পরিমাণ ২৩,০০০৲। একজন আহত হয়। কেহই ধৃত হয় না।

২৫এ ডিসেম্বর ত্রিপুরা জেলার মোচনায় ডাকাতির চেষ্টা করা হয়।

ফেব্রুয়ারী মাসে হুগলী জেলার বৈদ্যবাটীতে ডাকাতির চেষ্টা হয়। আগষ্টে বরানগরে ডাকাতির চেষ্টা করা হয়। ৭ই নভেম্বর ২৪পরগণা মামুদাবাদে ১,৭০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না। এই ডাকাতিতে মসার পিস্তল ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ডিসেম্বরে এড়িয়াদহে (২৪ পরগণা) ৪১০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

১৯১৪ সালেরই ২৬এ আগষ্ট কলিকাতার বিপ্লবীদলের চেষ্টায় বন্দুক ব্যবসায়ী রডা এণ্ড কোম্পানীর পঞ্চাশটি মসার পিস্তল (পিস্তলগুলি এমন নূতন

ভাবে তৈয়ারী যে তাহা রাইফেলের মতও ব্যবহৃত হইতে পারিত) এবং ৪৬,০০০ রাউণ্ড কার্টিজ, কোম্পানীরই একজন কেরানীর দ্বারা অপহৃত হয়। এই মামলায় অনুকূল মুখার্জী, গিরিন্দ্র ব্যানার্জী, কালিদাস বসু, ভুজঙ্গ ধর, হরিদাস দত্ত, নরেন্দ্র ব্যানার্জী ধৃত হয়। সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে, যে, পিস্তলগুলি অপহৃত হওয়ার অব্যবহিত পরেই বাংলার নয়টি বিভিন্ন দলে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। কমিটি ইহাও বলেন, আগষ্টের পরে বাংলার অধিকাংশ খুন ও ডাকাতিতেই এই মসার পিস্তল ব্যবহৃত হইয়াছে। বাংলার বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন দলের পরবর্তী ঘটনাবলীতে অস্ত্র ব্যবহারের ও অস্ত্র প্রাপ্তির যে সব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে বাংলার প্রত্যেক দলের হাতেই এই মসার গিয়াছে অথবা ইহার আদান-প্রদান হইয়াছে। পঞ্চাশটির মধ্যে একত্রিশটি পিস্তল বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে পুলিশ হস্তগত করে।

এই বৎসরের প্রথমভাগে গোয়েন্দা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার নৃপেন্দ্র ঘোষকে চিৎপুর রোডে হত্যা করা হয়। ট্রাম হইতে জনাকীর্ণ রাস্তায় নামিবার সময় তাঁহার উপর গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। আততায়ী বলিয়া ঢাকা সমিতির নির্মলকান্ত রায়কে ধরা হয়। নির্মলকান্ত রায়কে যাহারা ধরিয়াছিল তাহাদের বাংলার লাট ধন্যবাদ দেন ও পুরস্কৃত করেন। কিন্তু নির্মলকান্ত খালাস পায়। নির্মলের অপর সঙ্গী প্রিয়নাথ ব্যানার্জীও পরে ধৃত হয়। তাহাকে এই মামলায় জড়ানো যায় নাই। এ মামলায় আসামীর পক্ষে মিঃ নর্টন, মিঃ সি. আর. দাস, মিঃ জে. এন. রায় প্রভৃতি দাঁড়ান। জুরীরা নির্মলকে নির্দোষ বলেন—জজ একমত না হইয়া পুনরায় বিচারের আদেশ দেন। নূতন জুরী বসে। তাঁহারাও বলেন, নির্দোষ। জজ তবুও একমত হন না। তিনি পুনরায় জুরী ভাঙিয়া দেন—তখন সরকার পক্ষ মামলা তুলিয়া লন।

২৫এ নভেম্বর কলিকাতা মুসলমানপাড়ায় ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে ও বাটীর বাহিরে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বসন্তবাবু দৌড়াইয়া রক্ষা পান—একজন হেড কন্‌ষ্টেবল নিহত হয়, দুইজন কন্‌ষ্টেবল ও বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের একজন আত্মীয় আহত হয়।

১৯১৫—১৩ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা গার্ডেন রীচে ১৮,০০০৲ ডাকাতি হয়। একজনের সাত বৎসরের কারাদণ্ড হয়।

রাজনৈতিক ডাকাতিতে ইহাই প্রথম ট্যাক্সি ডাকাতি। ইহারই এক সপ্তাহ

পরে ২২শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বেলিয়াঘাটার এক চাউল-ব্যবসায়ীর ক্যাসিয়ারকে তহবিল হইতে ২০,০০০৲ টাকা দিতে বাধ্য করা হয়।

২৪এ ফেব্রুয়ারী কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে নীরদ হালদারকে গুলিতে নিহত করা হয়। নীরদ দৈবাৎ বিখ্যাত বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী যে ঘরে ছিল সেখানে উপস্থিত হয় এবং যতীন্দ্রনাথকে চিনিতে পারিয়া নাম ধরিয়া ডাকে।

২৮এ ফেব্রুয়ারী কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে ইন্‌স্পেক্টর স্বরেশ মুখার্জী জনৈক ফেরারী বিপ্লবীকে দেখিয়া তাহাকে গ্রেফ্‌তার করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময় উক্ত ফেরারী ও তাহার চার জন সঙ্গী তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে, তাঁহার আর্দালী আহত হয়।

এই বৎসরের (১৯১৫) সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বালেশ্বর ইউনিভার্স্যাল এম্পোরিয়ামে তল্লাস করা হয়, এবং পরে ময়ূরভঞ্জ জঙ্গলে যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন প্রভৃতি পাঁচজন বাঙালীর সঙ্গে বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেটের খণ্ডযুদ্ধ হয় (যথাস্থানে তাহা বলা হইয়াছে)।

২১এ অক্টোবর মসজিদবাড়িতে পুলিশ সাব ইন্‌স্পেক্টর গিরিন্দ্র ব্যানার্জীকে নিহত করা হয়। সাব ইন্‌স্পেক্টর উপেন্দ্র চ্যাটার্জী আহত হয়। ইন্‌স্পেক্টর সতীশ ব্যানার্জী রক্ষা পায়।

১৭ই নভেম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ৮০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

৩০এ নভেম্বর কলিকাতা সারপেনটাইন লেনে একজন কন্‌ষ্টেবল এবং স্থানীয় একজন বালক পিস্তলের গুলিতে নিহত হয়। কেহই ধৃত হয় নাই।

২রা ডিসেম্বর কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে ২৫,০০০৲ ডাকাতি হয়। একজনের তের বৎসর, একজনের দুই বৎসর ও একজনের এক বৎসর সাজা হয়।

১৪ই ডিসেম্বর শেঠবাগানে ৬,১০০৲ ডাকাতি হয়।

২৭এ ডিসেম্বর চাউলপট্টি রোডে এক ব্যক্তিকে আহত করিয়া ৭৫০৲ টাকা সম্বলিত একটি হাত-ব্যাগ ছিনাইয়া লওয়া হয়।

নিম্নের ঘটনাগুলি কলিকাতা হইতে ব্যবস্থা হইয়া কলিকাতার আশে পাশে ঘটে।

৬ই এপ্রিল ১৯১৫ এড়িয়াদহে ৫০০৲ ডাকাতি হয়।

৩০এ এপ্রিল নদীয়ার প্রাগপুরে ২,৭০০৲ ডাকাতি হয়। রাস্তা ভুল

হওয়ায় অনেকটা রাস্তা নৌকায় আসিতে হয়। একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বহু লোকজন লইয়া বিপ্লবীদের আক্রমণ করে। এই গোলমালে বিপ্লবীরা একজন নিজের লোককেই ভুলক্রমে গুলি করিয়া বসে। বিপ্লবকর্মে সমর্পিতপ্রাণ, ত্যাগনিষ্ঠ যুবক সুশীল সেন মারা যায়। আত্মরক্ষার আর উপায় না থাকায়, সঙ্গীর মৃতদেহ নদীতে নিক্ষেপ করিয়া নৌকাখানা ডুবাইয়া তাহারা চলিয়া যায়। পরে ধৃত হয়।* তিন জনের সতের বৎসর এবং একজনের আট বৎসর দ্বীপান্তর হয়। আশু লাহিড়ীর দ্বীপান্তর হয়।

২রা আগষ্ট আগড়পাড়ায় জনৈক বিল কালেক্টরকে আক্রমণ করা হইলে তাহার চীৎকারে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়। ফলে ঘটনাস্থলের কিছু দূরে বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা বিপিন গাঙ্গুলী পিস্তল সমেত ধৃত হন। তাঁহার পাঁচবৎসর কারাদণ্ড হয়।

২৫এ আগষ্ট মুরারী মিত্রকে তাহার বাড়ীতে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করা হয়। আগড়পাড়ার ঘটনার তদন্তে মুরারী মিত্র ও তাহার পুত্র প্রভাস পুলিশকে সাহায্য করিতেন বলিয়া সিডিশন কমিটিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৩০এ সেপ্টেম্বর নদীয়া জেলার শিবপুরে ২০,৭০০৲ ডাকাতি হয়। একজন কন্‌ষ্টেবল এবং একজন গ্রামবাসী নিহত হয়, এবং অপর এগারজন আহত হয়। নয় জন বিপ্লবী ধৃত হয়। নেতা নরেন ঘোষ অন্যতম। আট জনের যাবজ্জীবন ও এক জনের দশ বৎসরের দ্বীপান্তর হয়। সিডিশন কমিটির মতে এই ডাকাতি বরিশাল হইতে ১৯১২ সালে কলিকাতায় আগত দল দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়; এবং এই ডাকাতির পরে তাহারা একেবারে কাবু হইয়া পড়ে।

এই সালেই নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গেও প্রাগপুর এবং শিবপুরের মতই নৌকাযোগে ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়।

২২এ জানুয়ারী ত্রিপুরা জেলায় বাঘমারীতে ৪,১৭০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

৩রা মার্চ কুমিল্লা সহরে জেলা স্কুলের হেড্‌মাষ্টারকে হত্যা করা হয়। হেড্‌মাষ্টারের ভৃত্য গুরুতর আহত হয়, এবং পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একজন মুসলমান হত্যাকারীদের অনুসরণ করিতেছিল, তাহাকেও গুলি করা হয়।

* অতুলকৃষ্ণ ঘোষ বলেন, পুলিন (সেন) এসে বলে—সুশীলকে ডুবিয়ে দিয়ে এলুম। এই সুশীলকেই কিংস্‌ফোর্ড বেত্রদণ্ড দিয়াছিলেন।

১১ই মার্চ ত্রিপুরা জেলার বলদায় ৪,০০০৲ ডাকাতি হয়। দুই জন আহত হয়।

২৫এ মে ত্রিপুরা জেলার আউরাইলে ৪,২৫০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

৫ই জুন বাখরগঞ্জ জেলার গাজীপুরে ১৫,০০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

১৪ই আগষ্ট ত্রিপুরা হরিপুরে ১৮,০০০৲ ডাকাতি হয়। একজন ব্যক্তি গুলিতে নিহত হয়। তিনজন আহত হয়।

৭ই সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ চন্দ্রকোণায় ২১,০০০৲ ডাকাতি হয়। একজন গ্রামবাসী নিহত হয়। ছয়জন আহত হয়।

২৬এ নভেম্বর ময়মনসিংহ রসুলপুরে ৪৬০৲ ডাকাতি হয়। একজন লোক গুলিতে নিহত হয়।

১৯এ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ সশেরদীঘিতে (বাজিৎপুর) ধীরেন্দ্র বিশ্বাসকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। ধীরেন্দ্র পুলিশের ইন্‌ফরমারের কার্য করিতেছিল বলিয়া প্রকাশ পায়।

২২এ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে কালিয়া চাপড়ায় (কৈঠাদি) ডাকাতি হয়।

২৯এ ডিসেম্বর ত্রিপুরা করকলায় (চন্দনা থানা) ডাকাতি হয়। ডাকাতির পরিমাণ ১৫,০০০৲ টাকা। দুই ব্যক্তি গুলিতে নিহত হয়।

এই বৎসরই ১৮ই নভেম্বর খবর পাইয়া ঢাকা দলের ঐ সময়ের নেতৃস্থানীয় অনকূল চক্রবর্তী ও অপর কয়েকজন ফেরারী বিপ্লবীকে পুলিশ ঢাকার গুপ্ত আবাসে গ্রেফ্‌তার করে। ঐ একদিনে ঢাকার অন্যান্য গুপ্ত আবাস হইতে মসার পিস্তল আদি কতকগুলি অস্ত্র-শস্ত্র পুলিশের হস্তগত হয়।

এই সালেরই ১৯এ অক্টোবর ময়মনসিংহ সহরে পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট যতীন্দ্রমোহন ঘোষকে হত্যা করা হয়। তাঁহার শিশুপুত্রও (ক্রোড়ে ছিল) নিহত হয়।

এই সালেই উত্তরবঙ্গে ২৩এ জানুয়ারী রংপুরে কুরুল গ্রামে ৫০,০০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধরা পড়ে না।

১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯১৫) রায় সাহেব নন্দকুমার বসুকে (এডিশন্যাল পুলিশ সাহেব) হত্যা করার উদ্দেশ্যে চার জন বিপ্লবী তাঁহার বাড়ী যায় এবং তাঁহাকে

ডাকিয়া আনিয়া গুলি ছোঁড়ে; তিনি অনাহত রক্ষা পান, তাঁহার আর্দালী বাধা দিতে গিয়া গুরুতর আঘাতে নিহত হয়। (রংপুর দল)

২০এ ফেব্রুয়ারী রাজসাহী জেলার ধরাইলএ (নাটোর) ৩০।৪০ জন যুবক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ২৫,০৮০৲ ডাকাতি করে। বাড়ীর দারোয়ান নিহত হয়। অপর দুইজনও আহত হয়। এই ডাকাতি কলিকাতা হইতে ঢাকা অনুশীলন সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল।

এদিকে ১৯১৫ সালের প্রথম ভাগ হইতেই বাঙালী বিপ্লববাদীরা অবিলম্বে সৈন্যদলের সাহায্যে বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা করে; সমগ্র উত্তর ভারতের সৈন্য বিগড়ান কাজে তাহারা আত্মনিয়োগ করে এবং বিখ্যাত 'গদর' দলের বিপ্লবকামীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। এই উদ্দেশ্যে রাসবিহারীর নেতৃত্বে শচীন্দ্র, নলিনী, পিংলে এবং আরও অনেকে কাশী, দিল্লী, মিরাট, জব্বলপুর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে কার্য করিতে থাকে। প্রিয়নাথ ও ভূপতি বেনারস কেল্লার সৈন্যদল বিগড়াইবার কার্যে নিযুক্ত হয়, নলিনী বাগচী (এই নলিনীই ঢাকা ফলতাবাজারে ১৯১৮ সালে পুলিশের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধে নিহত হয়) জব্বলপুরে (মধ্যপ্রদেশ) সৈন্য বিগড়াইবার কার্যে নিযুক্ত হয়।

২১এ ফেব্রুয়ারী সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণার দিন নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু লাহোর হইতে তারিখ বদলাইবার সংবাদ আসে। এই সম্ভাবিত বিদ্রোহ ঘোষণার সংবাদ পূর্ববঙ্গের সমিতিগুলিতেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহারা উত্থানের জন্য সজ্জিত ছিল। ২৩এ মার্চ মীরাটের কেল্লার মধ্যে পিংলে কতকগুলি বোমা সমেত ধৃত হয়। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে উহা বর্ণিত হইয়াছে।

১৯১৫ সালেই ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহের চেষ্টা হয়। ম্যাভেরিক জাহাজে জার্মেনীর অস্ত্র-শস্ত্র জুনের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িবার কথা। আশা করা গিয়াছিল যে, এইভাবে যে জার্মান অস্ত্র-শস্ত্র আসিবে তাহা ১লা জুলাই সর্বত্র বিতরিত হইবে। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

৭ই আগষ্ট কলিকাতায় হ্যারি এণ্ড সনস্ তল্লাস করিয়া পুলিশ কয়েক জনকে গ্রেফ্তার করে।

এই সালের প্রথম ভাগে ১৭ই জানুয়ারী হাওড়াতে ৬,০০০৲ ডাকাতি হয়।

৩রা মার্চ হাওড়া দফরপুরে ২,০০০৲ ডাকাতি হয়। বলা বাহুল্য, সর্বত্রই আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩রা মার্চেই বরানগর দল ও বরিশাল দলের অনেকে ধৃত হয়।

এই সালেই ২৬এ জুন কলিকাতা গোপীরায় লেনে ১২,৫০০৲ ডাকাতি করিয়া লওয়া হয়। মালিককে বাংলায় একখানা পত্র লিখিয়া ধন্যবাদ দেওয়া হয়, এবং তাহার টাকা সুদ সমেত ফেরত দেওয়া হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। চিঠিতে তারিখ ছিল ১৪ই আষাঢ় ১৩২২ (২৮এ জুন) পত্রের নীচে সহি থাকে—

J. Balwant,

Finance Secretary to the Bengal Branch of Independent Kingdom of United India.

৪ঠা আগষ্ট সালকিয়া ডোমপাড়াতে অতুল ঘোষ প্রভৃতি আত্মগোপন করিয়া আছে এই সংবাদ পাইয়া পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করিয়া তল্লাস করিতে যায়। একজন ফেরারী ধৃত হয়। অন্য একজনকে গ্রেফ্তার করা হয়। সে হেড্ কনষ্টেবলকে পিস্তল দিয়া গুলি করিয়া পলাইতেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে অতুল ঘোষ তখন ছিলেন না।

এই ঘটনারই দিন কয়েক পরে রেল গাড়ীতে এক ট্রাঙ্কে একজনের মৃত দেহ বিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই মৃত ব্যক্তি অতুল ঘোষের আত্মীয়। সে পুলিশে খবর দিত বলিয়া তাহাকে সন্দেহ করা হইত—সিডিশন কমিটির ইহা অভিমত।

১৯১৬ সাল—১৬ই জানুয়ারী প্রাতে মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে সাব ইন্স্পেক্টর মধুসূদন ভট্টাচার্যকে গুলিতে হত্যা করা হয়। এই সম্পর্কে পরে পাঁচ জনকে ধৃত করা হয়। তন্মধ্যে একজন পিস্তল সমেত ধৃত হয়। ধৃত ব্যক্তি বরিশাল দলের নেতা বলিয়া সিডিশন কমিটিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই বৎসরের ৩০এ জুন পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বসন্ত চট্টোপাধ্যায়কে ভবানীপুর প্রেসিডেন্সি হাঁসপাতালের সন্নিকটে দিনের বেলায় বহু জনাকীর্ণ স্থানে তাহার আর্দালী হেড কনষ্টেবলসহ হত্যা করিয়া গুলি ছুঁড়িয়া সকলেই পলাইয়া যায়। সিডিশন কমিটির মতে এই হত্যাকাণ্ড ঢাকা অনুশীলন দলের দ্বারা অনুষ্ঠিত।

এই সালেই (১৯১৬) পূর্ববঙ্গে নিম্নলিখিত ঘটনা ঘটে :—

১৫ই জানুয়ারী বাজিতপুরে শশী চক্রবর্তীকে হত্যা করা হয়।

৬ই মার্চ ত্রিপুরা জেলায় গন্দোরায় (মুরাদনগর) ১৪,৬৯০৲ ডাকাতি হয়। একজন জখম হয়। একজনের অস্ত্র আইনে ও টেলিগ্রাফের তার কাটার জন্য চার বৎসর সাজা হয়।

৩০এ এপ্রিল ত্রিপুরা নাটঘরে ১৭,৫০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত না।

৯ই জুন ফরিদপুর ধানকাটিতে ৪৩,০০০৲ (হুণ্ডি) ডাকাতি হয়। এই টাকার অধিকাংশই কোন কাজে আসে না বা কেহ ধৃতও হয় না।

২রা সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা জেলায় ললিতেশ্বরে ৫৩০৲ ডাকাতি হয়। এখানে বিপ্লবী ডাকাতদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের ভীষণ লড়াই হয়। ফলে পাঁচ জন গ্রামবাসী নিহত হয়, পাঁচ জন আহত হয়। একজন বিপ্লবী (সর্পাঘাতে) নিহত হয়। বিপ্লবী এই সালেরই জুলাই মাসে অন্তরীণ আটক হইতে পলায়িত ঢাকা সমিতির ফেরারী প্রবোধ ভট্টচার্য।

সেপ্টেম্বরে ফরিদপুর পালং থানার ভাঙায় এক ডাকাতির আয়োজন করা হয়। এই দলই পরে ১৭ই অক্টোবর ময়মনসিংহ সাহিলদেওয়ে ৯০,০০০৲ ডাকাতি করে। বাড়ীর মুসলমান মালিক গুলির আঘাতে নিহত হয় এবং অপর ছয়জন আহত হয়।

৩০এ সেপ্টেম্বর ঢাকা রামদিনালীতে (ঘিয়র থানা) ৬৫৫৲ ডাকাতি হয়। সাতজন স্কুলের ছাত্র (ঈশান স্কুল, ফরিদপুর) ধৃত হয় ও সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

বৎসরের শেষভাগে ময়মনসিংহ ধরাইলে ডাকাতি হয়। বাড়ীর মালিকের পুত্র নিহত হয়। টাকা বেশী পাওয়া যায় না।

২৭এ ফেব্রুয়ারী পাবনা জেলার কাদিমপুরে ডাকাতি হয়। টাকার কথা উল্লেখ নাই।

এই সালে (১৯১৬) উল্লিখিত ঘটনা ব্যতীত দুইটি ইন্‌ফরমার নিহত হয়, একজন স্কুলের হেড্‌মাষ্টার, বিপ্লবদলের বিঘ্নকারী বলিয়া নিহত হয়। ঢাকাতে দুইজন কন্‌ষ্টেবল নিহত হয়। তাহারা ফেরারীদের খোঁজে ছিল।

১৯১৭ সাল—৫ই জানুয়ারী গরাণহাটায় জ্ঞান ভৌমিককে হত্যার চেষ্টা হয়। জ্ঞান বিপ্লবীদলে ছিল, কিন্তু সে পুলিশে সংবাদ দেয় বলিয়া সন্দেহ হয়। অমৃত সরকার এই হত্যার সম্পর্কে জেল হইতে খবর দেয় যে, সে পুলিশে খবর দেয়। চরিত্রগত দোষ।

এই জানুয়ারীতেই সিরাজগঞ্জে রেবতী নাগকে খুন করা হয়।

২৪এ ফেব্রুয়ারী ঢাকা পাইকারচরে ১,৩০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না। ১৫ই এপ্রিল রাজসাহী জামনগরে ২৬,৫৬৭৲ ডাকাতি হয়। এই ডাকাতির তিন মাস পর ঢাকা ষ্টেশনে দুই জন বিপ্লবী ধৃত হয়। একজনের পুঁটলিতে উপরোক্ত জামনগর ডাকাতির অলঙ্কারাদি পাওয়া যায়। তাহারা পুলিশকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িয়াছিল, কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। দুই জনেরই পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ড হয়।

৭ই মে কলিকাতা আরমেনিয়ন ষ্ট্রীটে স্বর্ণকারের দোকানে ৫,৪৫৯৲ ডাকাতি হয়। দোকানের দুইজন নিহত হয়। দুইজন আহত হয়। বিপ্লবীদের একজন নিহত হয়। তাহার পেটে গুলি লাগে। তাহাকে ট্যাক্সিতে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু আঘাত গুরুতর বলিয়া বিপ্লবীরাই তাহাকে একটা নির্জন স্থানে নামাইয়া গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়া যায়। মৃত ব্যক্তিকে সনাক্ত করিয়া জানা যায় তাহার নাম সুরেন্দ্র কুশারী।,

২০এ জুন রংপুর রাখালবুরুজে ৩১,০৮৬৲ ডাকাতি হয়। বাড়ীর মালিক ও তাহার পুত্র নিহত হয়।

২৩এ জুলাই ঢাকা সহরে পুলিশ কর্মচারীকে হত্যার চেষ্টা করায় একজনের আট বৎসরের কারাদণ্ড হয়।

২৭এ অক্টোবর ঢাকা আবদুল্লাপুরে (থানা মুন্সীগঞ্জ) ২৪,৮৩০৲ ডাকাতি হয়। টেলিগ্রাফের তার কাটা হয়। যে বাটীতে ডাকাতি হয় সেখানে তখন যাত্রাগান হইতেছিল এবং যাত্রাগানে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

৩রা নভেম্বর ত্রিপুরা জেলার মাঝিয়ারায় ৩৩,০০০৲ ডাকাতি হয়।

এই বৎসর (১৯১৭) আরও অনেক ধরপাকড় হয়। তন্মধ্যে গৌহাটির খণ্ডযুদ্ধ বিখ্যাত। গৌহাটিতে বহু বিশিষ্ট ফেরারী বিপ্লবী থাকিত। সেখানে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করিয়া সকলেই বাহির হইয়া যায়। মণীন্দ্র রায়, প্রভাস লাহিড়ী জখম অবস্থায় পরে ধৃত হয়, নলিনীকান্ত ঘোষও শেষে ধৃত হয়—সেও জখম হইয়াছিল। বাকি কয়েকজন ধৃত হয় না। তন্মধ্যে নলিনী বাগচী পরে (তারিণী মজুমদারের সঙ্গে) ঢাকা কলতাবাজারে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করিয়া মারা যায়।

এই সালেই (১৯১৭) সিরাজগঞ্জে আটঘরিয়া ভেনিজনা গ্রামে গোবিন্দ

কর এবং নিকুঞ্জবিহারী পালকে ধরিতে গেলে পুলিশের সঙ্গে (পুলিশের বড়-কর্তারাও ছিলেন) তাহারা সুদীর্ঘকাল লড়াই করে। কৃষ্ণ সাহার স্বীকারোক্তি হইতে পুলিশ সংবাদ পায়। দুই পক্ষই গুরুতররূপে আহত হয়। গোবিন্দ করের শরীরে সাতটি গুলি বিদ্ধ হয়, নিকুঞ্জও আহত হয়। নিকুঞ্জের বার বৎসর ও গোবিন্দের সাত বৎসর কারাদণ্ড হয়। এই গোবিন্দ করেরই কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছিল।

১৯১৮—১৫ই জুন ঢাকা কলতাবাজারে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করিয়া নলিনী বাগচী, তারিণী মজুমদার নিহত হয়। গৃহীসদস্য হরিচৈতন্য ধৃত হইয়া দণ্ডিত হয়। পুলিশ পক্ষেও কয়েকজন নিহত ও কয়েকজন গুরুতর ভাবে আহত হয় তন্মধ্যে গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চ কর্মচারী বসন্ত মুখোপাধ্যায়ের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর।

"বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা"

'বাংলায় বিপ্লববাদ' প্রথম সংস্করণ বাহির হইবার পর আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সম্পর্কে পুস্তক লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী, 'যুগান্তর' যুগের অন্যতম প্রধান কর্মী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কানুনগো মহাশয়ের "বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা" একখানা। তিনি এই পুস্তকে সাধারণভাবে বাংলার বিপ্লববাদীদের সম্পর্কে, বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে, এবং সেই সূত্রে বাঙালী জাতি ও বাংলার সমাজ সম্পর্কে যে হতাশার চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা বহুলাংশে একদেশদর্শিতায় বিকৃত। সমগ্র আন্দোলনের সহিত পরিচিত না থাকায় ইহা অসত্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে। তিনি ১৯০৮ সালেই দণ্ডিত হইয়া দেশের বাহিরে—সুতরাং আন্দোলনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিলেন। আমরা গোড়ায়ই বলিয়াছি, বিপ্লবযুগকে ভাল বা মন্দ বলিবার উদ্দেশ্য আমাদের নাই; যাঁহারা বিপ্লবযুগকে সরাসরি বিচার করিয়া এক কথায় 'ভাল' বা 'মন্দ' বলিয়া খালাস হন, তাঁহারা বিপ্লব আন্দোলনের অন্তর্নিহিত ঐতিহ্য ধারাটির সন্ধান জানিলে ভাল বা মন্দ বলিতে হয়ত আরও একটু বিবেচনা করিবেন। সেই কারণে যদিও আমরা ঠিক ইতিহাস লেখার মত এই আন্দোলনের ইতিহাস লিখি নাই, তবু যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, বিপ্লবীদের যে সকল কর্মচেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহার

প্রমাণ অকাট্য, তাহারাই বিপরীত কতকগুলি মিথ্যা গবেষণার ফল সমগ্র বিপ্লব আন্দোলনের ঘাড়ে না চাপাইয়াও হেমবাবু তাঁহার স্বীয় অভিজ্ঞতা এবং তাহারই বিশ্লেষণমূলক কাহিনী সাধারণকে জানাইতে পারিতেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস। হেমবাবুর প্রতিপাদ্য বিষয় যে যথার্থ নহে, তাহা দেখাইতে, প্রতিবাদে মৎসম্পাদিত 'বাংলার বাণী'তে যে লেখাটি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কতকাংশ এখানে তুলিয়া দিলাম।

গোড়ায়ই বলি, উদাহরণ দিয়া বিপ্লবকর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু বলা-ই, বিশেষ প্রশংসাযোগ্য কিছু প্রমাণ করা, বিপজ্জনক—লেখক হেমবাবুর সে বালাই ছিল না; তিনি প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন বিপ্লবের ব্যর্থতা, ক্ষুদ্রতা, হীনতা, চরিত্রগত দুর্বলতা; বিপ্লবীদের, সেই সঙ্গে গোটা জাতির অযোগ্যতা। বিপ্লবীদের যথার্থ ইতিহাস, স্বাধীন দেশেই যথার্থরূপে লেখা সম্ভব। অধিকাংশ কর্মচেষ্টাও প্রমাণ করা শক্ত। প্রামাণ্য নহে বলিয়া নহে, কিন্তু, কেন—তাহা আইনজ্ঞ মাত্রেই জানেন। গোপন কর্মের অতিরঞ্জনও সম্ভব, অতিনিন্দাও সম্ভব। যথার্থ ব্যাপার শুধু দরদী ও সেই সঙ্গে দেশের হিতকামী ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারাই প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। সে যাহাই হউক, বিপ্লবীদলের সঙ্গে হেমবাবুর পরিচয় অতি সামান্য। কোনও আন্দোলনের আদিতে থাকিলেই সেই আন্দোলনের মধ্যে ও অন্তে তিনি ছিলেন বা সেই মধ্য ও অন্তের ক্রমবিকাশের বিষয় তাঁহার কিছু বলিবার অধিকার সাব্যস্ত হয় না। গ্রন্থকার ১৯০৮ সালে ধৃত হন। তারপর যান দ্বীপান্তরে। সেখানে দীর্ঘকাল নিজ 'দুষ্কৃতি'র ফল ভোগ করিয়া ১৯২০ সালে রেহাই পান। 'দুষ্কৃতি' কথাটা বলিলাম, গ্রন্থকারেরই বইখানা পড়িয়া। তিনি যাহা করিয়াছেন—সেই ভুল—সেই ভুলের অনুতাপ, ভুলের সঙ্গীদের উপর বিদ্বেষই তাঁহার সমস্ত পুস্তকে ছড়ান। তিনি জনকয় বিপ্লবী কর্মীর (এঁদেরই বলিয়াছেন বিশিষ্ট নেতা, কর্মবীর) কথা আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন আমাদের জাতীয় চরিত্র! আর ঐ সকল দোষের জন্য দায়ী আমাদের সমাজ। এমনি ভাবে কিন্তু দেশের জনকয় কর্মী ও নেতার কার্যের আলোচনায় ঠিক ইহার বিপরীত প্রমাণও দেওয়া যায়। সুতরাং জাতীয় চরিত্রও বিপরীত হয়, সমাজও সেই হেতু প্রশংসনীয় হইয়া দাঁড়ায়। 'জাতীয় চরিত্র' কিন্তু এত সহজে প্রমাণ করা যায় না। ইহাই আমাদের বক্তব্য।

গ্রন্থকার বারীনবাবু ও 'ক' বাবুর আলোচনাতেই সমগ্র বিপ্লব আন্দোলনের

সমালোচনা বলিয়াছেন। কারণ "এঁরা দুইজনই আদিগুরুদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি, সবচেয়ে দেশপূজ্য ও আদর্শ পুরুষ বলে গণ্য।"

সত্যনিষ্ঠ লেখকের এই সকল হেঁয়ালীপূর্ণ যুক্তি দুর্বোধ্য। কোন আন্দোলনের আদিগুরু বা 'পাইওনিয়ার'ই আন্দোলনের সর্বসময়কার গুরু থাকেন না। এই মোটা কথাটা আমরা সবাই জানি যে, কোন একটা আন্দোলন গোড়ায় যে ভাবে আরম্ভ হয়, যে সকল লোক দ্বারা চালিত হয়, এমন কি যে উদ্দেশ্য যে আদর্শে তাহা সুরু হয়, ক্রমে তাহার বহু পরিবর্তন ঘটে, ভাব বদলায়, আদর্শ পর্যন্ত বদলায় এবং নানা অভিজ্ঞতায় পন্থা বদলায়; পূর্বে যে সব ব্যক্তি যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত, পরে সে যোগ্যতার মাপকাঠিও বদলায়। যে উপলক্ষ্যে কোন একটা দল গড়িয়া উঠে সেই উপলক্ষ্যটিও শেষে অবান্তর হইয়া দলের কাছে নূতন বৃহত্তর আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা সুতরাং দায়িত্ব ও কর্মপ্রণালী প্রবর্তিত হয়। 'ক' বাবু ওরফে অরবিন্দবাবু দেশপূজ্য, বিপ্লবী বলিয়া নহেন,—কিন্তু কেন, সেকথা শিক্ষিত বাঙালী জানেন। বারীনবাবুকে 'দেশপূজ্য' বা 'আদর্শ পুরুষ' বলিয়া দেশের লোক মানে—ইহা আমরা জানি না। তবে বিপ্লবযুগের অন্যতম পাইওনিয়ার বলিয়া তাঁহাকে লোকে শ্রদ্ধা করে। এই যে কানুনগো মহাশয় জাতির ও বিপ্লবীদের নিন্দারূপ অপকার্য আজ করিতেছেন—তাঁহাকেও লোকে তেমনি অন্যতম পাইওনিয়ার বলিয়াই গণ্য ও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু বাংলার 'বিপ্লবের চেষ্টায়' ১৯০৮ সালের পর ১৯১৫-১৬-১৭ সালে এবং পরে যে সকল কর্মী দেখা দিয়াছেন—তাঁহারা, কর্মী হিসাবে,—অভিজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান বিপ্লবী কর্মী হিসাবে—ত্যাগী হিসাবে যথেষ্ট যোগ্যতা দেখাইয়াছেন—তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বিপ্লব আন্দোলনে মৃত ও দণ্ডিত বহু ব্যক্তির নাম করা যায়—যাঁহারা কি ত্যাগ, কি সাহস, কি শৃঙ্খলা, কি সঙ্কল্প, কি বিপ্লবনিষ্ঠা, কি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় হেমবাবুর বর্ণিত 'ফাঁকিবাজ ধোঁয়াটে' নহেন। তিনিই লিখিতেছেন, 'বারীনের উপর অনেকেই চটিয়াছিল—তার নেতৃত্ব কেউ আমল দিত না; আর বারীন নেতা না হইয়াও নিজেকে নেতা বলিয়া জাহির করিয়াছিল'! বারীনবাবু যখন এমনি মেকী নেতা, তখন তাঁহারই সমালোচনা, সমগ্র বিপ্লব আন্দোলনের সঠিক সমালোচনা বলিয়া কেন গ্রাহ্য হইবে? বিপ্লব আন্দোলনে বরাবর 'আদর্শ' ব্যক্তি বলিয়া গণ্য ও মান্য একজন ব্যক্তির সমালোচনায়—ধরিয়া নিলাম—সমগ্র আন্দোলনের আলোচনা হয়, কিন্তু যখন তাঁহাদেরই দলের অনেকে তখনই

(১৯০৮ সালেই) বারীনবাবুর উপর চটিয়া গেলেন, তাঁহার নেতৃত্ব মানিতেন না—তখন তাঁহাকেই (বারীনবাবুকেই) ধরিয়া 'আদর্শ' দাঁড় করাইবার এই অপচেষ্টা কেন? এ দলেই কানাই, সত্যেন, সুশীল ভট্টাচার্য প্রভৃতি যদি ব্যতিক্রম, সমগ্র বিপ্লব আন্দোলনে বারীনবাবুই বা ব্যতিক্রম নন কেন? 'ক' বাবু ভিন্ন ধাতের লোক'—বিপ্লবের নাকি বিশেষ কিছু বুঝিতেন না; ইহাই যদি সত্য, তবে তাঁহাকেই ধরিয়া তাঁহার সমালোচনায় সমগ্র বিপ্লব আন্দোলনের সমালোচনা চেষ্টা কেন?

এখানে 'আদি' লইয়াও কথা উঠে। বাংলার এই বিপ্লব আন্দোলন, 'ক'বাবুর সৃষ্টি নয়, বারীনবাবুরও নয়, কানুনগো মশায়ের 'অ'বাবুরও নহে। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার এবং চৈতন্য ও রামমোহনের, বঙ্কিম বিবেকানন্দের বাংলার নব ভাবগ্রাহী মুক্ত মনের উত্তরাধিকারসূত্রে বাংলা যে মন পাইয়াছিল তাহাই স্বদেশী আন্দোলনের উপলক্ষে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। এর পূর্বে 'গুপ্ত সমিতি স্থাপন' করিয়া ইংরেজ মারার বা বিদ্রোহের চেষ্টা যাহা হইয়াছিল তাহা না হইলেও জাতীয় সাহিত্য প্রভৃতিতে যে স্বাধীনতার বাণী উচ্চারিত হইতেছিল তাহাতে যে দেশাত্মবোধ দেখা দেয়—তাহাই বাঁধনহারা গতিতে বাংলার যুবকদের ক্রমে বিপ্লবের দিকে ঠেলিয়া দেয়, 'স্বদেশী'ও শেষে অবান্তর হয়—অরাজকতা সৃষ্টিও শেষে আদর্শ হিসাবে পরিত্যক্ত হয়। এই আন্দোলন কৃত্রিম নয়—জাতির স্বতঃস্ফূর্ত দেশাত্মবোধ আহত ও নির্জিত হইয়া স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষায় বিপ্লবে ঝাঁপাইয়া পড়ে। কেহ পথ দেখায় নাই—পথই পথে টানিয়াছে—নেতাও অবান্তর; কর্মীর পর কর্মী এই পথে জুটিয়াছে,—পিছাইয়া পড়িলে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই কর্মীদের 'পথ নির্দেশ' করিয়াছে। এই আন্দোলন কোন সভাসমিতি বা বৈঠকে স্থির হয় নাই—ইহা বাংলার জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ। আজ এই আন্দোলনকে খেলো করিতে কারো কারো উদ্যম দেখা দিতে পারে, ইহার ব্যর্থতাও স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়িবে—কিন্তু পরাধীন জাতির এক অংশের স্বাধীনতার চেষ্টার,—আপ্রাণ চেষ্টার ফলে—যে সমগ্র জাতির মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে তাহা শত প্রতিক্রিয়ার পরেও বাংলার সমাজে রাষ্ট্রে সাহিত্যে সুস্পষ্ট হইয়া আছে।

আমরা বলি না বা বিশ্বাস করি না যে, তিনি এই ১৯০৮ সাল পর্যন্ত যে সকল বিপ্লবীদের (বারীন বাবু প্রভৃতির) কুৎসা কীর্তন করিয়াছেন,

যাঁহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা সবাই হুবহু এই রকমই। যদি ধরিয়াও নেওয়া যায়, যে বারীন বাবু বা দেবব্রত বাবু (গ্রন্থকারের মতে দেবব্রত বাবুর মিথ্যা বলাই ছিল অভ্যাস) প্রভৃতি এই রকমেরই, তবু একথা প্রমাণিত হয় না যে বিপ্লবী নেতারা, বিশিষ্ট কর্মীরা সবাই ছিলেন 'নামের পাগল', 'কর্তৃত্বপ্রিয়', 'ভীরু', 'নিজের মুক্তিই আগে চাহিতেন', মরিতে ও মারিতে ভয় পাইতেন, তাঁহারা স্বার্থপর, তাঁহাদের মন্ত্রগুপ্তি ছিল না, তাঁহারা দৈব-শক্তিতে বিশ্বাসী, বুজরুক ইত্যাদি।—আমরা সৌভাগ্যবশেই তবে ১৯০৮ সালের পরে কার্যতঃ বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দিই। আমরা অনেক বিপ্লবী নেতা ও কর্মী দেখিয়াছি যাঁহারা নাম চান নাই—'মন্ত্রগুপ্তি' যাঁহাদের ছিল ব্রত পালনের মতো, 'মন্ত্রগুপ্তির'র নিষ্ঠার বড় বাড়াবাড়ি দেখিয়াই, একবার নহে বহুবার বিপদে পড়িয়াও, সাজা পাইয়াও আবার যাঁহারা বিপ্লব দলে যোগ দিয়াছেন। কোন কোন বিপ্লবী ১৯০৮ সালে ধৃত, দণ্ডিত, লাঞ্ছিত হইয়া ১৯২৩-২৪-২৫-২৫-২৬ সালেও আবার আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন এই অভিযোগেই গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ধরিয়াছেন এবং বিচারে সাজা দিয়াছেন। একবার দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়া বা জেলে গিয়া ইঁহাদের মত বদলায় নাই—দলের নিন্দা করিয়া কেতাবও লেখেন নাই। বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের তাঁহারাই মধ্য ও অন্ত। আদিতেও দুই চার জন ছিলেন—তাঁহারা কেহ নীরবে আছেন—অপকর্ম করেন নাই।

কংগ্রেস গোড়ায় কি উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল? তখন কোন্ ধরণের রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তি কংগ্রেসে নেতৃত্ব করিত? সেই কংগ্রেস আজ কোথায় আসিয়াছে—আদর্শ, কর্মপদ্ধতি, কর্মী ও নেতৃত্বের যোগ্যতা বদলাইয়া যায় নাই কি? সেই ৫২ বছরের আগের কংগ্রেসের আলোচনা করিয়া সেই সব কর্মীদের আদর্শ ও যোগ্যতার কথা কহিয়া যদি কেহ বলেন—ছোঃ! তবে কি তাহা আজ সত্য হইবে? তা হইবে না; কিন্তু এমন অকৃতজ্ঞই বা কে আছে যে, ঐ গোড়ায় যাঁহারা কংগ্রেস করিয়াছিলেন—তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ আদর্শ সত্ত্বেও তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা না করিবে? ১৯০৪ সালেরও পূর্ব হইতেই বাংলার সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিশেষভাবে স্বাধীনতা-বাণী প্রচারিত হইয়াছিল সত্য—কিন্তু তবু এই বিপ্লব আন্দোলন এদেশে নূতন। নূতন আন্দোলনে অনেক বাজে লোক, ভবিষ্যতের ভীষণতা উপলব্ধি না করার

জন্য প্রথমটায় যোগ দেয়, অনভিজ্ঞতার দরুণ অনেক ভুল অনিচ্ছায় হয়, প্রথমটায় আদর্শ ও কর্মপদ্ধতিও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। এই সমস্ত ত্রুটি সব আন্দোলনের সূত্রপাতেই হয়। কিন্তু তাহা ধরিয়া পরবর্তীকালের ক্রমবর্ধমান সুনির্দিষ্ট আন্দোলনকে কেহ একতরফা বিচার করে না—করা যে সঙ্গত নহে তাহা বারীনবাবুর উপর বিদ্বেষবশতঃ কানুনগো মহাশয়ই হয়ত বুঝেন নাই—অন্যথায় ঐ Rowlatt Report-খানা পড়িয়াও বুঝিতেন। গ্রন্থকার Rowlatt Report-খানা পড়িয়া যেখানে আন্দোলনের ত্রুটি আছে তাহাই বাহির করিয়াছেন; কিন্তু ঐ রিপোর্টেও যেখানে আন্দোলনের শৃঙ্খলা, সাহস, নিষ্ঠা, সম্মুখসংগ্রামপ্রবৃত্তি প্রভৃতির বর্ণনা আছে,—তাহা তিনি দেখেন নাই। এই দেখার ইচ্ছাই গোড়া হইতে তাঁহার ছিল না।

হেমবাবু তাঁহার বইয়ে লিখিয়াছেন আলিপুর মামলায় নাকি অনেকেই গুপ্তকথা প্রকাশ করিতে ব্যস্ত, খালাস পাইবার জন্য দোষ স্বীকারে ব্যস্ত, নেতারা সবাই মুক্তির জন্য অতিব্যস্ত। এবং ইহাই সমগ্র বিপ্লবীদের স্বভাব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এবং এসব লিপিবদ্ধ করিয়া জাতির বিপ্লব-অযোগ্য স্বভাবেরই অকাট্য প্রমাণ দিয়াছেন বলিয়া তিনি মনে করেন। কিন্তু সরকারী মামলায়ই প্রকাশ, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পঁয়তাল্লিশ জনের মধ্যে একজনও গুপ্তকথা প্রকাশ করে নাই। কোন নেতাই, কোন কর্মীই খালাস পাইবার জন্য অতিব্যস্ত হয় নাই। সেশন আদালতে পুলিনবাবু বলিয়াছিলেন, 'সমিতির সকল কাজের জন্য একমাত্র আমিই দায়ী, আমি সাজা নিতে প্রস্তুত—আর সকলেই নির্দোষ'।—মামলায় দীন দরিদ্র আসামীর জন্যও সি. আর. দাশই খাটিয়াছেন। সকলের জন্য একই ব্যবস্থা। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় একে অপরকে বরং খালাস করিতে চাহিয়াছে। শেষে ব্যারিষ্টারের সঙ্গে পরামর্শ মত সরকারের সঙ্গে একটা আপোস হয়। তাহাতে কয়েকজন এইরূপ সর্তে দোষ স্বীকার করেন, যে, নির্দিষ্ট কতিপয় কর্মীকে বেকসুর খালাস দিতে হইবে, এবং স্বীকারের ফলে যাহাদের সাজা হইবে, তাহাদেরও মেয়াদ নামমাত্র হইবে। এই দোষ স্বীকার কিন্তু 'একরার নয়'। কে কি করিয়াছে, বা কি কি করিয়াছে তাহা বলা হয় নাই, কেবল মাত্র 'I am guilty of conspiracy'—এইটুকু বলিয়াছে, তাহাও সকলের সিদ্ধান্তে এবং বাক্যেও বিশিষ্ট সহ-কর্মীদের মুক্ত করারই জন্য। সবাই খালাস পাওয়ার জন্য

(বিশেষ নেতারা) যে অতিব্যস্ত হন নাই, তাহারই প্রমাণার্থ ইহার উল্লেখ করিলাম।

রাজাবাজার বম কেসে দীনেশ দাসগুপ্ত যতক্ষণ তাঁহার আত্মীয় যোগেশ গুপ্ত এবং তাঁহার অপর সঙ্গীদের মামলাও তাঁহার সঙ্গে একত্রে করিবার ব্যবস্থা না করিয়াছিলেন, ততক্ষণ নিজে উকিলের সাহায্য নেন নাই।—সকলকে ছাড়িয়া নিজের মুক্তি ধনীও চায় নাই—যার টাকা আছে তার মামলাও যে আলাদা চলে নাই সেজন্যই এই একটা ঘটনা মাত্র এখানে উল্লেখ করিলাম। এমনি আরো বহু প্রমাণ উল্লেখ করা যায়। গ্রন্থকার নাকি তাঁহার অভিজ্ঞতায় বিপরীতমাত্র ব্যাপারই দেখিয়াছেন।

আমাদের বিপ্লবীরা ধৃত হইয়া সর্বত্র খালাস হইতে ব্যস্ত হয় নাই। গ্রন্থকারের বর্ণিত আলিপুর মামলায়—নেতারা খালাস হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া সব বলিয়া দিয়াছে—কর্মীরাও অনেকে তেমনি খালাস হইবার জন্য অতি ব্যস্ত ও 'প্রতিযোগিতায়' 'ইনফরমেশন' দিয়াছে—প্রভৃতি যদি সত্য বলিয়া ধরিয়াও নেওয়া যায়, তবু তাহাতে প্রমাণিত হয় না, সুদীর্ঘ বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে, অসংখ্য মামলার বিপ্লবী আসামীরা তেমনটাই করিয়াছেন। বরং করেন নাই যে ঠিক তেমনি ঘটনা আমার নিজেরই ২৮টি জানা আছে—আরো কত ত নিজে জানি না।

সোনারঙ্গ মামলায়—এগার জন আসামীর একজনও একটি কথাও বলে নাই। কুমিল্লা ডাকাতি মামলায় সাতজনই সাজা পায়, একজনও কোন কথা বলে নাই। রাজেন্দ্রপুর ট্রেন ডাকতিতে চার পাঁচ জন ধৃত হয়, কেহই কিছু বলে নাই। নরিয়া, বাহ্রা, গোপডরেও তেমনি। চট্টগ্রাম খুনের মামলায় একরার নাই। প্রাগপুর ডাকাতিতে কেহ কিছু বলে নাই। লক্ষ্ণৌয়ে বাঙালী সুশীল লাহিড়ীর ফাঁসি হইলেও একরার করিয়া বাঁচিতে চাহে নাই। রাজাবাজার বম কেসে পাঁচজনই সুদীর্ঘ দ্বীপান্তরে দণ্ডিত—একজনও কন্‌ফেশন করিয়া বাঁচিতে চায় নাই। রডা আর্মস কেসে ধৃত আসামীরা কেউ একরার করে নাই। চারু বসুর ফাঁসি হয়, একরার করে নাই, কাউকে জড়ায় নাই, বাঁচিতে চায় নাই। যতীন রায় সার এণ্ড্রু ফ্রেজারের উপর আক্রমণ করে—দশ বছর সাজা হয়—একরার করে নাই। দক্ষিণেশ্বর বম কেসে ধৃত আট দশ জনের কেহই একরার করে নাই। দীর্ঘ সাজা পাইয়াছে। গৌহাটির গুলির মামলায় আসামীরা দীর্ঘ সাজা পাইয়াছে,

কিন্তু কেহই একরার করে নাই। সিরাজগঞ্জের গুলির মামলায় বিপ্লবীদের দীর্ঘ সাজা হইল, কিন্তু কেহ কিছু বলে নাই। ঢাকার আসক জমাদার গলিতেও পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ের মামলায় সাজা হয়, আসামীরা কেহ একরার করে নাই। এ ছাড়া প্রায় কোন মামলায়ই নেতৃস্থানীয়গণ এবং বিশিষ্ট কর্মী খালাস পাওয়ার জন্য মোটেই কন্‌ফেশন করেন নাই।

গ্রন্থকার হেমবাবু তাঁহার পুস্তকে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, 'জেল মস্ত reformatory'—বোধ হয় তিনি স্বয়ং ও তৎসঙ্গীদের reformation দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁর বক্তব্য এই—বাঙালী বিপ্লবীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের নিষ্ঠা ছিল না, তাই একবার জেলে গিয়াই সবাই 'reformed' হইয়া গেল—আর ওপথ মাড়ায় নাই। 'আমাদের দেশের জেলখানা রাজ-দ্রোহীদের পক্ষে অব্যর্থরূপে রিফর্মেটরী'—একথা গ্রন্থকার ও তস্য সঙ্গীদের অনেকের বেলায় হয়ত বা সত্যই কিন্তু এই বিপ্লব-আন্দোলনে তাঁহাদের পরে যাঁহারা ছিলেন, গোটা বাংলার সেই ব্যাপক আন্দোলনের ইতিহাসে অধিকতর বিপ্লবনিষ্ঠ, শক্ত, যাহাকে বলে stamina-সম্পন্ন ব্যক্তির অভাব হয় নাই। গ্রন্থকার হেমবাবু তাঁহাদের '১৯০৮' পর্যন্ত পরমায়ু-বিশিষ্ট দলের 'নিষ্ঠার অভাব', 'সুখপ্রিয়তা', 'দুর্বলচিত্ততা', 'লক্ষ্যহীনতা' (তাঁহারই মতে) প্রভৃতি দ্বারা যদি বিপ্লব আন্দোলনের তথা জাতীয় চরিত্রের অযোগ্যতা প্রমাণ করিতে চাহেন, তবে ঠিক তেমনি বিপরীত বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা জাতীয় চরিত্রের বিপরীত দিকই প্রমাণ করা যায়। বিপ্লবীদের ভায়লেন্স বা অনুরূপ কোন কর্মনীতি সমর্থনের জন্য নহে —কিন্তু গ্রন্থকারের উক্তি যে মিথ্যা, সেজন্য এসব কথা উল্লেখ করিতে হয়।

বহু বিশিষ্ট বিপ্লবকর্মী ১৯০৭-০৮ সালে একবার লাঞ্ছিত হইয়া পুনরায় এই আন্দোলনেই যোগ দিয়াছেন, আবারও দণ্ডিত হইয়া মুক্ত হওয়ার পর পুনরায় এ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, এর প্রমাণ আছে। বাঙালী যুবকদের, তথা জাতির staminaর অভাব, নিষ্ঠার অভাব প্রভৃতি প্রমাণ করিতে গ্রন্থকার মিথ্যাই কতগুলি বাজে কথা বলিয়াছেন, তাই এসব কথা আমাদের বলিতে হইতেছে। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র করের 'পাবনা গুলিমারা (পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের লড়াই হয়, দুই দলই গুলি চালায়) মামলায়' সাজা হয় সাত বৎসর দ্বীপান্তর। তাঁহার শরীরে বহু স্থানে গুলি বিদ্ধ হইয়াছিল। হাঁসপাতালে গোটা কয় কাটিয়া বাহির করে—বাকি কয়টা শরীরেই থাকিয়া যায়। তাহাতে

তাঁহার শরীরে গুরুতর ব্যাধিও দেখা দেয়। সাত বৎসর পরে তিনি মুক্ত হইয়া আসেন। সরকারেরই বিবরণীতে প্রকাশ, তিনি পুনরায় ১৯২২-২৩ সালে বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দেন। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯২৬) তিনি একজন প্রধান আসামী, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত। এসব লোক আমাদের হাতে হাতে স্বর্গ আনিয়া দিতে পারে নাই বা পারিত না বলিয়া এদের বিপ্লব-নিষ্ঠা বা স্বাধীনতা-লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও তজ্জন্য নির্যাতন ভোগের 'আত্মপ্রসাদ' ছিল না, একথা বলা হেমবাবুরই শোভা পায়, কারণ তিনি বারীন বাবুর ও তাঁহার নাম করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতিরই নিন্দা করিতে বসিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কুমিল্লায় পুলিশের হেপাজত হইতে পালান, পরে গুপ্তভাবে থাকেন। ১৯১৭ সালে তিনি পাথুরিয়াঘাটায় ধৃত হন। পরে তিনি যে নির্যাতন ভোগ করেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ, তাহা কলিকাতার মাসিকপত্র Modern Reviewএ ছাপা হইয়া আছে। তাঁহার সর্বাঙ্গে বিষ্ঠা ঢালিয়া স্নান না করাইয়া রাখিয়াছে,—জল-পিপাসার সময় মূত্রপূর্ণ বোতল দিয়াছে। বড়লাটের কাছেও পরে এই মর্মে দরখাস্ত যায়। যাহাই হউক, নির্যাতনের কথা নহে; কথা এই, এর পরও কানুনগো মহাশয়ের 'reformation' ত ঘটে নাই! ইহার পর যোগেশচন্দ্র regulationএ আটক হন—তার পর ১৯২০ সালে মুক্ত হন। আবার ১৯২৪ সালে অর্ডিন্যান্সে আটক হন। Stamina না থাকিলে—সরকারী বিবরণ ও বিচারে প্রকাশিত ও সাব্যস্ত যাহা হইয়াছে শুধু তাহাই বলি—১৯২৬ সালে কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁহারই আবার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইত না! তাহাতে প্রকাশ, তিনি যুক্ত প্রদেশে ও বিহারে নানাস্থানে বিপ্লব কেন্দ্র স্থাপন করিয়া কাজ করিতেছিলেন। শুধু জেল নয়, অমানুষিক নির্যাতন সহিবার পরেও গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত মত সকলেরই reformation হয় না দেখা গেল,—স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও কমে না। কৃতকার্য হয় নাই বলিয়াই কি ইহাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অস্বীকার করিব? বাংলার যুবকেরা স্বাধীনতার জন্য নির্যাতন ভোগে আত্মপ্রসাদ লাভ করিত না বলিয়াই নির্যাতনে হীন হইত—গ্রন্থকারের এই উক্তিই যে সত্য নয়, এই জন্যই কথাগুলি বলিলাম। আর সব পরাধীন জাতির স্বাধীন হইবার যোগ্যতার মতই বাঙালীরও যে যোগ্যতা আছে, তাহাই এখানে বলিতে চাই। এই প্রসঙ্গে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, রাজেন্দ্র লাহিড়ী প্রভৃতি

আরো কত নামই করা যায়। তা ছাড়া পুনঃ পুনঃ দণ্ডিত হইয়াও স্বাধীনতার কামনা কমে নাই—বিপ্লব আন্দোলনের কর্মী বলিয়া পুনঃ পুনঃ ধৃত, দণ্ডিত, Regulation ও Ordinanceএ অন্তরিত, ব্যক্তির নাম তো কতই করা যায়! আপাতত যে কয়টি নাম মনে আসিল উল্লেখ করিলাম:—ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী (বারকয় সাজার পর পনের বছর দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হন, মুক্ত হইয়া পুনরায় Reg. IIIতে বিপ্লবী বলিয়া অবরুদ্ধ হন), পূর্ণচন্দ্র দাস, বিপিন গাঙ্গুলী, নরেন্দ্রমোহন সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন সেন, ভূপতি মজুমদার, জ্যোতিষ ঘোষ, গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র ঘোষ, রমেশ চৌধুরী, কিরণ মুখার্জ্জী, রমেশ আচার্য, সুরেশ দাস, জীবন চ্যাটার্জী, মনোরঞ্জন গুপ্ত ইত্যাদি।*

বিপ্লবীরা ধরা পড়িলেই বাঁচিবার জন্য ব্যাকুল হইত—আর এই ব্যাপারটা 'ছেলেখেলাই' ছিল, বাঁচিতে পারিলে সেজন্যই ব্যস্ত হইত, এইসব প্রমাণ করিতে হেমবাবু তাঁহার দলের জন কয়েকের বাঁচিবার অতিব্যস্ততা দেখাইয়াছেন। অবশ্য দুই চার জনের নির্ভীকতার বর্ণনাও দিয়াছেন—কিন্তু তাহার মধ্যেও নামের নেশা, মন্ত্রগুপ্তির অভাব প্রভৃতির প্রমাণ দিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। কানাই ও সত্যেনের কার্য সেই সব বাক্‌জালের অন্তরালে পড়িয়া ম্লান হইয়া গিয়াছে।

বিপ্লব আন্দোলনে সব সময়ে কর্মপ্রণালী একভাবে চলে না। ১৯১৪ সালের পর বিপ্লবীরা পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ের ভাব দেখায়। তাহাতে নিশ্চিন্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে—বাঙালী যুবকেরা যে-কোন দেশের স্বাধীনতাকামীদের মত সাহস, কৌশল ও দৃঢ়তা-সম্পন্ন। সুযোগ পাইলে তাহারা আপাতদৃষ্টিতে অসাধ্য অনেক কিছুই সাধন করিতে পারে। লড়াই করা যেখানে স্থির সেখানে তাহারা অল্পসংখ্যক হইয়াও বহুসংখ্যকের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে 'প্রাণের মায়া' দেখায় নাই—বরং বিপরীত প্রমাণই দিয়াছে। অথচ তখনও ইচ্ছা করিলেই অনেকেই একরার করিয়া বাঁচিতে পারিত। হেমবাবুর চোখে এসব পড়ে নাই—অথচ, "বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা" তিনি লিখিয়াছেন। দুই চারিটি ঘটনাই মাত্র বলিব। বালেশ্বরে (১৯১৫) ম্যাজিষ্ট্রেটের বাহিনীর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন

* ১৯৪২ সালে বহু বাঙ্গালী বিপ্লবী বলিয়া নিরাপত্তা বন্দীরূপে দীর্ঘকাল কারাবাস করেন। উল্লিখিত ব্যক্তিরাও তন্মধ্যে আছেন—এ ছাড়া আরো অনেকে ধৃত হইয়া আবদ্ধ ছিলেন। তাহাদের নাম এখানে (দ্বিতীয় সংস্করণে) দেওয়া হয় নাই।

প্রভৃতি লড়াই করে, এবং মৃত্যু বরণ করে—একজনের ফাঁসি হয়। সে লড়াই ছেলেখেলাই বটে!

বলা যাইতে পারে ওতে আর কি হইল? কি হইল, সে কথার প্রমাণ বা প্রতিবাদ করিতে বসি নাই। গ্রন্থকার যদি কেবল বলিতেন—বাংলার বিপ্লবীরা দেশে স্বাধীনতা আনিতে পারে নাই—তাহা মাথা পাতিয়া মানিতাম বা এই পথ ভাল নহে বলিলে নীরব হইতাম। কিন্তু তাহাদের চেষ্টাকে খাটো করার, ব্যঙ্গ করার, শুধু বাহিরের কাজ নয় অন্তরটাকে পর্যন্ত ছোট করিয়া দেখানোর মতলবটাই আমাদের প্রতিবাদ করার বিষয়। কারণ তাঁহার বই লেখার উদ্দেশ্য শুধু বারীনবাবু নন, সকল বিপ্লবী তথা সমগ্র বাঙালী জাতি।

ঢাকা-কলতাবাজারে নলিনী বাগচী ও তারিণী মজুমদার বহু সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করে, অনেককে খুন জখম করিয়া শেষে গুলিতে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। নলিনী বাগচী মরিবার সময়ও নিজ নাম প্রকাশ করিয়া যায় নাই। কেহ তাহাকে জানুক, ইহা তাহার কাম্য নহে। এমনি ধারার 'মন্ত্রগুপ্তি' বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে বহু আছে। আমরা তাহা জানি; হেমবাবুর জানা না থাকিলে এবং প্রয়োজন হইলে সেই প্রমাণও দিব। এই মন্ত্রগুপ্তির অভাব লইয়াও তিনি কত নিন্দা, বিদ্রূপ, নিরাশার কথাই না শুনাইয়াছেন!

গৌহাটিতে শাস্ত্রীদের বন্দুক একদিকে, বিপ্লবীদের পিস্তল একদিকে, খণ্ডযুদ্ধ চলিল, শুধু চলিল না—সৈন্যদের ব্যূহভেদ করিয়া গুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে তাহারা জখম হইয়া এবং জখম করিয়া বাহির হইয়া গেল। পরে দুই চার জন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ধৃত হয়। অমানুষিক নির্যাতন সহিয়াও সেই দলের নলিনীকান্ত ঘোষ, প্রবোধ দাসগুপ্ত, মণীন্দ্র রায় প্রভৃতি কেহই একটি কথাও পুলিশকে বলে নাই। বগুড়াতেও বিপ্লবীরা খণ্ডযুদ্ধ করিয়া বাহির হইয়া যায়। ভারতবাসীদের মধ্যে যে জাতি হিসাবে বাঙালীই মরিতে ও মারিতে স্বভাবতঃ ভীরু, গ্রন্থকারের এই উক্তি যে সত্য নয়, তাহারই প্রমাণের জন্য তাঁহার বর্ণিত ঘটনার বিপরীত কয়েকটা বৃত্তান্ত মাত্র বলিলাম।

ডাকাতি, পরস্বাপহরণ কে সমর্থন করিবে? বিপ্লবীদের সেই কার্য আমরা সমর্থন করিতে বসি নাই; কিন্তু এই 'অপকার্যটিকে' হেমবাবু 'বিধবার ঘটি চুরি'

আখ্যা দিয়া ইহার স্বরূপটি যে বিকৃত করিতে চাহিয়াছেন, তাহা সত্য নহে ইহাই বলিতে চাই।

হেমবাবু উল্লেখ করিয়াছেন কাহাদের টাকা ডাকাতি করা হইবে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। রাশিয়ার বা আনন্দমঠের মত "যে অর্থশালী ব্যক্তি, খয়ের খাঁই বা ইন্‌ফরমারের কাজ করিত, অথবা যে সাধারণের অপ্রিয়, অত্যাচারী, পরস্বাপহারী, সুদখোর" তাহাদেরই উপর বৈপ্লবিক ডাকাতি হইত কিনা তাহার কোন হিসাব জানি না। কিন্তু এই ডাকাতি গ্রন্থকার-বর্ণিত 'বিধবার ঘটি চুরি' অর্থাৎ যেখানে কোন ভয় নাই সেই নিরীহ বিধবার হাজার টাকা গ্রহণের বীরত্ব—যে বিধবার "বাড়ীর আশেপাশে এমন পুরুষ মানুষ কেউ ছিল না, যে, ডাকাতদের একটুও বাধা দিতে পারে অর্থাৎ হিংসা কর্তে পারে"—এমনি ডাকাতিই যে কেবল বিপ্লবীরা করিয়াছে, ইহা সত্য নহে। ডাকাতি নিন্দার্হ-ই মনে করি, কিন্তু বাংলার বৈপ্লবিক ডাকাতি যে গ্রন্থকারের বর্ণিত 'বিধবার ঘটি চুরি' নহে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই লিখিতে হইতেছে বাহ্রা ডাকাতি প্রভৃতি বহু ডাকাতিতেই যে আক্রান্তেরা কেবল বাধাই দেয় নাই বন্দুকও চালাইয়াছে, বিপ্লবীরা বহু স্থলে আহতও হইয়াছে, ইহা সত্য কথা। বলা বাহুল্য মাত্র যে, আমরা ডাকাতি বা খুন কিছুই সমর্থন করিতেছি না। তবে গ্রন্থকার নিতান্ত অন্যায় সুযোগ গ্রহণ (এ সবের যথাযথ উত্তর দেওয়া যায় না বলিয়া) করিয়া যে বিপ্লবীদের জঘন্যভাবে খাটো করিতে কলম ধরিয়াছেন, আমরা তাহারই প্রতিবাদ করিতেছি। অনভিজ্ঞতা হেতুও তিনি এসব কথা বলিয়া থাকিতে পারেন, তাঁহার সকল কথার প্রতিবাদ করার স্থান ও কাল ইহা যদিও নহে, তবু আমরা সামান্য ইঙ্গিত করিয়া ইহাই বলিতে চাহিতেছি যে, বিপ্লবীদের সঠিক চিত্র তিনি আঁকেন নাই—আমাদের মনে হয় ইচ্ছা করিয়াই আঁকেন নাই।

গ্রন্থকার Rowlatt Report হইতে দেখাইতে চাহিয়াছেন যে বিপ্লবীরা অনেকেই গুপ্ত কথা সব বলিয়া দিয়াছিলেন। Rowlatt Report বিপ্লবীদের খাটো করিবার সহজ মতলবেই লিখিত। তবু বলি, Rowlatt Report-এর ঐ কথা ১৯০৮ সালের কথা। কিন্তু ১৯০৮ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্তর ইতিহাস কোথায়? তখন কয়জন নেতা, কয়জন বিশিষ্ট কর্মী গুপ্ত কথা বলিয়াছে, কয়জন মন্ত্রগুপ্তি নষ্ট করিয়াছে? আসল কথা এই—১৯১৪ সালের পরে ১৯১৫-১৬ সালের মধ্যে প্রায় সকল বিশিষ্ট নেতাই ধৃত হন। তখন অত্যন্ত নূতন

এবং অপরীক্ষিত অনভিজ্ঞ লোকই বিপ্লব আন্দোলন চালায়। এই সময়েও যাঁহারা ধৃত হন, তন্মধ্যে যাঁহারা পুরাতন বিশিষ্ট কর্মী তাঁহাদের সংখ্যা বেশী নহে, (যথা নলিনীকান্ত ঘোষ, অমৃত সরকার, মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রভৃতি) তাঁহারা অমানুষিক নির্যাতন সহিয়াছেন—কিন্তু একটি কথাও প্রকাশ করেন নাই বা betray করেন নাই। অমৃত সরকার ও নলিনীকান্ত ঘোষের অমানুষিক নির্যাতনের কথা প্রকাশিত হয়। সুতরাং শেষকালের—১৯১৮ সালের, তখন দলের জমাট ভাঙিয়া গিয়াছে—ধৃত কেহ কেহ (এই সংখ্যাও মোট বিপ্লবীদের তুলনায় নিতান্তই কম) একরার করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই নরেন গোঁসাই শ্রেণীর। কেহ কেহ হতাশ হইয়াছে, কেহ কেহ মনে করিয়াছে, পুলিশ যখন সবই জানে, তখন আর না বলিয়া মিছামিছি নির্যাতন ভোগ করি কেন? কেহ আবার পুলিশ যতটুকু জানিয়াছে, তাহাই বলিয়া interned হইতেও চাহিয়াছে, internment হইতে পলাইতে পারিবে, এই মতলবেও কেহ কেহ বলিয়াছে। কাহাকেও বা পুলিশ ভ্রান্তও করিয়াছে। 'অমুক-অমুক বিশিষ্ট কর্মী এই এই কথা বলিয়াছে'—এই ভাবেও মিথ্যা বলিয়া ভ্রান্ত করিয়াছে। ইহা অবশ্যই আমরাও বিপ্লব আন্দোলনের গুণ বলি না, কিন্তু ব্যাপারটা যাহা হইয়াছে, তাহার সত্যকার দিকটা দেখানোই কি কানুনগো মহাশয়ের কর্তব্য ছিল না?

বিশেষ একটা সময়ের, বিশেষ একটা অবস্থার আংশিক ঘটনা, সমগ্র আন্দোলনের যথার্থ রূপ বলিয়া প্রমাণ করিতে যাওয়া আর সেই প্রমাণ বলেই সমগ্র জাতির দোষ-গুণ কীর্তন করা সমীচীন নহে।

আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, বিপ্লবী কর্মীরা ধরা পড়িয়া সবাই খালাসের জন্য ব্যস্ত হয় নাই, গুপ্তকথা ব্যক্ত করে নাই, নাম জাহির করে নাই, পরস্পরকে জড়ায় নাই—বহু মামলায়ও যে একরার নাই, তাহাও দেখিয়াছি। হেমবাবু প্রথমটায় বারীনবাবুর স্বীকারোক্তির কথা টানিয়া আনিয়া বলিতেছেন, ('বারীন কেন এমন করেছিল তার কারণ ঠিক ধরতে না পারলেও') 'বারীনের অবস্থায় পড়লে যে দেশ উদ্ধারকারীরাও ও রকম ক'রে থাকে, তা দেখানোর জন্যই অত কথা লিখছি।' গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য দু'টি, এক ব্যক্তিগত হিসাবে বারীন-বাবুকে ঘায়েল করা—অপর উদ্দেশ্য সমগ্র বিপ্লব আন্দোলন, তথা এই দেশবাসী সবাই যে অপদার্থ তাহা প্রমাণ করা।

'বারীনের অবস্থায় পড়লে সবাই যে তা ক'রে থাকে' (ক'রে যে থাকে না, তাহা বহু ধৃত দণ্ডিত ব্যক্তির ঘটনায় দেখাইয়াছি) তাহা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন—বীরেন্দ্র দত্তগুপ্তের Statement হইতে। বীরেন দত্তগুপ্ত অপেক্ষাকৃত বালক। বিপ্লব আন্দোলন তখনও এদেশে নূতন। অভিজ্ঞতা কম। বীরেন্দ্র সামস্থল আলমকে হাইকোর্টে হত্যা করে। বীরেন্দ্র ফাঁসির পূর্বদিন স্বেচ্ছায় ম্যাজিষ্ট্রেটের (রাউলাট রিপোর্টের কথা) সামনে একরার করে। সে বলে, "জ্ঞানেন্দ্র মিত্র নামক চালকের দ্বারা যতীন্দ্র মুখার্জী নামক একজন ভদ্রলোকের সহিত আমি পরিচিত হয়েছিলাম।" (তারপর 'যুগান্তর' পড়া ও বীরত্বপূর্ণ কাজ করার ইচ্ছা—পরে সামস্থল আলমকে হত্যা করার পরামর্শ, যতীনের আদেশ ইত্যাদি বলিয়া) "আমি যতীনের অনিষ্ট করবার জন্য এই এজাহার দিচ্ছি না। আমি বুঝতে পেরেছি, এনার্কিজম্ দ্বারা দেশের কোন হিত হবে না। যে সকল নেতা আমার ওপর দোষারোপ ক'রে বলছেন, এ কাণ্ড ঘটেছে কোনও মাথা পাগল বালকের দ্বারা, তাঁদের আমি দেখাতে চাই, আমি একলা এ কাজের জন্য দায়ী নই। আমার ও যতীনের পেছনে অনেক লোক আছেন, কিন্তু আমি তাঁদের নাম এই এজাহারে উল্লেখ করতে চাই না। যে সকল নেতা আমায় দোষ দিচ্ছেন, তাঁরা দয়া ক'রে এগিয়ে আসুন এবং আমার মত বালকদের সৎপথে চালিত করুন।" (সিডিসন কমিটির রিপোর্ট হইতে গ্রন্থকারের অনুবাদ)।

সিডিসন কমিটি বলিতেছে সুতরাং হেমবাবুও বলিয়াছেন এই এজাহার বীরেন্দ্র 'স্ব-ইচ্ছায়' দিয়াছে। কাল যাহার ফাঁসি হইবে, তাহাকে যে কোন লোভ দেখাইয়া এই একরার করান হয় নাই—ইহা বুঝা যায়। কিন্তু এই বালকটির 'betrayal'এর মূলে যে কতটা মানসিক উত্তেজনা রহিয়াছে এবং এই অনভিজ্ঞ যুবকের মানসিক সাম্য নষ্ট করার জন্য যে কি কি ব্যবস্থা হইতে পারে বা হইয়াছিল, তাহার সংবাদ কে বলিবে ?* কিন্তু এই একরারেই যাহা

* হেমচন্দ্র কানুনগোর Statement বলিয়া পুলিশের কর্তা একটা মনগড়া মিথ্যা বিবৃতি দেখাইয়া বয়স্ক ক্ষুরধারবুদ্ধি উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তিদেরও যদি বিভ্রান্ত করিতে পারেন—তখনকার 'বুদ্ধির শোচনীয় অবস্থার ফলে' দুই একটা ঘটনার কথা স্বীকার করিতে পারেন—তাহা হইলে বীরেন্দ্রের মত বালকের বিভ্রান্ত হওয়া বিচিত্র কি ? (উপেন্দ্রনাথের আত্মকথা দ্রষ্টব্য)

প্রকাশ পাইয়াছে তাহা হইতেই কি কানুনগো মশাই, বিপ্লবীদের এত মনস্তত্ত্ব ঘাঁটিয়াও, এই মনস্তত্ত্বটা বুঝেন নাই! এ তো স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বীরেনকে জেলে সংবাদপত্র নিয়া দেখান হইত, (সাধারণতঃ কিন্তু জেলে সংবাদপত্র নিয়া পড়ায় না) সব কাগজ নহে, বাছিয়া বাছিয়া যে সংবাদপত্রে বালককে নিন্দা করা হইয়াছে, 'মাথাপাগল' বলা হইয়াছে, তাহাই পড়ান হইত।

দেশের লোক তাহাকে পাগল বলিতেছে, ইহা সে শুনিয়াছে। তখন অনভিজ্ঞ বালকের মনে হইতে পারে,—আমি একা নই যে, 'আমাকে দোষ দিতেছ'—আরো অনেক লোক আছে। আমি যদি পাগল হই, উহারাও পাগল। নেতারা এখন নিন্দা করেন, আগে বাহবা দিয়াছেন; যাঁহারা নিন্দা করেন, তাঁহারা এগিয়ে এসে আমাদের মত ছেলেদের সৎপথে চালিত করুন!—কেহ বিপ্লবীকাণ্ডে ধরা পড়িলে, অপর পক্ষে পুলিশ কি কি ব্যবস্থা করিতে পারে এবং করে, কোন্ কোন্ কথা বলিয়া মন দমাইয়া দিতে চেষ্টা করে, স্বদেশের লোকদের দুর্বলতা প্রভৃতি দোষ দেখাইয়া কি কি ভাবে ভ্রান্ত করিতে পারে, তাহা বিপ্লবীরা ক্রমে অভিজ্ঞতা হইতে শিখে। বীরেন্দ্রকে পুলিশ সংবাদপত্রের cuttings পড়াইয়া পড়াইয়া ও নেতারা যে তাহাদের মত ছেলেদের বিপদে ফেলিয়া নিজেরা সাধু সাজিতেছে এবং দেশের সমস্ত ভাল লোকই যে তাহাদের নিন্দা করিতেছে, ইহা বুঝাইয়া, এই Statement করিতে প্রেরণা দেয় বলিয়াই এদেশে প্রচার। সুতরাং বারীনবাবুর স্বীকারোক্তিকে সমর্থন করিতে বীরেন্দ্রের স্বীকারোক্তি তুলিয়া সব 'দেশোদ্ধারকারীরা' যে এমনই একরার করিয়া থাকে, তাহা বলা চলে না। বহু ব্যক্তি যে একরার করে নাই, তাহা আমরা বলিয়াছি—হালের কাকোরী মামলায় ফাঁসির পূর্বে কেহ একরার করিয়াছে গ্রন্থকার জানেন কি? বীরেনের নজির গ্রন্থকারের কথামত মানিয়া নিলেও তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় না। কিন্তু বীরেনের ব্যাপারও যে স্বতন্ত্র, তাহাই বলিতে বীরেনের statementএর একটু সমালোচনা করিলাম। অবশ্য বীরেনের মত বালকদের দলে টানার সঙ্গতি-অসঙ্গতি ভিন্ন কথা।

ব্যক্তি হিসাবে বারীন বা কাহাকেও সমর্থন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যত বড় লোকই হউন, যদি দেশের সেবায় 'ছেড়ে দিলাম পথটা বদলে গেল মতটা' এই নীতি অনুসরণ করেন, তবে বেশীদিন তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি থাকে না। কিন্তু গ্রন্থকার কয়েকজন নেতা বা কর্মবীরের দোষ দেখাইয়াই

জাতীয় চরিত্রের হীনতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই জন্যই আমরাও তাঁহার লেখার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের জাতীয় চরিত্রের নানা দোষ ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে, নতুবা এখনও পরাধীন আছি কেন? কিন্তু বারীন বাবুর দোষ (তর্কের খাতিরে ধরিয়া নিলাম) যদি প্রকৃত পক্ষেই থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে সমস্ত জাতীয় চরিত্রই কলুষিত হইয়া গিয়াছে এমন যুক্তি কোথাও শুনি নাই। আলিপুরের বোমার মামলার আসামীগণের মধ্যে যেমন নরেন গোস্বামী ছিল, তেমনি সত্যেন বসু ও কানাই দত্তও ছিলেন, উল্লাসকরও আছেন। দেশের সকলেই খারাপ লোক, একথা এইভাবে কিছুতেই প্রতিপন্ন হয় না।

হেমবাবু গবর্ণমেন্টের প্রকাশিত Rowlatt Report-খানা ভাল করিয়া পড়িলেই মোটামুটি বুঝিতেন যে, সমস্ত দেশটাই তাঁহার বর্ণিত 'Sancho'র মত ছিল না। কত নির্লোভ, নিরহঙ্কার বীরহৃদয় যুবক নীরবে নিশ্চিহ্ন হইয়া বিপ্লব প্রচেষ্টায় আত্মদান করিয়া গিয়াছে। যাহারা অজ্ঞাত অখ্যাত হইয়া শুধু আত্মবলিদানেই জীবন সার্থক মনে করিয়া গেল, সেই সমস্ত চরিত্রের লোক হেমবাবুর চক্ষে পড়ে নাই। তিনি "বিশ বাইশ বৎসরের নিদারুণ অভিজ্ঞতায়" নাকি বুঝিতে পারিয়াছেন যে Sanchoর মত ভীরু এদেশের সকলেই।

এই "নিদারুণ অভিজ্ঞতা" শব্দেই তাঁহার মানসিক অবস্থা প্রকট হইয়াছে। আন্দামানের 'নিদারুণ অভিজ্ঞতা'য় অনেকের মত তাঁহারও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। আজ লাঞ্ছনা ভোগের পর তিনি নিজের হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে দেশের সমস্ত লোকই ভীরু, কাপুরুষ!

কানুনগো মহাশয় আমাদের জাতীয় অযোগ্যতা প্রমাণ করিতে বারীনবাবু, 'অ' বাবু 'ক' বাবু তথা সমগ্র বিপ্লব আন্দোলন এবং সেই সঙ্গে সমাজের দোষ-ত্রুটির মসীকৃষ্ণচিত্র আঁকিয়াছেন। সমাজের দোষত্রুটি আছে, কিন্তু সমাজের দিক হইতেও বাঙালীর নিরাশ হইবার কিছু নাই। আর মুক্তিকামী বিপ্লবীদের কাছে সমাজ অপরিবর্তনীয় বন্ধন বলিয়া মোটেই গ্রাহ্য হয় নাই। আমরা বলিয়াছি, আমাদের দেশে সমাজের অন্ত নাই। কিন্তু গত শতবর্ষ যাবৎ দেশে যে সামাজিক বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আজ পর্যন্ত জাতিকে উন্নতির পথেই অগ্রসর করিয়া দিতেছে; জাতির উন্নতির পরিপন্থী সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও সামাজিক কুরীতি ক্রমশ দূরীভূত হইতেছে। সমাজ সংস্কার বিষয়ে জাতিহিসাবে আমরা জগতের কোন জাতি অপেক্ষা কম পরিবর্তনশীল নই; ইহা আমাদের

জাতির সামাজিক জাতীয় ইতিহাসের দ্বাদশ সহস্র বৎসরের পাতায় লিপিবদ্ধ। রাষ্ট্র-বশ্যতা যাহাকে আজ অচলায়তনবৎ করিয়া রাখিয়াছে—রাষ্ট্র সপক্ষ হইলে তাহা দেশ কালের হাত ধরিয়া চলিতে পারিত। যাক্ ইহা তর্কের কথা। হেমবাবুর বর্ণিত সমাজ-চিত্র সত্বেও ইহা সত্য যে, জাতির সর্বাঙ্গে আজ প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধনমোচনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে ১৯০৫ সাল হইতে, কিন্তু সমাজে ও ধর্মে কুরীতির বন্ধন মোচনের প্রবল চেষ্টা তাঁহার পূর্ব হইতেই দেশে দেখা দিয়াছে। ১৯০৫ সালের পর হইতে যে স্বাধীনতাকামী দল অথবা বিপ্লবীদলের স্বষ্টি হইয়াছে, তাহাদের ভিতর হইতে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা দোষ, ধর্মসম্বন্ধীয় কুসংস্কার প্রথম হইতেই লোপ পাইয়াছে; দৈনন্দিন ব্যবহারে, কাজকর্মে ও চিন্তায় তাহাদের মধ্যে ঐ সমস্ত কুরীতির চিহ্ন মাত্রও প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল—হইয়াছেও। এদিকে হেমবাবু অযথা ইহাদিগকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন।

যাহাই হউক, সমাজে ও ধর্মে কুসংস্কার বিদ্যমান, সুতরাং জাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের অযোগ্য, একথা একেবারে অশ্রদ্ধেয়। এই যুক্তি, যাহারা ভারতবর্ষকে চিরকাল শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায় তাহাদের মুখেই সাজে।

আমাদের কথা ইহা নহে যে সামাজিক ও ধর্মনৈতিক কুসংস্কার বর্তমান থাকুক—আমরা আগে স্বাধীনতা অর্জন করিয়া লই। আমরা বিশ্বাস করি, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যখন জাগে, জাতির দেহে প্রাণের সঞ্চার যখন অনুভূত হয়, তখন তাহার সর্ব অঙ্গের অসাড়তাই দূর হইতে থাকে। সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রে, শিল্পে ও সাহিত্যে সর্বদিকেই সজীবতার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। এবং বাঙালী জাতির সকলদিকেই যে জাগরণের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা অতীতের ও বর্তমানের তুলনা করিলেই বুঝা যায়। বাঙালীর বর্তমান সমাজে, ধর্মবিশ্বাসে, রাজনৈতিক আন্দোলনে, শিল্প ও সাহিত্যে নবভাবের উন্মেষ যাহারা লক্ষ্য না করিয়া জাতির প্রাণে নৈরাশ্য ও আত্ম-অবিশ্বাস জাগাইতে সচেষ্ট হইয়াছে, হয় তাহারা অন্ধ—নয় তাহাদের উদ্দেশ্য অসাধু।

কানুনগো মশাই "আমাদের moral" নামক পরিচ্ছেদে লিখিতেছেন, "যে সনাতন ভাবের শিক্ষাতে আমরা সে-কাল হ'তে একাল পর্যন্ত ওত-প্রোতভাবে অভ্যস্ত হ'য়ে এসেছি, তার সঙ্গে স্বদেশপ্রীতি বা জাতীয় অভ্যুদয়ের

যোগাযোগ অসম্ভব। কারণ সে শিক্ষা চেয়েছে পরকালে ব্যক্তিগত অভ্যুদয় যা নির্ভর করে ইহকালের অভ্যুদয়কে অস্বীকার করার ওপর।"

এমনি করিয়া জাতির আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতির কদর্থ করা হইয়াছে, এবং ধর্মই যে এদেশবাসীর যাবতীয় উন্নতির পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, এই একদেশদর্শী পাশ্চাত্য ধর্ম-বিপ্লব ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের গোটাকয় বাঁধাবুলি ঝাড়িয়াছেন। এবং এই সব সমাজ ও ধর্মের প্রভাবেই তাঁহার স্বদলের নেতারা ও কর্মীরা কেহ ধোঁয়ার রাজ্যে গেলেন—কেহ informer হইলেন—কেহ আরো কত কিছু হইলেন, তাহা সাব্যস্ত করিয়াছেন!

যেমন ব্যক্তিহিসাবে তেমনই জাতিহিসাবে কাজ করিতে না চাহিলে ফাঁকির অভাব হয় না। তাহা আধ্যাত্মিক বুলি আওড়াইয়াও চলে—আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বিদ্বেষ বচন দিয়াও চলে—ধর্মের নাম করিয়াও চলে—আবার 'দূর দূর কিছু নয় কিছু নয়' করিয়াও চলে। রামবাবু যদি কাজ ছাড়িতে চান—তবে যেমন 'ধর্মের হেঁয়ালী' অবলম্বন করিতে পারেন, তেমনি শ্যামবাবু যখন কাজ ছাড়িতে চান, তখন 'ধর্মের হেঁয়ালী ভাঙ্গিবার' নাম করিয়া—এ জাতির যোগ্যতা যে কোন দিকেই নাই—তাহা প্রমাণ করিতে বসিয়া কাজ ছাড়িতে পারেন। 'নতুন নতুন' আদর্শের নাম করিয়া কোন পথ না বাতলাইয়া কাজ ছাড়িবার সোজাপথ আবিষ্কার করা যায়। কানুনগো মহাশয় সমাজের দোষ-ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন ভালই—কিন্তু তিনি কি বলিতে পারেন—তাঁহারই কথামত, এই যে তাঁহাদের দলের অনেকে জেলে গিয়া একরার করিল—কাগজ চাহিয়া আনিয়া Statement লিখিতে আরম্ভ করিল—এই যে ধৃত যুবকদের অভিভাবকেরা পর্যন্ত লাট সাহেবের কাছে 'কি সব লিখে পাঠাবার জন্য বিশেষ জিদ্ করেছিলেন' ইত্যাদি, এসব কি তাঁহাদের পরকালে ব্যক্তিগত অভ্যুদয় বেশী করিয়া হইবে এই আশায়, না ইহকালেরই অতি স্থূল ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ বুদ্ধিতে? বলিয়াছি ত—আত্মবঞ্চনা করিতে ইচ্ছা হইলে ধর্মের নাম করিয়াও করা যায়—আবার ধর্মকে গালি দিয়াও করা যায়। যাঁহারা দুর্বলতা দেখাইয়াছেন—দুর্বলচিত্ত বলিয়াই তাহা দেখাইয়াছেন, আদর্শে নিষ্ঠা না থাকায়ই দেখাইয়াছেন,—ইহা জাতীয় চরিত্র নহে—কারণ পরে বহু বিপ্লবী বিন্দুমাত্র 'সনাতন ধোঁয়া' বা তথাকথিত 'আধ্যাত্মিকতার' ধার না ধারিয়াই সোজা চলিয়াছেন—দুর্বলতা দেখান নাই। কেহ কেহ 'আধ্যাত্মিকতার'

দিকে ঝুঁকিয়াছেন হয়ত' কিন্তু বিপ্লবীদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কয় জন তাহা করিয়াছে? দুই একজনের দুই একটা ঘটনা লইয়া সাধারণ মন্তব্য করা বিড়ম্বনা। তা ছাড়া আধ্যাত্মিকতা সর্বক্ষেত্রে ব্যঙ্গ করার বস্তুও তো নয়। কাহারও মধ্যে দুর্বলতার জন্য মোটেই নহে, কিন্তু সহজ চিত্তবৃত্তির দিক হইতেও তাহা দেখা দিতে পারে, দেখা দেয়ও। গ্রন্থকারের বর্ণিত আলিপুরের মামলার দলের মধ্যে হয়ত এ ভাবের অনুকরণে প্রাবল্য ছিল, কিন্তু বরাবর বিপ্লবীদের নেতাদের, বিশিষ্ট কর্মীদের তাহা ছিল—একথা আমরা জানি না।—বরং কেহ অধিক মাত্রায় ধর্মচর্চা করিলে বিপ্লবীরা মনে করিত, সে কাজের বাহির হইয়া গেল। সুদীর্ঘ বিপ্লব ইতিহাসে গ্রন্থকারের একথা প্রমাণিত হয় নাই যে, এই দলে "ভক্তেরই প্রাচুর্য। ভক্তের ভগবান একজন খাড়া করেই তার কথা নির্বিচারে 'বুজরুকি' হইলেও মানিয়া নেওয়াই ছিল রেওয়াজ।" বরং বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট কর্মী বলিয়া দেশবাসীর কাছে গণ্য, পুলিশের কাছেও গণ্য, তাঁহারা নিজেদের 'অবতার' বলিয়া ঠাওর করেন নাই—আর ভক্তরা যে গুরুর বিন্দুমাত্র পতনে, বিন্দুমাত্র দুর্বলতা দর্শনে, বিপ্লবের আদর্শ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতিতে গুরুত্যাগ করিয়াছেন, নেতা ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ অনেক পূর্ব-বিপ্লবী নেতাদের, বিপ্লবনিষ্ঠ কর্মীদের উপর, তথা দেশের কর্মক্ষেত্রে প্রভাব নষ্ট হওয়ার মধ্যেই মিলিবে।*

* হেমচন্দ্র বাবুর 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'র এই সমালোচনা যখন লিখিত হয় তখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র, বিনয় বাদল দীনেশ প্রভৃতির বিপ্লবাঙ্ক অভিনীত হয় নাই। বলা বাহুল্য, যথাস্থানে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বয়স, জাতি ও ব্যবসায় হিসাবে বাংলার বিপ্লববাদীদের একটি তালিকা

বাংলার বিপ্লববাদীদের মধ্যে যে বয়সের, যে শ্রেণীর, যে ব্যবসায়জীবী লোক সাধারণত যোগ দিয়াছিল তাহার একটা তালিকা সিডিসন কমিটির রিপোর্ট হইতে দিলাম। যাহারা ১৯০৭-১৭ সালের মধ্যে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের জন্য সাজা পাইয়াছে, অথবা যাহারা অন্যান্য বিশেষ কার্যে অভিযুক্ত হইয়া সাজা পাইয়াছে—বা যাহারা বিপ্লবানুষ্ঠানে মারা গিয়াছে, এই তালিকায় মাত্র তাহাদেরই গণনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহাতে অন্তরীণদের রাজবন্দীদের এবং যাহারা শান্তিরক্ষার জন্য বা ঐ রকম কারণে মুচলেকা দিয়াছিলেন তাঁহাদের গণনা করা হয় নাই।

১০—১৫	২
১৬—২০	৪৮
২১—২৫	৭৬
২৬—৩০	২৯
৩১—৩৫	১০
৩৬—৪৫	৯
৪৫ বছরের উপর	১

কায়স্থ	
ব্রাহ্মণ	
বৈদ্য	
মাহিষ্য	
কৈবর্ত	৩
সাহা	২
রাজপুত	১
তাঁতি	
বৈশ্য	
কর্মকার	
বারুই	
মুচী	১
শূদ্র	১
উড়িয়া	
ইউরোপীয় অল্প আমদানী ব্যাপারে	

ছাত্র
শিক্ষক
তালুকদার
কোন ব্যবসায় নাই
ব্যবসায় বাণিজ্য
ডাক্তার অথবা কম্পাউণ্ডার
কেরানী ও সরকারী কর্মচারী
সংবাদপত্র
কৃষি ব্যবসায়ী
আফিম স্মাগলার

দ্বিতীয় পর্যায়ের

১৯২৩—৩রা আগষ্ট কলিকাতা শাঁখারীটোলা পোষ্ট অফিসে হানা দিয়া রিভলভার দেখাইয়া টাকা লুট করার চেষ্টা করে। টাকা না পাইয়া বিপ্লবীরা পোষ্ট মাষ্টারকে গুলি করে। এই সম্পর্কে ধৃত বরেণ ঘোষের প্রাণদণ্ড হয়।

ডিসেম্বর (১৯২৩) চট্টগ্রাম বি-এ-রেলওয়েতে ১৭০০০৲ ডাকাতি হয়। একজন আসামীকে পুলিশ সাব-ইন্‌সপেক্টর ধরিতে গেলে—তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। অবশ্য আসামীকে গ্রামের লোক ধরিয়া ফেলে।

১৯২৪—১২ই জানুয়ারী স্যার চার্লস টেগার্ট ভ্রমে মিঃ ডে নামক ইংরাজকে কলিকাতা চৌরঙ্গীতে গোপীনাথ সাহা গুলি করিয়া হত্যা করে।

৬ই ফেব্রুয়ারী গোপীনাথের ফাঁসি হয়। এই সালের এপ্রিল মাসে টেগার্ট ভ্রমে মিঃ ব্রুম্‌কে কলিকাতা হ্যারিসন রোডে হত্যা করার চেষ্টা হয়। মে মাসের মাদারীপুরের পালং থানায় ডাকাতি হয়। কয়জন ভদ্রযুবক সন্দেহে ধৃত হয়। ৬ মাস পর নবেম্বর মাসে জামীনে মুচলেকায় আবদ্ধ করা হয়।

২৫মে চট্টগ্রামের সাব-ইন্‌সপেক্টর প্রফুল্ল রায়কে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। এই সম্পর্কে……দত্তকে ধৃত করা হয়। বিচারে দণ্ডিত হয়। হাইকোর্টের আপীলে মুক্ত হয়। কিন্তু নূতন অর্ডিন্যান্‌সএ আটক করা হয়।

এই সালেই—মানিকতলায় বোমা আবিষ্কার। যশোদারঞ্জন পাল ও অবনী মুখার্জী যথাক্রমে ১০ ও ৭ বৎসর কারাদণ্ড হয়। দ্বিতীয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার সন্তোষ মিত্র আসামী ছিলেন। মুক্তিলাভ করেন।

২২শে আগষ্ট কলিকাতা মীর্জাপুর ষ্ট্রীটের এক দোকান একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। একজন নিহত হয়। একজন আহত হয়। তৃতীয় ব্যক্তি শিশির কুমার ঘোষ (পূর্বে অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন) লাফ দিয়া আততায়ীকে ধরিতে যায়। শিশির পুলিশকে বলে: বসন্ত কুমার ঢেঁকীই বোমা নিক্ষেপকারী। এই সম্পর্কে বসন্ত ও শান্তিলাল চক্রবর্তী ধৃত হয়। শান্তিলাল সেশান আদালতে মুক্তি পায়। কিন্তু এই শান্তিলালেরই মৃতদেহ (৩রা অক্টোবর) অতি বিকৃত

অবস্থায় দমদম ও বেলঘরিয়ার মাঝামাঝি স্থানে রেল লাইনের পাশে পাওয়া যায়। অম্বিকা খাঁ পুলিশের প্ররোচনায় এই হত্যা করে বলিয়া আলিপুর জেলে এক পত্র লেখে। পরে অম্বিকা আত্মহত্যা করে।

২৪শে নবেম্বর ই-বি-রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারকে লক্ষ্য করিয়া একজন বাঙালী যুবক পিস্তল ছোঁড়ে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পুলিশের বিশ্বাস ঐ গাড়ীলুঠ করার উদ্দেশ্য ছিল।

১৯২৫—৩রা ফেব্রুয়ারী বরিশালে "বিপ্লববাদী" পুস্তিকা বিতরিত হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্র কর ধৃত হয়।

এই সালের শেষভাগে দক্ষিণেশ্বরে বোমার কারখানা আবিষ্কার। মূল অনুশীলন ও মূল যুগান্তর দলের লোক এইখানে ধৃত হয়।

৯ই আগষ্ট কাকোরী রেল ষ্টেশনে ডাকাতি—পরে ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯২৬—২৮শে মে সি, আই, ডি পুলিশের উচ্চ কর্মচারী রায় বাহাদুর ভূপেন চাটার্জীকে প্রেসিডেন্সী জেলে হত্যা করা হয়। দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলায় দণ্ডিত আসামী অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী এই সম্পর্কে ফাঁসি হয়।

১৯২৮—সাইমন কমিশন বর্জন আন্দোলনের কালে ফেব্রুয়ারী মাসে লালা লাজপৎ রায় নিহত হন। লালা লাজপৎ রায়ের হত্যার জন্য দায়ী মিঃ স্যাণ্ডার্সকে লাহোরে হত্যা করা হয়। এই সম্পর্কে ভগৎসিং প্রভৃতির বিরুদ্ধে গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা বাহির হয়।

১৯২৯—ডিসেম্বরে মেছুয়াবাজারে বোমা; পুলিশ বোমার ফরমূলা চিঠি-পত্র ঠিকানা ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র পায়। বিপ্লবীরা ধৃত হয়। মেছুয়াবাজার ষড়যন্ত্র মামলার ইহাই উপাদান।

বাঙ্‌লা

১৯৩০

(১) ১লা ফেব্রুয়ারী রামানন্দ ইউনিয়ান স্কুলের সহকারী শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায় কিশোরগঞ্জে (ময়মনসিংহ) নিহত হন। স্থানীয় বিপ্লব সংস্থার বিরোধী কাজ করেন বলিয়া তিনি নিহত হন।

(২) ১৮ই এপ্রিল, সূর্যসেন অনন্ত সিংহ ও অন্যান্যের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের সন্ত্রাসবাদীদল কর্তৃক চট্টগ্রাম সহরের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস, জেলা পুলিশ অস্ত্রাগার ও "অকজিলিয়ারী ফোর্স আরমারী" আক্রান্ত ও লুন্ঠিত হয়। জের জালালাবাদ খণ্ড যুদ্ধ।

(৩) ৭ই মে চট্টগ্রামের শিকলবাহা গ্রাম অতিক্রম করিবার কালে কয়েকজন ফেরারী বিপ্লবী গ্রামবাসীদের উপর গুলি ছুঁড়িয়া পলাইয়া যায়।

(৪) ১৩ই মে হাওড়ায় শিবপুর থানার এক দারোগার গৃহে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

(৫) ১৯শে জুলাই (রংপুর) গাইবান্ধা সহরের গাইবান্ধা রোড অতিক্রম কালে পুলিশ কর্মচারীদের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

(৬) ২রা আগষ্ট ময়মনসিংহ সরকারী-গুদাম লুণ্ঠন মামলার একজন আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার সময় একজন কনেষ্টবল গুলিবিদ্ধ হয়।

(৭) ২৫শে আগষ্ট ডালহাউসী স্কোয়ারে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। মিঃ টেগার্ট আহত হন নাই। বোমা-নিক্ষেপকারী তরুণ বিপ্লবী অনুজা সেন গুরুতর রূপে আহত হন ও মৃত্যু বরণ করেন। এই সম্পর্কে ডাঃ নারায়ণ রায়, ডাঃ ভূপাল বসু প্রভৃতি ধৃত হন এবং কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

(৮) ২৬শে আগষ্ট কলিকাতার জোড়াবাগান পুলিশ কোর্ট প্রাঙ্গণে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

(৯) ২৭শে আগষ্ট কলিকাতা ইডেন গার্ডেনের পুলিশ ফাঁড়িতে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

(১০) ২৯শে আগষ্ট দেশবন্ধুপার্কে রতন ভূষণ হাজরা নিহত হন।

(১১) ২৯শে আগষ্ট—বাঙলার পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর মিঃ লোম্যান এবং ঢাকার পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট মিঃ হড্‌সন্ ঢাকায় মিটফোর্ড হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ হন।

(১২) ৩০শে আগষ্ট ময়মনসিংহ সহরে ময়মনসিংহ গোয়েন্দা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার পবিত্র বোসের গৃহে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

(১৩) ২৩শে সেপ্টেম্বর—খুলনা থানার প্রাঙ্গণে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। সেখানে জেলা গোয়েন্দা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর এবং আরও অনেকে ছিলেন।

(১৪) ১৩ই অক্টোবর—ময়মনসিংহ জেলা গোয়েন্দা বিভাগের সাব ইন্‌স্‌পেক্টার এবং তাহার দেহরক্ষী, দুইজন ওয়ার হাউস লুণ্ঠন মামলার ফেরারী আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার সময় গুলিবিদ্ধ হয়।

(১৫) ১লা ডিসেম্বর—রেলওয়ে ইন্‌স্‌পেক্টার তারিণী মুখার্জি চাঁদপুর রেলওয়ে স্টেশনে ভুলবশতঃ গুলিবিদ্ধ হইয়া নিহত হন। বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ছিল পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেলকে হত্যা করা। ঐ ট্রেনেই তিনি আসিতেছিলেন।

(১৬) ৮ই ডিসেম্বর—রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বাংলার জেলসমূহের ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেল কর্ণেল সিম্‌সন গুলিতে নিহত হন।

১৯৩১

(১) ১২ই জানুয়ারী—ঢাকার ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডসের একজন কেরাণী ডাকাতির চেষ্টার সময় গুলিবিদ্ধ হইয়া আহত হয়।

(২) ২৩শে ফেব্রুয়ারী—বরিশাল জেলা গোয়েন্দা বিভাগের সাব-ইন্‌স্‌পেক্টারের গৃহে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

(৩) ১৬ই মার্চ—চট্টগ্রাম জেলা গোয়েন্দা-বিভাগের সহকারী সাব ইন্‌স্‌পেক্টার পটিয়া থানার অন্তর্গত 'বরামা'য় ফেরারী বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তিদার কর্তৃক গুলিতে আহত হন।

(৪) ১৭ই মার্চ—নদীয়া জেলা গোয়েন্দা-বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টারের গৃহে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

(৫) ১৭ই মার্চ—নদীয়া, কোতয়ালী থানায় একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

(৬) ১৭ই মার্চ—নদীয়ার পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টের গৃহে বোমা নিক্ষিত হয়।

(৭) ৭ই এপ্রিল—মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জে, পেডি নিহত হয়।

(৮) ২৪শে এপ্রিল—'রয়েল ক্যালকাটা গল্‌ফ ক্লাবে' একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

(৯) ২৭শে জুলাই—আলিপুরের জেলা ও সেসন্ জজ্ মিঃ গারলিক্, আই, সি, এস নিহত হন। ধৃত হওয়ার আগেই হত্যাকারী বিষ খায়।

(১০) ২১শে আগষ্ট—টাঙ্গাইলে (ময়মনসিংহ) ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ এ, ক্যাসেলসের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়।

(১১) ৩০শে আগষ্ট—চট্টগ্রামের পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার খান বাহাদুর আসানুল্লা নিহত হন।

(১২) ৯ই সেপ্টেম্বর—বর্ধমান কালনা থানায় একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

(১৩) ১০ই সেপ্টেম্বর—বর্ধমান মেমারি থানায় "কমাণ্ডিং অফিসারের" গৃহে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

(১৪) ২৮শে অক্টোবর—ঢাকা সহরে, ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডুর্ণোর প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। ডুর্ণো আহত হন।

(১৫) ২৯শে অক্টোবর—ক্লাইভ বিল্ডিংএ "ইউরোপিয়ান এসোসিয়েসনের" সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্সের অফিসে তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। বিমল দাশগুপ্ত অকুস্থলে ধৃত হয়। দশবৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। পেডি হত্যা মামলার ফেরারী আসামীরূপে থাকা অবস্থায় বিমল মিঃ ভিলিয়ার্সকে আক্রমণ করিতে যায়।

(১৬) ১১ই নভেম্বর—ময়মনসিংহের সেরপুর মহকুমা রাজবল্লভপুরে ইন্‌স্‌পেক্টার মনোরঞ্জন চৌধুরীকে গুলি করিয়া হত্যার চেষ্টা হয়।

(১৭) ১৪ই ডিসেম্বর ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সি, জি, বি, স্টিভেন্স নিহত হন।

(১৮) ৩০শে ডিসেম্বর—মাণিকতলা ডাকাতি মামলার প্রধান সাক্ষী ৫২নং গৌরীবাড়ি লেনে জখম হয়।

১৯৩২

(১) ১৯শে জানুয়ারী—ঢাকায় সার্জেণ্ট বোর্ণকে লোহার ডাণ্ডা দ্বারা মারাত্মক ভাবে জখম করা হয়। সশস্ত্র বিপ্লবীদল কর্তৃক তাহার পিস্তলটি অপহৃত হয়।

(২) ২২শে জানুয়ারী—হাওড়া আমতা রেলওয়ের পাতিহাল স্টেশনে হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের রেলগাড়ীর কামরায় একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

(৩) ৬ই ফেব্রুয়ারী—সিনেট হাউসে (কলিকাতা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে পিস্তলের গুলিতে বাঙ্গলার গভর্ণরের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। ছাত্রী বীণাদাস অকুস্থলে ধৃত হন।

(৪) ১১ই মার্চ—মুর্শিদাবাদের কান্দির মহকুমা অফিসের কোয়ার্টারে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

(৫) ২৮শে মার্চ—রংপুর লালমণিরহাটে "সেটেলমেণ্ট অফিসার"দের ক্যাম্পে পিস্তল-গুলি লুট করিবার জন্য আগুন দেওয়া হয়।

(৬) ২১শে এপ্রিল—মার্টিন কোম্পানীর মিশন রো অফিসবাড়ীর গুদামে একটি বোমা বিস্ফোরণ হয়।

(৭) ৩০শে এপ্রিল—মেদিনীপুর জেলা বোর্ড অফিসে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগলাস আই, সি, এস গুলিবিদ্ধ হইয়া নিহত হন।

(৮) ১৮ই মে—চট্টগ্রাম সহরের লামাবাজার পোষ্ট অফিসে একটি পার্সেল বিস্ফোরিত হয়, এবং তাহাতে একজন 'পিয়ন' আহত হয়।

(৯) ২৬শে মে—ঢাকা লাটপ্রাসাদের সম্মুখে গার্ড কনেস্টবল সোলেমান খান নিহত হয় এবং বিপ্লবীগণ তাহার পিস্তল লইয়া যায়।

(১০) ১২ই জুন—ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের (বি, এ, আর) রাজবাড়ী স্টেশনে একটি ট্রেনে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। সেই ট্রেনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট (ফরিদপুর) ভ্রমণ করিতেছিলেন।

(১১) ১৪ই জুন—চট্টগ্রাম, পটিয়া থানা এলাকায় ধলঘাটে ফেরারী বিপ্লবীদের আস্তানায় আক্রমণ চালাইবার সময় ক্যাপ্টেন ক্যামেরন গুলিবিদ্ধ হইয়া নিহত হন।

(১২) ২৭শে জুন—ঢাকা সহরে, সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু কামাক্ষ্যা সেন তাঁহার স্বগৃহে গুলিবিদ্ধ হইয়া নিহত হন। আইন অমান্য আন্দোলন কালে বিক্রমপুরের কর্মীদের উপর কামাক্ষ্যা সেন অত্যাচার করেন বলিয়া বিপ্লবীরা তাঁহার মৃত্যুদণ্ড দেয় বলিয়া প্রকাশ। অন্যথায় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে তিনি কিছু করেন নাই।

(১৩) ১৯শে জুলাই—ত্রিপুরার পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌ মিঃ এলিসন কুমিল্লা সহরে গুলিবিদ্ধ হন।

(১৪) ৫ই আগষ্ট—চৌরঙ্গীতে "স্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকার সম্পাদক স্যার আলফ্রেড ওয়াটসনকে গুলি করিবার প্রথম চেষ্টা করা হয়। আততায়ী আত্মহত্যা করে।

(১৫) ২২শে আগষ্ট—ঢাকা, নবাবপুর রেলওয়ে ক্রসিংএর সম্মুখে ঢাকার এডিশনাল (অতিরিক্ত) পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ সি, গ্র্যাসবিকে হত্যার চেষ্টা করা হয়।

(১৬) ২৪শে সেপ্টেম্বর—চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে অবস্থিত 'ইউরোপীয়ান ইন্‌স্টিটিউট' বোমা ও পিস্তলে সজ্জিত বিপ্লবীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন একজন মহিলা বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার, তিনি

আত্মহত্যা করেন। এই আক্রমণে একজন ইউরোপীয়ান মহিলা হত এবং কতিপয় ইউরোপীয় ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আহত হয়।

(১৭) ২৮শে সেপ্টেম্বর—কলিকাতা ষ্ট্রাণ্ড রোডে 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ আলফ্রেড ওয়াটস্‌নকে হত্যার দ্বিতীয় চেষ্টা করা হয়।

(১৮) ১৮ই নভেম্বর—রাজসাহীতে রাজসাহী জেলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্—মিঃ লিউককে হত্যার চেষ্টা করা হয়।

(১৯) ১৯শে নভেম্বর—ত্রিপুরায় কালিকচ্ছে 'মালিয়া' নামক একজন গুপ্তচরকে হত্যার চেষ্টা করা হয়।

১৯৩৩

(১) ৯ই জানুয়ারী—১ম ডর্‌সেট বাহিনীর সৈনিক মিঃ ফ্লাভেলের পিস্তল অপহরণের জন্য তাহার উপর আক্রমণ করা হয়।

(২) ১৭ই ফেব্রুয়ারী—চট্টগ্রাম গৈরালায় সূর্য সেন ও ব্রজেন্দ্র সেন সশস্ত্র প্রতিরোধের পর ধৃত হন।

(৩) ১৮ই মে—আনওয়ারার (চট্টগ্রাম) নিকটে গহিরায় পুলিশ ও সৈন্যদল সন্দেহবশতঃ একটি (বিপ্লবীদের) আশ্রয়স্থল পরিবেষ্টিত করিলে ফেরারী বিপ্লবীগণ সরকারী সৈন্যদলের উপর গুলি বর্ষণ করে। তারকেশ্বর দস্তিদার ও শ্রীমতী কল্পনা দত্ত নামে দুইজন ফেরারী বিপ্লবী ধৃত হন। সরকার পক্ষীয় কেহ হতাহত হয় নাই।

(৪) ২২শে মে—১৩৬।৩বি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ফেরারীদিগের আস্তানা পুলিশ ও সৈন্যদল কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইলে, ফেরারী বিপ্লবী, দীনেশ মজুমদার, নলিনী দাস, জগদানন্দ মুখার্জী অবরোধকারীদের প্রতি গুলি বর্ষণ করে এবং তাহাতে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ ইন্সপেক্টার এম, ভট্টাচার্য আহত হন। উভয় পক্ষে গুলি বিনিময় হয়। ইহার মধ্যে দুইজন জেল-পলাতক ছিল। তিনজনই ধৃত হয়। দীনেশ মজুমদারের ফাঁসির হুকুম হয়।

(৫) ২৩শে আগষ্ট—ময়মনসিংহের রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তি বীরেন্দ্র নাথ দে নিহত হন।

(৬) ৩রা সেপ্টেম্বর—মিঃ বি, ই, জে বার্জ আই, সি, এস (মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট) নিহত হন। তাঁহার দুইজন আততায়ীও নিহত হয়।

(৭) ২৮শে অক্টোবর—অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ১৫ জন যুবকের একটি দল দিনাজপুরের হিলি রেলওয়ে স্টেশন আক্রমণ করে এবং একজন ডাক পিয়ন, একজন 'রেলওয়ে মেকানিক' এবং চারজন কুলীকে আহত করিয়া মেল ব্যাগ ও নগদ টাকা অপহরণ করে। ডাক পিয়নটি পরে মারা যায়। ৭ জন 'ডাকাত' সেই দিনেই পুলিশ কর্তৃক পথে ধৃত হয়। প্রাণকৃষ্ণের ফাঁসির আদেশ হয়। পরে হাইকোর্টে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ হয়। হৃষীকেশ ভট্টাচার্যেরও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

১৯৩৪

(১) ৭ই জানুয়ারী—চট্টগ্রামে ক্রিকেট খেলার মাঠে ইউরোপীয়ানদের উপর আক্রমণ করা হয়।

(২) ২০শে ফেব্রুয়ারী—ময়মনসিংহের অন্তর্গত কুলিয়াচর থানার বীর কাসিমনগর স্কুলে, ডাকাতির চেষ্টায় রত সশস্ত্র দুইজন যুবক ধৃত হয়।

(৩) ২৩শে ফেব্রুয়ারী—কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশনে ডি, আই, বি এ-এস-আই অসিতরঞ্জন চক্রবর্তীকে একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি ছোরা লইয়া আক্রমণ করে ও তাহাকে ছোরা দ্বারা জখম করিবার চেষ্টা করে। অপর একজন লোকের বাধাদানে আক্রমণ ব্যাহত হয়।

(৪) ২৪শে ফেব্রুয়ারী—'লেসিয়ারা'র (ত্রিপুরা) সূর্যকান্ত ভট্টাচার্য আহত হন।

(৫) ১০ই এপ্রিল—নারায়ণগঞ্জ থানার বাবুরাইল রোডে তিনজন ভদ্র যুবককে কয়েকজন মুসলমান সন্দেহবশতঃ খোঁজ করিতে গেলে তাহাদের মধ্যে একজন যুবক রিভলভার বাহির করিয়া গুলি করে, তাহাতে একজন মুসলমান নিহত হয় ও অপর একজন গুরুতর রূপে আহত হয়। এই ঘটনায় ধৃত বিপ্লবী মতি মল্লিকের ফাঁসি হয়।

(৬) ৬ই মে—দুইজন যুবক কর্তৃক শিবপুর (হাওড়া) থানায় বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

(৭) ৮ই মে—দার্জিলিং লেবং ঘোড় দৌড় মাঠে বাংলার গভর্ণরকে আক্রমণ করা হয়। আক্রমণকারীরা ধৃত হয়। তন্মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন।

যুক্তপ্রদেশ

১৯৩০

(১) ৩১শে মে—কানপুরে বোমা প্রস্তুত করিবার সময় কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের বিস্ফোরণ হয়।

(২) ৮ই আগষ্ট—ঝান্সীতে লক্ষ্মী পাণ্ডে নামে এক ব্যক্তি বিভাগীয় কমিশনারকে হত্যার চেষ্টা করে।

(৩) ৮ই সেপ্টেম্বর—কাশীতে একটি বার্লির টিনে বোমা বিস্ফোরণের ফলে এক বৃদ্ধা মারা যায়।

(৪) ১লা ডিসেম্বর—কানপুরে পুলিশের একটি অনুসন্ধানকারী দল আক্রান্ত হয় এবং সালিগ্রাম শুক্লা ও অপর বিপ্লবী সুরেন পাণ্ডে কর্তৃক তিনজন পুলিশ আহত হয়। সালিগ্রাম পুলিশের সহিত সংঘর্ষে নিহত হন।

১৯৩১

১লা হইতে ১৩ই জানুয়ারী পর্যন্ত কাশীতে অনেকগুলি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে।

২রা জানুয়ারী—অশোককুমার বসু নামক এক ব্যক্তি সি, আই, ডি, ইন্‌স্‌পেক্টার টিকারাম এবং একজন সাব-ইন্‌স্‌পেক্টারকে হত্যার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হয়। আততায়ী ধৃত হয় ও দণ্ডিত হয়।

৭ই জানুয়ারী—কাশীতে 'মেল-ভ্যান' লুণ্ঠন করিবার জন্য বোমা ব্যবহৃত হয়।

১১ই জানুয়ারী—কানপুরে ডেপুটি কলেক্টরের ক্যাম্পে নারিকেল (cocoanut) বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু ইহা বিস্ফোরিত হয় নাই।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—এলাহাবাদে কাকোরী ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ফেরারী আসামী বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা চন্দ্রশেখর আজাদ আলফ্রেড্ পার্কে পুলিশ কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হইয়া নিহত হন। তৎপূর্বে পুলিশের সঙ্গে কিছুক্ষণ রিভলভার যুদ্ধ হয়।

৬ই জুন—কানপুরে দুইজন কনেস্টবল একজন ফেরারী বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করিবার সময় আক্রান্ত হইয়া গুরুতর রূপে আহত হয়।

১৮ই জুলাই—কানপুরে জনৈক বিপ্লবী পুলিশের চর হইয়াছে সন্দেহ

করিয়া তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। তাহার নাম বীর বাহাদুর তেওয়ারী।

২৪শে নভেম্বর—বীর বাহাদুর তেওয়ারীর উপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ চলে।

১৯৩২

২৩শে জানুয়ারী—এলাহাবাদে হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাব্লিকান এসোশিয়েশনের নায়ক যশপাল, পুলিশের সহিত কিছুক্ষণ গুলি বিনিময়ের পর ধৃত হন। দুইটি পিস্তল ও অনেক গোলাবারুদ পাওয়া যায়।

১লা ফেব্রুয়ারী—লক্ষ্ণৌতে একটি বোমা বিস্ফোরণের ফলে চারজন সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার, দুইজন কনেস্টবল এবং অপর দুইজন আহত হয়।

২৩শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৮ই এপ্রিল—এলাহাবাদে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। দুইজন কনেস্টবল আহত হয়।

১লা এপ্রিল—এলাহাবাদে, গঙ্গানদীর উপর ডাফরীণ ব্রীজের ধ্বংসকার্যে রত পাঁচব্যক্তি ধৃত হয়।

১০ই মে—সীতাপুরে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গৃহের বাহিরে একটি দেশী বোমা বিস্ফোরিত হয়। কেহ আহত হয় নাই।

১৯৩৩

৫ই জানুয়ারী—কানপুরে একজন ফেরারী আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার সময় পুলিশদল বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফেরারী আসামী পরে ধৃত হয়।

১৫ই মার্চ—বেনারসে একজন ফেরারী বিপ্লবী ধৃত হয়। তাহার নিকট একটি পিস্তল এবং ৫৯টি গুলি পাওয়া যায়।

বিহার

১৯৩০

১৩ই অক্টোবর—জামালপুরে তিনজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি একজন সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার ও কনেস্টবলের উপর গুলি বর্ষণ করে। তাহারাও প্রত্যুত্তরে গুলি নিক্ষেপ করে। কিন্তু আততায়ীগণ পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

১৯৩১

২৮শে জুন—পাটনায় দুইজন বিপ্লবী কর্তৃক বোমা নিক্ষেপের ফলে একজন সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার ও একজন হাবিলদার মারাত্মক ভাবে জখম হয়। বিপ্লবীরাও আহত হইয়াছিল। তিনটি বোমা, একটা রিভলবার, দুইটি কার্তুজ এবং একটি "অটোমেটিক পিস্তল" পাওয়া যায়।

১২ই আগষ্ট—ছাপরাতে দুইজন যুবক ধৃত হয়, একটি ছয়-কামরা রিভলভার একটি পুরাতন পিস্তল (Loaded), কিছু বারুদ এবং ক্লোরফর্‌ম্ পুলিশ হস্তগত করে।

১৯৩২

৯ই নভেম্বর—বেতিয়ায় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সরকারী সাক্ষী ফণী ঘোষ দুইজন যুবক কর্তৃক মারাত্মক ভাবে ছুরিকাহত হয়। গণেশ গুপ্ত নামে এক ব্যক্তিও বিপ্লবী যুবকদ্বয়ের পলায়নে বাধা দিতে গেলে আহত হয়।

১৯৩৩

কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই।

১৯৩৪

২৩শে মার্চ—মধুবনির পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টারের গৃহে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়—তাহাতে দুইজন বালক আহত হয়।

পাঞ্জাব

১৯৩০

২২শে ফেব্রুয়ারী—অমৃতসরে খালসা কলেজে ১৫০ জন ছাত্রের এক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার সময় খালসা কলেজের অধ্যক্ষকে লক্ষ্য করিয়া একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাতে ১জন নিহত ও ১১জন আহত হয়। তিন ব্যক্তি ধৃত হয়।

২৭শে এবং ২৮শে মে—লুধিয়ানা জেলায় কয়েকজন স্থানীয় লোক কর্তৃক [পরীক্ষার জন্য] দুইটি বোমা রেলপথের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। [ইহারাই পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও ডেপুটি পুলিশ-কমিশনারকে হত্যার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল]।

৬ই জুন—লায়ালপুরে ইউরোপীয়ান অফিসারদের একটি ক্লাবে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু কোন ক্ষতি হয় নাই।

১৬ই জুন—ঝঙ্গে একটি পুলিশ-ব্যারাকে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়—তাহাতে দুইজন পুলিশ আহত হয়। চারিজন ধৃত হয়।

১৯শে জুন—রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর, অমৃতসর, লায়ালপুর, গুজরাণওয়ালা এবং শেখুপুরায় একই দিনে ছয়টি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরিত হয়। দুইজন পুলিশ অফিসার নিহত এবং চারজন আহত হয়।

২০শে জুলাই—লাহোরে লাহোর-বিপ্লবী দলের একজন (শিখ) সভ্যের সুটকেসে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়।

৪ঠা অক্টোবর—লাহোরে মোটর গাড়ীতে যাইবার সময় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কে, বি, আব্দুল আজিজের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয় এবং সে আহত হইয়া পরে মারা যায়। গাড়ীর চালকও আহত হয়।

১২ই অক্টোবর—লাহোরে পুলিশ সার্জেণ্ট স্মিথকে রিভলভার দ্বারা প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয় কিন্তু সে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

৪ঠা নভেম্বর—লাহোরে, তৈলসিং এবং বশেশ্বর নাথ নামে দুইজন বিপ্লবী 'কর্তব্যকার্যে' রত একটি পুলিশ-দলের উপর গুলি নিক্ষেপ করে। তাহাদের মধ্যে একজন আহত হইয়া মারা যায়।

২৩শে ডিসেম্বর—লাহোরে, সমাবর্তন উৎসব সমাপ্ত করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার সময় পাঞ্জাবের গভর্ণর, হরিকিষন নামে এক বিপ্লবী কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হইয়া আহত হন। দুইজন মহিলা, একজন পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার এবং একজন এসিষ্টেণ্ট পুলিশ সাব-ইনস্‌পেক্টার আহত হয়। আততায়ী ঘটনাস্থলেই ধৃত হয় এবং পরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

১৯৩১

৭ই মে—সুচেতগড়ে জম্মু প্রদেশ হইতে দুইজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি পুলিশ প্রহরী দ্বারা আনীত হইবার সময়, দুই ব্যক্তি (ধৃত ব্যক্তিগণের সঙ্গী তাহাদের জামিন হইবার জন্য আসিয়াছিল) প্রহরীগণকে রিভলভার লইয়া আক্রমণ করে। একজন কনেষ্টবল্‌ গুলিবিদ্ধ হইয়া নিহত হয়, এবং একজন হাবিলদার ও সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার আহত হয়।

২৬শে জুলাই—অমৃতসরে দুইজন যুবক ধৃত হয় এবং একটি দেশী পিস্তল (Muzzle-Loading) পাওয়া যায়। প্রকাশ তাহারা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হত্যার কার্যে নিযুক্ত বিপ্লবী দলের সভ্য।

১৯৩২

১২ই মার্চ—লাহোরে স্বর্ণ অলঙ্কারের একটি প্রতিষ্ঠান অস্ত্র সজ্জিত চারিজন যুবক কর্তৃক আক্রান্ত হয়। আততায়ীগণ বিপ্লবী দলভুক্ত ছিলেন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই ডাকাতি করা হইয়াছিল।

১৯৩৩ ও '৩৪ খৃঃ কোন ঘটনা ঘটে নাই।

বিপ্লবী অবনী সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত

১৯২৩ সালের আগষ্ট মাসে অবনী মুখার্জীকে ঢাকাতে রাখা হয়। এই যাত্রায় অবনী বিদেশ হইতে বাংলায় আসিয়া প্রথম কলিকাতায় উঠেন; এবং নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য শ্রীভূপতি মজুমদারের সঙ্গে গোপনে দেখা করেন। সিঙ্গাপুর কেল্লায় অবনীর সঙ্গে একই সময়ে ভূপতিবাবু কারারুদ্ধ ছিলেন। অবনীকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে ভূপতিবাবু উৎসাহী ছিলেন না; ইহা উপলব্ধি করিয়াই হয়তো অবনী অন্য আশ্রয়ের সন্ধানে উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট যান। সুভাষচন্দ্রকেও আশ্রয়ের কথা জানান। উপেনবাবু অবনীকে অনুশীলন সংস্থার আশ্রয় লইতে উপদেশ দেন, এবং প্রতুল গাঙ্গুলীকেও অবনীর সংবাদ দেন। এই সময় সুভাষবাবুও প্রতুল গাঙ্গুলীকে অবনীর আগমন সংবাদ দিয়া আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে বলেন। তাহার ফলে অনুশীলন সমিতি অবনীকে ঢাকাতে নিরাপদ স্থানে রাখার সিদ্ধান্ত করে। তখন নন্‌-কো-অপারেশনের প্রায় শেষ অবস্থা। দিল্লীর কংগ্রেসের পর রবি সেন, রমেশ চৌধুরী, অমর চ্যাটার্জী, ভূপতি মজুমদার, জীবন চ্যাটার্জী প্রভৃতি ২১ জন গ্রেপ্তার হন। কিন্তু নরেন সেন ও প্রতুল গাঙ্গুলী সেই সময় আত্মগোপন করিয়াছিলেন। তাঁহারাই অবনীকে গোপনে আশ্রয় দেন। ঢাকাতে এই সময়ে কেবল অবনীই নহেন—বিপ্লবী নলিনী গুপ্তও ছিলেন। নলিনী গুপ্তকেও সুভাষবাবুই আশ্রয় দিতে বলেন।

ঢাকার বিপ্লবীদলের নেতৃবৃন্দ উভয়কে একই সময়ে স্থান দেন—কিন্তু স্বতন্ত্র স্থানে রাখেন। সমিতির চেষ্টা ছিল নলিনী গুপ্তকে দিয়া কর্মীদের বোমা তৈয়ারী শেখানো। আর অবনীর মারফতে রাসবিহারীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করাই ছিল সমিতির উদ্দেশ্য।

এই অবনী ও নলিনী গুপ্ত একই সময়ে ঢাকাতে থাকিলেও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হইত না। পরস্পরে জানিতেনও না যে তাঁহারা উভয়েই ঢাকাতে আছেন। অবনী ও নলিনী গুপ্ত প্রতুল গাঙ্গুলীদের বাসায় মধ্যে মধ্যে আসিতেন এবং প্রতুলবাবুর ভগ্নীপতি মনোরঞ্জনবাবু ও প্রতুলবাবুর ভাই বিপ্লব-কর্মী বীরেন্দ্রের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করিতেন। এই দুইজন সম্পর্কে বীরেন্দ্রের তখনকার impression বা ধারণা এইরূপ—নলিনী গুপ্ত তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা Third International হইতেই আসিয়াছেন, নরেন্দ্র ভট্টাচার্যের মারফতে। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—রাশিয়ায় গিয়া বলা যে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনিই যোগাযোগ স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার কথা-বার্তায় ইহা বুঝা যাইত। নলিনীর প্রতি বীরেন্দ্রের ভাল ধারণা হয় নাই। বীরেন্দ্ররা ছিল আদর্শবাদী—সর্বপ্রকার মাদক দ্রব্য অস্পৃশ্য মনে করিত। নলিনীর মুখে মদের গন্ধ পাইত বলিয়াও তাহার বিরূপ ধারণা হয়। নলিনীর মুখে প্রায়ই শুনিত—I am not a nationalist but an inter-nationalist—narrow outlook আমার নাই।—নলিনী প্রায়ই অবনীর আদ্যশ্রাদ্ধ করিতেন। অবনী বাজে লোক ইহাই বলিতেন। অথচ অবনী অনেক সময় বহু বিষয়ে কথা বলিলেও, নলিনী সম্পর্কে কিন্তু কোন কথা বলেন নাই। বীরেনের নিকট নলিনীর তুলনায় অবনীকে গম্ভীর, দায়িত্বশীল ও পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া মনে হইয়াছে, যদিও তখন বীরেন অবনীকে অবনী বলিয়া জানিত না। স্পষ্টতঃ দেখা গিয়াছে, যে, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীদের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যাঁহারা ভারতে আসিয়াছেন বা প্রেরিত হইয়াছেন—তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য তো ছিলই না, বরং শত্রুতাই ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কে খাঁটি কে মেকী ধরাও অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ঢাকাতে অবস্থান কালে নলিনী গুপ্ত অন্যরূপ বলিলেও, মানবেন্দ্র রায়ের India in Transition বইখানা অবনী মুখার্জীর লেখা বলিয়াই বীরেনের ধারণা হয়। তাহার হেতু অবশ্য এই:—ডাঃ ভূপেন দত্ত ভারতে আসিয়া ১৯২৭ সালে যখন নারায়ণগঞ্জ পানামে ছাত্র

সম্মেলনে যান তখন সেখানে বীরেন্দ্র প্রসঙ্গত মানবেন্দ্র-লিখিত পুস্তক 'India in Transition'-এর প্রশংসা করিলে ডাঃ ভূপেন্দ্র বলেন—"ওতো অবনীর লেখা। মানবেন্দ্রের নামে বাহির হইয়াছে।"

১৯২৮ সালে অবনী রুশ-ভাষায় লিখিত দুইখানা পুস্তক (ভারতবর্ষে কৃষক ও কৃষি সম্বন্ধীয় দুইখানা পুস্তক) প্রতুলবাবুর নামে পাঠান। পুস্তকের নাম—রুশ ভাষার সঙ্গে ইংরেজীতেও ছিল।

মীরাট বোলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় অবনীর একখানা পত্র দলিল স্বরূপ উপস্থিত করা হয়। চিঠিখানা বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ হস্তগত করে। তাহাতে প্রমাণ হয় অবনী ভারত হইতে রাশিয়ার থার্ড ইন্‌টারনেশনালের তখনকার প্রেসিডেণ্ট মঃ জিনোভিয়েভের নিকট পত্র লেখেন। তাহাতে লেখা ছিল—"ভারতীয় বিপ্লবীদের নিকট ভারত সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এক শ্রেণীর ভারতীয় বিপ্লবীকে পাঠানর ফল ভাল হইবে না,—ভাল হইতেছেও না।" লক্ষ্যস্থল নলিনী গুপ্ত বলিয়াই মনে হয়।

অবনী মুখার্জী সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। বিপ্লবী অবনী সম্পর্কে সেই কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির মত যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উদ্দেশ্য, যাহাতে পাঠকগণ নিজেদের ধারণা সুস্পষ্ট করিয়া লইতে পারেন।

অবনী সম্পর্কে ভূপতি মজুমদারের উক্তি

অবনী যখন সিঙ্গাপুর কেল্লায় বন্দী ভূপতিবাবুও তখন ঐখানে বন্দীরূপে ছিলেন।—ভূপতিবাবুর উক্তির মর্ম এই যে, ১৯২৩ সালে অবনী কলিকাতায় ভূপতিবাবুর সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে দেখা করেন এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে বলেন। অবনী সম্পর্কে ভূপতিবাবুর ধারণা ভাল ছিল না, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ভূপতিবাবু অবনীকে পুনরায় বিদেশে যাইতেই বলেন—এবং অবনীর যাইবার খরচের টাকার জন্য কাশীতে শিবপ্রসাদ গুপ্তের নিকট হইতে টাকা আনান। এমন সময়ে অবনী ভূপতিবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া জানান যে, ভূপতিবাবুদের খেয়াল মত চলিতে তিনি (অবনী) প্রস্তুত নহেন, তিনি তাঁহার সাহায্য বা আশ্রয়ও চাহেন না। ভূপতিবাবু বলেন, 'ইহার

পরই বোধ হয় অবনী প্রতুলদের (প্রতুল গাঙ্গুলীদের) আশ্রয়ে ঢাকায় গিয়া থাকেন।' ভূপতিবাবু আরও বলেন, 'অবনীর স্বপক্ষে বলিবার এই যে অবনী কনফেশন করিয়া থাকিলেও, কোথাও কোন মামলায় সাক্ষ্য দেন নাই (যেমন অপর কন্‌ফেশররা দিয়াছে, ও লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছে); ইহা ছাড়া অবনী জেল হইতে ছাড়াও পায় নাই, সে সত্য সত্যই কেল্লা হইতে পলাইয়া যায়।'—যে বিপ্লবী এতো বড় কন্‌ফেশন করিল, প্যারোলে বাহির হইবার অনুগ্রহ লাভ করিল, (ভূপতিবাবুর ধারণা) সে ব্যক্তি জেল হইতে মুক্তিলাভ করিবে স্বভাবতঃই বৃটিশের অনুগ্রহে। কিন্তু প্রশ্ন এই—অবনী জীবনের উপর অশেষ ঝুঁকি লইয়া সেই বিদেশে বন্ধুবান্ধবহীন পরিবেশের অনিশ্চিত অন্ধকারে, অজানা পথে একমাত্র নিজের বলবুদ্ধির উপর ভরসা করিয়া পলায়ন করে কেন? অবনী সম্পর্কে বস্তুতঃই ইহা রহস্য। অবনীর মুক্তির এই আকাঙ্ক্ষাকে দুর্দমনীয় বলা চলে; ইহার প্রেরণা রাজনৈতিক ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অতুল বসুর অভিমত

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীঅতুল বসু (গবর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল) ইউরোপ যাত্রা কালে অবনীকে জাহাজে দেখেন—১৯২৪ সালে। অবনীর পুনরায় ভারত হইতে ইউরোপ যাত্রার একটি চিত্র এইখানে পাওয়া যাইতেছে।

১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে কলম্বোতে অতুলবাবু প্রথম অবনীকে দেখেন। অবনী তখন ছদ্মবেশে ছিলেন। তাঁহাকে কতকটা জঙ্গ্‌লীর মত দেখাইতেছিল, এমনি অদ্ভুত ছিল তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ। তবে হাজার হইলেও মুখে একটা ভারতীয় ছাপ ছিল। অতুলবাবু একদিন প্রশ্ন করেন—'Are you an Indian?' অবনী সংক্ষেপে জোর দিয়া বলেন—'No' এবং অন্য প্রসঙ্গে চলিয়া যান। অবনী জাহাজে নিজের পরিচয় দেন এই বলিয়া যে, তিনি Half-Caste.—তাঁহার মা কুলি রমণী, বাপ একজন ওলন্দাজ। বলেন, আমিও প্রথমে কুলিগিরি করি। পরে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখি, জার্মানীতে গিয়া Ph.D হই। অবনীর জঙ্গ্‌লীর মত বেশভূষা এবং বংশের ঐ পরিচয় জানিয়া অতুলবাবুর দুইজন Cabin-mate (ডাচ্

ভদ্রলোক) অতুলবাবুকে অবনীর সঙ্গে মিশিতে মানা করিতেন। বলিতেন, 'তুমি student, সরকারী বৃত্তি লইয়া যাইতেছ, উচ্চবংশের ছেলে—ওর সঙ্গে মিশিও না।' অতুলবাবু আরো বলেন, অবনীকে অত্যন্ত interesting মনে হইত। তিনি ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর রাজনীতি এমন কি বাঙালাদেশের বিপ্লব আন্দোলনের কথাও বলিতে পারিতেন। অত্যন্ত interestingly গল্প বলিতেন। লেনিন হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মাজীর প্রসঙ্গেও অনেক কথা বলিতে পারিতেন। অতুলবাবু প্রসঙ্গত একদিন বাঙ্গালার বিপ্লবীদের কথায় বলেন—নলিনীকিশোর গুহের লেখায় এক অবনী মুখার্জীর নাম দেখিতেছি, তুমি কি তাহার বিষয়ে কিছু জান? তখনও কিন্তু অবনী আত্মপরিচয় দেন না। জাহাজ পোর্ট সৈয়দ বন্দরের কাছাকাছি আসিলে অতুলবাবু একদিন অবনীর হাত দেখেন। অতুলবাবুর এই বিদ্যা আয়ত্ত ছিল। হাত দেখিয়া অতুলবাবু বলেন—ভুল, ভুল কথা বলিয়াছ, তুমি revolutionist; educationist বা learned লোক নও। এই কথায় অবনী সচকিত হন। প্রশ্ন করেন—কি করিয়া বুঝিলে? অতুলবাবু বলেন—আমি অন্য একজন বড় revolutionistএর হাত দেখিয়াছিলাম। অবনী বলেন—কে সে? অতুলবাবু স্যার আশুতোষ মুখার্জীর নাম করেন। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে revolution আনিয়াছিলেন। আশুতোষের ছিল অত্যুগ্র মঙ্গলক্ষেত্র—অবনীরও ছিল তাই। কিন্তু আশুতোষের বৃহস্পতির ক্ষেত্র ছিল সমুন্নত, অবনীর তাহা ছিল না। সেই চিহ্নের কথা বলিয়াই অতুলবাবু অবনীকে বলেন—তুমি revolutionist, learned লোক নও। অতুলবাবু অবনীকে revolutionist বলায় অবনীর সন্দেহ হয় অতুলবাবু হয়তো বৃটিশ স্পাই, অবনীর পিছু লইয়াছেন। অবনী একটু আল্‌গা আল্‌গা থাকে। তখন হইতে অবনী অতুলবাবুকে 'মিষ্টিক্' বলিয়া ডাকিতেন। জাহাজে এই নাম চালুও হয়। জাহাজ পোর্ট সৈয়দ বন্দরে থামিলে অতুলবাবু প্রভৃতি বন্দর দেখিতে বাহির হওয়ার সময় অবনী অসুখের অজুহাতে জাহাজেই থাকিয়া যান। স্থির করে, অতুলবাবু পুলিশ লইয়া আসিতে থাকিলেই পায়খানা দিয়া পলাইয়া যাইবেন। তদনুযায়ী প্রস্তুত হন। জাহাজে Mitzmann নামক একজন পোলিশ জু'র সঙ্গে অবনীর বন্ধুত্ব হয়। তাহাকে কাগজ পত্র দিয়া বলেন—আমি পলায়ন করিলে তুমি এই কাগজপত্র লণ্ডনের ঠিকানায় দিও। অতুলবাবুরা বন্দর দেখিয়া ফিরিয়া আসিলে সঙ্গে

পুলিশ নাই দেখিয়া অবনী অনেকটা নিশ্চিন্ত হন। অতুলবাবু জাহাজে ফিরিয়া তাঁহার দাদা পবিত্র বসুকে পত্র লেখেন। খামে পবিত্রবাবুর নাম দেখিয়া (আমেরিকায় পবিত্রবাবুর সঙ্গে অবনীর পরিচয় ঘটে। পবিত্রবাবুকে অবনী বিশেষ শ্রদ্ধা করিত) প্রশ্ন করেন, 'পবিত্রবাবু তোমার কে?' দাদা শুনিয়া অবনী ভাবেন—পবিত্রবাবুর ভাই স্পাই হইতে পারে কি? তখনও কিন্তু অবনী সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত নহেন। জাহাজ বন্দর ছাড়িলে তবেই তিনি নিশ্চিন্ত হন।

পোর্ট সৈয়দ. ও মার্সাইয়ের মাঝামাঝি আসিলে পূর্বোক্ত Mitzmann অতুলবাবুকে বাঙলার বিপ্লব আন্দোলন ও বিপ্লবীদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন,—বিপ্লবীদের তিনি চেনেন কিনা। অতুলবাবু বলেন—শশাঙ্ক হাজরা প্রভৃতি দুইচারিজনকে জানিতাম—বিশেষ কিছু জানিনা। Mitzmann প্রশ্ন করেন (একান্তে)—'অবনী মুখার্জীর নাম শুনিয়াছ?' অতুলবাবু বলেন—নলিনীকিশোর গুহের পুস্তকে নাম দেখিয়াছি। Mitzmann ছদ্মবেশী অবনীকে দেখাইয়া বলেন—'He is Abani.' অতুলবাবু অনেকটা অবিশ্বাসভরে বলেন—'Go to hell,' অর্থাৎ এঁকে কোনমতেই ভদ্র বাঙালী মনে হয় নাই। অবনীর পাশপোর্টে নাম ছিল R. Sahir.

অবনী টেবিলের পাশেই ছিলেন। অতুলবাবুর কানে কানে সুস্পষ্ট বাঙলায় বলেন—'অবিশ্বাস ক'রবার কোন কারণ আছে কি?' কলিকাতার সুন্দর বাঙলা শুনিয়া অতুলবাবু লাফাইয়া ওঠেন। অতঃপর মার্সাই বন্দরে নামিয়া অবনীসহ ফিটনে করিয়া চারি ঘণ্টা ভ্রমণ করেন এবং অবনীর নিকট তাঁহার পলায়নের কাহিনী শুনেন।

অবনী পরে মস্কো হইতে একখানা পুস্তক অতুলবাবুকে পাঠান। তাহাতে উপহারস্বরূপ নিম্নোক্ত লেখাগুলি আছে:—

"Presented to my dear friend 'Mystic'—alias Atul Bose to remember the pleasant journey we had together from Colombo to Paris.

Abani Mukherjee
4th July, 1924"

উল্লিখিত উপহার-পুস্তকের এক কোণে অবনী নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়া দেন—

"Ships that pass in the
night and meet each
other in passing
only a signal thrown and
a voice in the darkness"

অতুলবাবু আরও বলেন—দীর্ঘ এক মাসের মধ্যেও, এতো কথাবার্তা, এক টেবিলে খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা সত্ত্বেও অবনী যে half-caste R. Sahir ভিন্ন বাঙালী ইহা কোন ক্রমেই সন্দেহ হয় নাই। অবনী এমন ভাবেই থাকিত—এমন কি মুখাবয়ব পর্যন্ত বিকৃত করিয়া রাখিত।

ডক্টর ভূপেন দত্তের মতামত

অবনীর সিঙ্গাপুর হইতে পলায়ন সম্পর্কে ডাঃ ভূপেন্দ্র দত্ত ১৯৪৭ সালে লেখককে বলেন যে, তিনি উহা বিশ্বাস করেন না। পুলিসের চক্ষুতে ধূলি দিয়া দুই দুইবার বিদেশ হইতে আসা যাওয়া বিশ্বাস্য বলিয়া তাঁহার মনে হয় নাই। আর যদি অবনী সত্যই দুই দুইবার এভাবে যাওয়া আসা করিয়া থাকেন তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে, অবনী হয় বৃটিশ এজেণ্ট নয় তো একজন অদ্ভুত-কর্মা ব্যক্তি—ভূপেনবাবুর ইহাই অভিমত। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, পুলিশ অবনীকে 'ধর ধর' করিয়া সিঙ্গাপুরে ধরার চেষ্টা করিয়াছিল এ সংবাদ লোকমুখে তিনি শুনিয়াছেন। তবে, সকলের কথাই অনুমান এবং বিরুদ্ধ প্রমাণ না থাকায় অবনী যে মিথ্যা বলিয়াছে, ইহা মনে করার কোন হেতু দেখি না।

মানবেন্দ্র রায়ের কথা

অবনীর সঙ্গে মানবেন্দ্র রায়ের মতভেদ ঘটে। অবনীর প্রতি মানবেন্দ্র যথেষ্ট প্রসন্নও ছিলেন না। সুতরাং অবনীর হইয়া তাঁহার ওকালতি না করারই কথা। কিন্তু তিনিও তাঁহার 'স্মৃতিকথা'য় অবনী কনফেশন করিয়া বহু লোককে ফাঁসাইয়াছে—এইরূপ কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই। বরং প্রমাণের অভাবে এই

ধরণের কোন কথা সত্য বলিয়া প্রচার করেন নাই। দেরাদুনে প্রতুল গাঙ্গুলীকে নরেন্দ্রনাথ ইহাও বলিয়াছেন, যে, অবনীর বিরুদ্ধে ইউরোপে কাহারো কাহারো নিকট যে অভিযোগ শুনিয়াছিলেন,—অনুসন্ধানে তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই।

বিনয় সরকারের সার্টিফিকেট

কাশীর বিখ্যাত বিপ্লবী শিবপ্রসাদ গুপ্ত ১৯১৫ সালে সিঙ্গাপুরে ধৃত হন। সেই সময়ে অবনী মুখার্জীও ধৃত হন এবং উভয়ে এক জেলেই থাকেন। শিবপ্রসাদ গুপ্ত আমেরিকা হইতে জাপানে আসিতেছিলেন। তাঁহাকে সাংহাইয়ে গ্রেফ্তার করা হয়। আসলে হেরম্ব গুপ্তর "গুপ্ত" বলিয়াই তাঁহাকে প্রথম ধরা হয়। ঐ সময়ে অধ্যাপক বিনয় সরকারও সাংহাইয়ে ছিলেন। শিবপ্রসাদের কারামুক্তির পথ পরিষ্কার হয় দুইটি কারণে। কারণ দুইটি হইল—(১) মালব্যজীর টেলিগ্রাম, (২) বিনয় সরকারের এই সার্টিফিকেট। বৃটিশ কন্সাল-জেনারেল বিনয়-বাবুকে শিবপ্রসাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। বিনয়বাবু তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু শিবপ্রসাদকে বৃটিশ-সিংহের 'থাবা' হইতে বাঁচাইবার জন্য অবলীলাক্রমে বলিয়া যান: "শিবপ্রসাদ একজন অত্যন্ত বৃটিশ-ভক্ত মডারেট, শিবপ্রসাদ বৃটিশ মালের বড় এজেণ্ট। কাপড়ের কারবারী।" শিবপ্রসাদের সঙ্গে কি পরিমাণ টাকা থাকিতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তরে বিনয় সরকার বলেন—"এঁরা সব অত্যন্ত রক্ষণশীল ধরণের ধনী। ব্যাঙ্কে বড় একটা টাকা পয়সা রাখেন না,—সোনা কিনিয়া বা অনুরূপ কোন প্রকার অর্থ সঙ্গে রাখেন—তা' কয়েক লক্ষ টাকা তাঁর মত ধনীর থাকাই সম্ভব। তিনি কাশীর বড় জমিদার। রাজা মতিচাঁদের ভাইপো।" ইতিমধ্যে মদনমোহন মালব্যজীর একখানা টেলিগ্রাম যায় শিবপ্রসাদের নামে। এ আবার কোন্ ব্যক্তি, বিপ্লবী সন্দেহে ধৃত 'গুপ্ত'র নিকট টেলিগ্রাম করিল? এ ক্ষেত্রেও বিনয়বাবু মালব্যজী সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সার্টিফিকেট দেন:—'মালব্যজী বড়লাটের পরিষদের সদস্য—বড়লাটের বিশেষ বন্ধু—প্রবীণ মডারেট "বৃটিশ ফ্রেণ্ড"!'—বৃটিশ কন্সল-জেনারেল শিবপ্রসাদকে মুক্তি দানের ব্যবস্থা করেন। শিবপ্রসাদের নিকট বহু অর্থও ছিল। তাহা ব্যবসায়ের জন্য রাখিতেন বলিয়া আপত্তি করা হয় নাই। শিবপ্রসাদ যখন জেলে তখন অবনীও জেলে ছিলেন। অবনী তখন মারাত্মক নোট-বই সহ ধৃত হইয়া জেলে আটক

ছিলেন। সেই নোট-বইতে রাসবিহারী-প্রদত্ত ফেরারী বিপ্লবীদের অনেকের নাম ছিল, বিপ্লবীদলের সমর্থক ও সহানুভূতিশীল অনেক গৃহস্থেরও নাম ছিল। ঐ নোট-বইয়ে জাপানস্থিত জার্মাণ কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয়বার বিপ্লবীদলকে অস্ত্র সাহায্যের যে-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহারও সুস্পষ্ট আভাস মিলিল। অবনীর কোর্ট মার্শালে বিচার হয় এবং মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়। অবনীর নিজের চেষ্টায় এবং শিবপ্রসাদ গুপ্তের কতক সহায়তায় সিঙ্গাপুর কেল্লার (তথাকার জার্মাণ-যুদ্ধবন্দী এবং স্থানীয় অন্যান্য বন্দীরা তো অবনীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলই) রক্ষীদের মধ্যেও জন কয়েক অবনীকে সাহায্য করিতে উৎসাহী ছিল। এই সূত্রেই একদা সমুদ্রে স্নান করিতে যাওয়ার সুযোগ অবনী পাইয়াছিল। অবশ্য অন্যান্য প্রহরীরা বিশেষতঃ যাহারা স্নান করাইতে বন্দীদের লইয়া গিয়াছিল—তাহারা স্বভাবতঃ যতটা সাবধান ও সতর্ক থাকা প্রয়োজন—ততটা সতর্কই ছিল। ইহারই মধ্যে অবনী পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। সিঙ্গাপুর কেল্লা হইতে এই পলায়ন সম্পর্কে ১৯২৩ সালে অবনী স্বহস্তে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এইরূপ :—

"রক্ষীদের সঙ্গে জনকয় জার্মাণ বন্দীসহ অবনী সমুদ্র-স্নানে যায়। অবনী সাঁতার দিতে দিতে এক ফাঁকে সরিয়া পড়েন। প্রথমটা প্রহরীরা বুঝিতেই পারে নাই। অবনী অদৃশ্য হইয়া পড়ে এবং সমুদ্রের তীর ধরিয়া চলিতে থাকে। চলে তাহার অনাহার ও অনিদ্রা। জঙ্গলে লুকাইয়া থাকে। মশক ও নানাবিধ কীটের দংশনে দেহ জর্জরিত হয়। পরে সমুদ্রতীরে আসিয়া ঐ দেশীয় একটি নৌকা লক্ষ্য করিয়া হাত পা নাড়িয়া চিৎকার করিতে থাকে। ক্লান্তিতে অবসন্ন দেহে পড়িয়া যায়। মাঝি নৌকা লইয়া আসে। অবনী আকারে ইংগিতে বুঝাইয়া মাঝির দয়ার উদ্রেক করিতে সক্ষম হয়। মাঝি অবনীকে নৌকায় তুলিয়া লয়। মাঝি-প্রদত্ত আহারে কিছুটা সুস্থ হইয়া মাঝির আদেশ মত কাজ করিতে থাকে। অতঃপর মাঝিরই সহায়তায় এক বড়লোকের ভৃত্যরূপে আশ্রয় পায়। অবনী ক্রমে জাভা হইয়া বিদেশে চলিয়া যায়।"

অধ্যাপক বিনয় সরকার অবনী সম্পর্কে আরও বলেন: "আমরা সাংহাইয়ে অবনীর কেল্লা হইতে পলায়নের কথা শুনি, সংবাদপত্রেও ঐ সংবাদ বাহির হয়, এই পলায়নকে আমরা কিন্তু বাংলার বাহাদুর ছেলের কর্ম বলিয়াই বাহবা দেই। ইহার বিপরীত কোন কথা শুনি নাই।"

বার্লিনে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ ও কমিটি গঠন

১৯১৪ সালে যুদ্ধ ঘোষণার পরেই জার্মান গবর্ণমেণ্ট বিদেশস্থ ভারতীয় বিপ্লবীদের কাজে লাগাইতে চাহেন। বার্লিনে এবং ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে ও আমেরিকায় অনেক ভারতীয় ছাত্র ছিলেন। তাঁহারা অনেকেই ছাত্র রূপে বিদেশে যান। পড়াশুনাই ছিল উদ্দেশ্য। পূর্ব হইতেই যে কতিপয় বিপ্লবীও বিদেশে কাজ করিতেছিলেন—ইহা উক্ত হইয়াছে। যুদ্ধের সময় জার্মান অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যে ভারতে বিপ্লবাগ্নি জ্বালাইতে পারা যাইবে—আশু বিদ্রোহ দেখা দিবে—এই আশায় ভারতীয় ছাত্রগণ অনেকেই উৎসাহিত হইলেন এবং বিপ্লবানুষ্ঠানে অংশগ্রহণে উৎসাহ দেখাইলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে—জার্মান গবর্ণমেণ্ট বিশেষ উদ্দেশ্যেই বিদেশের ভারতীয়দের কাজে লাগাইতেছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, ভারতীয়গণ প্রচার করুক—বৃটিশ হারিতেছে—জার্মানী জিতিতেছে, আর প্রচার করুক বৃটিশ বিদ্বেষ। এইজন্য তাঁহারা তাহাদের অর্থ দিবেন, অশান্তি ও বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইতে অস্ত্র দিবেন। জন কয়েক ভারতীয় নেতাকে তাঁহারা এইভাবে জার্মানীর সাহায্যে লাগাইতে চাহেন। কিন্তু তখনই ভারতের স্বতন্ত্র স্বাধীনতা—স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রশ্ন উঠিল। ভারতীয় বিপ্লবীরা বলিলেন :—আমরা আলাদা নহি, ভারতে বিপ্লবীদল আছে, তাঁহাদের সঙ্গে যোগাযোগেই আমরা সশস্ত্র বিদ্রোহের চেষ্টা করিব। আমাদের কর্ম-পদ্ধতি আমরা স্থির করিব। আমাদের নেতা ও কর্মী আমরা স্থির করিব। জার্মানীর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হইবে স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে, কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। আমরা ঋণ স্বরূপ সাহায্য গ্রহণ করিব। ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের আমরা প্রতিনিধি। প্রতিনিধিরূপেই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। বার্লিনে এই কমিটি গঠিত হয়। ভূপেন্দ্রনাথ উহার ট্রেজারার হন। এই কমিটিরই তিনজন প্রথম প্রচারক হন—(১) শ্রীধীরেন সরকার (অধ্যাপক বিনয় সরকারের ভ্রাতা), (২) শ্রীবিষ্ণু সুখতনকর (মহারাষ্ট্র—প্রাচীন ভারতের লেখক), (৩) চঞ্চয়া (Chanchaya) (মাদ্রাজ)। লক্ষ্য

করিবার বিষয়, পরবর্তী কালে দ্বিতীয় যুদ্ধে রাসবিহারী ও নেতাজী যে কারণে ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে জাপানের তাঁবেদার রূপে চালাইতে চাহেন নাই, স্বতন্ত্র লীগ ও আজাদ হিন্দ্ দল গঠনের প্রয়োজন বোধ করেন, সেই কারণেই ১ম বিশ্বযুদ্ধেও জার্মানীর তাঁবেদার না হইবার জন্য ভারতীয় বিপ্লবীরা প্রথম হইতেই সতর্ক ছিলেন। বৃটিশের যাহারা শত্রু তাহারা 'আমাদের মিত্র ও মিত্রস্থানীয়' রাজনীতিতে এইরূপ পরিস্থিতির সুযোগ লইতে হইবে—ভারতীয় বিপ্লবীদের এই বিশ্বাস বহুদিনের। এই দিকে তাঁহারা সচেতন এবং যথাসম্ভব সক্রিয় ছিলেন—১৯১৪ সালের পূর্ব হইতেই। ইহার একাধিক প্রমাণ আছে।

ধীরেন সরকার, চন্দ্র চক্রবর্তী ও হেরম্ব গুপ্ত জার্মান-ভারত ষড়যন্ত্রের ভারতীয় প্রতিনিধি বলিয়া জার্মান গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত হন (সিডিশন কমিটির মতে ইহাই ভারতীয় বিপ্লবীদের German Committee)। ১৯১৬ সাল পর্যন্তও এই চেষ্টা চলে। বার্লিন হইতে জার্মান কর্তৃপক্ষ ওয়াশিংটনস্থ জার্মান কন্‌সালকে লেখেন—হেরম্ব গুপ্তকে জাপান গবর্ণমেণ্ট তাড়াইয়া দিয়াছে। সুতরাং অতঃপর ডাঃ চক্রবর্তীকে সেই স্থলে প্রতিনিধিরূপে গণ্য করা হইল। এই চক্রবর্তী নেতা হওয়ায় তাহার মারফতেই অর্থাদি দেওয়া হইয়াছে। যতটা জানা যায়, চক্রবর্তী সেই অর্থ আর যাহাই করুন বিপ্লব কার্যে ব্যয় করেন নাই।

যাঁহারা জার্মানীতে-আমেরিকায়-জাপানে-তুরস্কে-কাবুলে বৈদেশিক সাহায্যে ভারতের বিপ্লব-প্রয়াসকে সফল করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং দীর্ঘদিন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কয়েক জনের নামই মাত্র আমরা জানি।

১৯০৫ সাল হইতে ১৯১০ সালের মধ্যে যে সকল ভারতীয় আফ্রিকা-এশিয়ার মিশর-তুরস্ক-আফগানিস্থান-জাপানে এবং লণ্ডন-প্যারী-বার্লিন-ভিয়েনা-নিউইয়র্ক-সানফ্রান্‌সিকো-কালিফোর্ণিয়া প্রভৃতি ইউরামেরিকায় ভারতীয়দের স্বাধীনতার প্রয়োজনের প্রতি ঐ সকল দেশবাসীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন এবং ভারতীয় ছাত্রদের সংঘবদ্ধ করিতে প্রয়াসী ছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা (রাজপুতানা), ম্যাডাম কামা (বোম্বে), সর্দারসিংজী রাণা (কাথিবায়াড়), বীরেন চট্টোপাধ্যায়

(বাঙালী—হায়দরাবাদ-প্রবাসী), বিনায়ক সাভারকর (বোম্বাই), ওবেদুল্লা (যুক্তপ্রদেশ), তারক দাস (বাংলা), রামচন্দ্র (পাঞ্জাব), হরদয়াল (পাঞ্জাব), বরকতুল্লা (যুক্তপ্রদেশ), ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (বাংলা), সুধীন বসু (বাংলা), মীর্জা আব্বাস (বিহার), পাণ্ডুরং কান্‌কোজী, খগেন্দ্রচন্দ্র দাস, অধর নস্কর প্রভৃতি।

১ম বিশ্বযুদ্ধ-কালে, অর্থাৎ ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সাক্ষাৎভাবে যাহারা ইউরোপ-আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে থাকিয়া ভারতের সঙ্গে ইউরোপীয় কোন কোন রাষ্ট্রশক্তির ডিপ্লোমেটিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং ভারতের বিপ্লব-প্রয়াসকে সাহায্য দানের সুযোগ খোঁজেন এবং সুযোগ গ্রহণ করেন তন্মধ্যে বীরেন চট্টো (বাংলা ও হায়দরাবাদবাসী), ডাঃ বিষ্ণু সুখতনকর (মহারাষ্ট্র), ধীরেন সরকার (বাংলা), অজিৎ সিংহ (পাঞ্জাব), প্রমথ দত্ত (বাংলা), ডাঃ ভূপেন্দ্র দত্ত (বাংলা), পাণ্ডুরং কান্‌কোজী (বোম্বাই), বরকতুল্লা, খানচাঁদ বর্মা (যুক্তপ্রদেশ), মহেন্দ্রপ্রতাপ (যুক্তপ্রদেশ), লাজপৎ রায় (পাঞ্জাব), শিবপ্রসাদ গুপ্ত (যুক্তপ্রদেশ), জাফরালী খাঁ (যুক্তপ্রদেশ), হৃষীকেশ লট্টো (পাঞ্জাব), ডাঃ হাফিজ (যুক্তপ্রদেশ), হোরমনজী ফারশাপ (বোম্বাই), তারক দাস (বাংলা), রজবলী (পাঞ্জাব), হেরম্ব গুপ্ত (বাংলা), নন্দরকার (বোম্বাই), বীরেন দাসগুপ্ত (বাংলা), চঞ্চয়া (মাদ্রাজ), রাসবিহারী বসু (বাংলা), মানবেন্দ্র রায় (বাংলা), আবদুল ওয়াহেদ (বিহার), ডাঃ মনসুর (যুক্তপ্রদেশ), রামচন্দ্র, ভগবান সিং (পাঞ্জাব); অবনী মুখার্জী (বাংলা), হরদয়াল (পাঞ্জাব), চম্বকরাম পিল্লাই (ত্রিবাঙ্কুর), সরদার ওমরাও সিং (পাঞ্জাব), হেমেন্দ্র রক্ষিত (বাংলা), ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (বাংলা), শৈলেন ঘোষ (বাংলা), সুরেন কর (বাংলা)। সুরেন কর সম্বন্ধে অবনী বিশেষ প্রশংসা করেন। এ ছাড়া বিদেশস্থ ভারতীয় ছাত্রদের আরো অনেকে প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে বিপ্লব সংঘটনের জন্য ভারতে আসেন বা আসিতে চেষ্টা করেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেন। সেই সম্পর্কে যাঁহাদের নাম পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রসঙ্গত এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নূতন পর্যায়

১৯২০ সালে বিপ্লবীদের মুক্তি দেওয়া হয়। মহাত্মাজীর আন্দোলনে অনেকে যোগদান করেন। যাঁহারা এই আন্দোলনের সাফল্য বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিলেন তাঁহারাও ইহার পথ সুগম রাখিতে সংকল্প করেন এবং পূর্বের বিপ্লবাত্মক ও সন্ত্রাসবাদমূলক কার্য হইতে বিরত থাকেন। ১৯২৩ সালে শাঁখারীটোলার* ঘটনা ঘটিলেও তাহা একটি দলের বিচ্ছিন্ন প্রয়াস। ইহা বিপ্লবী দলগুলির সাধারণ সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম রূপেই তখন দেখা দেয়। ইহার পরবর্তী বিপ্লব-প্রয়াসকে বুঝিতে হইলে ঐ সময়কার বিপ্লব-সংস্থাগুলির মধ্যে যে মতামত ও মতভেদ দেখা দেয় তাহা বুঝা আবশ্যক। মহাত্মাজীর আন্দোলন সাফল্য লাভ করিবে—এই আশা তখন প্রায় তিরোহিত। চৌরীচৌরার পরে মহাত্মাজী যখন নিজেই আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন—তখন এই পথে স্বাধীনতা অর্জন যে সম্ভব তাহা বিপ্লবীরা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লব-প্রয়াস চালাইতে হইবে এই বিষয়ে তাঁহারা একমত হইলেও কোনপ্রকার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং উহারই আনুষঙ্গিক খুনজখম এবং লুণ্ঠনাদি দ্বারা অর্থ সংগ্রহের কর্মনীতি গ্রহণ সঙ্গত মনে করিলেন না। কিন্তু একদল কর্মী (১৯২৩ সাল হইতে অনেকেই জেলে অবরুদ্ধ) আবার বিপ্লব-কার্য—অর্থাৎ অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম চালাইয়া যাইবার এবং উহারই মাধ্যমে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে লাগিল। কিন্তু বিপ্লবীদলের অধিকাংশ নেতা ইহার সমর্থক ছিলেন না। তাঁহারা সংস্থা রক্ষা করা, ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং সর্বভারতীয় সংস্থার দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিয়া সাফল্যজনকভাবে সশস্ত্র বিদ্রোহ করার কথা ভাবিতেন,—ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে অকারণ শক্তিহানি ঘটিবে, পূর্ব পদ্ধতিরই অনুবর্তন হইবে, ইহাই মনে করিতেন। কিন্তু অপর দিকে কতিপয় উৎসাহী কর্মী মনে করিতেন, যে, নেতাগণ এখন শান্তি চাহেন, আর বিপ্লবাত্মক কার্যে পূর্বের মতো আত্মনিয়োগ করিতে চাহেন না, কংগ্রেসের বন্ধ্যা কর্মনীতিই

* কলিকাতার শাঁখারীটোলা পোষ্টাফিসে ডাকাতি করা হয়—টাকা পাওয়া যায় না। পোষ্টমাষ্টারকে পিস্তলের দ্বারা আহত করা হয়। বরেন ঘোষ অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়।

অবশেষে তাঁহারা গ্রহণ করিবেন—সশস্ত্র বিপ্লবের পথে পা' দিবেন না—তাই এই সব কথা বলিতেছেন। বিভিন্ন দলেই এই রকমের কিছু কিছু উৎসাহী কর্মী ছিলেন। তাঁহারা জেলে থাকিতেই, নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাহিরে গিয়া কাজ আরম্ভ করিবেন, এই মর্মে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ইহাদের বলা হইত, রিভোল্টিং গ্রুপ, তাঁহারা নিজেদের বলিতেন—অগ্রবর্তী বা advance group, নেতাদের বিপ্লব-নিষ্ঠা ও কর্মশক্তির উপর তাঁহাদের আস্থা নাই—ইহাই তাঁহারা বলিতেন।

মেদিনীপুর জেলে বাংলার বিপ্লবী বিভিন্ন দলের নেতারা মিলিয়া স্থির করেন যে এবার বাহিরে গিয়ে মিলিত ভাবে কাজ করিবেন। সর্বভারতীয় বিপ্লব সাধনের জন্য, পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে যে সকল শিক্ষা লাভ হইয়াছে সংস্থার লোক সংগ্রহ ব্যাপারে, অস্ত্র সংগ্রহ কার্যে, দেশীয় সৈন্যদলের ও বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য লাভের জন্য নূতন উদ্যমে উহা কাজে লাগানো হইবে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণের ও অর্থ সংগ্রহের নূতনতম কর্মনীতিও বিবেচিত হইল। মিলিতভাবে, সম্পূর্ণ এক সংস্থার অন্তর্গত হিসাবে কাজ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। যাঁহারা এই ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনুশীলনের নরেন্দ্রনাথ সেন ও রবি সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ), প্রতুল গাঙ্গুলী, সংযুক্ত যুগান্তর দলের যাদুগোপাল মুখার্জী, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপতি মজুমদার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জেলখানায় বিভিন্ন দলের এই মিলন-প্রয়াসে পূর্বোক্ত 'রিভোল্টিং গ্রুপ' উৎসাহ দেখান নাই। কেহ কেহ পরে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা ইহার ব্যর্থতাই কামনা করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা মনে করিতেন, এই সকল নেতা আসলে কিছু করিবেন না—ঐক্যবদ্ধ হইয়া বড় রকমের একটা কিছু করার গল্পই শুধু করিবেন, তাহাতে অপেক্ষাকৃত নূতন কর্মীরা বিভ্রান্ত হইবে। জেলের এই ঐকমত্য ও কর্মনীতি অনুযায়ী কারামুক্তির পর (১৯২৭ সালের শেষ ভাগেই বিপ্লবী বন্দীদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়) প্রকৃত প্রস্তাবে মিলিত ভাবে কাজকর্ম আরম্ভ হয়। কলিকাতা কংগ্রেসে (১৯২৮ সালে) বিভিন্ন দল একত্র হইয়া কাজকর্ম করিতে থাকে। কিন্তু এই কংগ্রেসের অধিবেশনেই বিভিন্ন দলের মধ্যে কর্মভার লইয়া মতানৈক্য দেখা দিতে থাকে। উহাই আবার দলগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থবোধ আমদানী করে; মিলন-প্রয়াস এইভাবে আরম্ভ হইতে

না হইতেই ব্যর্থ হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, নেতৃস্থানীয়দের অনেকের আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও কাহারো কাহারো নেতৃত্বহানির আশঙ্কায়, এবং 'মিলন' সত্ত্বেও বিভিন্ন গ্রুপের স্বতন্ত্র অনুভূতি সংস্কার মধ্যে কার্য করিতে থাকায়—বিশেষ করিয়া কোন কোন ব্যক্তির অনুদারতা ও অবিশ্বাসের দরুণ—এই একান্ত শুভ প্রয়াস ব্যর্থ হয়। সে যাহাই হউক, যে রিভোল্টিং গ্রুপের কথা বলিতেছি তাঁহাদের পরবর্তী কাজকর্মে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাসনা ও কল্পনা তাঁহাদের যাহাই থাকুক না কেন, কার্যতঃ পূর্বেকার সেই মামুলি প্রথায় অস্ত্রসংগ্রহ, বোমা নির্মাণ এবং অন্যান্য সব কাজকর্ম, দলগড়ার চেষ্টা ও পুলিশের দ্বারা খানাতল্লাস, গ্রেফতার ও ষড়যন্ত্র মামলায়ই মাত্র পর্যবসিত হইয়াছে। অন্য কল্পনা কার্যকরী হয় নাই। তবে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন—একটা নূতনতম বলিষ্ঠ অধ্যায়। বিভিন্ন মূল দল হইতে রিভোল্টিং গ্রুপের এই সকল কর্মী বাহির হইয়াছিলেন বলিয়া, শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন-বোধ হইতেও ভিন্ন ভিন্ন দল হইতে আগত কর্মীরা মিলিত হইয়াছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে ভিন্ন দলের কর্মীর আনাগোনা ও সংশ্রব দেখা যায়। কাজের আগ্রহে সাময়িক হইলেও এইরূপ যোগাযোগ ঘটিয়াছে। যেমন দেখা যায় অনুশীলন দলের রাজেন্দ্র লাহিড়ী (কাকোরী মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত) যুগান্তর দলের বিদ্রোহী কর্মিগণের সঙ্গে 'দক্ষিণেশ্বরে' গ্রেফ্‌তার হইয়াছেন।

নায়ক ও কর্মীরূপে বিভিন্ন গ্রুপে যাঁহারা ছিলেন তন্মধ্যে কলিকাতার দলের সন্তোষ মিত্র; ঢাকা অনুশীলন দলের সতীশ চন্দ্র পাকড়াশী ও নিরঞ্জন সেন এবং দক্ষিণ কলিকাতার অনুশীলনের যতীন দাস ও বিনয় রায়; চট্টগ্রামের সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ নগেন সেন (জুলু সেন), অনন্তহরি মিত্র এবং প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী প্রভৃতির নাম করা যায়। ইতিমধ্যে ১৯২৩ সালে সন্ত্রাসবাদী কার্য হিসাবে শাঁখারীটোলার ঘটনা ঘটিয়াছে। বিখ্যাত আই-বি পুলিশের দুর্ধর্ষ নেতা স্যার চার্লস টেগার্ট ভ্রমে মিঃ ডে-কে হত্যা করা হয়। হত্যাকারী গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হয়। গোপীনাথ জানায়—মিঃ টেগার্টকেই আমি হত্যা করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু নির্দোষ একজন মরিয়াছে—এই জন্য আমি দুঃখিত। মিঃ টেগার্টের নিস্তার নাই। আমি ফাঁসিতে মরিব কিন্তু আমার মৃত্যুতে বাংলার যুবকগণ দৃঢ় সংকল্প লইয়া অগ্রসর হইবে।

ইহার পর ১৯২৫ সালে ঘটে—দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা। দক্ষিণেশ্বর

আড্ডায় বোমা পাওয়া যায়। অনন্তহরি মিত্র, প্রমোদরঞ্জন প্রভৃতি যুবকগণ ধৃত হন।

এই বোমার মামলার আসামীরা যখন কলিকাতার আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ছিলেন—তখন একদা আই-বি পুলিশের বিশিষ্ট অফিসার ভূপেন্দ্র চ্যাটার্জীকে ঐ মামলার আসামীগণ জেলখানার মধ্যেই আক্রমণ করে এবং হত্যা করে। লোহার ডাণ্ডা, বজ্রমুষ্টি প্রভৃতি ছিল তাহাদের অস্ত্র।

ভূপেন্দ্র চ্যাটার্জী এই মামলার আসামীদের কাহারো কাহারো সঙ্গে বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া সাক্ষাৎ করিতেন। ইহাতে অবশিষ্ট আসামীদের সন্দেহ জন্মে। কারাকক্ষে আসিয়া অতঃপর এইরূপ করিতে কেহ সাহসী না হয়—এই উদ্দেশ্যেই একপ্রকার নিরস্ত্র হইয়াই ভূপেন্দ্র চ্যাটার্জীকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিতে সংকল্প করে। এই সংকল্পের দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করিবার। ইহার ফলাফল সুনিশ্চিত জানিয়াই এই কার্য করা হয়। এই মামলায় অনন্তহরি ও প্রমোদরঞ্জনের ফাঁসি হয়। অন্যান্যের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়।

এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে—১৯২৩।২৪ সাল হইতেই বাঙলার বিপ্লব-দলের কর্মীদের মধ্যে অনেকে যুব-আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন, কৃষক-আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই সকল আন্দোলন তখন পর্যন্তও পূর্বতন বিপ্লব-সংস্থা-নিরপেক্ষ ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। তাই ঐ প্রয়াসের মধ্যেও অনৈক্য দৃষ্ট হয়। বিশেষ করিয়া ছাত্র ও যুব-আন্দোলনে ইহার তীব্রতা ও তিক্ততা লক্ষ্য করা যায়।

এই রিভোল্টিং বা বিদ্রোহীদল সম্পর্কে ঐ দলের অন্যতম গ্রুপের নেতা সতীশ পাকড়াশীর স্বীয় উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার উক্তির মর্ম—১৯২৯ সালে এই নূতন দল পুরাতন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কৃতসংকল্প হয়। Alternate leadership প্রয়োজন—ইহাই ছিল প্রেরণা। বিপ্লবদলগুলির যুবক কর্মীদের মধ্যে নূতন কিছু করার জন্য উদ্দীপনা জাগে। বিপ্লবদলগুলির মধ্যে থাকিয়াই তাহারা দল গড়িতে চেষ্টা করিতেছিল বলিয়া দলের সংহতি ও নেতৃত্বে ব্যাঘাত ঘটে—এই সকল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কিছুটা শাসনও চলিতে থাকে।

"যুগান্তর দলের বরিশাল শাখা, সূর্য সেন বা মাষ্টার-দার চট্টগ্রাম দল, অনুশীলনের ঢাকা-ময়মনসিংহ-বরিশাল-দক্ষিণ কলিকাতা ও বহরমপুরের প্রধান অংশ অনতিবিলম্বে সংগ্রাম আরম্ভ করার জন্য আগুয়ান হয়। ঢাকার বি, ভি,

দলও সম্মিলিত সংগ্রামোন্মুখ দলে যোগ দেয়" (সতীশচন্দ্র পাকড়াশী—অগ্নিদিনের কথা)। রংপুর প্রাদেশিক সম্মেলনের সময় এই বিদ্রোহী দলের কতিপয় নেতা রংপুরে মিলিত হন এবং আলাপ আলোচনার পর মোটামুটি একটা কার্যপদ্ধতি স্থির হয়। স্থির হয়, তিনটি জেলায় অস্ত্রাগার আক্রমণ করা হইবে। ঢাকা ও কলিকাতায় ছোট ছোট ঘাঁটি একই দিনে ও একই সময়ে আক্রমণ করা হইবে। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ না চালাইয়া এবং বড় রকমের দেশব্যাপী বিপ্লবের আশায় অপেক্ষা করিয়া না থাকিয়া, ছোট ছোট ক্ষেত্রে একটা বিদ্রোহাত্মক সংগ্রাম করিয়া—সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রতি জনগণের চিত্তকে আকৃষ্ট করার প্রেরণা ও কল্পনা ছিল। এই আশাও তাঁহারা করিতেন যে, সত্য-সত্যই কাজ কিছু করিতে পারিলে পুরাতন বিপ্লবীরাও না আসিয়া পারিবেন না। ১৯২৯ সালের নবেম্বর মাসেই সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ কলিকাতায় আসেন এবং সতীশ পাকড়াশী ও নিরঞ্জন সেনের মেছুয়াবাজারের বাসায় গোপন পরামর্শ হয়। অস্ত্রের অভাব অনুভূত হয়। যাই হউক, যথাশক্তি একই কালে বিভিন্ন জেলায় একটা সশস্ত্র বিদ্রোহাত্মক কার্য আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত হয়। এই সময়ে (নবেম্বর, ১৯২৯) বিদ্রোহাত্মক গোপন ইস্তাহার বিতরণ করিয়া যুবকদের আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে বলা হয়। কিন্তু মেছুয়াবাজারের বাড়ীর উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়ে—অথবা গোপন সংবাদ পাইয়া পুলিশ ১৮ই ডিসেম্বর (১৯২৯) রাত্রিতে বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং নিদ্রিত বিপ্লবীদের শয়নকক্ষে ঢুকিয়া পড়ে। কাগজপত্র, ঠিকানা, লাল ইস্তাহার, বোমা তৈয়ারীর ফরমূলা সহ সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন, রমেশ বিশ্বাস ধরা পড়েন। পূর্ব কথামত অতি প্রত্যূষে সুধাংশু দাশগুপ্তও বোমা ও রিভলভার লইয়া মেছুয়াবাজার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয়—এবং তৎক্ষণাৎ গ্রেফ্‌তার হয়। ঐ বাড়ীর ঠিকানা হইতে পরপর আরো কয়টি বাড়ী তল্লাস করা হয় এবং বোমা তৈয়ারীর সরঞ্জাম সহ যুবকগণ ধৃত হয়। এই ভাবে বরিশালের মুকুল সেন, শচীন কর, জগদীশ চ্যাটার্জী, খুলনার নির্মল দাস প্রভৃতি অনেক যুবক ধরা পড়ে। বিভিন্ন জেলার ৩২ জন যুবককে লইয়া মেছুয়াবাজার বোমার ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করা হয়। বিচারে সতীশ পাকড়াশী ও নিরঞ্জন সেনের ৭ বৎসর দ্বীপান্তর এবং সুধাংশু দাশগুপ্ত, রমেন বিশ্বাস প্রভৃতির পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

মেছুয়াবাজার ধরপাকড়ের চার মাস পরে চট্টগ্রামের সূর্য সেন, অম্বিকা

চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ এবং লোকনাথ বলের নেতৃত্বে ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দিনেই রাজসাহীতে রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন হইতেছিল। সেই সম্মেলনের চারজন সভাপতিকেই রাত্রে গ্রেফ্‌তার করা হয়—ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ), প্রতুল গাঙ্গুলী, জ্যোতিষ ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলী। সহসা গ্রেফ্‌তারের কারণ ছিল 'চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠন"। শুধু এই কয়জন সভাপতিই নহেন—বাংলার বিপ্লবী দলগুলির বড়ছোট বহু নেতাকেই ঐ দিনই বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে গ্রেফ্‌তার করা হয় এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিভিন্ন জেলে ও বন্দী-নিবাসে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। অর্থাৎ বিপ্লবী দলের নেতারা এবং তাঁহাদের অনুগামীরা এই সময়ে বিপ্লবাত্মক কার্যানুষ্ঠান অথবা কোন প্রকার সন্ত্রাসবাদমূলক কাজ হইতে বিরত থাকিলেও—প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদেরই বিরোধী রিভোল্টিং দলের বিপ্লবাত্মক কর্মপ্রচেষ্টার ফলেই তাঁহাদের অনেককেই কারারুদ্ধ হইতে হইল।

রিভোল্টিং বা বিদ্রোহীদলের পটভূমিকা না হইলে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণ তথা চট্টগ্রামের এই বিপ্লবী সংস্থার অভ্যুত্থানের তাৎপর্য সম্যক্ বুঝা যায় না। সেই কারণেই এখানে বাংলার এই বিদ্রোহী বা অগ্রগামী দলগুলির কথা উল্লেখ করা হইল।

চট্টগ্রামের প্রচণ্ডতম প্রয়াস

চট্টগ্রাম "অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" ব্যাপারের নেতা সূর্য সেন, অনন্ত সিংহ প্রভৃতি। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা পূর্ব হইতেই প্রধানতঃ দুই দলে বিভক্ত ছিল,—অনুশীলন ও যুগান্তর দলে। সূর্য সেনের দল যুগান্তর দলের সঙ্গেই যুক্ত হইয়া ছিল, যদিও তাঁহার দলের কেহ কেহ অনুশীলন দলে ছিলেন। কিন্তু চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার আক্রমণাদি কার্যের পরিকল্পনা ও কর্মানুষ্ঠানে অনুশীলন তো নহে-ই, যুগান্তর দলেরও কোন নেতৃত্ব বা সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল না। এই কর্মানুষ্ঠান প্রকৃত পক্ষে সূর্য সেন এবং তাঁহার নিতান্ত অনুরক্ত সহকর্মী প্রভৃতির নূতন সংগৃহীত

ও সুগঠিত স্থানীয় দলের দ্বারাই হইয়াছিল। ইহার দায়িত্ব ও কৃতিত্ব সবকিছু চট্টগ্রামের স্থানীয় বিপ্লবীদের, ইহা পূর্বোক্ত বাংলার রিভোল্টিং গ্রুপের চট্টগ্রাম শাখারই প্রচণ্ডতম মৃত্যুঞ্জয়ী উদ্যম।

রিভোল্টিং দলগুলির পরিকল্পনার ধারা মেছুয়াবাজার বোমা আবিষ্কারে ও ধরপাকড়ে বিপর্যস্ত হইয়া যায়। ইহারই চার মাস পরে—চট্টগ্রামের দলের নেতা সূর্য সেন, আর বিলম্ব করিলে তাঁহার দলের কর্মীরাও ধরা পড়িয়া যাইবে এবং কর্মীরাও আর ধৈর্য ধারণে সম্মত নহে, দেখিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়াই ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল শুক্রবার অস্ত্রাগার, পুলিশ ব্যারাক ও টেলিগ্রাফ্ অফিস আক্রমণ তথা বিপ্লবী অভ্যুত্থানের নির্দেশ দেন।

১৮ই এপ্রিলের অন্যতম নায়ক লোকনাথ বলের বিবৃতি

"২২শে এপ্রিল ভোরবেলা আমরা দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পরে জালালাবাদ পাহাড়ে উঠে আশ্রয় গ্রহণ করি। ১৮ই (১৯৩০) এপ্রিল অস্ত্রাগার দখল করার পর চট্টগ্রাম আমাদের করায়ত্ত হয়। তারপর তিনদিন বিভিন্ন পাহাড়ে আমাদের দিন কাটে। এ ক'দিন একরকম অনাহারেই আমাদের থাকতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে পাহাড়ের দু'একটা কাঁচা আম এবং ঘোলা জল এই ছিল আমাদের খাদ্য ও পানীয়। ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে উঠার সময় বহু গ্রামবাসী আমাদের দেখতে পেয়েছিল। আমরা জানতাম আমাদের সংবাদ সেদিন পুলিশের কাছে গোপন থাকবে না। তাই একটা চরম হিসাব নিকাশের জন্য আগে থেকেই সেদিন প্রস্তুত হয়েছিলাম। অবশ্য প্রস্তুত হয়েছিলাম বললে কথাটা ঠিক বলা হবে না। তিন দিনের অভুক্ত, দীর্ঘপথ অতিক্রম করার ফলে পরিশ্রান্ত, আমরা তখন একরকম মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম।···বেলা অনুমান পাঁচটা, হঠাৎ পাহাড়ের উপর থেকে আমাদের রক্ষী বিপদসূচক সঙ্কেতধ্বনি করে উঠল। যে যেখানে ছিলাম ছুটে এসে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখলাম, একদল সৈন্যবাহিনী সঙ্গীন উঁচিয়ে আমাদের পাহাড়ের দিকে ছুটে আসছে। আমরা তাড়াতাড়ি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে নিলাম। সৈন্যবাহিনী যখন আমাদের রাইফেলের গুলির পাল্লার ভেতর এসে পড়ল, তখন আমি গুলি বর্ষণের নির্দেশ দিলাম। আমাদের গুলিবর্ষণ সুরু হ'তেই সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণ সুরু করল। কিছুদূর গিয়ে তারা পেল ছোট্ট একটি পাহাড়ী খাল। সেখানে তখন জল ছিল না

বললেই হয়। সেই খালের ভিতরে নেমে তারা আশ্রয় গ্রহণ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গুলি বর্ষণের পাল্টা জবাব সুরু হোল। অনুমান পনর মিনিট পরস্পর গুলি বর্ষণের পর আমরা হঠাৎ লুইসগানের গুলি বর্ষণের আওয়াজ পেলাম। প্রথমেই আমার ছোট ভাই 'টেগরা' আহত হয়ে পড়ে গেল, আমাকে সম্বোধন করে 'টেগরা' বলল, 'সোনাভাই! আমি চল্‌লাম, তোমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ক'রো।' লুইসগানের গুলিবর্ষণ ক্রমশঃ তীব্রতর হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে ত্রিপুরা সেন, নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, প্রভাস বল, মধু দত্ত, নির্মল সেন, অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার, জিতেন দাসগুপ্ত, পুলিন ঘোষ, শশাঙ্ক সেন এবং মতি কানুনগো আহত হয়ে পড়ে গেল। তাদের রক্তে লাল হ'য়ে উঠল জালালাবাদের মাটি, জাতির পরাধীনতার, জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত সুরু হোল স্বাধীনতাকামী তরুণ শিশুদের রক্তে।……

তখন অনুমান সাতটা, হঠাৎ সরকারী সৈন্যবাহিনীর দিক থেকে তিনবার হুইসেলের আওয়াজ পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুলি বর্ষণের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। আমরা সবাই লাফিয়ে উঠে দেখলাম সৈন্যবাহিনী পলায়ন করছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গুলিবর্ষণ সুরু হল। আমাদের বন্দেমাতরম্ এবং ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে তখন আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হোয়ে উঠেছে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। একদিকে তিন দিনের অভুক্ত, পথশ্রমে ক্লান্ত জনপঞ্চাশেক বিপ্লবী (আমাদের অধিকাংশই ছিল পনর ষোল বছরের বালক), অন্য দিকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, অভিজ্ঞ, রণবিদ্যায় পারদর্শী গভর্ণমেণ্টের বাছাই করা সৈন্যবাহিনী।…পরাধীন জাতির ইতিহাসে বিপ্লবীদের সে দিনের জয়লাভ কম গৌরবের বিষয় নয়। জালালাবাদের শহীদ্‌রা তাদের রক্ত দিয়ে তাদের প্রাণ দিয়ে বিশ্বের সম্মুখে সেদিন প্রমাণিত করেছিল ভারতবর্ষের তরুণরা কাপুরুষ নয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য, জাতির কলঙ্ক-কালিমা ধুয়ে মুছে ফেলার জন্য হাসিমুখে তারা মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারে। জালালাবাদের শহীদ্‌রা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে চিরদিন অমর হোয়ে থাকবে।

বহু বছর ধরে ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের কার্যক্রম ডাকাতির ও খুনের ভেতরই সীমাবদ্ধ ছিল। সরকারী উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীকে খুন করা একটা আদর্শ বিপ্লবী কার্য বলে পরিগণিত হোত। আমাদের মনে হোল, প্রচলিত আন্দোলনের গতি ও তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যক। ক্ষমতা হস্তগত

করাই সমস্ত বিপ্লবী কার্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তদনুযায়ী আমরা সিদ্ধান্ত করলাম চট্টগ্রামকে স্বাধীন করে দেশের সামনে একটা আদর্শ স্থাপন করব। আক্রমণের দিন ঠিক হোল ইংরেজী ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল রাত দশটা। ঐদিন ছিল গুড্ ফ্রাইডে (Good Friday)। একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল ঐ দিনটার সাথে জড়িয়ে, আইরিশ প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর ইষ্টার বিদ্রোহের রক্তরাঙা স্মৃতি আমাদের তরুণ প্রাণে দিত আগুনের ছোঁয়াচ।

চট্টগ্রামের রেলওয়ে অস্ত্রাগার দখল করার ভার দেওয়া হ'য়েছিল নির্মলদা (শ্রীযুক্ত নির্মল সেন) এবং আমার উপর। মাষ্টার সেন (সূর্য সেন) ছিলেন আমাদের সর্বোচ্চ নেতা। আমাদের কার্যের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছিলাম তাঁরই নির্দেশে। নির্মলদা এবং আমার মধ্যে সাব্যস্ত হল রেলওয়ে অস্ত্রাগার দখল করার সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করব আমি। ১৮ই এপ্রিল বেলা তিনটের সময় আমি স্থানীয় Taxi Standএ গিয়ে একজন Driverকে বললাম, ঐ দিন রাতে আটটার সময় গাড়ী নিয়ে আমার বাসায় যেতে। আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু বেরুব বেড়াতে। সন্ধ্যার সময় নির্মলদা, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, জীবন ঘোষাল (মাখন), ফণী নন্দী, সুবোধ চৌধুরী এবং আমি সামরিক পোষাক পরে Taxiর জন্য অপেক্ষা করছি। আমার গায়ে ছিল উচ্চ ইংরেজ সামরিক কর্মচারীর পোষাক এবং অন্যেরা সৈন্যের পোষাক পরিহিত ছিল। আটটার সময় Taxi এলে আমরা গাড়ীতে উঠে Driverকে পাহাড়তলীর দিকে গাড়ী চালাবার নির্দেশ দিলাম (পাহাড়তলী ষ্টেশন চট্টগ্রাম সহরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত)। রেলওয়ে অস্ত্রাগারের সম্মুখের পথ দিয়ে যাবার সময় আমরা দেখে গেলাম, অস্ত্রাগারের অবস্থা অন্যান্য দিনের মতই স্বাভাবিক। আমাদের গাড়ী যখন পাহাড়তলী ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে পৌঁছল, তখন আমি Driverকে গাড়ী থামাতে বললাম। গাড়ী থামাতেই আমি এবং রজত গাড়ী থেকে নেমে Driverএর দিকে রিভলভার লক্ষ্য করে তাকে বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দিলাম। Driver আমাদের নির্দেশ পালন করল। আমরা Driverকে রাস্তার পাশের বাঁশ ক্ষেতে নিয়ে যাই এবং তার হাত পা বেঁধে chloroformএর সাহায্যে তাকে অজ্ঞান করে দিই।

প্রায় দশটার সময় আমাদের গাড়ী রেলওয়ে অস্ত্রাগারের side gateএ গিয়ে উপস্থিত হোল। পাহাড়তলী থেকে ফিরে আসার সময় গাড়ী চালাবার ভার

নিয়েছিল জীবন ঘোষাল। অস্ত্রাগারের সম্মুখে আমাদের ছয় জন সাথী আমার নির্দেশানুযায়ী আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। তাদের একজন এসে ধাক্কা দিয়ে gate খুলে দিলে আমাদের গাড়ী অস্ত্রাগারের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। অস্ত্রাগারের রক্ষী আমাদের পরিচয় জানার জন্য চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'Halt, Who comes there ?' (থাম! কে আসছে?) তার জবাবে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—'Friend' (বন্ধু)। তারপর আমাদের গাড়ী অস্ত্রাগারের সিঁড়ির সামনে গিয়ে থামল। আমি একা গাড়ী থেকে নেমে এসে অস্ত্রাগারের বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। আমার কাছ থেকে তখন রক্ষীর দূরত্ব ছিল অনুমান সাত আট হাত। রক্ষীকে আমি ডাকলাম, 'Sentry, ইধর আও' (রক্ষী! এদিকে এসো)। রক্ষী আমার সম্মুখে এসে সামরিক কায়দায় আমাকে অভিবাদন করল। তার ডান হাত রাইফেলের butt স্পর্শ করা মাত্রই আমি বাঁ হাত দিয়ে তার রাইফেল চেপে ধরি এবং ডান হাতে তার বুকের সামনে রিভলবার লক্ষ্য করে বলি—আমরা স্বদেশী, আমরা অস্ত্রাগার দখল করতে এসেছি। তুমি পালিয়ে যাও। আমি তাকে রাইফেল ছেড়ে দিতে বলার পর সে হঠাৎ আমার হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিল, আমি তখন বাধ্য হয়ে তাকে গুলী করি, সে আহত হয়ে পড়ে গেল, অন্য তিনজন রক্ষী তাদের রাইফেল ধরবার চেষ্টা করলে আমি এবং আমার সাথীরা ক্রমাগত গুলী বর্ষণ করে তাদের প্রতিহত করলাম, আমাদের প্রথম গুলীর আওয়াজ শুনেই অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী Sergeant-Major Farrel তার ঘরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে অস্ত্রাগারের রক্ষীকে ডাকল, আমি তাকে হুঁসিয়ার করে বললাম, 'আমরা ভারতীয় প্রজাতন্ত্র বাহিনীর সভ্য। আমাদের নেতার হুকুমে আমরা অস্ত্রাগার দখল করছি। তুমি যদি আমাদের কোনো অনিষ্ট করার চেষ্টা কর তাহলে জেনো তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।' আমার কথা শোনার পর সে তার ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং অনতিবিলম্বে আমাদের আক্রমণ করার জন্য তার রিভলবার নিয়ে ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রক্ষীর গুলীতে আহত হয়ে সে মাটিতে পড়ে যায়। তার স্ত্রী তখন আমার কাছে এসে তাঁর এবং তাঁর শিশুর জীবন ভিক্ষা চাইলেন, আমি তাঁকে বললাম—'আপনি আমাদের মায়ের মত। আপনার স্বামীর মৃত্যুর জন্য আমরা দায়ী নই। আমরা তাকে হুঁসিয়ার করেছিলাম। আপনি নির্ভয়ে ঘরের ভেতরে যান, কেউ আপনার অনিষ্ট করবে না।'

পুলিশ অস্ত্রাগার দখল করার ভার দেওয়া হয়েছিল শ্রীযুক্ত অনন্ত সিং এবং গণেশ ঘোষের উপর। ঐ অস্ত্রাগার ছিল একটা ছোট পাহাড়ের উপর। রাত দশটার সময় আমাদের সাথীরা একখানা গাড়ী করে অস্ত্রাগারের কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং সিঁড়ি বেয়ে অস্ত্রাগারের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। দূর থেকে অস্ত্রাগারের রক্ষীকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়েন, রক্ষী আহত হয়ে পড়ে গেল, আমাদের সাথীরা তখন গুলী বর্ষণ করতে করতে অস্ত্রাগারের দিকে ছুটে যান। অস্ত্রাগারের অন্যান্য রক্ষীরা তখন প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল। পুলিশ অস্ত্রাগারকে আমাদের সামরিক Headquarterএ পরিণত করা হোল এবং আমাদের সর্বোচ্চ নেতা, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতাদের অন্যতম, আমাদের প্রিয় মাষ্টারদা নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

Telegraph and Telephone Office দখল করার ভার দেওয়া হয়েছিল শ্রীযুক্ত অম্বিকা চক্রবর্তীর উপর। রাত দশটার সময় তিনি এবং আর কয়েকজন সাথী টেলিগ্রাফ অফিসে যান এবং রিভলবার দেখিয়ে Exchange Boardএর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে সরিয়ে দিয়ে হাতুড়ির সাহায্যে Exchange Boardকে চুরমার করে দেন। আক্রমণের সংবাদ পেয়ে টেলিগ্রাফ অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁর বন্দুক নিয়ে ছুটে আসেন; কিন্তু আমাদের সাথীদের গুলী বর্ষণের ফলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

১৮ই এপ্রিলের দু'তিন দিন আগে আমাদের কয়েকজন সাথী রেলওয়ে লাইন কেটে দেবার জন্য সহর পরিত্যাগ করে যান, ১৮ই এপ্রিল রাত ১০টার সময় তাঁরা ধুম এবং লাঙ্গলকোটের মাঝামাঝি রেলওয়ে লাইন কেটে দেন।

চট্টগ্রাম আমাদের করায়ত্ত হোল। পরে আমরা শুনেছিলাম, চট্টগ্রামের সমস্ত ইংরেজ পুরুষ রমণী ও শিশুরা সমুদ্রগামী একখানা জাহাজে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। আজীবন পরাধীনতার দূষিত আবহাওয়ায় লালিত পালিত হোয়ে জীবনে সেদিন আমরা প্রথম পেলাম স্বাধীনতার আলো, স্বাধীন দেশের মুক্ত হাওয়ার প্রথম পরশ। সে এক অপূর্ব অনুভূতি! পৃথিবীর সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত পবিত্রতা দিয়ে বুঝি গড়ে উঠেছিল সেই অনুভূতি।"

(স্বাধীনতা সংখ্যা, যুগান্তর)

'চট্টগ্রাম করায়ত্ত হলো'—ইহা অবশ্যই ভাবপ্রবণ অত্যুক্তি। আসলে বিপ্লবীদের এই ঘটনার পরেই আত্মরক্ষার জন্য আত্মগোপন করিতে হয়। সহর

ত্যাগ করিয়া তখন তাহারা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছে। সকলেই একত্র ঐ স্থানে যাইতেও সক্ষম হয় নাই। পুলিশ ব্যারাকে পেট্রোলের আগুনে হিমাংশু সেন আহত হয়। অনন্ত, গণেশ এবং আরো দুইজন—মুমূর্ষু হিমাংশু সেনকে মোটর গাড়ীতে করিয়া নিরাপদ স্থানে রাখিতে লইয়া যান। এই ভাবে তাঁহারা সূর্যবাবুর মূল দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। জালালাবাদ পাহাড়ের গৌরবময় সংগ্রামে তাই তাঁহারা ছিলেন না। চট্টগ্রাম সহরে ১৯শে এপ্রিল হইতেই পুলিশ ও সৈন্য-বাহিনীর কড়াকড়ি পাহারা। সহর হইতে বাহিরে যাওয়া ও সহরে আসা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। খানাতল্লাস ইত্যাদি সুরু হইয়াছে, সন্দেহভাজন যুবকদের ধরিতেছে। ৪ দিন পর ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে বৈকাল ৪টায় সৈন্যদল বিপ্লবীদের আক্রমণ করে। তাহাদের সঙ্গে ছিল মেসিনগান। বিপ্লবীদলের সকলেই মরিবার জন্যই মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল—এবং তাহারা এই অসম যুদ্ধেও গুলিবর্ষণ করিয়া প্রতিপক্ষকে আহত ও নিহত করিয়াছিল অবশ্য নিজেরাও নিহত হইতেছিল। ১১ জন বিপ্লবী নিহত হয়, ৪ জন গুরুতর আহত হয়। বিখ্যাত বিপ্লবী অম্বিকা চক্রবর্তী যুদ্ধে মারা গিয়াছেন, এই কথা সরকার পক্ষও বিশ্বাস করে। নেতা সূর্য সেনও মৃত বলিয়া জানিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসেন। অম্বিকাবাবুকে মৃত মনে করিবার কারণ, গুলি তাঁহার কপাল ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অম্বিকাবাবু আশ্চর্য রকমে বাঁচিয়া যান। পাহাড়ের স্নিগ্ধ বাতাসে তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসে। কিন্তু চলিতে অক্ষম। উঠিবার চেষ্টা করিতেই পাহাড়ের নীচের এক ডোবা-পুকুরে গড়াইয়া পড়িয়া যান এবং কিছু সুস্থ হইয়া গ্রামে আশ্রয় নেন। অত্যন্ত রুগ্ন অবস্থায় পরে তিনি পটিয়ায় ধৃত হন। বিচারে ট্রাইবুন্যাল তাঁর ফাঁসির হুকুম দেন। হাইকোর্ট ফাঁসির হুকুম রদ করেন। যাঁহাকে মৃত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট একবার ঘোষণা করিয়াছে, তাঁহাকে সেই গবর্ণমেণ্ট দ্বিতীয়বার মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন না। তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ইহাই কারণ।

জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে সর্ব প্রথম মৃত্যু-বরণ করে হরিগোপাল বল, টেগরা (লোকনাথ বলের ছোট ভাই)। নিহত শহীদদের মধ্যে কিশোর-বয়স্ক (মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সের) নির্মল সেন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। একে একে নিহত হল—নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য,

ত্রিপুরা সেন, প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত, জিতেন্দ্র দাস, মধুসূদন দত্ত, পুলিন ঘোষ। গুরুতর আহত হন অর্ধেন্দু দস্তিদার, মতিলাল কানুনগো, অম্বিকা চক্রবর্তী, বিনোদ দত্ত। অর্দ্ধেন্দু ও মতিলাল পরদিনই মারা যান।

নেতা সূর্য সেন মৃত বিপ্লবী সহকর্মীদের কোমর হইতে রিভলভারগুলি খুলিয়া নিলেন, প্রত্যেকের পকেটে হাত দিয়া টাকা বা কাগজপত্র যাহা ছিল নিয়া নিলেন। সহকর্মী অন্নদাপ্রসাদ গুপ্ত বলেন :—"অম্বিকাদার পকেটে কয়েকটি টাকা ছিল, মাষ্টারদা তাঁর পকেট থেকে টাকাগুলো বার করে নিলেন। তারপর তাঁর কোমর থেকে সদ্য নূতন রিভলভারটি খুলে নিলেন।" অম্বিকা বাবুকে সূর্যবাবু মৃত বলিয়াই ভুল করেন। এখানে সূর্যবাবুর নেতৃত্ব-শক্তির পরিচয় মিলিতেছে। প্রাণ-প্রিয় সহকর্মী, তন্মধ্যে কিশোর-বয়স্কই বেশী, তাহাদের মৃত্যু দেখিলেন, তথাপি এই মৃত্যুর শ্মশানে দাঁড়াইয়াই নীরবে অপূর্ব নিষ্ঠার সহিত অন্তরের শোক দুঃখ সহ্য করিয়া পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য আগাইয়া চলিয়াছেন। দেখা যায়, সূর্য সেন তাঁহার সংগ্রাম-নিষ্ঠা জালালাবাদেই শেষ করিতেছেন না, শাসক-শক্তিকে আরো আঘাত হানিবার জন্য তখনকার অবস্থানুযায়ী কর্মানুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিতেছেন। তিনি সহকর্মীদের লইয়া আত্মগোপন করিলেন এবং সেই গোপন কেন্দ্র হইতে আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। তাহাকে গেরিলা সংগ্রাম বলা হউক, অথবা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ বলা হউক, আসলে এই সবই শাসন-শক্তিকে আক্রমণ তথা যথাসম্ভব আঘাত হানারই মরণ-বরণের কর্মনীতি। এ যেন মৃত্যু-আলিঙ্গনের কর্ম-নীতি। মৃত্যু-ভয় জয় করিবার এই প্রেরণা চট্টগ্রামের এই সকল বিপ্লবীদের পাগল করিয়া দিয়াছিল।

জালালাবাদের সংগ্রাম ২২শে এপ্রিল ১৯৩০। ৬ই মে কালারপোলের খণ্ড যুদ্ধ। স্থির করা হয়, কর্ণফুলি নদী পার হইয়া চট্টগ্রামের শ্বেতাঙ্গপাড়া আক্রমণ করা হইবে। সহরে তখন পুলিশের সতর্কতা, ধরপাকড় ও অস্ত্রসজ্জা প্রভৃতি এইরূপ আক্রমণের মোটেই অনুকূল নহে। কিন্তু স্বদেশ রায়, মনোরঞ্জন সেন, রজত সেন, ফণী নন্দী, সুবোধ চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ গুপ্ত জেদ করিতে লাগিলেন —তাঁহারা এই আক্রমণ করিবেন। কালারপোলের ছয় জনের মধ্যে চার জনই সংঘর্ষে কিছুটা আহত হওয়া মাত্রই নিজেদের পিস্তলের গুলিতেই আত্ম-হত্যা করে। এই সম্পর্কে এই সংস্থার অন্যতম বিপ্লবী কর্মী অনন্তপ্রসাদ গুপ্ত বলেন—"মাষ্টারদা অনেক করে তাঁদের বুঝিয়ে নিবৃত্ত করতে চাইলেন; কিন্তু

তাঁরা একরকম জোর করেই মাষ্টারদার সম্মতি আদায় করে নিলেন। তাঁদের প্রিয়তম সাথীরা সবাই প্রাণ দিয়েছে জালালাবাদে, আর তাঁরা পড়ে থাকবেন পেছনে? তাঁদের প্রত্যেকেরই তখন অত্যন্ত বেপরোয়া অবস্থা, অন্তরে সর্বক্ষণ মৃত সাথীদের জন্য হাহাকার। বেঁচে থাকাটাই যেন তাঁদের কাছে অপরাধজনক বলে মনে হচ্ছিল। অনেক করে মাষ্টারদা তাঁদের শান্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। মাষ্টার দা'র সমস্ত যুক্তির উত্তরে তাঁদের ছিল শুধু একটি মাত্র আকুল আবেদন—'মাষ্টারদা, জালালাবাদ আমাদের ডাকছে, এর পরও যদি আমাদের থাকতে বলেন—তাহলে আমাদের শরীরটাই শুধু পড়ে থাকবে কিন্তু আমাদের মন মরে যাবে।' সেদিন তাঁদের সেই আকুল আবেদনে সায় দেওয়া ছাড়া মাষ্টারদার আর কোন উপায়ান্তর ছিল না, যদিও এই সায় দেওয়ার পক্ষে কোন যুক্তি তিনি খুঁজে পান নি।" (মাষ্টারদা—৭২-৭৩ পৃঃ)

এই গ্রন্থারম্ভে আমরা লিখিয়াছি: "মরণের কথায় কি রস আছে কে জানে, কিন্তু এই মরণের পথে লোক জুটিল।" চট্টগ্রামের এই দলটির কর্মীদের আসন্ন মৃত্যুর জন্যই নেতারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দেশের জন্য, পরাধীনতার গ্লানি দূর করিবার চেষ্টায়, বৃটিশ-শাসনের যে কোন কেন্দ্রে আঘাত করিবার জন্য মরিতে হইবে; এই ভাবই কর্মীদের উন্মাদ করিয়াছিল। ১৮ই এপ্রিলের আক্রমণের উদ্যোগ-পর্বে কিশোর ও যুবকদের এই মৃত্যু বরণ করিবার জন্যই দেহ-মনে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তাই দেখিতেছি নেতার পক্ষেও এই মৃত্যু বরণের আকাঙ্ক্ষা রোধ করা সম্ভব হয় নাই। নেতা 'বাধ্য হইয়া' সম্মতি দেন—ইহা বিপ্লবী সংস্থার নিয়মানুবর্তিতা-সম্মত মোটেই নহে। আর তাহা দেখা দিলে ভাবাতিশয্য নাটকীয় পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছায়।

বিপ্লবের আদর্শ ও উহার নির্ধারিত কর্মনীতিকে সাফল্যের পথে পরিচালনা করার গুরুদায়িত্ব ও নেতৃত্ব যাঁহার হাতে, তাঁহার পক্ষে অযৌক্তিক ভাবালুতার নিকট বাধ্য হওয়া সাজে না—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু এই যে মৃত্যুকে জানিয়া শুনিয়া বরণ করিবার মহাবীর্য তাহা এই সকল কর্মীর আত্মবলিকেই শুধু মহিমান্বিত করে নাই; পরাধীনতার শৃঙ্খল-মোচনের প্রয়াসে মৃত্যু-ভয় তুচ্ছ করিবার প্রেরণাও যুবজনের মধ্যে আনিয়া দেয়। প্রতিটি আঘাত সাফল্য আনে না সত্য, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীর প্রতিটি সচেতন আঘাত যে বৈদেশিক

শাসন-শক্তির মূল শিথিল করিতে থাকে ইহাতে সন্দেহ নাই। বাংলার কবির শাশ্বত কামনা ছিল, এই দুর্ভাগ্য দেশ হইতে 'রাজভয়'—'মৃত্যুভয়' দূর হউক। তাহা বিপ্লবীদের জীবন-দানের সাধনায় সত্য হইয়াছে। আমাদের জাতির চরিত্রে ইহা দানা বাঁধে নাই কেন তাহা অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য।

এই দলের যে সকল কর্মী ধরা পড়ে—নির্যাতনের ভয়ে নানা প্রলোভনে ও ভ্রান্তিতে তাহাদের কয়েকজন একরার করিতে আরম্ভ করিলে ফেরারী অনন্ত সিংহ পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ধৃত কর্মীরা আর 'একরার' না করে এবং যাহারা একরার করিয়াছে তাহারা যাহাতে প্রদত্ত বিবৃতি প্রত্যাহার করে, বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিংহের আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্য ছিল তাহাই। ইহার যৌক্তিকতা লইয়া প্রশ্ন থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার ফলে মামলায় যে সরকার পক্ষ রাজসাক্ষী পায় নাই, পূর্ব-প্রদত্ত বিবৃতি প্রত্যাহৃত হইয়াছে—তাহা অবশ্যই স্বীকার্য।

অনন্ত সিংহ ও অপর ৩০ জনের বিরুদ্ধে স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালে 'অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' তথা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মামলা আরম্ভ হয়।

মামলার রায়—১৯ মাস মামলা চলার পরে—১৯৩২ সালে বাহির হয়।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ পান অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত, ফণী নন্দী, সুবোধ চৌধুরী, সহায়রাম দাশ, ফকির সেন, লালমোহন সেন, সুখেন্দু দস্তিদার, সুবোধ রায়, রণধীর দাসগুপ্ত। অনিল বসুকে ও নন্দ সিংহকে বোর্ষ্টাল জেলে যথাক্রমে তিন ও দুই বৎসর রাখা হয়। নিতাই ঘোষ, শান্তি নাগ, অশ্বিনী চৌধুরী, ননী দেব, মলিন ঘোষ, শ্রীপতি চৌধুরী, সুকুমার ভৌমিক, হীরালাল বল, বিজন সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, বীরেন দস্তিদারকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু বঙ্গীয় অর্ডিন্যান্স্‌এ সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের আটক করা হয়।

* * * * *

১৯৩০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর চন্দননগরে একটা বাড়ীতে চট্টগ্রাম দলের পলাতক কর্মীরা অবস্থান করিতেছিল। পুলিশ সন্ধান পাইয়া সদলবলে বাড়ী ঘেরাও করে। পুলিশ ও বিপ্লবীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে জীবন ঘোষাল নিহত হয়। গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্ত ধরা পড়েন। পুলিশ তাঁহাদের চট্টগ্রামে আনিয়া মামলার আসামী শ্রেণীভুক্ত করে।*

* চন্দননগরে এঁদের আশ্রয়দাতা রূপে ধৃত হন—শশধর আচার্য ও তাঁহার স্ত্রী অথবা স্ত্রী

নবেম্বর মাসে অসুস্থ অবস্থায় অম্বিকা চক্রবর্তী ধৃত হন। কিন্তু তাঁহাকে তখন চিকিৎসার্থ সিউড়ী জেলে পাঠাইতে হয় বলিয়া তাঁহার মামলা হয় পরে।

চট্টগ্রাম দলের প্রধান নেতা সূর্য সেন পলাতক থাকিয়া অবশিষ্ট কর্মীদের লইয়া নূতন পরিকল্পনায় কাজ আরম্ভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জেলের বন্দীদের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ স্থাপিত হইল। এদিকে চাঁদপুরে ইন্‌স্পেক্টর তারিণী মুখার্জীকে পুলিশের বড় কর্তা ক্রেগ ভ্রমে রিভলভারের গুলিতে নিহত করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের আসামী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের হয় ফাঁসি, কালিপদর হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বিচার হয় কলিকাতায়। ১৯৩১ সালে আবিষ্কৃত হইল ডিনামাইট ষড়যন্ত্র। জেলের ভিতরে কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া গেল। বাহিরে সহরের বিভিন্ন জায়গায় মাটির তলায় ডিনামাইট আবিষ্কৃত হইল। জেলের কারা-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বন্দীদের মুক্তি এবং আদালত গৃহ ইত্যাদি উড়াইয়া দেওয়ার পরিকল্পনা লইয়াই এই ষড়যন্ত্র হয়। দুইজন কর্মী সন্দেহ-প্রযুক্ত ধৃত হওয়ার ফলে ষড়যন্ত্র ফাঁশ হইয়া যায়। ধরপাকড় আরম্ভ হয়। ৮জনকে লইয়া স্বতন্ত্র ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। বিচারে তিন বছর ও ৬মাস সাজা হয়। প্রকাশ, আসামীরা এই সর্তে দোষ স্বীকার করে যে তাহাদের শাস্তি লঘু হইবে।

১৯৩২ সালের জুন মাসে চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রামে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে নেতা সূর্য সেন সহকর্মীদের সহিত আত্মগোপন করিয়া ছিলেন। পুলিশ তাঁহার আবাসস্থল ঘিরিয়া ফেলে। এই সংঘর্ষে পুলিশ মেসিনগান ব্যবহার করে। বিপ্লবীরা রিভলভার চালায়। সরকার পক্ষে ক্যাপটেন ক্যামেরণ নিহত হন। বিপ্লবী নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন এই সংগ্রামে নিহত হন। সূর্য সেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার পুলিশের চক্ষু এড়াইয়া সরিয়া পড়েন। এই দলে যে সকল স্ত্রীকর্মী যোগ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে এই প্রীতিলতার বিপ্লব-নিষ্ঠা অপূর্ব। বিপ্লবীদের আশ্রয় দিবার অপরাধে বৃদ্ধা সাবিত্রী দেবী ও তাঁহার পুত্র রামকৃষ্ণের চার বৎসর কারাদণ্ড হয়।

এবার সূর্য সেন পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। এই আক্রমণের নেতৃত্বভার দেন প্রীতিলতার উপর। ২৪।৯।১৯৩২ সালের এই

বলিয়া কথিত সুহাসিনী দেবী। প্রকৃত নাম সুহাসিনী গাঙ্গুলী ওরফে চট্টগ্রামের পুঁটুদি, পরে অন্তরীণাবদ্ধ হন। প্রকাশ, ইঁহাদের স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিতে হইয়াছিল পুলিশের নিকট। সুহাসিনী গাঙ্গুলী ছিলেন বিপ্লবীদের স্নেহময়ী 'দিদি'র মতো।

আক্রমণে মিসেস সুলিভান নিহত হন এবং আরো ১০।১২ জন আহত হন। এই আক্রমণে প্রীতিলতার সঙ্গে ছিল ৮ জন তরুণ কর্মী। এই অভিযান অত্যন্ত দুঃসাহসিক ছিল। চট্টগ্রামে তখন অত্যন্ত কড়াকড়ি পাহারা—বিশেষ শ্বেতাঙ্গ পাড়ায়। তাহা সত্ত্বেও সাহস ও গোপনতার মধ্যে ইহার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বোমা ও পিস্তল লইয়া বিপ্লবীরা শ্বেতাঙ্গ ক্লাবের উপর আক্রমণ চালায়। উভয় পক্ষে গুলি চলে। প্রীতিলতা গুরুতর রূপে আহত হন। ক্লাবগৃহ হইতে ১০০ গজ দূরে আসিয়াই পড়িয়া যান। তখনই পটাসিয়াম সায়ানাইড্ খাইয়া মৃত্যু বরণ করেন। প্রীতিলতা ভিন্ন আর কোন বিপ্লবীকেই পুলিশ ধরিতে সক্ষম হয় না। যদিও এই উপলক্ষে বহু যুবককে সন্দেহে গ্রেফ্তার করা হয় তথাপি পুলিশ কোন মামলা খাড়া করিতে সক্ষম হয় না। প্রীতিলতার জামার পকেটে তাহার একটি বিবৃতি পাওয়া যায়। উহার মর্ম :—মাষ্টারদা (সূর্য সেন) আমাকে এই আক্রমণের নেতৃত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেন। আমি বলি, এতোগুলি যোগ্য ও অভিজ্ঞ ভাই থাকিতে আমার ন্যায় বোনের (স্ত্রীলোকের) উপর এইরূপ গুরুভার কেন? মাষ্টারদা যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দেন যে বোনেরাও হাতেনাতে কাজ করিতে সক্ষম —ভাইদের পশ্চাতে তাহারা পড়িয়া থাকিবে না, ইহাই প্রমাণ করার প্রয়োজন আছে ইত্যাদি। বস্তুতঃ বিপ্লবী দলে এইভাবে স্ত্রীকর্মীর এই ধরণের কার্যে সাক্ষাৎ নেতৃত্বগ্রহণ এই প্রথম। প্রীতির কর্মনিষ্ঠাও ছিল অপূর্ব। সূর্যবাবুর এই সকল বিপ্লবানুষ্ঠানের টাকা কর্মীদের নিকট হইতে সংগৃহীত হইত। প্রীতির বাবা ছিলেন দরিদ্র। প্রকাশ, একদা প্রীতিদের বাড়ীতে অন্য সদস্যরা বলাবলি করেন যে, আজই সূর্য সেনের নিকট ৫০০৲ পাঠান চাই। উহার মধ্যে ৪৫০৲ সংগ্রহ হইয়াছে, ৫০৲ এখনো বাকি। প্রীতির আর্থিক অবস্থা সকলেই জানিত তাই তাঁহাকে টাকার কথা বলা হয় নাই। প্রীতি ৫০৲ টাকা আনিয়া দিতেই প্রশ্ন হইল, এটাকা কোথায় পেলে। প্রীতি জানান—কাল বাবা মাহিনা পেয়েছেন (৫০৲ **টাকাই মাহিনা**), আমার কাছেই টাকা থাকে। তাই দিলাম। ইত্যাদি···('মাষ্টারদা')[১]।

১ কিন্তু এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া প্রীতির কনিষ্ঠ বোন শান্তিলতা বলেন :—তাঁদের বাবা ৫০৲ টাকা নয়—বেতন পাইতেন, ১৫০৲ টাকা। প্রীতি পার্টিকে এই ৫০৲ই শুধু নয়—এর পূর্বে বহু অর্থ দান করেছেন, মায়ের বহু গহনা পার্টির কাজে দান করেছেন। প্রীতি ক্লাবের ঘটনায় নিজে আহতও হয়েছিলেন।

শুধু চট্টগ্রাম সহরেই নয়, চট্টগ্রামের বহু পল্লীতে এবং ঘাঁটিতে ঘাঁটিতেও সিপাহী-শান্ত্রীর সমাবেশ। ইতিমধ্যে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের অপর নারীকর্মী কল্পনা দত্তও বাড়ী ছাড়িয়া আত্মগোপন করিয়াছেন। পাহাড়তলীতে কল্পনাকে পুরুষবেশে পুলিশ গ্রেফ্‌তার করে। দুই মাস জেলে আবদ্ধ থাকার পর কল্পনা জামীনে মুক্ত হইয়াই নেতা সূর্য সেনের নির্দেশে পলাতক হইয়াছেন। ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১০টায় গৈড়লা গ্রামে সূর্য সেনের গোপন আশ্রয়স্থল পুলিশ ঘিরিয়া ফেলে। বহুক্ষণ ধরিয়া পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে শান্তি চক্রবর্তী গুরুতর রূপে আহত হয়। কিন্তু আশ্রয়দাত্রী ও ব্রজেন সেন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। একটি নির্জন স্থানে তারকেশ্বর ঘোষ দস্তিদার প্রভৃতি সহকর্মীদের সঙ্গে সূর্য সেন সাক্ষাৎ করিতে নিভৃত বাসস্থান হইতে বাহির হন। সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী সংবাদ পাইয়া পূর্ব হইতেই স্থানটার চারিদিকই ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। ঐদিন ঐস্থানে শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত, কল্পনা দত্ত, সুশীল দাসগুপ্ত, ব্রজেন সেন প্রভৃতি ছিলেন। কেহ কেহ ডোবার জলে রাত্রে ডুবিয়া থাকেন, এবং অন্ধকারে পলাইয়া যাইতে সক্ষম হন। ব্রজেন সেনের বিবৃতি এইরূপ—"একটু পরেই আমি ধরা পড়ে গেলাম। মাষ্টারদা ছাড়া আর সবাই সরে পড়তে সক্ষম হল। মাষ্টারদা মিলিটারী বেষ্টনী ভেদ করতে চেষ্টা করেন—কিন্তু পারেন নি—গুর্খারা তাঁকে দেখতে পেয়ে ধরে ফেলে। মাষ্টারদার আর আমার হাত পা ও বুকে শক্ত বাঁধন দিয়ে ফেলে রাখে।"

সারারাত সূর্য সেন ও ব্রজেন সেনের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলে। "পরদিন ভোরে দুজনকে হাতকড়ি পরিয়ে কোমরে শিকল দিয়ে বেঁধে বেশীর ভাগ রাস্তা উলঙ্গ অবস্থায় হাঁটিয়ে নিয়ে পটিয়া ক্যাম্পে এনে হাজির করে। পটিয়া হইতে চট্টগ্রাম আসার পথে একটা রেল-ষ্টেশনে পুলিশের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ইংরেজ সার্জেন্ট রেলের কামরায় মহাউল্লাসে—(যেহেতু সূর্য সেনকে গ্রেফ্‌তার করা সম্ভব হইয়াছে) ঢুকিয়া পড়ে। একটা গুণ্ডা সার্জেন্ট জিজ্ঞাসা করিল, "Who is great Surja Sen—that old man?" এই বলেই সেই বর্বর জানোয়ারটা মাষ্টারদার মুখের ওপর প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলে—তাঁর নাকমুখ দিয়ে অবিরাম ধারায় রক্ত ছুটল—মাষ্টারদা জ্ঞান হারিয়ে আমার গায়ের উপর এলিয়ে পড়লেন।" (ব্রজেন সেনের উক্তি—'মাষ্টারদা'—পৃষ্ঠা ৯১)

সূর্য সেনের গ্রেফ্‌তারের তিন মাস পরে কল্পনা দত্ত ও তারকেশ্বর দস্তিদার

ধরা পড়েন। পুলিশের সঙ্গে এইখানেও বিপ্লবীদের সংঘর্ষ হয়। কল্পনাদের আশ্রয়দাতা গহিরা গ্রামের (আনোয়ারা থানা) পূর্ণ তালুকদারের গুলির আঘাতে মৃত্যু হয়। তাঁর ছোট ভাই নিশি তালুকদারের বুকেও গুলি লাগে। তিনি নিহত হন। স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে কল্পনা দত্ত, তারকেশ্বর ও সূর্য সেন তিন জনের একত্রই বিচার হয় (তৃতীয় অস্ত্রাগারলুণ্ঠন মামলা)। ১৯৩৩ সালের ১৪ই আগষ্ট রায় দেওয়া হয়—কল্পনার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি। ১৯৩৪ সালের ১৩ই জানুয়ারী উভয়ের ফাঁসি হয়। প্রকাশ: ১২ই জানুয়ারী রাত্র ১২টার পর রাত্রেই তাঁহাদের ফাঁসি দেওয়া হয়। ইহাও প্রকাশ, ঐ রাত্রে ইংরেজ সৈন্য ও পুলিশ দল সূর্য সেনের দেহের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়া তাঁহাকে অচৈতন্য করিয়া ফেলে। প্রাতে ঐ অচৈতন্য দেহই ফাঁসিতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়।

সূর্য সেনের ফাঁসির পর

সূর্য সেনের ফাঁসির রায় প্রকাশ হইবার পরই তাঁহার অবশিষ্ট অনুগামী কর্মিগণ প্রতিশোধ লইতে মরিয়া হইয়া উঠে। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে গৈরলা গ্রামের নেত্র সেনকে নিহত করা হয়। এই নেত্র সেনই নেতা সূর্য সেনের আশ্রয় স্থান সম্পর্কে পুলিশে খবর দিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। এই জানুয়ারী মাসেই ৭ই তারিখে চট্টগ্রাম সহরের ক্রিকেট খেলার মাঠে দর্শক হিসাবে সমবেত ইংরাজগণকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকজন তরুণ বোমা ছোঁড়ে এবং পিস্তল চালায়। ঘটনার স্থলে হিমাংশু চক্রবর্তী ও নিত্য সেন মৃত্যু বরণ করেন। হরেন চক্রবর্তী ও কৃষ্ণ চৌধুরীকে সশস্ত্র পুলিশ ধরিয়া ফেলে। বিচারে বহরমপুর জেলে এই দুজনের ফাঁসি হয়। ইহাদের কাহারো বয়সই ১৬।১৭র বেশী ছিল না। ইতিমধ্যে অবশিষ্ট পলাতক শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত, কালিকিঙ্কর দে প্রভৃতি ধরা পড়েন। সূর্য সেনের সংস্থার বিপ্লবাত্মক কর্মানুষ্ঠান অধ্যায়ের এইখানেই শেষ হয়।

নেতা সূর্য সেনের মধ্যে খাঁটি বিপ্লবী-চরিত্র লক্ষ্য করিবার। ধরা পড়িয়া দণ্ডিত হইবার পর বিপ্লবীদের মধ্যে পলায়নের জন্য খুব বেশী চেষ্টা দেখি না। ক্যাম্পে বা জেলে রাজবন্দীরূপে বা দণ্ডিত বা বিচারাধীন আসামীরূপে কারামুক্ত

হইবার প্রয়াস যথেষ্ট নাই। অবশ্য ১৯১৬।১৭ সালে (তখনও রাসবিহারীর অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া আগমনের প্রত্যাশা ছিল) অন্তরীণ হইতে পলায়নের বেশ কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। 'দলন্দা' হইতে নলিনীকান্ত প্রভৃতির এবং মেদিনীপুর জেল হইতেও দীনেশ মজুমদার, নলিনী দাশ প্রমুখের পলায়নের সংবাদ আসে। এছাড়া বক্সা ক্যাম্প হইতে জিতেন গুপ্ত ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্তীর এবং (আন্তঃপ্রাদেশিক মামলার) পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত প্রভৃতির আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মৃত্যুজয়ী সংকল্প লইয়া পলায়নের (১৯৩৪) কৃতিত্ব আছে। এরূপ আরও কিছু কিছু পলায়ন-চেষ্টার সংবাদ আছে। ১৯৩০ সালের পরও অন্তরীণ হইতে বেশ কয়েকজন পলায়ন করে। কিন্তু বিপ্লবীদলের অধিকাংশ নেতা ও কর্মীই—ধরা পড়িবার পরে—কতকটা ইহাই নিয়তি বা আপাততঃ পরিণতি বা পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যে-করিয়াই হউক এখনই পলাইতে হইবে, পলাইয়া বাহিরে গিয়া কাজ করিতে হইবে—এমন সংকল্প খুব বেশী দেখা যাইত না। অবশ্য বিপ্লবী দলের অনেককেই পুলিশ যখন ধরে তখন তাঁহারা ধরা পড়িবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং ধরা পড়িয়া তাঁহাদের পলায়নের প্রশ্নও তেমন আসে না। কিন্তু যাহারা সত্যই সাক্ষাৎ ভাবে বিপ্লবাত্মক কর্মানুষ্ঠানের জন্য গোপন ষড়যন্ত্রে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ধৃত হইয়া বা দণ্ডিত হইয়া কারাজীবনকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। এমন কি সংস্থা তাঁহাদের নষ্ট হইতেছে, ইহা বুঝিলেও কারাগার বা অন্তরীণ হইতে পলায়ন করিতে অনেকেই উৎসাহ বোধ করেন নাই। এমনি বিপ্লবী বলিয়া ধৃত হওয়া চলে; কিন্তু বন্দিজীবন হইতে পলায়ন-প্রয়াস—এবং ঐ প্রয়াসকালে ধরা পড়িলে বহুবিধ নিশ্চিত লাঞ্ছনার সম্ভাবনায় হয়ত অনেকেই উৎসাহ দেখান নাই। ভাবটা অনেকটা এইরূপ: বন্দী করা হইয়াছে—এই অধ্যায়ের শেষ হইয়াছে। আবার ছাড়া পাইলে, দেখা যাইবে। অথবা জেল হইতে গোপনে সংবাদ পাঠাইয়া, সংযোগ স্থাপন করিয়া সংস্থা চালাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাইবে। কিন্তু নিয়ত জেল হইতে পলাইবার সক্রিয় প্রয়াস বেশী দেখা যায় নাই। অনেকে 'ভদ্রলোকে'র মতোই নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু সূর্য সেন ধরা পড়িবার পরে কারারুদ্ধ হইয়াও—অতিমাত্রায় সিপাহী-শাস্ত্রীর কড়াকড়ির মধ্যেও, তাঁহার অবশিষ্ট সহকর্মীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন এবং কারাগার হইতে মুক্ত হইবার

চেষ্টা চালান। তাঁহার ধরা পড়িবার পূর্বেও তিনি তাঁহার যে সকল সহকর্মী তখন বিচারাধীন অবস্থায় কারাগারে ছিলেন—তাঁহাদের মুক্ত করিয়া আনিবার জন্ম ব্যাপক চেষ্টা করিয়াছিলেন। সূর্যবাবুদের সংস্থার মধ্যে শাসক-শক্তিকে পুনঃ পুনঃ আঘাত হানিবার (হউক না সে আঘাত নিতান্ত স্থানীয়) যে প্রেরণা ছিল তাহা শেষ পর্যন্ত অনির্বাণ ছিল।

সূর্য সেনের আদর্শ-নিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সহকর্মী, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারলুণ্ঠন মামলার ফেরারী আসামী চট্টগ্রামের বিনোদবিহারী দত্ত ১১ বৎসর পরে ধরা দেন। তাঁহার তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

সমালোচকের দৃষ্টিতে—বিপ্লবী

একজন বিপ্লবীর কথা বলিতেছি। ধৃত হইয়াছিলেন যক্ষ্মা অবস্থায়। আমরা জানিয়াছি, তিনি জেলে থাকিতে তাঁহার যক্ষ্মা সারিয়া গিয়াছে। জেলের আদর যত্ন কি এত বেশী যে সেখানেই তাঁহার যক্ষ্মা ভাল হইল? তাহা নহে। বাহিরে এই যক্ষ্মা লইয়াই যে অনিয়ম, যে পরিশ্রম করিতেন, রৌদ্র বৃষ্টি সমানভাবে মাথায় করিতেন, তাহা জেলে যাওয়ায় বন্ধ হইল। জেলের কঠোরতা, সেলে আটক, প্রভৃতি দুঃখ হইতেও ইহারা বাহিরে থাকিতে বেশী দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেন। সেই স্বেচ্ছায় দুঃখভোগ, সেই দুঃখভোগের নিষ্ঠা, যাহারা দেখিয়াছে—তাহারা জানে, ইহারা সাধারণ মানুষ নহেন। ইহাদের জীবন উন্নত কি না তাহা জানি না, তবে অসাধারণ। আর কাহারও বিবরণ দিব না, দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা এই একজনের কথাই সামান্য কিছু বলিব।

নারদ ভক্তিসূত্রে আছে, ভক্তি নিজেই ফলস্বরূপা। এই প্রেম-ভক্তি মানুষকে আত্মারাম করে। মানুষ ইহার আস্বাদন পাইলে, 'অমৃতো ভবতি' 'তৃপ্তো ভবতি'। কিন্তু ভগবৎপ্রেমে মানুষ আনন্দ অনুভব করে, শ্রেষ্ঠ হয়—'অমৃতো ভবতি'। দেশপ্রেমে, মানুষ তেমন আনন্দ অনুভব করে কি, মানুষ শ্রেষ্ঠ হয় কি, অমৃত হয় কি? প্রেম যাহাকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠুক, তাহার গতি-প্রকৃতি কি একই ধারার? একজন মানুষকে আশ্রয় করিয়া অথবা একটি শালগ্রামশিলা বা ঐ রকম একটা কোন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া যদি মানুষের প্রেম গড়িয়া উঠিতে

পারে, তাহাতে করিয়াই যদি মানুষ মানুষ হইতে পারে, শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে, তবে দেশকে আশ্রয় করিয়া তাহা সম্ভব কি?

বিপ্লববাদী দেশকে ভালবাসে শুনি; শুনি দেশের প্রতি তাহার প্রেম অনন্যসাধারণ, দেশের জন্য সে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতে উদ্যত। এই একনিষ্ঠায় তাহার জীবন উন্নত হইয়াছে কি? ধর্মজীবন লাভ করিলে মানুষ উন্নত হয়। সে উন্নতি আমরা বুঝি—তাহার ত্যাগে, চরিত্রমাধুর্যে, নিষ্ঠায়, ভক্তিতে, স্থৈর্যে। দেশসেবা যদি ধর্ম, আর সেই দেশসেবা যদি খাঁটি হয়, তবে মানুষ কেমনটি হইবে? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জনৈক বিপ্লববাদীকে (ধরুন তাঁহার নাম অনন্তকুমার) পুলিশ রাস্তায় গ্রেপ্তার করে। তিনি তখন যক্ষ্মারোগে ভুগিতে-ছিলেন। অনন্তকুমারকে আমরা কঠোর সমালোচকের দৃষ্টি নিয়া লক্ষ্য করিয়াছি। শুধু এই পরীক্ষা লইবার জন্য যে, ইঁহারা মানুষ হিসাবে কতটা উন্নত হইয়াছেন, তাহা দেখিব। ইঁহাদের জীবনী কেহ লিখিবে না, আমাদেরও লিখিবার উপায় নাই—কারণ কোন অবস্থায়ই লিখিবার অনুমতি মিলিবে না। সেই বিরক্তি আশঙ্কা করিয়াই তাঁহার প্রকৃত নাম দেওয়ার ভরসা হইল না।

অনন্তকুমার ঘর বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছেন। সুদিনে দুর্দিনে তিনি অবিচলিত। যাহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বাহির হইয়াছেন—সেদিকে একৈক-লক্ষ্য। তাঁহাকে সুদিনেও যেমন নীরবে, অবিচলিত চিত্তে, নিরলস ভাবে কর্ম করিতে দেখিয়াছি, দুর্দিনেও তেমনই দেখিয়াছি। ইঁহার ভরসা যে কোথায় বুঝিতাম না। কৃতকার্য হইলেও উৎফুল্ল নহেন, অকৃতকার্য হইলেও অবসাদগ্রস্ত নহেন। কি একটা আনন্দ যেন বুকের মধ্যে জমিয়া আছে! গীতায় আছে, কর্ম্মেই অধিকার, ফলে নহে। সেকথা আমরা যাহারা বলি, সংস্কৃত শ্লোক অনর্গল বলিয়া যাই—সেই আমরা বিফল হইলে ভগ্নমনোরথজনিত দুঃখ যথেষ্ট ভোগ করি! কিন্তু অনন্তকুমারকে গীতার শ্লোক আওড়াইতে শুনি নাই, কিন্তু গীতার ঐ বাণী তাঁহার মধ্যে সার্থক হইয়াছে, দেখিয়াছি।

দলের অর্থ যেন তাঁহার কাছে বুকের রক্ত হইতেও মূল্যবান। অর্থব্যয় সম্বন্ধে এত কৃপণতা, সত্যকার কৃপণ ভিন্ন কেহ করিতে পারে না। সহস্র সহস্র টাকা হাতে আসিয়াছে, কিন্তু নিজে, যে হোটেলে খরচ কম, সেখানেই আহারের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন ছাত্রদের মেসে সাধারণত এক বেলার খোরাক খরচা ছিল তিন আনা। হোটেলে ছিল দুই

আনা। অনন্তকুমার খুব না ঠেকিলে, তিন আনা ব্যয় করিয়া মেসে খাইতেন না। তাঁহার গায়ে দেখিয়াছি একটি শক্ত কোট। সেই একটা কোটই তিনি শীত ও গ্রীষ্মে সমভাবে গায়ে দিতেন। ময়লা হইলে নিজে কাচিয়া লইতেন। সেই কোটেরও গায়ে তালি দেখিয়াছি। অত্যধিক পরিশ্রম করিলে মানুষ এক-আধটু জলখাবার খায়। কিন্তু তাঁহাকে দুই বেলা ভাত খাওয়া ছাড়া আর কিছু খাইতে আমরা দেখি নাই। ভবানীপুর হইতে কলিকাতা প্রায়ই হাঁটিয়া আসিয়াছেন, মোটর ত স্বপ্নের অতীত, ট্রামেও চড়েন নাই। একবার মনে আছে, দারুণ গ্রীষ্মে অনেকটা রাস্তা হাঁটিয়া পার্কের ভিতরে আসিয়া একটু ছায়ায় বসিয়াছেন, মুখে ক্লান্তির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। বলিলাম, 'চলুন ঐ সরবতের দোকানে।' পয়সা তিনি যে ব্যয় করিবেন না তাহা জানিতাম। বলিলাম, 'পয়সা আমার সঙ্গে আছে, চলুন।' অনন্তকুমার হাসিয়া বলিলেন, 'সরবত তো ছেলেমানুষে খায়—আর খায়—যারা নবাব সওকৎজঙ্গ।' ভোগ-বিমুখ অনন্তকুমারকে কখনও ত্যাগের বক্তৃতা দিতে শুনি নাই। কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবনটা, জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার ছিল এই ত্যাগনিষ্ঠায় মণ্ডিত। অথচ কোথাও কোনও আড়ম্বর নাই, কোনও অভিনয় নাই! তিনি কতটা ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন তাহা বুঝিবার সাধ্য কি? একদিনের দুদিনের পরিচয়ে, কথাবার্তায় একটুও পরিচয় পাওয়া যাইবে না। বলিয়াছি, অনন্তকুমারকে বিশেষভাবে সমালোচকের দৃষ্টি নিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলাম—তাই কতকটা জানিয়াছি। একবার তাঁহাকে একটা বাসায় থাকিবার জন্য কয়েকটা টাকা দেওয়া হয়—সে টাকা খুবই সামান্য, তাহাতে কোন রকমে কায়ক্লেশে চলিতে পারে। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হইয়া গেলাম—তিনি ঐ সামান্য টাকা হইতেও টাকা বাঁচাইয়া অন্য একটি বিপ্লববাদীর প্রয়োজনীয় খরচ জুটাইয়াছেন। সহজে সেকথা জানা যায় নাই, অনেক দিন পরে তবে সেকথা বাহির হইয়াছে। 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।' গৌর-ভক্তদের এই লক্ষণ অনন্তকুমারের মধ্যে ষোলআনা দেখিয়াছি। কোন চেষ্টা নাই, অভিনয় নাই, কথা নাই, আড়ম্বর নাই—এ যেন তাঁহার স্বভাবধর্মে পরিণত হইয়াছে। তিনি যেন সবার চাইতেই ছোট; হিমালয় ও ধরণীর মতই যেন তিনি সহিষ্ণু—ভয় নাই, ভাবনা নাই, রাগও নাই। অথচ যে পথে পা দিয়াছেন তাহাতে ভয়, ভাবনা ও রাগের কারণ যথেষ্টই আছে।

কিন্তু প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে ছাড়িবে কেন? শরীরের উপর এত বড় অত্যাচার, অনিয়ম সহিল না। কাসি দেখা দিল। বলা বাহুল্য অনন্তকুমারের কোন medical attendance আসিল না। একটু একটু কাসি বৈ ত' নয়? কত লোকেই ত' কত কাসে! সেই কাসি লইয়াই অনাহার, অনিদ্রা, সাধারণ মানুষের কল্পনাতীত পরিশ্রম।

অনন্তকুমার ফেরারী। পুলিশের নজর এড়াইয়াই তিনি চলেন। তবে বহুদিন হইয়া গিয়াছে, এখন অনেকটা নিরাপদ। অল্প সময়ে বেশী কাজ করা যায় বলিয়া আজকালকার কংগ্রেসকর্মীরা মোটর ব্যবহার করেন, অনন্তকুমারের এই সু-বুদ্ধি তখন জন্মায় নাই। যাহা হউক, অনন্তকুমার পায়ে হাঁটিয়াই, সেই কাসি বুকে লুকাইয়া দিনের পর দিন কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। যখন হাঁটার কাজ থাকে না তখন বাসায় বসিয়া ভাঙ্গা রিভলভারটি বাহির করেন।

কাসি বাড়িয়া উঠিল, হাঁপানির অবস্থা। ক্রমেই বন্ধুবান্ধবদের কাছে ধরা পড়িতে লাগিল। শরীর যে দুর্বল হইতেছে তাহাও আর লুকান সম্ভব নহে। অনুরোধে, তিরস্কারে, শেষে ডাক্তারের কাছে গেলেন। যে ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় ছিল অর্থাৎ টাকা লাগিবে না, সেখানেই গেলেন। বন্ধুবান্ধবেরাও নানা কাজে থাকে। সব সময় এ নিয়া পীড়াপীড়িও করিতে পারে না। সকলের আহার-বিহারেও নিশ্চয়তা নাই। ডাক্তার একটা মিকৃশ্চার দিলেন। দৈনিক চার বার ঔষধ খাইতে হইবে। সপ্তাহখানেক মাত্র ঔষধ খাইয়া একদিন ডাক্তারের কাছে গিয়া অনন্তকুমার বলিলেন, 'ডাক্তার বাবু, এমন একটা ওষুধ দিন, যা' জল দিয়ে খেতে না হয়, গ্লাসেরও দরকার না হয়।' ডাক্তার বুঝিলেন, বুঝিয়া একটা পেটেণ্ট ট্যাবলেট দিলেন। অনন্তকুমারের সুবিধা হইল; ঔষধ খাওয়ার জন্য আর তাঁহার বাসায় ফিরিবার প্রয়োজন নাই। রাস্তায় হাঁটিয়াই ট্যাবলেট মুখে ফেলা যায়। জলের কল ত' রাস্তায়ই আছে। একদিন বলিলাম, 'ওষুধ যে খান না, মারা যাবেন ত' শেষে!' অনন্তকুমার অমনি হাসিয়া বলিলেন, 'হাঁ, মরা গাছের ফল কি না, একটু সর্দি কাসি হ'লেই মারা যায় আর কি? আর, ওষুধ ত' নিয়ম মতই খাই'—বলিয়া পকেট হইতে ট্যাবলেটের শিশি বাহির করিয়া দেখাইলেন। অবাক হইলাম। বলিলাম, 'ডাক্তার বলে নাই rest নিতে?' অনন্তকুমার বলিলেন, 'ডাক্তাররা ত' কতই বলে, না বললে কি ওদের ব্যবসা চলে!' হাঁপানি ক্রমেই বাড়িল, কাসির সঙ্গে রক্তও দেখা দিল। বন্ধু-

বান্ধবেরা ঠিক করিলেন, তাঁহাকে মরিতে দেওয়া হইবে না, জোর করিয়া চিকিৎসা চালাইতে হইবে। বিপ্লববাদীদের হুকুম হইল—তাঁহার হাঁটাহাঁটি বন্ধ করিতে হইবে, ঔষধ খাইতে হইবে, ল— বাবুর তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে থাকিতে হইবে। শিশুকে মানুষ যে রকম শাসন করে অনন্তকুমারের উপর তেমনই শাসন চলিত। অনন্তকুমারের জন্য দুগ্ধের বন্দোবস্ত হইল। ঔষধ পথ্য কতকটা নিয়মিত হইল, শুশ্রূষার জন্য লোক নিযুক্ত হইল। অনন্তকুমার নিরুপায় হইয়া বলিলেন,—'কেবল অপব্যয়।'

কলিকাতায় রোগের কিছুই হইল না, ডাক্তার বায়ু পরিবর্তন করিতে বলিলেন। হাওড়ায় গাড়ীতে ওঠা গেল—বলা বাহুল্য, থার্ড ক্লাসে। গাড়ীতেই দুইবার ফিট হয়। একটু একটু চোখ বুজিয়া থাকেন; কিন্তু বিন্দুমাত্রও হা-হুতাশ নাই। চেঞ্জে গিয়া ঔষধ পথ্যের যথা সম্ভব সুবন্দোবস্ত হইল। অনন্তকুমার বলিলেন, 'আপনারা যে কি করিতেছেন, organisation টাকার অভাবে suffer করিতেছে, নষ্ট হইতেছে, এখানে আমার জন্য এত ব্যয়। Organisationএর স্বার্থের দিক দিয়া এটা অন্যায়!' কিন্তু ল— বাবু এ বিষয়ে শক্ত। অনন্তকুমারকে খোলাখুলিই বলিলেন, 'আপনার এ বিষয়ে কোন মতামত দিবার প্রয়োজন নাই।' কিছুদিন পরে ল— বাবু চলিয়া আসিলেন। যাহারা রহিল তাহারা কতকটা ছেলেমানুষ, তাহাদিগকে অনন্তকুমার বলিলেন, 'সমুদ্র পারে অমনি মানুষ ভাল হয়, অত দুধের দরকার নাই'—দুধের পরিমাণ কমিল। এদিকে কোন চেষ্টাই সফল হইল না, রোগ বাড়িতেই লাগিল। যক্ষ্মার পরিণামে তিনি ক্রমেই দুর্বল হইতে লাগিলেন। কাসির ফিট যখন উঠিত তখন সেই নীরব-কর্মীর দিকে চাহিয়া থাকা বস্তুতই শক্ত হইত। ফিট থামিলেই একটু হাসিয়া ফেলিতেন। যেন কিছুই হয় নাই।

আবার কলিকাতায় আনা হইল, চিকিৎসার চেষ্টা চলিল। এখানে অনন্তকুমারকে তিলে তিলে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি,—দেখিয়া মনে হইয়াছে এই সমাহিত জীবন, এই স্থৈর্য—এই অমানুষিক সহিষ্ণুতা, এই ত্যাগ—কোথা হইতে আসিল? কোনও দিন সাধন-ভজন করিতে দেখি নাই। কিন্তু নিষ্কাম কর্মের ভিতর দিয়া যে অনন্তকুমার স্বভাবতই এই অনাড়ম্বর জীবন লাভ করিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ কি?

মানুষ অনেক দিন রোগে ভুগিলে খিটখিটে হয়; আজ রান্নাটা খারাপ

হইয়াছে, 'খাইতে পারি না,'—সময়মত পথ্যটা না পাইলে রোগী বিরক্তও ত' হয়। কিন্তু এই যে নিদারুণ ব্যাধি, অসহনীয় হাঁপানি ও কাসির যন্ত্রণা, তবু কিন্তু অনন্তকুমার পাথরের মত অবিচলিত। একদিনও শুনি নাই, এটা খাইতে ইচ্ছা করে বা করে না; একদিনও বলেন নাই, ক্ষুধা পাইয়াছে, খাইতে দাও। বাড়ীঘর নহে—ঠাকুর চাকরও নাই। অনভ্যস্ত বিপ্লবকর্মী কেহ রান্না করিতেছে—ডালের সঙ্গে জল মিশে নাই, কোন দিন হয়ত খুবই বিলম্ব হইয়া গেল। কিন্তু রোগীর বিরক্তি নাই—এদিকে যেন তাঁহার খেয়ালই নাই। একদিন অত্যন্ত দেরী হইয়া গিয়াছে, প্রায় একটা বাজে। অনন্তকুমার খাইতে বসিলেন, কিন্তু কেমন করিয়া সেদিন ভাতগুলি সব নষ্ট হইয়া গেল। আবার ভাত বসিল। সেবারত যুবক দুঃখ করিয়া বলিল, বড় দেরী হইয়া গেল।—অনন্তকুমারের কিন্তু একটুও বিরক্তি নাই, চাঞ্চল্য নাই। তিনি যে রক্তমাংসের মানুষ, তাঁহার যে ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত না। অনন্তকুমার হাসিয়াই রহস্য করিয়া বলিলেন, 'রাঁধতে সয় বাড়তে সয় না! আর এক ঘণ্টায়ই হয়ে যাবে, তোমার বুঝি খুব খিদে লেগেছে?'—যুবক আর বলিবে কি? কেবল চরিত্রমাধুর্যে আকৃষ্ট হয়। মানুষের রোগ হইলে, কেহ যদি বাতাস করে, মাথায় হাত বুলায়, ভাল লাগে। অনন্তকুমারের সেই ব্যসনও ছিল না। অনবরত কাসি; কাসির পর রক্ত একটু পড়িল। সেই ফিটের পরে ভয়ানক ক্লান্তও হইতেন; কিন্তু একদিনও বলেন নাই, একটু বাতাস কর। এই যে ফিট উঠিতেছে, তবু একথা কখনও বলেন নাই, আমার কাছে একজন থাক। বরং কোন কাজ থাকিলে বলিয়াছেন, "আমার কাছে থাকার কি দরকার, ওকেই ত' ও-কাজে পাঠান যায়।" একদিন অনন্তকুমার, যে যুবকটি রান্না করে তাহাকে কোথায় পাঠাইয়া তাঁহার একটি ছোট বাক্স আনাইয়াছেন, তাহাতে ছোট-খাট কয়েকটি যন্ত্র থাকিত। দুপুরে যখন কেহই থাকিত না তখন অনন্তকুমার যে পিস্তল মেরামত করিলে কাজ চলে, তাহাই মেরামত করিতে লাগিয়া যাইতেন। অনন্তকুমার জানিতেন যে, ল— বাবু প্রভৃতি এই দুর্বল শরীরে তাঁহার এ কাজে বাধা দিবেন, খুটখাট করিতে দিবেন না। তাই ছেলেটিকে বলিয়া এ সমস্ত লুকাইয়া আনাইয়াছেন, দুপুরটা এই কাজ করিয়াই কাটান। একদিন ধরা পড়িলেন। আর একদিন আমরা আসিতেছি, দেখি আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে একটা গাছের কাছে অনন্তকুমার বুকে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। দেখিয়া শঙ্কিত

হইলাম, ব্যাপার কি ? জেরা করিয়া জানা গেল—আজ পার্কে একজন বিপ্লববাদীর আসার কথা ছিল, তাহাকে বাসায় নেওয়ার উপায় নাই, অন্য কাহারও দ্বারা কাজটি হইবে না, তাই অনন্তকুমার সন্ধ্যায় একা হাঁটিয়া পার্কে আসিয়াছেন। বাসা হইতে একেবারে সবটা আসিতে পারেন না, ক্লান্ত হইয়া পড়েন। পার্ক হইতে ফিরিবার সময় (তখন রাত্রি) কাসির 'ফিট' উঠিয়াছে, আর চলিতে পারেন না—তাই, গাছতলায় বুকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। গালাগালি করা হইল, ল— বাবু বলিলেন, 'আপনাকে নিয়া আর উপায় নাই। একেবারে ছেলেমানুষ !'—অনন্তকুমার আস্তে আস্তে বলিলেন, 'আপনারাও ছেলেমানুষ—এতে কি রোগ সারে ? রোগ অমনি সারে !'—আর একদিনকার কথা বলি। একজন বাড়ী-ঘর-ছাড়া ফেরারীর মা ছেলেকে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। মা জানেন যে, ছেলের খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট। তাই টাকা দিয়া বলিয়াছেন, 'এ টাকা আমার নিজের, একদিন একটু ভাল করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিও।'

উক্ত ফেরারী বিপ্লববাদী কলিকাতায় থিয়েটার দেখে নাই। সেদিন কি কথায় ঠিক হইল—মা যে টাকা দিয়াছেন তাহা হইতে কয়েক টাকা ব্যয় করিয়া থিয়েটার দেখা হইবে—আরও তিনজন যাইবে। যাওয়া হইল। অনন্তকুমার সে খবর পরের দিন পাইয়াছিলেন। অনন্তকুমারের কাছে যাইতেই বলিলেন, 'কি, বাবুদের থিয়েটার দেখা আরম্ভ হয়েছে ?' কতকটা কৈফিয়তের মত আমরা বলিলাম, '— বাবুর মায়ের দেওয়া টাকা হইতেই ব্যয় করিয়াছি। অনন্তকুমার তেমনি ভাবেই বলিলেন,—'মায়ের দেওয়া টাকা হলেই তা অপব্যয় করা যায় না। মায়ের দেওয়া টাকা আরও অন্যভাবে ব্যয় করা যেত।' এই একৈকনিষ্ঠ বীর ভক্তের কাছে সকলেই সেদিন লজ্জিত হইয়াছিলাম।

এমনই যখন তাঁহার শরীরের অবস্থা তখন কলিকাতায় ও ঢাকায়, ১৯১৪ সালের শেষভাগে, প্রধান প্রধান বিপ্লববাদীরা ধৃত হইয়াছেন। অনন্তকুমার ঐ শরীর নিয়াই খাটিতে আরম্ভ করিলেন। ছেলেগুলিকে ভরসা দিতে লাগিলেন। গুরুতর কাজে হাত দিতে অগ্রসর হইলেন। এমনই অবস্থায় একদিন গঙ্গার ঘাটে পুলিশ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

অনন্তকুমার কেমন ধারার মানুষ, আমরা বলিতে চাহি না—তবে যে সাধনায়

মানুষ সমাহিত হয়, আত্মস্থ হয়, আত্মারাম হয়, তৃপ্ত হয় ;—যাহার সন্ধান পাইলে মানুষের ভোগের স্পৃহা থাকে না, রাগ-দ্বেষ থাকে না, লোভ নিঃশেষ হইয়া যায়, সে সাধনা হয়ত তাঁহার ছিল। তবে কখন কোনও ধ্যান-ধারণা বা সাধনা করিতে তাঁহাকে দেখি নাই। তাঁহাকে দেশের লোকে ডাকাত বলিয়া জানে,—বড় জোর, বিপ্লববাদী বলিয়াই জানে।

বিপ্লববাদীর পন্থা নিয়া তর্ক উঠিবে, কিন্তু বিপ্লববাদীর খাঁটি দেশপ্রেম যে তাহাকে মানুষ হিসাবে কি করিয়াছে, তাহা বুঝিলেই বুঝিব—ভগবৎপ্রেম, দেশপ্রেম কোনটাই সহজ নহে ; তখন ভক্তেরই কথা খাঁটি মনে হইবে—

'পীরিতি পীরিতি সব জন কহে,
পীরিতি মুখের কথা।'

আদর্শে, প্রেমাস্পদে কতখানি নিষ্ঠা থাকিলে, এই পীরিতি সম্ভব হয়, কতখানি আত্মবিসর্জনে এই প্রীতির পরিচয় মিলে, আমরা জানি না—সে প্রীতি আমাদের নাই !*

যতীন্দ্রনাথ ও বালেশ্বরের খণ্ডযুদ্ধ

বালেশ্বরের 'ইউনিভার্সেল এম্‌পোরিয়ম্‌' খানাতল্লাসের জন্য ডেনহাম্‌ ও টেগার্ট গমন করেন। বালেশ্বর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ মিঃ কিল্‌বী তদন্তে যোগ দেন। ওখানে যতীনবাবুদের কাহাকেও পাওয়া যায় না। তবে একখানা কাগজে কাপ্তিপোদা লেখা ছিল। কাপ্তিপোদা ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে। মিঃ কিল্‌বী স্থানীয় এস্‌.ডি.ও-কে সঙ্গে লইয়া কাপ্তিপোদা খানাতল্লাস করেন। কাপ্তিপোদার গুপ্ত আশ্রয় স্থান দেখাইয়া স্থানীয় লোক বলে—এখানে বাঙ্গালী বাবুরা থাকেন। কাপ্তিপোদা তল্লাস করিয়া কাহাকেও পাওয়া যায় না। তবে ঐস্থানে বন্দুক ছুঁড়িবার চিহ্ন দেখিতে পান। ঐখানেই মিঃ কিল্‌বী শুনিতে পান, তহিলদার

* প্রথম সংস্করণের জন্য ১৯২০ সালে ইহা লিপিবদ্ধ হয়, এবং প্রথম সংস্করণে যথাস্থানে সংযোজিত হয়। আজ তৃতীয় সংস্করণে বলিতে সক্ষম হইতেছি, কল্পিত অনন্তকুমার—ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী—মহারাজ। সেদিনের বিপ্লবীদের একটা 'টাইপ' হিসাবেই এই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালীবাবুদের দোকান আছে। যতীন্দ্রনাথ কাপ্তিপোদা হইতে থানাতল্লাসের পূর্বে সরিয়া পড়িলেও চিত্তপ্রিয় ও যতীশকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসেন। এইভাবে পাঁচজন (যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন, যতীশ). বুড়িবালাম নদীর তীরে গোবিন্দপুরে আসেন। নদী পার হইবার জন্য নৌকা সংগ্রহের চেষ্টা করেন। নৌকার মাঝি সানি সাহুর কিছুটা সন্দেহ হয়। প্রশ্ন করে—'আপনারা কোথায় যাইবেন?' 'স্টেসনে যাইবেন, তবে নদী পার হইতে চান কেন?' ইতিমধ্যে কিছু লোক জড় হয়। সানি দফাদার ডাকিতে যায়। ক্রমে লোক জমিয়া যায়। যতীনবাবুরা কিছু দূরে গিয়া বসেন। তখন বেলা এগারটা। গ্রামের মাতব্বর রাজ মোহান্তি লোকজন লইয়া তাঁহাদের ধরিতে আগাইয়া যায়। বিপ্লবীদের গুলিতে রাজ মোহান্তি মারা যায়। এই ঘটনার সংবাদ মিঃ কিল্‌বীর নিকট বালেশ্বরে পৌছে। যতীনবাবুরা অতঃপর একটা শুক্‌নো পুকুরের উপর আশ্রয় লন। ঐ স্থানটি অপেক্ষাকৃত উঁচু ও ঝোপ-জঙ্গলে ঘেরা। এদিকে মিঃ কিল্‌বী, সার্জেন্ট রাদারফোর্ড সহ পুলিশ বাহিনী লইয়া দুইদিক হইতে পূর্বোক্ত পুকুরের দিকে অগ্রসর হন। অনুসরণকারী গ্রামবাসীদের কেহ কেহ মিঃ কিল্‌বীকে বলেন, 'ঐ যে কাপড় উড়িতেছে, ঐখানে বাবুরা আছে।' বস্তুতঃ যতীন্দ্রনাথ, পলায়নের পথ নাই ইহা নিশ্চিত বুঝিয়াই সশস্ত্র পুলিশদলকে জানাইয়া দেন তাঁহারা এখানেই আছেন এবং সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। প্রকাশ, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন প্রভৃতি যতীন্দ্রনাথকে বলেন, 'দাদা, আমরা এদের বাধা দিতেছি এবং ধরা দিতেছি, আপনি অন্যদিকে চলিয়া যান।' যতীন্দ্রনাথ বলেন, 'যতীশ রুগ্ন, তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারি না। এখানে আমরা সম্মুখ যুদ্ধেই মৃত্যু বরণ করিব।' বামে রাদারফোর্ডের দল—দক্ষিণে কিল্‌বীর দল অগ্রসর হইতে লাগিল। বিপ্লবীগণ গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষ হইতেই গুলি চলিল। পুলিশের ছিল রাইফেল, বিপ্লবীদের রিভলভার ও মসার পিস্তল। কিল্‌বী ও রাদারফোর্ড আহত হন নাই, তবে তাঁহারা সাক্ষ্যদান কালে বলেন তাঁহাদের আশেপাশেই বিপ্লবীদের নিক্ষিপ্ত গুলি পড়িয়াছে। পুলিশ পক্ষের আর কেহ আহত বা নিহত হইয়াছে কিনা জানা যায় না। চিত্তপ্রিয়ের বক্ষে গুলি বিদ্ধ হয় এবং সে ঐ স্থানেই মৃত্যু বরণ করে। যতীন্দ্রনাথের মাড়িতে, বগলের নীচে গুলি বিদ্ধ হয়। মনোরঞ্জন ও নীরেন অবিশ্রান্ত গুলি ছুঁড়িতে থাকে। মামলায় সাক্ষ্যদান কালে মিঃ কিল্‌বী বলেন—

একজন বিপ্লবী উঠিয়া নিকটবর্তী স্থান হইতে কাপড় ভিজাইয়া জল লইতে চেষ্টা করিতেছে। কিল্‌বী গুলিবর্ষণ করেন না। নীরেন ও মনোরঞ্জন মরিয়া হইয়া গুলিবর্ষণ করিতেছিল। যতীন্দ্রনাথ আদেশ করেন—'যুদ্ধ বন্ধ কর। সাদা নিশান উড়াইয়া দাও।' নীরেন ও মনোরঞ্জন নেতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া দুইখানা সাদা কাপড় উড়াইয়া দেয়। সুস্পষ্ট বুঝা যায়, স্নেহপ্রবণ যতীন্দ্রনাথ তিনটি তরুণকে বাঁচাইবার জন্যই এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

বজ্রাদপি কঠোরাণি
মৃদুনি কুসুমাদপি

এই লোকোত্তর চরিত্রই ছিল বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের।

মিঃ কিল্‌বী ট্রাইব্যুনালের মামলায় বলেন—তিনি নিকটবর্তী হইতেই যতীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি ও চিত্তপ্রিয়ই গুলি করিয়াছি। এই তিনজন লোক সম্পূর্ণ নির্দোষ, আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল মাত্র। আমরা কি করিব তাহারা জানিত না। সমস্ত দায়িত্ব আমার ও আমার লেফটেনেণ্ট চিত্তপ্রিয়ের।' তিনখানা খাটিয়া আনাইয়া যখন আহতদের শোয়াইয়া দেওয়া হয় এবং মনোরঞ্জন ও নীরেনকে গ্রেপ্তার করে তখন যতীন্দ্রনাথ মিঃ কিল্‌বীকে শেষ অনুরোধ করেন—'See that no injustice is done to those boys under the Britishraj, for whatever was done I am responsible.' পরদিন হাসপাতালে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। যতীন্দ্রনাথের কাতর আবেদন রক্ষা করিবার মত ঔদার্য বিদেশী রাজশক্তির ছিল না। বিচারে নীরেন ও মনোরঞ্জনের মৃত্যুদণ্ড হয়। যতীশ রুগ্ন বলিয়া তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, যদিও রাজশক্তি জানিতেন যে ভারতে বৃটিশ রাজশক্তির অবসান ঘটাইবার জন্যই তাহারা লিপ্ত ছিল তথাপি রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা (waging war against king) সাক্ষ্যপ্রমাণের দুর্বলতার জন্যই আনা হয় নাই। ট্রাইব্যুনাল বিচার করিয়াছে—রাজ মোহান্তি হত্যার।

রডা বন্দুক চুরির ব্যাপার

১৯১৪ সালে প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রডা কোম্পানীর বন্দুক অপহরণ একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যতদূর জানা যায় রডা কোম্পানীরই একজন কর্মচারী শ্রীশ সরকার কোম্পানীর সাতগাড়ী বোঝাই মাল জাহাজ-ঘাট হইতে খালাস করিয়া আনিবার সময় পথে এক গাড়ী (মাল সমেত) কৌশলে ভিন্নপথে সরাইয়া ফেলিতে সক্ষম হন। শ্রীশ সরকার নিজের চাকুরী ও ভবিষ্যৎ ক্ষতির নিশ্চিত সম্ভাবনা এবং বিপদের ঝুঁকি লইয়াই ইহা সম্পন্ন করেন। পুলিশ শ্রীশের কোন সন্ধানই পায় না। শ্রীশ সরকার সম্পর্কে অতঃপর কিছুই জানা যায় না। নীরব কর্মীর এই ত্যাগ ও বিপ্লব-নিষ্ঠা অতুলনীয়। রডার বন্দুক অপহরণের পরিকল্পনা ও উহার দায়িত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন কথা শোনা গিয়াছে; পুস্তকেও লিপিবদ্ধ দেখা গিয়াছে। রডার বন্দুক অপহরণ সম্পর্কে শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষ বলেন:—শ্রীশ (সরকার) আসিয়া বলে, বন্দুক ও কার্তুজের বাক্স নির্জন স্থানে রাখিয়া আসিয়াছে। অতুলবাবু ও নরেন্দ্র ভট্টাচার্য রডার ঐসকল অস্ত্র আনিতে উদ্যোগী হন। নরেন্দ্র রাত্রিতে ঐসকল জিনিসপত্র অতুলবাবুদের ২নং শ্রীদামমুদির লেনস্থ বাড়ীতে প্রথম নিয়া আসে। জিনিসপত্রগুলি সত্বর সরান প্রয়োজন। অতুলবাবুদের পরিবারের পুরোহিত হরি ভট্টাচার্য সন্নিকটের বস্তীতে থাকিতেন। ঐখানেই, হরি ভট্টাচার্যের গৃহে, অস্ত্রশস্ত্র রাখা হয়। হরি অতুলবাবুর মাকে মা বলিতেন। কিন্তু হরি ভট্টাচার্যের গৃহে রাখাও নিরাপদ নহে বলিয়া তাঁহারই পরামর্শক্রমে সেরপুরের জমিদার গোপালদাস চৌধুরীর পেনেটির বাগান বাড়ীতে (ঠাকুরবাড়ী) সরান হয়। হরি ভট্টাচার্য ঐ ঠাকুর-বাড়ীর পুরোহিত ছিলেন। বাক্স খুলিয়া মসার পিস্তল ও গুলি বাহির করা হয়। উপরোক্ত পেনেটির বাগান বাড়ীর অর্ধমাইল দূরে ট্যাক্সী করিয়া নেওয়া হয়। সেখান হইতে বিভিন্ন থলিয়ায় ভরিয়া সাইকেলযোগে ঠাকুরবাড়ীতে পৌছান হয়। এই কার্যে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া যায়। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য শেষ রাত্রিতেই সরিয়া যান। অতুলবাবু, অমরবাবু প্রভৃতি প্যাকিংগুলি সব পোড়াইয়া ফেলেন। ভোরের দিকে পুলিশ হানা দেয়; অতুলবাবুদের বাড়ী সার্চ করা হয়। পুলিশ আপত্তিজনক কিছু পায় না।

রডা বন্দুক চুরির ব্যাপারে মলংগা লেনের বিপ্লব-কর্মীদের উপর খুব চাপ

পড়ে। কারণ শ্রীশ সরকারের সঙ্গে মলংগা লেনের অনুকূল মুখার্জী প্রভৃতির যোগাযোগ ছিল। বিপ্লবী নায়ক বিপিন গাঙ্গুলীর আত্মোন্নতির সংস্থাভুক্ত—অনুকূল মুখার্জী, গিরিন্দ্র ব্যানার্জী প্রভৃতিকে 'রডা কেসে' আসামীভুক্ত করা হইয়াছিল। যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গেই অতুলবাবু বলেন :—নরেন্দ্র ভট্টাচার্য ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কিছু করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে। এই সময় যে ভাবেই হউক বৃটিশকে আঘাত করিতেই হইবে,—ভাঙ্গাচোরা রিভলভার যাহা আছে এবং চুরি করিয়া বা সংগ্রহ করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা লইয়াই থানা, ট্রেজারী আক্রমণ করিতে হইবে। 'ইনসারেকশন' গোছের একটা কিছু করা চাই। এই বিষয়ে নরেন্দ্রের আন্তরিকতা ও কর্মপ্রবণতা সম্পর্কে অতুলবাবুর উচ্চ ধারণা ছিল। অবশ্য নরেন্দ্রের এই পরিকল্পনায় যতীনবাবু তখন কোন গুরুত্ব দেন না বলিয়া, অতুলবাবু বলেন। বলা বাহুল্য, জার্মাণ ষড়যন্ত্র তথা জার্মাণ অস্ত্র-সাহায্য লাভের ব্যাপার তখনও দানা বাঁধে নাই।

রডা কেসের অন্যতম প্রধান আসামী হরিদাস দত্ত বন্দুক চুরি সম্পর্কে বলেন :—ছাতাওয়ালা গলিতে শ্রীশ সরকার, আশু রায়, হরিদাস দত্ত প্রভৃতি মিলিত হন—নরেন্দ্র ভট্টাচার্যও ছিলেন। সেই গুপ্ত আড্ডায় রডার বন্দুক অপহরণের কথা হয়। নরেন্দ্রনাথ, ইহা সম্ভব হইবে কিনা এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। শ্রীশ সরকার দৃঢ়তার সহিত বলেন, ইহা সম্ভব। পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রীশ রডার একগাড়ী মাল সরান। এই অপহরণে অংশগ্রহণ করেন হরিদাস দত্ত, আশু রায়, অনুকূল মুখার্জী, কালিদাস বসু প্রভৃতি। মাল ভুজঙ্গধর চৌধুরীর বাড়ীতে নেয় প্রথম। কালিদাস বসু ঘোড়ার গাড়ী চালায়; কালিদাস ও হরিদাস গাড়োয়ান সাজে। বাক্স খুলিয়া বন্দুক ও গুলি বিভিন্ন স্থানে সরানো হয়। অল্প কয়দিন পরেই হরিদাসবাবুকে বাঁশতলা লেনে গ্রেফ্‌তার করা হয়। পুলিশ সেখানে বিশ হাজার টোটা পায়। এই সম্পর্কে হরিদাসবাবুর স্বতন্ত্র অস্ত্র আইনে দুই বৎসর সাজা হয়। বলা বাহুল্য, রডার বন্দুক চুরির মামলায় অপর সকলের সঙ্গেও দুই বৎসর সাজা হয়। হরিদাস বাবু প্রসঙ্গত বলেন—প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকার নিকট তাঁহারা অনেক সাহায্য পাইয়াছেন।

অতুলবাবুর বিবৃতি এবং হরিদাসবাবুর বিবৃতি একত্র পাঠ করিলে কিছুটা

অসামঞ্জস্য মনে হইতে পারে। তবে হরিদাসবাবুর বিবৃতিতেও দেখা যায়, এই ব্যাপারে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য গোড়া হইতে ছিলেন। সুতরাং বন্দুক অপহরণের পরে শ্রীশ নরেন্দ্রনাথকে খবর পাঠাইতে পারেন, (নরেন্দ্রনাথ তখন অতুলবাবুর বাড়ীতেই থাকিতেন) ইহা সম্ভব। ইহাও সম্ভব—এক গাড়ী বাক্সের কতক বাক্স অতুলবাবুদের ওখানে যায় এবং তাঁহারা উহা পেনেটির বাগান বাড়ীতে প্রথম সরাইয়া দেন। হরিদাসবাবু বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের ঢাকা সংস্থাভুক্ত বিশিষ্ট কর্মী,—১৯১৪ সালের পূর্বেই কলিকাতায় আসেন এবং কলিকাতায় বিপিন গাঙ্গুলীর আত্মোন্নতির কর্মীদের সঙ্গে যুক্ত হন।

গৌহাটি খণ্ডযুদ্ধ সম্পর্কে নলিনী ঘোষের বিবৃতির সংক্ষিপ্ত মর্ম ঃ

বিনায়করাও কাপ্‌লের সঙ্গে নাগপুরে দেখা করিয়া জব্বলপুর আসেন (১৯১৬)। এলাহাবাদের রঘুবীর প্রসাদের (রঘুবীর হাবিলদার ছিল এলাহাবাদ কোর্টে) নিকট নলিনীবাবু পত্র দেন, "আমি·········তারিখে······ গাড়ীতে এলাহাবাদ আসিতেছি।" রঘুবীর ছিল সংস্থার Post-Box. কিন্তু ইতিমধ্যে প্যাম্‌ফ্লেটিং (Liberty)-এ রঘুবীর ধৃত হইয়াছে; তাহার নামের পত্র পুলিশ খুলিল। নলিনীবাবু এলাহাবাদ স্টেশনে আসিয়াই ধৃত হন কলিকাতা কীড্‌ স্ট্রীটে আনিয়া অত্যাচার করে। সেখান হইতে পুনরায় নে এলাহাবাদ—উদ্দেশ্য ছিল প্রহারের চিহ্ন দূর করিয়া ফেলা। পরে নিয়া আসে ঢাকা—নারায়ণগঞ্জে। অন্তরীণ আদেশ ভঙ্গের জন্য স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল-এ বিচার হয়। কিন্তু মুক্ত হন। পরে অন্তরীণ আইনে আটক করিয়া 'দলন্দা'য় রাখে দলন্দায় ভোরে ও বৈকালে ১ ঘণ্টা বেড়াইতে দিত। একদিন দলন্দার বেড়াইবার সময় নলিনী অপর বন্দী প্রবোধ বিশ্বাসকে বলেন—'বাইরে যাবে'?—এই বলিয়াই প্রবোধকে নিয়া গেটে আসে। নলিনীবাবুর পরিধানে ছিল (গ্রেফ্‌তারের সময়ও এই পোষাকই ছিল) হাফ্‌ প্যান্ট ও বুট জুতা গেটের সান্ত্রী মনে করে, কোন পুলিশ অফিসার। দলন্দায় তখন Police

Trainig College ছিল—এক অংশে। প্রবোধকে মনে করে (তার ছিল ধুতি পরা) Watcher-guard. নলিনীবাবু গেটে আসিয়াই আদেশের স্বরে বলেন, 'গেট খোল'। সিপাহী তাড়াতাড়ি সেলাম দিয়া গেট খুলিতেই তাঁহারা সরিয়া পড়েন।

নলিনীবাবুরা ২৩শে ডিসেম্বর (১৯১৬) দলন্দা হইতে পলায়ন করেন। এই পলায়নের দরুন সমস্ত সিপাহী ও অফিসারদের সাজা পাইতে হয়। পলায়নের পর নলিনীকান্ত এক আত্মীয় বাড়ী গিয়া কাপড় বদলান—এবং রাত্রিতে নৌকায় কাঁকিনাড়া হইতে চন্দননগরে মতিলাল রায়ের বাড়ীতে যান। মতিবাবুর সঙ্গে পূর্ব হইতেই জানা শোনা ছিল। চন্দননগরের আড্ডায় ক্রমে অনেকে আসেন। অমরেন্দ্র চ্যাটার্জীও ছিলেন (তখন ফেরারী)। নলিনীকান্ত অমরবাবুকে অনুশীলনের গৌহাটি গোপন কেন্দ্রে লইয়া যান।

নলিনীবাবুদের পলায়নের ৪ মাস পরে দলন্দা হইতে প্রবোধ দাশগুপ্ত পলায়। প্রবোধ রাত্রে সেলের কাঁচ ভাঙ্গিয়া পালায়, পরে প্রাচীর টপ্‌কায়। দলন্দায় আটক বন্দীদের hunger-strike-এ প্রবোধ যোগ দেয় না, পলায়নের মতলবেই। বিভিন্ন আড্ডা ঘুরিয়া গৌহাটি কেন্দ্রে গিয়া উপস্থিত হয়।

৭ই জানুয়ারী (১৯১৮)। গৌহাটি, আটগাঁও বাড়ীতে পুলিশের সহিত প্রথম খণ্ডযুদ্ধে বিপ্লবীরাই জয়ী হইয়া বাহির হইয়া যায়। ৯ই তারিখে দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় দিবাভাগে—নবগ্রহ পাহাড়ের কাছে। আটগাঁও বাড়ীতে ছিলেন :— নলিনী ঘোষ, প্রভাস লাহিড়ী, মণীন্দ্র রায়, প্রবোধ দাশগুপ্ত, অমর চ্যাটার্জী। ফাঁসীবাজার বাড়ীতে ছিল—নলিনী বাগচি, তারাপ্রসন্ন দে, নরেন ব্যানার্জী।

স্থির হইয়াছিল ৯ই তারিখে নবগ্রহ পাহাড়ের নিকট সকলে একত্র হইবে। রাত্রের খণ্ডযুদ্ধে অন্ততঃ দশজন পুলিশ আহত হয় বলিয়া নলিনীকান্ত ঘোষ অনুমান করেন। নবগ্রহ পাহাড়ে পুলিশ যখন তিন দিক ঘেরাও করিয়া সন্নিকটে আসিতেছে—তখন নলিনীকান্ত সকলকে বলিলেন, 'আর মায়া মমতা নয়, এবার আমি পুলিশদের আটকাই—তোমরা সব পলাইয়া যাও, তাঁহারা প্রথম আপত্তি করেন। বলেন, আমরাও fight করি। নলিনীবাবু বলেন, fight করিয়া মরা অপেক্ষা পলাইয়া গিয়া কাজ করা আরো ভাল। আর মায়া বাড়ানো নয়, বলিয়াই নলিনীবাবু পুলিশ দলকে গুলি করিতে লাগিলেন। প্রবোধ, নলিনী, তারাপ্রসন্ন, নরেন পলাইতে লাগিলেন।

একটা বিল ধরিয়া যাইতে লাগিল। নরেন্দ্র দৌড়াইতেছিলেন বিলের পাড় দিয়া, পুলিশ এক মাইল দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে ধরে। তারাপ্রসন্ন বিলের জল ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল বহু দূর যাওয়ার পর যখন সে ফিরিয়া দেখিতেছিল, পুলিশ কতদূর—তখন পুলিশের একটা ছর্‌রা আসিয়া তাহার পেটে লাগে। সে মনে করে গুলি ভীষণ লাগিয়াছে। সে পড়িয়া যায় জলেই। নলিনী বাগচি ও প্রবোধ দাশগুপ্ত পলায়নে সমর্থ হয়। নলিনী ঘোষকে গুরুতর জখম অবস্থায় পাহাড়ের পাদদেশেই গ্রেফ্‌তার করে। তার হাতে ছিল ৩৮০ বোরের রিভলভার।

এই সম্পর্কে গৌহাটি যুদ্ধে লিপ্ত বর্তমানে বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনের হিসাবরক্ষক মণীন্দ্র রায়ের বিবৃতি এইরূপ :—আটগাঁও আশ্রয়কেন্দ্রে অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী পাদ্রীর ছদ্মবেশে ছিলেন ; পাদ্রীদের আলখাল্লা—বুকে ক্রশ চিহ্ন। মিলিত যুগান্তর দলের সতীশ চক্রবর্তীও ছদ্মবেশে ছিলেন। গৌহাটির সংঘর্ষের পূর্বে সতীশবাবু অন্যত্র যান। তাই সংঘর্ষে তিনি ছিলেন না। আটগাঁও বাড়ীতে ২৪ ঘণ্টাই পলাতক বিপ্লবীরা পাহারা দিত। ঘটনার রাত্রিতে—রাত্রি ২॥টায় মণীন্দ্র ছিল পাহারায়। 'ঠক্ ঠক্' শব্দ হইতে মণীন্দ্র লক্ষ্য করিয়া দেখিল, বাড়ী পুলিশ ঘেরাও করিতেছে। পুলিশের কর্তা ফেয়ারওয়েদার সাহেব দরজায় ঘা দিয়া বলেন, খোল, খোল, দরজা খোল! ইতিমধ্যে নলিনীকান্ত সকলকে বলেন, ফল্ ইন্। বিপ্লবীরা শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হয়। সংগ্রাম—মৃত্যু-বরণই স্থির হয়। ফেয়ারওয়েদার চিৎকার করিয়া বলেন, Open please. নলিনীকান্ত উত্তরে বলেন, —it is open, enter and be killed. বলিয়াই নলিনীবাবুই প্রথম গুলি বর্ষণ করেন। তখন উভয় পক্ষে সমানে গুলি বিনিময় হইতে থাকে। ফেয়ারওয়েদার বিপ্লবীগণের এককালীন এতোটা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বোধ হয়। বেগতিক বুঝিয়া সাহেব দলবল লইয়া সরিয়া পড়েন। মনে হইল, পুলিশ দূরে সরিয়া গিয়াছে ; আবার অধিক সংখ্যায় আসিবে। তখন সকলে উপরে গিয়া ঠিক করিলেন, ধরা দেওয়া হইবে না। গুলি নিঃশেষ হইবার পূর্বেই মরিতে হইবে। এমনই সময় সহসা মনে হইল পলায়ন সম্ভব। বাড়ীর উত্তর দিক দিয়া এক খাসিয়া বুড়ীর বাড়ীর ভিতর দিয়া—প্রথম মণীন্দ্র, পরে আর সকলেই পলাইয়া যায়। অমরেন্দ্রবাবু যাহাতে নিরাপদে গৌহাটি ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন

তাহার ব্যবস্থা করা হয়। মণীন্দ্র রায়ের পায়ে গুলি লাগে। এই জখম দেখিয়াই ১০ই জানুয়ারী একটা শ্মশানে মণীন্দ্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। প্রভাস লাহিড়ীও গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পরে কামাখ্যা মন্দিরে ধৃত হয়। মণীন্দ্র বলেন—মসার পিস্তলের কার্তুজ ৩৮০ বোর পিস্তলে ভরিয়া তাহারা গুলি করে। গুলি গরম করিয়া লইবার কালে প্রবোধ দাশগুপ্ত আহত হইয়াছিল। মামলায় সরকারী বিশেষজ্ঞ বলেন—মসারের গুলি পিস্তলে ভরা সম্ভব নহে। কিন্তু সত্য সত্যই বিপ্লবীরা তাহাই করিয়াছিল।

মামলায় পুলিশ ইন্‌সপেক্টার সাক্ষ্যদান কালে বলেন, গৌহাটির খণ্ড যুদ্ধে পুলিশের ৩০ জন আহত হয়। মামলায় নলিনীকান্ত ঘোষ (৭ বৎসর), তারাপ্রসন্ন ও নরেন্দ্র ব্যানার্জী (৫ বৎসর), মণীন্দ্র ও প্রভাস (৩ বৎসর) কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা

সীতানাথ দে, প্রভাত চক্রবর্তী, পরেশ গুহ, জীতেন গুপ্ত, হরিপদ দে, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত প্রভৃতিকে লইয়া আন্তঃপ্রাদেশিক মামলা আরম্ভ হয়। এই মামলায় ২৫০ জনের উপর যুবক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও ব্রহ্মদেশে ধৃত হয়। তন্মধ্যে ৪০ জনকে আসামী শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

অনুশীলন সমিতির কর্মীবৃন্দই এই ষড়যন্ত্র মামলার আসামী। এই মামলার বিবরণীতে উক্ত হইয়াছে:—'অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীগণ বাঙ্গলার বাহিরের পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, ব্রহ্মদেশ ও মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের বিপ্লবীদের যোগাযোগে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। বাঙ্গলার বাহিরে Hindusthan Socialist Republican Association নামক বিপ্লব সমিতি কাজ করিতেছিল। এই হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান সমিতি পূর্বোক্ত অনুশীলনেরই অঙ্গ।......১৯৩২ সালে হিজলী বন্দীশালার ঘটনার প্রথম স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে 'স্বাধীন ভারত' গোপন ইস্তাহার ভারতের সর্বত্র বিতরিত হয় ('we find a wide distribution all over India of revolutionary leaflets known as the 'Swadhin Bharat leaflet').

অন্তরীণ আদেশ ভাঙ্গিয়া পলাতক প্রভাত চক্রবর্তী প্রভৃতির বিপ্লব সংস্থা কর্তৃকই ইহা প্রচারিত হয়। 'স্বাধীন ভারত' সম্পর্কে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী ধৃত হয়। একখানা পত্রে দেখা যায় উত্তরবঙ্গে ঐ সময়ে অনুশীলন সমিতির ব্যাপক সংস্থা ছিল। পূর্বোক্ত প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী জলপাইগুড়ি জেল হইতে মেদিনীপুর জেলে স্থানান্তরিত হইবার সময় বেরামপুরের নিকটে ট্রেণ হইতে পলায়ন করে। ১৯৩৩ সালে হিলি স্টেশন ডাকাতিতে পুনরায় ধৃত হইরার পূর্বে তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। দেখা যায়, এই সময়ে সীতানাথ দে, ধীরেন ভট্টাচার্য পাঞ্জাবে বিপ্লব আয়োজনে তৎপর রহিয়াছে। আরো দেখা যায়, আসামী শ্যামবিহারীলাল শুক্লা পূর্বোক্ত সীতানাথের সঙ্গে সাজাহানপুরে বিপ্লব সংস্থা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করিয়াছে (১৯৩২ সাল)।'

অমৃতসরের ছাত্র শিবনারায়ণের বাড়ী তল্লাস করা হয়। তল্লাসে ধীরেন ভট্টাচার্যের লিখিত এক পুস্তিকা পাওয়া যায়, তাহাতে ষড়যন্ত্রের কর্মনীতির উল্লেখ থাকে। পূর্বোক্ত সীতানাথ দে ১৯৩৩ সালের প্রথমভাগে মাদ্রাজ গমন করে। পাঞ্জাব হইতে সীতানাথ কয়েকজন সঙ্গী লইয়া যায়। অমৃতসরের রোশনলাল, নিত্যানন্দ প্রভৃতি সীতানাথের প্রেরণায় হায়দ্রাবাদ ও গোয়ালিয়র হইতে কিছু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে। এবং ইহারাই দিবাভাগে মাদ্রাজ Ooty Bank আক্রমণ করিয়া তিন হাজার টাকা লুণ্ঠন করে। এই সম্পর্কে নিত্যানন্দ, খুশীরাম পরে ধৃত হয়। অপর সঙ্গীরা মাদ্রাজে আত্মগোপন করিতে সক্ষম হয় এবং বোমা নির্মাণে আত্মনিয়োগ করে। পূর্বোক্ত রোশনলাল বোমা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে রেল লাইন পার হইবার সময় পড়িয়া যায় এবং গুরুতররূপে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহা ছাড়াও মাদ্রাজে পুলিশের উপর আরেকটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বাঙ্গলার পুলিশ অনেকদিন পরে উপলব্ধি করে যে মাদ্রাজে পূর্বোক্ত বিপ্লব অনুষ্ঠান বাঙ্গলা দলের যোগাযোগে হইয়াছে। ধীরেন ভট্টাচার্যকেও লাহোরে গ্রেপ্তার করা হয়। কলিকাতার ১১নং শীতলা লেনে cipher-এর বা সংকেতলিপির তালিকায় দুইটি পাঞ্জাবী যুবকের নাম পাওয়া যায়। তাহাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই ষড়যন্ত্র শুধু বাঙ্গলায় সীমাবদ্ধ নহে, অন্যান্য প্রদেশেও ইহার অস্তিত্ব দেখা যায় ('The conspiracy was not a mere local affair but it had its adherents in every province')। এই ষড়যন্ত্র মামলায় ঢাকা জেলার আড়াইহাজার-নিবাসী

জীতেন্দ্রনাথ সাহা অন্যতম সরকারী সাক্ষী হয়। এই সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে সে কি ভাবে বিপ্লব দলে যোগদান করে তাহা বিবৃত করে এবং নিরঞ্জন ঘোষাল, পরেশ গুহ, প্রভাত চক্রবর্তী, হরিপদ, পূর্ণানন্দ, অমূল্য সেন প্রভৃতি বহু বিপ্লবীকে জড়ায়। এই দলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলে—'The object of our party was to achieve independence for India by an armed rising'. প্রভাত চক্রবর্তী তথা 'মাষ্টার মশায়' দলের নেতা বলিয়া জীতেন্দ্র বলে। জীতেন ইহাও স্বীকার করে, এই দলে সে অন্তরঙ্গ সদস্য ছিল না (inner circle member)। ইহাও বলে, প্রেসিডেন্সী জেল হইতে পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, সীতানাথ দে প্রভৃতি নায়কগণকে পলায়নে সাহায্য করিবার জন্য গাড়ী, দড়ির মই এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। এই পলায়নের পরিকল্পনা করে পরেশ গুহ এবং উক্ত উদ্দেশ্যে জেলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। কাঁকুড়গাছির গুপ্ত অস্ত্রশালা সম্পর্কেও জীতেন বিবৃতি দান করে। ইহাও বলে—আমাদের দলে কতক সদস্য গোপনে অস্ত্র-আমদানীকারিগণের (স্মাগলার) সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। ইহা ছাড়া বোমা তৈরী করা হয়। একই সময়ে ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করা হয় ('The armed rising we were planing was to take place all over India at the same time').

বিচারকগণ বলেন,—সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায় ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে অনুশীলন সমিতির কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে। ঢাকা শাখা কলিকাতা কেন্দ্রের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হইয়াছে। সাক্ষ্যপ্রমাণে ইহাও দেখা যায় নরেন ঘোষ, সত্য ঘোষ টাঙ্গাইলে ১৯২৬-২৭ সালে বিশেষভাবে কর্মতৎপর রহিয়াছে। নরেন ঘোষকে পার্টির নেতাগণ অস্ত্রসংগ্রহের জন্য বার্মায় পাঠায়। বিচারকগণ পাঞ্জাব দল সম্পর্কে বলেন—সীতানাথ দে ও ধীরেন ভট্টাচার্য অনুশীলন দলের প্রতিনিধিরূপে পাঞ্জাব গমন করেন এবং সংস্থা গড়িয়া তোলেন। সীতানাথ পাঞ্জাবে সাধুবেশে ছিলেন বলিয়া সাক্ষী বলে। অপর সাক্ষী পাঞ্জাবী ছবি দত্ত বলে, ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে সে ভলাণ্টিয়ার ছিল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জি. ও. সি. আমিরচাঁদ গুপ্তের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। তাহার মাধ্যমে মনসা সিং-এর সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘটে। (১৯৩১ সালে মিয়ানওয়ালি ডাকাতি কেসেই এই মনসা সিংহের ফাঁসি হয়)। ভারতে বিপ্লবের জন্য

সাক্ষীকে কিছু কাজ করিতে মনসা সিং বলেন। সাক্ষী তদনুযায়ী পণ্ডিত দয়াচাঁদের নিকট গমন করে এবং বিপ্লবদলের সন্ধান করে। পণ্ডিত দয়াচাঁদ অমৃতসরে একজন ব্রহ্মচারীকে দেখায় এবং বলে, ইনি বাঙ্গালা হইতে আসিয়াছেন। এই ব্রহ্মচারীই সীতানাথ দে। কলিকাতার ১১নং শীতলা লেনে সাংকেতিক লিপিতে প্রাপ্ত তালিকায় এই পণ্ডিত দয়াচাঁদের নাম পাওয়া যায়। সাক্ষী অতঃপর সীতানাথ দ্বারা বিপ্লবী দলভুক্ত হয়। এই মামলার অন্যতম প্রধান আসামী পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত সম্পর্কে বিচারকগণ বলেন যে, পূর্ণানন্দ বরাবর কারারুদ্ধ থাকিয়াই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।—দেখা যায় সাংকেতিক লিপি হইতেই পুলিশ অনেক সন্ধান পায়।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৩৬ সালের অক্টোবরে স্পেস্যাল ট্রাইব্যুনালে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার বিচার আরম্ভ হয়। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে বিচারকগণ রায় দেন। প্রীতিরঞ্জন দাশ পুরকায়স্থ, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত ওরফে প্রবীর, শান্তিরঞ্জন সেন, প্রফুল্লকুমার সেন ওরফে সত্যবাবু, কানুদা, মণিদা, মণীন্দ্র রায়, সেজদা, মনোরঞ্জন বোস, নিরঞ্জন রায়, জগৎ, ফাল্গুনী, অরুণ (দেখা যায় প্রফুল্ল দীর্ঘকাল ফেরারী থাকিয়া বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন সময়ে উপরোক্ত দশটি ছদ্মনামে পরিচিত হইয়াছিলেন) ; পারুল মুখার্জী ওরফে নীহার, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, শ্যামবিনোদ পাল-চৌধুরী ওরফে সুরেশ, প্রণবকুমার রায়, কালিপদ ভট্টাচার্য ওরফে মৌলভী, হরেন্দ্রনাথ মুন্সী, বিভূতি দত্ত, নিরঞ্জন ঘোষাল, ধনেশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি ২৯ জনের বিচার হয়।

মামলায় আসামীগণের বিরুদ্ধে কঠোর দণ্ডাদেশ হয়।

আন্তঃপ্রাদেশিক মামলা চলিবার কালে যে সব বিপ্লবকর্মী বাহিরে থাকিয়া সংস্থার কাজ চালাইতেছিলেন, এবং যাঁহারা উক্ত মামলার ফেরারী আসামী ও যাঁহারা আন্তঃপ্রাদেশিক মামলা চলাকালেই আলীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে পলায়ন করেন—তাঁহাদের কতককে লইয়াই টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা। টিটাগড় গোপনকেন্দ্রে ২০।১।৩৬ তারিখে খানাতল্লাস হয় এবং পারুল মুখার্জী সহ পূর্ণানন্দ ও শ্যামবিনোদ ধৃত হয়। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার অনেক উপাদান

এই সূত্রে আবিষ্কৃত হয়। এই মামলায় প্রকাশ পায় যে, ২০।১২।৩৪ তারিখে ব্যারাকপুরের মহকুমা হাকিম একখানা বেনামী চিঠি পান। উহাতে এইরূপ লেখা ছিল—টিটাগড়ের একটি বাড়ীতে একজন আধুনিক তরুণী একা রহিয়াছে এবং ঐ গৃহে অনেক তরুণ রাত্রিতে যাতায়াত করে। মহকুমা হাকিম এই সন্দেহযুক্ত বাড়ীতে অনুসন্ধান করিতে নির্দেশ দেন (জানুয়ারী, ১৯৩৫)। কিন্তু টিটাগড় পুলিশ বাড়ীটি সন্দেহযুক্ত মনে করিলেও থানার কয়েকজন পুলিশ লইয়াই তল্লাস করিতে সাহসী হয় না। অধিক সংখ্যক পুলিশের প্রয়োজন বোধ করে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ২০।১।৩৬ তারিখে উক্ত গৃহ ঘেরাও করে এবং তল্লাস আরম্ভ করে। উক্ত বাড়ীতে যে সকল বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ছিল এবং কাগজপত্র ছিল তাহা পারুল মুখার্জী অনেকটা নষ্ট করিতে সক্ষম হয়। পুলিশ যতটা হস্তগত করিতে সক্ষম হয় তাহা হইতে এবং অন্যান্য সূত্রে অপর আসামীদের ধরিতে সক্ষম হয়। বলা বাহুল্য, আসামীগণ সকলেই ঢাকা অনুশীলন সমিতির সদস্য এবং কেহ কেহ আন্তঃপ্রাদেশিক মামলার ফেরারী আসামী। প্রকৃত প্রস্তাবে আন্তঃপ্রাদেশিক ও টিটাগড় ষড়যন্ত্র এক ষড়যন্ত্রেরই দুইটি অংশ বলা চলে।

বাঙ্গালার বাহিরে বিপ্লবপ্রচেষ্টা

বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা শুধু যে বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকে নাই, বাংলার বাহিরেও যে তাহা সক্রিয় ছিল—তাহা দিল্লী, লাহোর, বেনারস এবং পরবর্তী কাকোরী ও আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণী হইতেই প্রমাণিত। বাংলার বিপ্লবীগণ বাংলার বাহিরে, বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যেই শুধু সংগঠন চালায় নাই। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে স্থানীয় অধিবাসী যুবকগণকেও তাঁহারা দলভুক্ত করিয়াছেন। ষড়যন্ত্র মামলাগুলিতেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ষড়যন্ত্রের স্থান যদিও দিল্লী-লাহোর-বেনারস ও অন্যত্র তথাপি ষড়যন্ত্রের সংগঠন, প্রেরণা ও নেতৃত্ব করিয়াছে বাংলার বিপ্লবীগণ।

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী দীননাথের স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ পায় রাসবিহারী বসুই (তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেফ্‌তারী ওয়ারেণ্ট বাহির হয়) ছিলেন

ষড়যন্ত্রের নেতা। বড়লাটের জীবন নাশের চেষ্টা, (১৯১২, ২৩শে ডিসেম্বর), লাহোর লরেন্স উদ্যানে সিলেটের কুখ্যাত গর্ডন সাহেবকে হত্যার চেষ্টাও (১৯১৩, ১৭ই মে) দিল্লী ষড়যন্ত্রের 'কর্ম' বলিয়া ধার্য করা হয়। অনুশীলনের বিশিষ্ট ফেরারী কর্মী অমৃত হাজরার রাজাবাজার বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া একটি সাঙ্কেতিক লিপি পুলিশ হস্তগত করে। উহাতে দিল্লীর আমিরচাঁদ ও আবেদবিহারীর নাম ঠিকানা পাওয়া যায়। এই মামলায় আসামীগণের সকলেরই সাজা হয়। আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ, আবেদবিহারী এবং বসন্ত বিশ্বাসের (অল্প বয়স বলিয়া বসন্তের প্রথম যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ হয়, সরকার পক্ষের আপীলের ফলে ফাঁসির হুকুম হয়) ফাঁসি হয়। বলরাজের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিষয়-বস্তু :—১৯১৪ সালে, যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই গদরপার্টির ও বিদেশস্থ ভারতীয় বিপ্লবীগণের উদ্যোগে যাঁহারা ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাইতে আসিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে পিংলে, কর্তার সিং প্রভৃতি রাসবিহারীর সঙ্গে যুক্ত হন। সেনাবাহিনীর মধ্যে ইতিপূর্বেই সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাইবার কাজ আরম্ভ হয়। রাসবিহারীর নেতৃত্বে বাঙ্গালী বিপ্লবী শচীন সান্ন্যাল, নগেন্দ্র দত্ত (গিরিজা), নলিনী মুখার্জী, বিভূতি হালদার প্রভৃতি এবং কর্তার সিং, পিংলে, দামোদর স্বরূপ, ভাই পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে এই কার্যে লিপ্ত ছিলেন। মুন্না সিং ও সুচা সিং রাজসাক্ষী হয়। ১৯১৫ সালে উপস্থিত ধৃত আসামীদেরই বিচার হয়। ১৯১৫ সালের নভেম্বরে ৬১ জনকে দায়রা সোপর্দ করা হয়। কিন্তু সেশনে বিচার আরম্ভ হয় ১৯১৬ সালের এপ্রিলে। সেপ্টেম্বরে রায় বাহির হয়। ২৪ জনের ফাঁসির হুকুম হয়। ২৭ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বাকি আসামীদের ১০।৭।৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দান করা হয়। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ২৪ জনের মধ্যে ১৭ জন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর হস্তক্ষেপে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। গণেশদত্ত পিংলে, বিষেণ সিং, জগৎ সিং, সুরণ সিং (পিতা বীর সিং), সুরণ সিং (পিতা ঈশ্বর সিং), হরনাম সিং, কর্তার সিং এই সাতজনের ফাঁসি হয়। ইহারা অনুকম্পা ভিক্ষা করেন নাই। বলবন্ত সিং, হরনাম সিং তুন্দা, কেদার সিং, কুসল সিং, নন্দন সিং, পৃথ্বী সিং, রুড়ু সিং, দেওয়ান সিং, সোহন সিং, ওয়াসন সিং, ভাই পরমানন্দ, পরমানন্দ, হির্দেরাম, জগ্নিৎরাও, রামশরণ দাস যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করেন।

এই মামলার রাজসাক্ষী মুন্না সিং সাক্ষ্যে বলেন :—কোমাগাটা মারুর যাত্রীদের উপর ভীষণ অত্যাচারের কথা শুনিয়া আমরা উত্তেজিত হই—এবং আমেরিকা হইতে ভারতে আসিয়া বিদ্রোহ ঘটাইবার জন্য রওনা হই। ভারতে আসি। অমৃতসরে আসিয়া নেতা রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহ করার কথা বলেন এবং একটি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত স্বাধীন ভারতের পতাকার (লোহিত, সবুজ ও নীল) পরিকল্পনা প্রদান করেন।

রাজসাক্ষী সুচা সিং মিরাট, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ, বেনারস, ফিরোজপুর, আম্বালা সেনাব্যারাকে সৈন্যদের বিগড়াইবার জন্য কিভাবে বিপ্লবী দল কাজ করিয়াছে তাহার বর্ণনা দান করেন।

ইহার পর আরও একটি মামলা, লাহোর অতিরিক্ত ষড়যন্ত্র মামলা, দায়ের করা হয়। এই অতিরিক্ত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ১০০ জন, ফেরারী ছিলেন আরও ১২ জন। এই মামলার বিচার আরম্ভ হয় ১৯১৫ সালের ২৯শে অক্টোবর। এই মামলাতেও রাসবিহারী বসু ফেরারী আসামীগণের অন্যতম। এই মামলায় ১৬ জন রাজসাক্ষী দাঁড়ায়। রাজসাক্ষী সকলেই শিখ। বিদ্রোহ করা, বিদ্রোহ সফল করিবার জন্য ট্রেজারী লুঠ, ওয়ালক্যানেল সেতু ধ্বংস করিবার উদ্যম, হত্যা। এই সেতু ধ্বংসকালে ধৃত পাঁচজন বিপ্লবীরই ফাঁসি হইয়াছে।

ইহার পর ১৯১৭ সালে লাহোরে দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র মামলা বলিয়াও একটি মামলা দায়ের করা হয়।

বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা—শচীন সান্যাল ১৯১৫ সালের জুন মাসে ধৃত হন। শচীন্দ্রকে ষড়যন্ত্রের প্রধান আসামী করিয়া মামলা আরম্ভ হয়। এই মামলায় দণ্ডিত ব্যক্তিগণ দামোদর স্বরূপ, গণেশ লাল, নলিনী মুখার্জী, প্রতাপ সিং, লছমী নারায়ণের ৫ বৎসর করিয়া ; আনন্দ ভট্টাচার্য, বঙ্কিম মিত্র, কালীপদ'র ৩ বৎসর করিয়া, এবং জিতেন সান্যালের দুই বৎসর কারাদণ্ড হয়। এই মামলার আসামীগণ রাজার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাইবার বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিয়াছিল বটে, তবে লাহোর ও দিল্লীর মত হত্যাকাণ্ড ঘটায় নাই,—তাই ইহাদের লঘু সাজা দেওয়া হইল বলিয়া বিচারকগণ রায়ে মন্তব্য করেন। কিন্তু শচীন সান্যালের উপর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হয়। রায় বাহির হয় ১৯১৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী। শচীন্দ্র ১৯২০ সালে—সম্রাটের ঘোষণায়

পর—মুক্তিলাভ করেন। মামলার বিষয়বস্তু :—সেনা-ব্যারাকে অসন্তোষ সৃষ্টি, সৈন্যগণকে বিদ্রোহ করিতে উত্তেজিত করা, বোমা তৈরী, রাজদ্রোহমূলক পুস্তিকা প্রভৃতি প্রচার।

বেনারস মামলায় বিচারক রায়ে বলেন :—'কাশীর ষড়যন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যাপার নয় ; দিল্লী, লাহোর ও কাশী ষড়যন্ত্র একই ভারতব্যাপী বিদ্রোহ ঘটাইবার প্রয়াসের অভিব্যক্তি। রাসবিহারী নেতা, কাশীর কাজে শচীন্দ্র রাসবিহারীর প্রধান সহচর। শচীন্দ্র ঢাকা অনুশীলন সমিতির সহিত সংযুক্ত ছিল।'

* * * *

তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা—বাংলার দধীচি বীর যতীন দাস ১৯২৯ সালের লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় (ইহা তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা) অন্যতম আসামী ছিলেন। দক্ষিণ কলিকাতার তরুণ যুবক যতীন দাস কেমন করিয়া উত্তর ভারতের বিপ্লব-ষড়যন্ত্রে যুক্ত হইলেন তাহা বুঝিতে হইলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অনুধাবন করিতে হইবে। যতীন দক্ষিণ কলিকাতার তরুণ বিপ্লবী কর্মী। দক্ষিণ কলিকাতার অন্যতম বিপ্লবী কর্মী সুনীল ব্যানার্জীর মাধ্যমে তিনি প্রতুল গাঙ্গুলী, ও ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজের) সঙ্গে পরিচিত হন, এবং সংস্থাভুক্ত হন। এই সংস্থার মধ্য দিয়াই শচীন সান্যালের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ মেলামেশা ঘটে। পরবর্তীকালে ভগৎ সিংএর সঙ্গে যতীনের পরিচয় ঘটে। ভগৎ সিং কিভাবে বিপ্লব সংস্থায় যোগদান করেন—অন্যত্র তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লাহোরের এই মামলায় বেতিয়ার (বিহার) অধিবাসী ফণীন্দ্র ঘোষ সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, ১৯১৬ সালে তিনি অনুশীলন সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। অন্তরীণেও আটক ছিলেন। ফণীন্দ্র ভগৎ সিংএর সঙ্গে কলিকাতা আসেন।

যতীন ও ভগৎ সিংএর মামলার ব্যাপারে একটি অনন্যসাধারণ ত্যাগ-নিষ্ঠ বিপ্লবী চরিত্রের সাক্ষাৎ মিলে। এই চরিত্র রামশরণ সিংয়ের।

রামশরণ সিং প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। মুক্ত হইয়া তিনি কলিকাতা আসেন এবং অনুশীলন দলের বিশিষ্ট কর্মীদের তখনকার (১৯২৮) মেস্-বাড়ীর (১৬৪ বৌবাজার স্ট্রীট—কলিকাতা) নীচের তলায় একটি কামরায় থাকেন এবং ছোটখাট মেরামতি কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। রামশরণ সিং পাঞ্জাবী। সন্দেহক্রমে তাঁহাকে এই মামলায় ধৃত করা হয়। রামশরণ সিং

পুলিশের নিকট নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেন :—'১৯২৮ সালে ১৬৪নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে কেদারেশ্বর সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেনের সঙ্গে দেখা করিয়া বোমা পিস্তল লইয়া পুনরায় সন্ত্রাসমূলক কাজ করার প্রস্তাব করি। কিন্তু অনুশীলনের ঐ সকল নেতৃবৃন্দ বলেন যে তাঁহারা বর্তমানে নীতি হিসাবে স্থির করিয়াছেন—হিংসামূলক কোন কার্য করিবেন না। বর্তমানে কংগ্রেসের মধ্যে এবং শ্রমিক-কৃষকের মধ্যেই কাজ করিবেন। তবে তাঁহারা যদি কিছু করিতে চান, ভগৎ সিং যতীন দাস প্রভৃতিকে লইয়া, তাঁহাদের নিজ দায়িত্বে তাহা করিতে পারেন। এই "অনুমতি" পাইয়া ভগৎ সিংকে তিনিই দিল্লী পরিষদে বোমা নিক্ষেপ করিতে প্রেরণ করেন। এইজন্য দায়ী তিনি-ই।' প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তিনি—রামশরণ সিং—ভগৎ সিংদের পাঠান নাই। শুধু ভগৎ সিং প্রভৃতি তরুণ কর্মীদের বাঁচাইবার জন্য এইপ্রকার একরার করেন। তিনি এই একরারের সমর্থনে যুক্তি দিতেন :—'আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার বাঁচিয়া কি হইবে, কিন্তু ইহারা বাঁচিলে দেশ স্বাধীন করিতে পারিবে।' এই আকাঙ্ক্ষা ও মনোবৃত্তিকে কি আখ্যা দিব ?

রামশরণ সিং ১৬৪নং বৌবাজারে ছিলেন ইহা সত্য। একটা কিছু করিবার জন্য অনুশীলনের নেতৃবৃন্দের নিকট অস্ত্র চাহিতেন, ইহাও সত্য। ভগৎ সিং ও যতীন দাস (ফণী ঘোষও সঙ্গে ছিল) ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও প্রতুল গাঙ্গুলী প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করেন, ইহাও সত্য (সেই সাক্ষাতের বিবরণ অন্যত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে); কিন্তু ভগৎ সিং ও যতীন দাসের কর্ম-সিদ্ধান্তের কথা রামশরণ সিং জানিতেন না। কতকটা অনুমান করিয়াই উপরোক্ত একরার করেন।

* * * *

লাহোর ১ম ষড়যন্ত্র মামলার ফেরারী আসামী ছিলেন কৈলাশপতি। ১৯২৯ সালে ২৮শে অক্টোবর তাঁহাকে দিল্লীতে গ্রেফ্‌তার করা হয়। যে বাড়ীতে তিনি ধৃত হন, সেখানে ৪টি বোমার খোল, একটি পিস্তল, বোমা তৈয়ারীর মালমশলা প্রভৃতি এবং অনেক রাজদ্রোহকর পুস্তিকা পাওয়া যায়। যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য সেখানে মিলিয়াছিল—বিশেষজ্ঞের মতে তাহা ৬শত বোমার পক্ষে যথেষ্ট। লাহোর দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯২৯) এই কৈলাশপতি পুলিশের অত্যাচারে রাজসাক্ষী হন। রাজসাক্ষী হইয়া তিনি নিম্নোক্ত কথা বলেন :—'বাংলার দলের সঙ্গে পূর্বে যে যোগাযোগ ঘটিয়াছিল তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অতঃপর ছিন্ন

যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বাংলার দল হইতে হীরেন্দ্র মজুমদার দিল্লীতে প্রেরিত হন। এই হীরেন্দ্রই কৈলাশপতি প্রভৃতিকে প্রতুল গাঙ্গুলীর সহিত আলাপ করাইয়া দেন (এই তরুণ কর্মী হীরেন্দ্র ঢাকার সুবিখ্যাত জননায়ক বীরেন্দ্র মজুমদারের পুত্র। দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ থাকেন ও প্রাণত্যাগ করেন)। রাজসাক্ষী রূপে কৈলাশপতি যখন এই বিবৃতি কোর্টে প্রদান করিতে গিয়া হীরেন্দ্র, প্রতুল গাঙ্গুলী এবং আজমীরের অর্জুনলাল শেঠীর নাম করেন তখন আসামীপক্ষের ব্যারিষ্টার পরলোকগত মিঃ আসফ্ আলী (বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা ও উড়িষ্যার ভূতপূর্ব গবর্ণর) বাধা দিয়া বলেন :—'এই কোর্টে এই সকল ব্যক্তি আসামীরূপে উপস্থিত নহে—সুতরাং তাহাদের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না।' কোর্ট বলেন :—তাঁহারা আসামী নহেন, ঠিকই ; তবে বিচারকগণ রাজসাক্ষীর এই ধরণের উক্তিকে এই মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ না করিলেও, এই বিবৃতি আদালত লক্ষ্য করিতে পারেন—'may take judicial notice.' এই মামলার অন্যান্য কার্যের মধ্যে বড়লাটের ট্রেন ধ্বংসের জন্য বোমা রাখা অন্যতম।

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা অনেকদিন চলার পরে সরকার অর্থব্যয়ের আশঙ্কায় মামলা তুলিয়া লন। কিন্তু আসামীদের মধ্যে বিশিষ্টদের 'ষ্টেটপ্রিজনার' করা হয় চার জনকে ১১০ ধারায় (যে ধারা বদমায়েসদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়) আবদ্ধ করা হয়। এই চারজনের অন্যতম ছিলেন দিল্লী হিন্দু কলেজের অধ্যাপক —শ্রী এন্, কে, নিগম।

বিহার

প্রকৃত প্রস্তাবে কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার পরে বিহারে যে সকল বিপ্লবানুষ্ঠান হয়—তাহা উক্ত দলেরই প্রয়াস। দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী ডাঃ শৈলেন চক্রবর্তী এলাহাবাদেরই অধিবাসী এবং পূর্বোক্ত হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোশিয়েশনেরই বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। বিহারের **হাজিপুর ষড়যন্ত্র মামলার** প্রধান আসামী যোগেন্দ্র শুক্ল কাশী গান্ধী আশ্রমে থাকাকালীন কাকোরীর অন্যতম আসামী মন্মথ গুপ্ত কর্তৃক দীক্ষিত হইয়া দলভুক্ত হন। বিহারের বিপ্লব কর্মীদের মধ্যে যোগেন্দ্র শুক্ল একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন।

বিপ্লবী সংগ্রাম-নিষ্ঠা

(১)

যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জীর বিবৃতি :—

[বাংলার বাহিরে কর্মপ্রচেষ্টার কিছুটা পরিচয় এবং সুদীর্ঘ সংগ্রাম-নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত হিসাবেই এই বিবৃতি প্রকাশিত হইতেছে।]

১৯১৬ সালের জুলাই মাসে পুলিশ কর্তৃক বাড়ীতে গ্রেপ্তার, ঐ গ্রেপ্তার থাকাকালেই বাড়ীর পায়খানা দিয়া পলায়ন। অক্টোবরে কলিকাতায় সমিতির বাংলা, উত্তর ভারত ও আসামের তখনকার হেড কোয়ার্টার পাথুরিয়াঘাটায় ধৃত, তৎপর কীড্ স্ট্রীটে পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার। ১৯১৬ হইতে ১৯২০ পর্যন্ত জেলে। ১৯২০ সালের শেষভাগে মুক্তিলাভ; পরে ১৯২১ সালের আন্দোলনে কুমিল্লায় বিশেষ অংশ গ্রহণ। ১৯২২ সালে কুমিল্লায় Labour House স্থাপন।

শ্রমিকের মালিকত্ব ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল। সমিতির whole time কর্মীদের জীবিকা সংস্থান অপর উদ্দেশ্য ছিল। প্রারম্ভিক কাজের সাহায্য কল্পে নরেন সেনের নির্দেশে সমিতি প্রথম তিন শত টাকা দেয়। অতঃপর পাওয়া যায় মহেশবাবুর সাহায্য। যদিও ইহা সম্পূর্ণ গঠনমূলক কাজ তথাপি ইহার উন্নতি ও প্রভাব দৃষ্টে পুলিশ কর্তৃপক্ষ নানা বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি করিতে থাকে। যোগেশচন্দ্র বলেন :—'ফলে আমি স্থির করি এভাবে কাজ চলিবে না, আমাকে পুরা মাত্রায় বিপ্লব কাজই করিতে হইবে। তদনুযায়ী ঢাকায় গিয়া দলের পরিচালকদের এই অভিপ্রায় জানাই। তাঁহারা আমাকে সংযুক্ত প্রদেশে কাজের চার্জ দিয়া পাঠান। ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে কাশীতে পৌঁছি। সান্যাল (শচীন) আন্দামান হইতে ফিরিয়া আসেন। কিছুকাল পরে তিনিও এলাহাবাদে কাজ আরম্ভ করেন। কাজকর্মের শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থার জন্য সান্যালের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলে। কাশীতে রমেশ চৌধুরী, নলিনীকিশোর গুহ এবং প্রতুল গাঙ্গুলী এই উদ্দেশ্যে শচীনবাবুর সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে (মহারাজ)

ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী শ্রীযুক্ত সান্ন্যালের প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লন। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী শ্রীযুত সান্ন্যাল সমিতির কলিকাতা কেন্দ্রে আসেন ও কাজ আরম্ভ করেন। আমি যুক্ত প্রদেশের সম্পূর্ণ ভার লই। শচীন বক্সীকে পূর্বেই লক্ষ্নৌতে কাজে বসাইয়াছিলাম। রাজেন লাহিড়ীকে কাশীর চার্জ দিয়া আমি নাম বদলাইয়া কানপুরে প্রাদেশিক কেন্দ্র করিয়া কাজ আরম্ভ করি। লক্ষ্নৌয়ে ক্ষেত্র ভাল ছিল না বলিয়া পরে শচীন বক্সীকে ঝাঁসীতে পাঠাই, কারণ সেখানে দেখিলাম অতি ভাল পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

সাহ্‌জাহানপুরে রামপ্রসাদকে দলভুক্ত করায় দলের অনেক সুবিধা হয়। ১৯১৮ সালে মৈনপুরী ষড়যন্ত্রের পলাতক নেতা বলিয়া তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। আশফাকুউল্লা, রোশন সিং আদি কিছু লোকও তাঁহার সঙ্গে ছিল। মীরাটে বিষ্ণুশরণ ডুবলীশকে শচীন সান্ন্যাল দলে টানিলেন। ভগৎ সিংও কানপুরে আমার কাছে আসিল। কাজ জিলায় জিলায় অগ্রসর হইতে লাগিল।

তখন হইল ঘোরতর টাকার অভাব। জোর করিয়া টাকা গ্রহণের অভিযানও হইল, স্থানে স্থানে। কিন্তু ফল কোথাও আশাপ্রদ তো হইলই না, বরং এ অভিজ্ঞতা আমাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তখন অর্থের জন্য বাংলায় আসিয়া কুমিল্লা পর্যন্ত পৌঁছিতে হইল। শ্রীযুক্ত মহেশ ভট্টাচার্যের নিকট হইতে ১,০০০৲ টাকা লইয়া ৫০০৲ শচীন সান্ন্যালকে কলিকাতায় দিলাম আর সংযুক্ত প্রদেশের দেনা শোধ করিলাম। এলাহাবাদ হইতে ২০ মাইল দূরের গ্রামে আমার নেতৃত্বে ভগৎ সিং, রামপ্রসাদ বিস্‌মিল প্রভৃতি ডাকাতিতে যায়। চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু গ্রামের লোক গুলিতে নিহত হয়। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় চার্জ হিসাবে অবশ্য আনা যায় নাই। ঝাঁসীতে M. N. Roy-এর চার খানা চিঠি পাইয়া (কৃষ্ণগোপাল শর্মার মারফতে) তাঁহার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উৎকট ইচ্ছা হইল। International backing ছাড়া ভারতে বিপ্লব তো সম্ভব নয়ই, পলাতকদেরও দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। এর জন্য ভারতের বাইরে আশ্রয় চাই। এম. এন. রায় মারফতে International backing-এর সুযোগ গ্রহণ করার মত বিরাট সংস্থা আমাদের ছিল। তাই বেশ ঝুঁকি নিয়া পণ্ডিচেরীতে যাই। ঐখানে রায়ের এজেন্ট রূপে ছিলেন রামচন্দ্রলাল শর্মা। এক গ্রামে interned ছিলেন। সেখানে গিয়া দেখা করি। কিন্তু সেখান

হইতে ফিরিবার পথে কৃষ্ণগোপালের মাদ্রাজী বন্ধু এবং রামচন্দ্র শর্মারও এজেন্ট, পুলিশকে আমার সংবাদ দেয় এবং দেখাইয়া দেয়। পুলিশ মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া হাওড়ার পুল পার হইলেই আমাকে ধরিয়া ফেলে এবং বাংলার জেলে আটক রাখে। হাজারীবাগ জেল হইতে কাকোরী মোকদ্দমায় ১৯২৫ সনের ডিসেম্বরে লক্ষ্ণৌ জেলে পাঠায়। সেখানে প্রধান সরকারী সাক্ষী বাণারসীলাল ও Confessing Accused বনওয়ারীলাল আমাকে সনাক্ত করে। আদালতে ষড়যন্ত্রের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপান হয়। আমার গ্রেফ্‌তারের পরে কাজের দায়িত্বভার রামপ্রসাদ ও রাজেন লাহিড়ীর উপর পড়ে। শচীন বক্সী ঝাঁসীতে এক ভাল field তৈয়ার করিয়াছিলেন। কাশীর সংগঠনেও শচীন বক্সীর দান ছিল অপরিমেয়।

কানপুরে ১৯২৪ সনের অক্টোবরে প্রথম পার্টির (H. R. A) প্রাদেশিক কমিটির অধিবেশনের অল্পদিন পরেই আমি গ্রেফ্‌তার হই। প্রাদেশিক কমিটির অধিবেশনের রিপোর্ট (খসড়া) আমার নিকট ছিল। উহাতে সংযুক্ত প্রান্তের ২৩টি জিলায় সংগঠন কার্য কায়েম করা হইয়াছে এবং খরচ চাঁদা দ্বারা চালাইতে হইবে, পুলিশের বিরুদ্ধে এবং সমাজবাদের পক্ষে সক্রিয় প্রচার চালাইতে হইবে ইত্যাদি কথা লিপিবদ্ধ ছিল। এই কাগজটি ছিল কাকোরী মোকদ্দমায় exh. 98. Sir Hugh Stephenson বাংলায় Criminal Law Amendment Act পাশ করাইবার জন্য যে Statement দিয়াছিলেন এই কাগজই ছিল উহার প্রধান উপাদান।

Hindusthan Republican Association নামে কাজ চলিয়াছিল। তাহার constitution ছিল কাকোরী কেসে বিশিষ্ট document; আর ছিল 'Revolutionary' leaflet। রাজেন লাহিড়ী এই কাগজগুলি পার্শেলে কয়েক স্থানে পাঠায়। সে কথাই বাণারসীলাল বলে, শাহ্‌জাহানপুর সম্বন্ধে। রায় বাহাদুর জিতেন মুখার্জী (D. S. P., C. I. D.) কাশীর ডাকঘর হইতে বিভিন্ন স্থানের ঠিকানা পায়—যে সব স্থানে ঐ দিন উহা প্রেরিত হইয়াছিল। ফলে কানপুর, রায়বেরেলী, জব্বলপুর আদি স্থানে খানাতল্লাসী হয় এবং নূতন নূতন লোক গ্রেফ্‌তার হয় ও তাহাদের দ্বারা নূতন কথা বাহির হইয়া পড়ে। তৎপূর্বেই চিঠিপত্রের মারফতে রামপ্রসাদের প্রতি পুলিশের সন্দেহ হয়। পুলিশ দৃষ্টি রাখে। তাহার চিঠি হইতেই আলীগড়ে শিবচরণলালের

খোঁজ পায়। এবং সেই সূত্রে মিরাটের প্রাদেশিক সভার কথা জানিয়া পুলিশ ওখানে নজর রাখে। তার পরেই ব্যাপকভাবে গ্রেফ্‌তার করা হয় ২৬শে অক্টোবর। কাকোরী ডাকাইতি হইয়াছিল ৯ই আগষ্ট সন্ধ্যায়। ১০জন লোক গাড়ী থামাইয়া গার্ডের সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া রেল কোম্পানীর টাকা অপহরণ করে।

কাকোরী কেসে শচীন সান্যালের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষাৎ প্রমাণই ছিল না, কেন না পূর্ব্ব হইতেই তিনি নিজেকে কলিকাতায় পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার life transportation হয় এই জন্য যে তিনি বাঁকুড়ায় 'Revolutionary' ইস্তাহারের জন্য দণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং এই ইস্তাহার U. P.তে distributed হইয়াছিল, তাই এই কাগজ দ্বারাই ষড়যন্ত্রের সহিত তিনি জড়িত। রামপ্রসাদ ও রাজেন লাহিড়ীর বিরুদ্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ ছিল। আমার বিরুদ্ধে তিনটা প্রমাণই দুর্বল ছিল। কিন্তু জজ রায়ে লেখেন যে, সে (যোগেশ) ষড়যন্ত্রে না থাকিলে সুদূর বিদেশের দুইটি লোক,—বাণারসী ও বনোয়ারী, তাহাকে সনাক্ত করিতে পারিত না। গোবিন্দচরণ কর ও রাজকুমার সিংহ কাকোরী ডাকাতিতে ছিল না, তবু সনাক্তের উপরই তাহাদিগকে লম্বা সাজা দেওয়া হইয়াছিল।

পণ্ডিত জগৎনারায়ণ লাল, বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর, নিম্ন আদালতের সওয়ালের শেষে বলেন—"I have now come to know the whole life history of Jogesh Ch. Chatterjee and I can say without any hesitation that he is a great patriot. Had I been a revolutionary I would have made him my leader."

চীফ্‌ কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লুই ষ্টুয়ার্ট এবং অপর জজ খান বাহাদুর মহম্মদ রেজা আপীলের রায়ে আমার বিষয়ে লিখিয়াছিলেন—"We are satisfied from the evidence that Jogesh Ch. Chatterjee was one of those who originally conceived the idea of a revolution and he was a member of the Central Committee which operated in Bengal."

এরই জন্য আমাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়া হইল মাত্র, যাহা খুবই নাকি 'lenient'.

রাজনৈতিক আসামীদের প্রতি 'যথাযোগ্য ব্যবহারের জন্য কাকোরী

ındertrial রূপে আমরা ১৭ দিনের hunger strike করিয়া কৃতকার্য হই। কিন্তু সাজা পাওয়ার সংগে সংগে উহা বন্ধ করা হয়। ফলে আমরা আবার hunger strike করি। ৪৪ দিন পরে গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর অনুরোধে উহা শেষ হয়, ফতেহগড় সেণ্ট্রাল জেলে। অপর জেলেও উহা চলিয়াছিল। পরে এই দাবী লইয়াই ভগৎ সিং আদি লাহোর জেলে অনশন করেন, উহাতেই যতীন দাস শহীদ হন। ফলে A. B. C. class হয়।

ফতেহগড় জেলে অনুমান ১৯৩৪ সালের জুলাইর প্রথম সপ্তাহে মণীন্দ্র ব্যানার্জী (এই মণীন্দ্র বেনারসের ডি-এস-পি রায় বাহাদুর জিতেন মুখার্জীকে গুলিবিদ্ধ করিবার সময় চীৎকার করিয়া বলে—'কাকোরী কী বদলা।' মণীন্দ্রের দশ বৎসর সাজা হয়।) অনশনে প্রাণ দিলে, ১ সপ্তাহের মধ্যেই ১৯৩৪ এর ১১ই জুলাই বিশেষ শ্রেণী, association ও দৈনিক কাগজাদির দাবী লইয়া আমার ১৪২ দিনের অনশন আগ্রা কেন্দ্রীয় জেলে আরম্ভ হয়। এই অনশনে ওজন ৬২ পাউণ্ড কম হইয়াছিল। পরবর্তী বৎসর রাজনৈতিকদের বিশেষ শ্রেণী, association, দৈনিক কাগজ, খেলাধুলা, পড়াশুনার সুযোগ এবং আন্দামানের কয়েদীদের ভারতীয় জেলে প্রেরণের দাবী লইয়া আবার আমার ১১১ দিনের অনশন ১৯৩৫-৩৬ সালে চলে। এইবার কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রাদেশিক সভাপতি শ্রীরফি আহাম্মদ কিদওয়াই আদির দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে U. P. সরকার আমার সব প্রান্তীয় সর্তগুলি মানিয়া লয়।

কাকোরী কেস হইতে মুক্তিলাভ ১৯৩৭ সালের ২৪শে আগষ্ট। আবার ঐ বৎসরই ডিসেম্বরই দিল্লীতে গ্রেফ্‌তার হই। Conference for the Release of Political Prisoners-এর সভাপতিরূপে দিল্লী ষ্টেশনে নামিবামাত্র দিল্লীতে যাওয়া নিষিদ্ধ করিয়া ban করা হয়। উহা অমান্য করিয়া আবার ৪ মাসের সাজা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধারম্ভে আবার ১৯৪০ সালের মে মাসে লক্ষ্ণৌ পার্কে কংগ্রেস সত্যাগ্রহ প্যারেডে গ্রেফ্‌তার, পরে জেলে আটক করিয়া Deoli Camp-এ পাঠায়। সেখান হইতে আবার classification & repatriation-এর দাবীতে অনশনে বিনাসর্তে মুক্তি দেওয়া হয় ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে। ১৯৪২ সালের মে'তে পলাতক অবস্থায় '৪২ আন্দোলন পরিচালনা করিয়া ২০শে

অক্টোবর U. P.তে লোড়োং নামক স্থানে ধৃত হই। কিন্তু পুলিশ S. I.কে গুলি মারার অভিযোগ আনা হয়। এটা জেলে আদালতের বিচারে ১০ বৎসরের সাজা হয়। আবার লক্ষ্ণৌ-এ আনিয়া Lucknow-BarabankiConspiracyর (১৯৪৩-৪৪) প্রধান আসামী করিয়া আরও ৭ বৎসরের সাজা হয়।

১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে লক্ষ্ণৌ জিলা জেলে আবার '৪২ সালের বন্দীদের দুর্দশার বিরুদ্ধে অনশন করিলে দৈহিক অবস্থা তাড়াতাড়ি খারাপ হইতে থাকে এবং দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ হয়। তখন শরৎ বোস, চন্দ্রভানু গুপ্ত, পণ্ডিত নেহরু আদির প্রচেষ্টায় উহার সমাপ্তি ঘটে।"

মন্মথনাথ গুপ্ত তাঁহার 'ভারত মেঁ সশস্ত্র ক্রান্তি চেষ্টা কা রোমাঞ্চকারী ইতিহাস' নামক হিন্দী পুস্তকের ১৭৭ পৃঃ যোগেশ চ্যাটার্জী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"আর. এস. পি'র মহান নেতা শ্রীযোগেশ চ্যাটার্জী অনশনের দরুণ দেউলী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ১৯৪২ সালের বিপ্লবকে সংগঠিত করিবার জন্য তিনি বিশেষ গৌরবজনক চেষ্টা করিয়াছিলেন। আগষ্ট বিপ্লবে তাঁহার লম্বা সাজা হয়।"

উক্ত পুস্তকেই আবার ২২০ পৃঃ তিনি 'বীর যোগেশ চ্যাটার্জী' হেড লাইনে লিখিয়াছেন—'আগষ্ট বিপ্লবের বন্দীগণকে সি শ্রেণীতেই যে রাখা হইতেছিল ইহা যোগেশচন্দ্রের নিকট অসহ্য ছিল, কেননা রাজবন্দীগণের শ্রেণী প্রণয়নে এবং তাহাদিগকে জেলে সংগ্রাম করিয়া বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা করিয়া দেওয়ার বিষয়ে ইঁহার যে দান তাহা আর কোন জীবিত ব্যক্তির নাই। এই জন্যই তিনি ১৯৪৫ সনে মরণ পণ করিয়া অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সারা ভারতব্যাপী অনশন আরম্ভ হইয়াছিল। এই মহান নেতার জেলে ২৫ বৎসর কাটিয়া যাওয়া সত্বেও তাঁহার উদ্যমের লাঘব ঘটে নাই এবং তিনি আগষ্ট বিপ্লবীদের অগ্রসারিতে ছিলেন।'...অতঃপর যোগেশ চ্যাটার্জী বলেন:—'কাকোরী মোকদ্দমায় চন্দ্রশেখর আজাদ ধৃত হুন নাই কিন্তু তাঁহাকে ধরাইবার জন্য ৫০০০৲ দেওয়া হইবে ঘোষণা করা হয়। ভগৎ সিং তখন বলবন্ত সিং নামে পুলিশের খোঁজের ভিতরে ছিলেন। ইঁহারাই বিশেষ উদ্যমের সহিত দলের কাজকে বজায় রাখেন। ভগৎ সিং, কানপুরের সাথী বিজয়কুমার সিং (কাকোরীর রাজকুমার সিং-এর ছোট ভাই) ও বটুকেশ্বর দত্ত আদি লাহোর মামলায় ছিলেন।

এই বিজয়ের দ্বারাই ফতেহগড় এবং আগ্রা জেলে আমার সহিত দলের যোগাযোগ ছিল, এবং একবার ইহারা আমাকে ফতেহগড় হইতে পলায়নে সাহায্য করে। কর্তৃপক্ষ ইহা জানিতে পারিয়াই ভীষণ সাজা দিয়া আমাকে আগ্রা জেলে প্রেরণ করে। সেখানে উহারাও সে উপলক্ষে আগ্রায় দলের কেন্দ্র স্থাপন করে। আবার প্ল্যান হয় আগ্রা হইতে লক্ষ্ণৌ যাইবার পথে রেলগাড়ী হইতে আমাকে ছাড়াইয়া নেওয়ার। তাহা হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, রাজগুরু আদি এই চেষ্টায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্রে তাঁহাদের বিরুদ্ধে ইহা একটা প্রধান চার্জ ছিল এবং ইহার সমর্থনে কর্ণেল জাফ্রি ও অন্যান্য অনেকে সাক্ষ্যদান করেন—লাহোর মামলায়।

ভগৎ সিং ও চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বেই ১৯২৮ সালে, দিল্লীর সভায় পার্টির নামে Socialist কথা জুড়িয়া পুরা নাম করা হয় Hindusthan Socialist Republican Association। এই ভাবে কাকোরী কেস এবং লাহোর কেস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। Lahore 'Kakori'-রই off-shoot.

উত্তর ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনের পরে কাকোরী হইতে উদ্ভূত হইয়া ধারাবাহিক ভাবে চলে।

ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেবের ফাঁসীর পরের দিনই ভারত সরকার সুখদেবের লিখিত একখানা চিঠি Pressএর মারফৎ প্রচার করেন, দেখাইবার জন্য, যে, ইহারা বাস্তবিকই দোষী ছিল। সেই চিঠিখানায় বিশেষ কাজের উদাহরণ স্বরূপ আমাকে জেল হইতে বাহির করিয়া আনা একটা বিশেষ কাজ বলিয়া উল্লিখিত ছিল।

সুখদেবকে বলা হইয়াছিল "brain of the conspiracy"। বস্তুতঃ সুখদেব এই চিঠিখানা গোপনে চন্দ্রশেখর আজাদের উদ্দেশ্যে বাহিরে পাঠাইতেছিলেন ফাঁসীঘর (condemned cell) হইতে; কিন্তু উহা জেল ফটকে ধরা পড়িয়া যায়।'

ভগৎ সিং বাংলার বিপ্লবী দলভুক্ত হন এইভাবে:—ভগৎ সিং লাহোরের নেশনাল কলেজের ছাত্র। বিবাহ করিবার জন্য বাড়ীতে তাঁহার উপর চাপ দেওয়া হয়। তাঁহার অধ্যাপক জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারকে ভগৎ ধরিয়া পড়েন, বিবাহ করিবে না; দেশের কাজ করিবে। এই সময়ে শচীন সান্যাল লাহোরে যান।

প্রোফেসর বিদ্যালঙ্কার ভগৎ সিং-কে শচীনের নিকট প্রেরণ করেন। শচীন সব কথা শুনিয়া ভগৎ-কে প্রশ্ন করেন, তুমি সব ছাড়িয়া বিপ্লব দলে যোগ দিতে প্রস্তুত আছ কি? ভগৎ বলেন—নিশ্চয়। বিবাহের সমূহ তাগিদ এড়াইবার জন্যও ভগৎ সিং লাহোর ত্যাগ করিতে চাহিতেছিল। অতঃপর শচীন এক পত্র দিয়া ভগৎ সিং-কে যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জীর নিকট কানপুরে পাঠান (১৯২৪ মার্চ-এপ্রিল)। যোগেশ ভগৎ সিং-এর সঙ্গে আলাপ করিয়া তাঁহাকে 'all-time-worker' রূপে সংস্থার মধ্যে গ্রহণ করেন। প্রথমে ভগৎকে বাঙ্গালী মেসে রাখা হয়, পরে 'প্রতাপ' অফিসে—গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী তাঁহাকে (ভগৎকে) স্থান দেন।

(২)

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের বিবৃতি

১৯৩০ সালের এপ্রিলে সমিতি হইতে এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হয় যে কতককে জেল বা অন্তরীণ হইতে পলায়ন করিয়া গা ঢাকা দিতে হইবে। দেওঘরের বাসস্থান হইতে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে গিয়া গ্রেপ্তার হয়। প্রেসিডেন্সী জেলে লইয়া আসে। পূর্ণানন্দ বলে—১৯৩০ সালে জেল সমস্যা লইয়া একযোগে কাজ করার চেষ্টা করি। 'Fight against jail authority'—এই common program-এ revolt group কাজ করিতে সম্মত হন। প্রেসিডেন্সী জেলের এই প্রয়াস বক্সাতে কার্যকরীভাবে পাকা হয়।

পূর্বোল্লিখিত পলায়নের নীতি অনুযায়ী বক্সা ক্যাম্প হইতে জীতেন গুপ্ত ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী পালায়। বক্সা হইতে পলায়ন সহজ ছিল না। ক্যাম্পের চারিদিকে সৈন্য মোতায়েন ছিল। Double wiring (তারের বেড়া) ছিল। রাস্তায় Military Picket ছিল। পলাইবার একটিমাত্র রেল ষ্টেশন লালমণিরহাট। বক্সা ক্যাম্পে একটা টাওয়ার ছিল। পূর্ণানন্দ একটা সুযোগে টাওয়ারে উঠে এবং ক্যাম্পের দুর্বলতা বা ছিদ্র লক্ষ্য করে। দেখে তারের বেড়ার একটা স্থান উঁচু; উহার নীচ দিয়া যাওয়া যায়। কিন্তু বন্দুকধারী সান্ত্রী থাকে। ঐ সান্ত্রী যদি দুই মিনিট অন্যদিকে চাহিয়া থাকে,

তাহা হইলে এই তারের বেড়া পার হওয়া যায়। কিন্তু তৎপর দ্বিতীয় বেড়া। সেখানে সান্ত্রীদের 'ফেমিলি' ব্যারাক। সুতরাং ভাগ্যের উপরে 'চান্স' নিতে হইবে। ক্যাম্পের সকলকে জানানও সম্ভব ছিল না।—তাহাদেরও দৃষ্টি এড়াইতে হইবে। বন্দী-সংখ্যা তখন মোট ১৫০; চাকর-বাকরও আছে। জীতেন গুপ্ত ত্যাগী, সাহসী, নিয়মনিষ্ঠ, দেহের দিকেও অতি কর্মক্ষম ও ক্ষিপ্র। সেও একজন মনোনীত হইল। অপর জন হইল ঢাকার কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী। স্থির হইল অমাবস্যার রাত্রে তাহাদের যাইতে হইবে। পোষাক দেওয়া হইল কম্ফার্টার, লাইট সোয়েটার, হাতে দস্তানা, পায়ে মোজা। রাত্রে গাছে থাকিতে হইবে, কারণ বাঘ ভাল্লুকের ভয় ছিল। পূর্বেই 'স্মাগলিং' করিয়া জেলে টাকা নেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের টাকা দেওয়া হইল। তাহারা নির্দিষ্ট সময়ে ক্ষিপ্রগতিতে প্রথম তারের বেড়া অতিক্রম করিল। তিন চার মিনিটের মধ্যেই বুঝিতে পারা গেল তাহারা নির্বিঘ্নে 'ডেঞ্জার জোন' পার হইয়াছে। পরদিন দেখা গেল দ্বিতীয় তারের বেড়ায় দস্তানা আটকাইয়া আছে। এই পলায়ন-কার্য এত গোপনে সুসম্পন্ন হয় যে ক্যাম্পের লোকও দুপুরে জিজ্ঞাসা করে কৃষ্ণপদ কোথায়। বক্সা ষ্টেশন বন্দী ক্যাম্প হইতে চার মাইল দূর। বন্দীদের জন্য ক্যাম্পে নাপিত আসিত ষ্টেশন হইতে। সে-ই বৈকালে আসিয়া গোপনে বলিল, 'বাবু, জীতেনবাবু, কৃষ্ণবাবুকে দেখে এলাম ষ্টেশনে'। ইহাতে ক্যাম্পের লোক ব্যাপার বুঝিয়া লইল। কিন্তু তখনও ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ কিছুই জানিত না। পরিকল্পনা ছিল লালমণিরহাট পার না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা না যাওয়া পর্যন্ত গোপন থাকা চাই। তাহাই ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে কলিকাতা পুলিশ হইতে চারিদিন পর ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ প্রথম সংবাদ পায়। তখন তাহারা ক্যাম্পে আসিয়া লোক গুণিতে আরম্ভ করে এবং জীতেন ও কৃষ্ণপদ কোথায় সন্ধান করে। এই পলায়ন ঘটে ১৯৩১এর শেষভাগে। পূর্বে উল্লিখিত পলায়নের পরিকল্পনা অনুসারে ইতিমধ্যে প্রভাত চক্র ও পরেশ গুহ অন্তরীণ হইতে পলায়ন করে। বক্সায় Camp Commander ছিল কোট্টাম—ঢাকার ডি. আই. বি. পুলিশ সুপারিনটেন্ডেণ্ট্। ডুরনো সাহেবের উপর গুলি মারার সময় কোট্টাম ঢাকায় ছিল। ঢাকার নাগরিকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। এখন বক্সা হইতে জীতেন ও কৃষ্ণপদের পলায়নের পর ডেটেনিউদের উপর কোট্টাম অত্যাচার আরম্ভ করে। এই অত্যাচার প্রতিরোধ করা যাইতেছিল

না—উহা সহ্য করাও অসম্ভব হইয়া উঠে। তখন অনুশীলনের প্রধানগণ স্থির করেন এই অত্যাচার বন্ধ করিতেই হইবে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ ইন্‌টারভিউ চাহিয়াও পাওয়া যায় না; কোট্রামকে কিছুতেই ক্যাম্পে আনা যায় না। তাহার সহকারী মিঃ লিউলিনকে পাঠায়। পূর্ণানন্দ একদা লিউলিনের নিকটে যায় এবং বলে—কম্যানডেন্টের নিকট আমাদের বহু কথা থাকিতে পারে—সে আসে না কেন? This is cowardice. কোট্রামকে coward বলায় মিঃ লিউলিন কোট্রামকে বলে—ওরা যখন ইন্‌টারভিউ চায় আপনার দেখা করা উচিত। এবার কোট্রাম, যাহারা দেখা করিতে চায় তাহাদের একজন একজন করিয়া ডাকিয়া পাঠায়। ইন্‌টারভিউ টেবিলের পাশে দুইজন সশস্ত্র সিপাই দাঁড় করাইয়া রাখে। স্থির হয় অফিসে গিয়াই কোট্রামকে প্রহার করা হইবে। প্রহার করার উদ্দেশ্য ছিল অসহায় নিরস্ত্র বন্দীদের উপর অত্যাচারের যথাসাধ্য প্রতিবাদ করা এবং বাহিরে এই কথা প্রচার করা। প্রথমে যে দুই তিনজন ইন্‌টারভিউতে যায় তাহারা কোট্রামকে মারিতে পারে না। কারণ দুই পাশে প্রহরী থাকে আর কোট্রাম টেবিলের বিপরীত দিকে সরিয়া বসে। পরে যায় পূর্ণানন্দ মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্প লইয়া। পূর্ণানন্দ যাইতেই কোট্রাম প্রথম 'Good morning' বলে। সেও উত্তরে Good morning জানায়। এর পরই পূর্ণানন্দ পায়ের স্যাণ্ডাল হাতে লইয়া কোট্রামের গালে আঘাত করে। এই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই সিপাহীরা পূর্ণানন্দকে ব্যাটন দ্বারা মাথায় মুখে প্রহারে প্রহারে রক্তাক্ত করিয়া দেয়। তাহার কাঁধের ও চোয়ালের হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাকে হাসপাতালে নিয়া ক্ষতস্থান সেলাই করে ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ক্যাম্পে রাখিয়া যায়। পরদিন অন্যতম বিপ্লবী ধীরেন্দ্র মুখার্জী ইন্‌টারভিউ করিতে যায় এবং পূর্ণানন্দের মতই জুতা খুলিয়া কোট্রামকে আঘাত করে। ধীরেন্দ্রকেও প্রহরীরা প্রহার করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ণানন্দের মত গুরুতর জখম করে নাই। ইহা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল। কোট্রামকে প্রহার করার জন্য এই দুইজনের বিরুদ্ধে জলপাইগুড়িতে মামলা দায়ের করা হয়। তাহাদের জলপাইগুড়ি জেলে লইয়া যায়। মামলায় এই দুইজনের দুই বৎসর করিয়া সাজা হয়। (জলপাইগুড়ি জেল হইতে পূর্ণানন্দ ও ধীরেন পলায়নের চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টার কথা কর্তৃপক্ষ জানিতে পারে। অতিরিক্ত পাহারার ব্যবস্থা হয়। পায়ে বেড়ি লাগানো হয়।)

পূর্ণানন্দ বলেন, কোট্টামকে প্রহার করিয়া অত্যাচারের প্রতিবাদের ব্যাপারে অনুশীলনের রবি সেন প্রভৃতির এবং রিভোল্টিং গ্রুপ প্রভৃতির সমর্থন ছিলই—মাদারীপুরের পঞ্চানন চক্রবর্তী, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, যতীন ভট্টাচার্যেরও পূর্ণ সমর্থন ছিল।

বক্সা জেলে পূর্ণানন্দ ও ধীরেনের পরে ঢাকার সুরপতি চক্রবর্তী (মেধাবী ছাত্র জেল হইতে পরীক্ষা দিয়াও ফরাসী ভাষায় অতিশয় কৃতিত্বের সহিত এম-এ পাশ করেন) গিয়াও কোট্টামকে মারে। এজন্য তাহারও দুই বৎসর জেল হয়। তাহার উপর অত্যন্ত পীড়ন চলে। তাহাকে ঘানিতে দেওয়া হয়। সুরপতির দেহ অতি ক্ষীণ। জেল নিয়ম অনুযায়ীও কোনরূপ কঠোর শ্রম, বিশেষতঃ ঘানিতে দেওয়া, চলে না। তবু সাজা দিবার জন্য তাহাকে ঘানিতে দেয়। সুরপতিকে ঘানির নিকট নিলে সে দৃঢ়কণ্ঠে জানায়—"আমি কিছুতেই ঘানি টানিব না।" তখন তাহাকে ঘানির সঙ্গে বাঁধিয়া ঘানি চালায়। সুরপতি অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

পূর্ণানন্দ ও ধীরেনকে জলপাইগুড়ি হইতে রাজসাহী সেন্ট্রাল জেলে নেয়। মিঃ লিউক জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট। দণ্ডিত রাজবন্দীদের উপর অসহনীয় অত্যাচার চালায়। অত্যাচারে অত্যাচারে পূর্ণানন্দদেরও স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই সময়েই রাজসাহীর সমিতির কর্মীরা মিঃ লিউকের উপর পিস্তলের গুলি চালায়, লিউক গুরুতর রূপে আহত হন। এই সম্পর্কে ১৪।১৫ বৎসরের তরুণ ভোলা রায় ধৃত হয়। গুলি করা মামলায় তাহার সাত বৎসর কারাদণ্ড হয়।

রাজসাহী হইতে পূর্ণানন্দকে ১৯৩৩ সালে আলিপুর জেলে লইয়া আসে। প্রভাত, জীতেন, কৃষ্ণপদ প্রভৃতিকে পূর্বেই আনিয়াছিল। পূর্ণানন্দকে extremely dangerous বলিয়া স্বতন্ত্র সেলে রাখিত। ইতিমধ্যে আন্তঃ-প্রাদেশিক মামলার আসামীদেরও অনেককে জেলে আনিয়াছে। পূর্ণানন্দের কারাদণ্ডকাল শেষ হইয়াছে—তাহাকে ডেটেনিউ করিয়া লইয়া গেল। এই সময়ে আন্তঃপ্রাদেশিক মামলা পরিচালনা এবং বাহিরের বিপ্লব-কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য পূর্ণানন্দ পুনরায় জেল হইতে পালাইবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিল। এই উদ্দেশ্যে অত্যন্ত কঠিন ও জটিল 'সাইফার' যোগে খবরাখবর চলিতে লাগিল। প্ল্যান ছিল জেলের বাহিরের দেওয়ালে ডিনামাইট বসাইয়া দেওয়াল ভাঙিবে। ডিনামাইট কার্যকরী হইলে ঐ ভাঙ্গা দেওয়াল দিয়া

পালাইবে। ডিনামাইট কার্যকরী না হইলে ল্যাডার সাহায্যে পালাইবে। নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের পাকা খবর জেলে আসিল—'আমরা প্রস্তুত।' তদনুযায়ী পূর্ণানন্দ ও ক্ষীরোদ দত্ত পালাইবার উদ্যোগ করে। ব্যারাকে গুণতি করার সময় অন্য লোকের দ্বারা গুণতি ঠিক রাখিয়া পূর্ণানন্দ ও ক্ষীরোদ ছাদে যায়, এবং প্রায় সমস্ত রাত্রি ছাদে থাকে। এক ছাদ হইতে অন্য ছাদে বুকে হাঁটিয়া যাইতে হইয়াছিল। ইতিপূর্বে পূর্ণানন্দ কিছু দড়ি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। একদিন তল্লাস করিয়া ব্যারাক হইতে কিছু দড়ি লইয়া যায়। প্রায় দুই শত হাত ছাদ অতিক্রম করিতে বুকের ছাল উঠিয়া যায়। নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া তাহারা অপেক্ষা করিল—কিন্তু বাহির হইতে পূর্ব ব্যবস্থা মত কেহ আসিল না। পরে জানা যায় জেলের বাহিরে ঐদিন অত্যন্ত কড়া পাহারা মোতায়েন ছিল। তাই বাহির হইতে ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয় নাই। রাত্রি সাড়ে চারিটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাহারা পুনরায় অতিকষ্টে পূর্ববৎ বুকে হাঁটিয়া ব্যারাকে ফিরিয়া যায়। গুণতিকালে সহকর্মী অনাথ লাহিড়ীর চাতুর্য তাহাদের রক্ষা করে।

অতঃপর পলায়নের ব্যবস্থা হয় ট্রেনে। পূর্ণানন্দকে দেউলি বন্দীনিবাসে নিবে বলিয়া খবর পায়। 'সাইফারে' কাঁকুড়গাছি আড্ডায় এই সংবাদ পাঠানো হয়—যথাস্থানে ট্রেন থামাইবে এবং স্মোকস্ক্রীণের সাহায্যে পূর্ণানন্দ পলায়ন করিবে। কিন্তু কাঁকুড়গাছি আড্ডা সার্চ হওয়ায়—এই সাইফারের পত্র বাহিরের বিপ্লবীদের হস্তগত হয় না। পূর্ণানন্দকে দেউলিতে নিয়া যায়। তাহার স্যুটকেসে জনৈক কর্মীর ভুলে একটা ড্রাফ্‌ট রহিয়া যায়। ঐ ড্রাফ্‌ট কমাণ্ডার ফেণীর (Fenni) হাতে পড়ে। পূর্ণানন্দ উহা কাড়িয়া আনিতে উদ্যত হইতেই ফেণী সরিয়া পড়ে। এই ড্রাফ্‌ট হইতেই সাইফারের key বাহির করিতে পুলিশ সক্ষম হয়। এই সাইফার হইতেই পূর্ণানন্দকে আন্তঃপ্রাদেশিক মামলার অন্যতম প্রধান আসামীর শ্রেণীভুক্ত করা হয়। তাহাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে লইয়া আসে। এইখানে আবার পলায়নের চেষ্টা হয়।

পলায়ন করিতেই হইবে—জেলের দুঃখভোগ এড়ানোর জন্য নহে, পরন্তু বিপ্লব-কর্মের গুরুদুঃখ ও গুরুভার বহিবার আত্মপ্রসাদের জন্যই। আলিপুর জেলের বিভিন্ন সেলে তাহারা থাকে, দিনের বেলায় কতক সময় তাহারা একত্র হয়। সেই সময় সেলে দেওয়াল টপকানো অভ্যাস করিতে থাকে। একজন

দাঁড়ায়, তাহার স্কন্ধে একজন উঠে, দ্বিতীয় ব্যক্তির স্কন্ধে আরেকজন উঠিলেই প্রাচীরের মাথা ধরা যায়। তৃতীয় ব্যক্তি দড়ি মুখে করিয়া লাফ দিয়া পড়িবে এবং সেই দড়ি ধরিয়া রাখিবে। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি দড়ি ধরিয়া উঠিবে। দুইজনের স্কন্ধে পরপর উঠিয়া প্রাচীর পাইতে ও নামিয়া যাইতে কত সময় লাগিতে পারে তাহা পরীক্ষা করা হয়। ৬ মাস ধরিয়া ইহা অভ্যাস করা হয়। দেখা যায় তিন-জনের পলাইতে ৬০ সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগিবে না। কিন্তু পলাইতে হইবে দিনের বেলা, যখন ঝড় ও বৃষ্টি হইবে। জেল সুপার পাটনির নিকট পূর্ণানন্দ আবেদন করে, "মামলার জন্য আমাদের পরামর্শ করিতে হইবে।" পাটনি একত্র হইতে অনুমতি দেন। 'স্টেটস্‌ম্যান' কাগজে আবহাওয়ার রিপোর্ট দেখিয়া ঝড় বৃষ্টি হইবে অনুমান করিয়া প্রস্তুত হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে বৃষ্টি হয় না। একদিন আগে বা পরে বৃষ্টি হয়। এইভাবে দিন কয় গেল। এই দলে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় (Meteorologist)। তিনি আবহাওয়ার রিপোর্ট পরীক্ষা করিয়া একদিন বলেন,—আজ ঝড় বৃষ্টির নিশ্চিত সম্ভাবনা। আরেক সমস্যা দেখা দিল, প্রাচীর পার হইয়া পলায়নকালে দুই এক মিনিটের মধ্যেই পাগলা ঘণ্টি পড়িয়া যাইবে এবং সিপাহীরা ছুটিয়া আসিবে। তাহাদের কতকটা সময়ের জন্য বাধা দিবার উপায় কি? ছোট গেট দিয়া সিপাহীরা আসিবে। স্থির হইল,—একজনকে প্রাণপণ করিয়া গেট আটকাইতে হইবে। তাহাকে মারপিট করিবে, অন্য সাজাও দিবে নিশ্চয়ই। ত্যাগনিষ্ঠ কর্মী অমূল্য সেন অত্যন্ত বলিষ্ঠ। সে-ই গেট আগলাইবার ভার লইল। দুই এক মিনিট ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেই পলায়নকারীরা জেল সংলগ্ন গঙ্গা পার হইয়া যাইতে পারিবে। প্রত্যাশিত বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রথম ব্যাচের পূর্ণানন্দ, নিরঞ্জন ও হরিপদ পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী এক মিনিটের মধ্যেই পলাইয়া যাইতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় ব্যাচের সীতানাথ দেও পলাইতে সক্ষম হয়। কিন্তু সে বোধ হয় দড়িটা ধরিয়া রাখিতে পারে নাই; তাই এই দ্বিতীয় ব্যাচের অপর দুইজন, ভোলানাথ দাস ও সত্যেন্দ্র মজুমদার, attempting to escape charge-এ ধরা পড়ে।

পাগলা ঘণ্টি পড়িতেই পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী অমূল্য সেন গেটে ছুটিয়া যায়-এবং সিপাহীদের ঠেকায়। চলে ধস্তাধস্তি ও প্রহার। অমূল্য প্রহারে জর্জরিত হইয়াও সাফল্যজনকভাবে সিপাহীদের বাধা দিয়া বেশ কতকটা সময় ঠেকাইয়া

রাখে। পলায়নের সংবাদ পাইয়াই পুলিশ সহরের নির্গমপথ বন্ধ করিয়া দিবে। খবরাখবর করিয়া গোয়েন্দা পুলিশের ঘাঁটি আগলাইতে আনুমানিক যে অর্ধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা সময় লাগিবে তাহার পূর্বেই পলাতকদের কলিকাতার সীমানা পার হওয়া চাই। তাই তাহারা ভিন্ন ভিন্ন পথে সমিতির গোপন কেন্দ্রের দিকে রওয়ানা হইল। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছিল। ট্রামে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহারা 'মড়া পোড়াইয়া' ফিরিতেছে, বলে। হরিপদ পরিচিত বাসায় কাপড় বদলাইয়া আসিতে দেরী করায় বালীগঞ্জ ষ্টেশনের সন্নিকটবর্তী রাস্তায় ধৃত হয়। আর সকলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জগদ্দল কেন্দ্রে নিরাপদে আশ্রয় লইতে সক্ষম হয়। টিটাগড় Police raid-এর পূর্ব পর্যন্ত (১৯৩৬) তাহারা আত্মগোপন করিয়া থাকিতে সক্ষম হইয়াছিল।

* * *

[এখানে দুইটি বিপ্লবীর চিত্র সংযোজিত হইতেছে—একটি দেশবাসীকে গভীর ভালবাসার আর একটি আত্মবিলুপ্তির ।]

সোহনলাল পাঠক

ব্রহ্মদেশে বিপ্লব চেষ্টায় সোহনলাল পাঠকের ফাঁসি হয়। সোহনলাল সৈন্যদলকে বিপ্লবমন্ত্র দান করিতেছিলেন। একদা সিপাহীদের জমাদার সোহনলালকে ধরিয়া ফেলে। সোহনলাল সশস্ত্র থাকিলেও—জমাদারকে দেশের লোক—'ভাই', বলিয়া গুলি করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিলেন না। এইভাবে ধরা পড়ার অর্থ মৃত্যু, জানিয়াও সোহনলাল নিষ্কৃতির জন্য পিস্তল ব্যবহার করেন নাই। সোহনলাল জেলে গিয়া কোন জেল নিয়মই পালন করেন নাই। যে ইংরেজকেই মানি না—তার জেলের নিয়ম মানিব কেন? কর্তৃপক্ষ আসিলে দাঁড়াইতেন না, সেলাম করিতেন না। কেহ আলাপ করিলে অবশ্য নম্র ও ভদ্রভাবেই আলাপ করিতেন। ক্ষমা চাহিলে ফাঁসির পরিবর্তে মুক্তি পাইবে এ কথা ইংরেজ কর্তৃপক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ বলা হইলেও সোহনলাল ক্ষমা চান না। বলেন—ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিত ইংরেজের। কারণ তাহারাই জুলুম করিতেছে—জুলুম করিয়া আমাদের দেশ অধীনে রাখিয়াছে। সোহনলালের ফাঁসি হয়। বর্মার এক মিলিটারী পুলিশের ব্যারাকে—ডিনামাইট ও রিভলভার আবিষ্কৃত হয়। বহু ব্যক্তিকে ভারতরক্ষা আইনে আটক করা হয়।

গারলিকের হত্যাকারী কানাই

কর্ণেল সিমসনের হত্যাপরাধে দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয় ৭ই জুলাই ১৯৩১ সালে। ঐ মাসেরই ২৭শে তারিখে আলিপুর জজ আদালতে সেসান্ জজ মিঃ গারলিকের কোর্টে একটি বাঙ্গালী যুবক প্রবেশ করে এবং গারলিকের কপাল লক্ষ্য করিয়া অব্যর্থ গুলি ছোঁড়ে। একজন পুলিশ অফিসার গুরুতর আহত হয়। আততায়ী বিপ্লবী অতঃপর আত্মহত্যা করে। মৃত বিপ্লবীর পকেটে একখানা কাগজে নিম্নলিখিত পরিচয় ছিল: "ধ্বংস হও, দীনেশ গুপ্তকে অবিচারে ফাঁসি দেওয়ার পুরস্কার লও।—ইতি বিমল গুপ্ত"। এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পেডীকে হত্যা করা হয়। এই হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া মেদিনীপুরের বিপ্লবী বিমল গুপ্ত নামক যুবককে পুলিশ খুঁজিতেছিল। বিমল সন্দেহে পুলিশ ইতঃপূর্বে একটি যুবককে ধরেও; পরে বিমল নহে বলিয়া তাহাকে মুক্তিদান করে। কিন্তু পেডী-হত্যাকারী বিমল গুপ্তকে ধরিবার জন্য পুলিশ জোর অনুসন্ধান চালাইতেছিল। এমনি সময়ে মিঃ গারলিককে হত্যা করিয়া যে-যুবক আত্মহত্যা করিল,—তাহার পরিচয়-লিপিতে নাম পাওয়া গেল "বিমল গুপ্ত"। প্রথমটায় পুলিশ মনে করিল—পেডী-হত্যাকারী বিমল গুপ্তই এই ভাবে গারলিককে হত্যা করিয়া আত্মহত্যা করিল। কিন্তু নিহত যুবকের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার জন্য বিমল গুপ্তের দাদাকে আনা হইল সনাক্ত করিতে। দাদা জানাইলেন, মৃতদেহ বিমলের নহে। মেদিনীপুর হইতে বিমল গুপ্তের পিতা ও মাতাকে আনা হইল সনাক্ত করিতে। তাঁহারা সকল রকমে পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহে জানাইলেন—এ-ব্যক্তি তাঁহাদের 'বিমল' নহে। ইহার ৪ মাস পরেও 'আনন্দবাজারে' সরকারী পুরস্কার ঘোষণার বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায়: "গারলিকের হত্যাকারীর পরিচয় প্রদানকারীকে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।" আসলে নিহত যুবক কানাই ভট্টাচার্য। ২৪ পরগণার বিপ্লবী নায়ক সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত।* কানাই বাংলার

* এই সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র দাস বলেন—জেল হইতে সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমতি ও নির্দেশেই সম্পূর্ণ নূতন কর্মী 'কানাই' সুরেশবাবুর সাহায্য গ্রহণ করেন এবং অভীষ্ট পরিণাম বরণ করেন।

বিপ্লবীদের মন্ত্রগুপ্তির এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। নাম যশের কামনা নাই—প্রকাশের অভিলাষ নাই—নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার পূর্বে পরিচয়ের ক্ষীণতম সূত্রও রাখিতে চাহিতেছে না। পেডী-হত্যাকারী বিমলকে পুলিশ খুঁজিতেছে। যদি পুলিশ বোঝে যে বিমল মারা গিয়াছে তাহা হইলে ফেরারী বিপ্লবী নিশ্চিন্ত হইয়া কাজ করিতে পারিবে, তাই নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করিতে যাওয়ার পূর্বে নিজের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন করিয়া—বিমল গুপ্তের নামে পরিচিত হইতে চাহিল! নাম-যশ ও প্রকাশের কাঙ্গাল সে আর নহে। এই আত্মবিলুপ্তির সাধনা অপূর্ব। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন: মহাপুরুষদের শেষ দুর্বলতা যশের আকাঙ্ক্ষা। মন্ত্রগুপ্তির সাধনায় বাংলার বিপ্লবীরা অনেকেই সেই দুর্বলতা পরিহার করিয়াছিল।

অত্যাচারের কবলে বিপ্লবী

আদর্শের অগ্নিপরীক্ষা

বিপ্লবীদের উপর পুলিশের অত্যাচার সম্পর্কে কিছুটা বলা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আশুতোষ কাহিলীর বিবৃতি অত্যাচারের ধরণ-ধারণ উপলব্ধি করিতে সাহায্য করিবে। অত্যাচারের ফলাফল সম্পর্কে পুলিশের বড় অফিসারদের অভিজ্ঞতাও উল্লেখযোগ্য। বিবৃতির মর্ম:—

১৯১৬ সালের আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে (বসন্ত চ্যাটার্জী ইহার অল্পকাল পূর্বেই কলিকাতায় নিহত হন) অনুশীলনের প্রাচীনতম কর্মী আশুতোষ কাহিলী এলাহাবাদে ধৃত হন। এলাহাবাদে জেল হাজতে রাখে। সৈন্য বিগড়াইবার অপরাধে অভিযোগ আনা হয়। বাঙ্গালী পুলিশ না যাওয়া পর্যন্ত যুক্তপ্রদেশের পুলিশ, আশুবাবুরা বাঙ্গালার সমিতির সহিত যুক্ত ইহা বুঝিতে পারে নাই; মনে করিয়াছিল, পাঞ্জাবী বিপ্লবীদের সহিতই ইহারা কেবল যুক্ত। আশুবাবু জেলে গিয়াই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। নিউমোনিয়া দেখা দেয়। বুকে যন্ত্রণা। হাসপাতালে রাখে কিন্তু কোন ঔষধপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা নাই; কম্পাউণ্ডারই

দেখে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিলে আশুবাবু জানান যে, তাঁর প্রবল জ্বর (তখন ১০৫° জ্বর), বুকে ব্যথা। কিন্তু ডাক্তারও আসে না—ঔষধও দেয় না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তারকে ডাকিয়া ঔষধ দিতে এবং দুধ বার্লি দিতে বলেন। এদিকে কম্পাউণ্ডার জানে না ইংরেজী। সে সাহেবের মুখে 'milk' শুনিয়াই ভাবিল 'দুধে জল দেয়' বলিয়া আসামী নালিশ করিয়াছে। সাহেব চলিয়া গেলেই কম্পাউণ্ডার ১ সের খাঁটি দুধ আনিয়া আশুবাবুকে বলে, খাও। আশুবাবুর তখন প্রবল জ্বর। বমি হইতেছে। কে শোনে, দুইটা জোয়ান লোক বুকে চাপিয়া বসে—দুধ খাইতে হইবে। এই যন্ত্রণা থামে তখন, যখন একজন কয়েদি (সামান্য ইংরেজী বুঝিত) আসিয়া বলে—দুধের জন্য আসামী নালিশ করে নাই। বুকে 'ব্যথা' বলিয়া নালিশ করা হইয়াছিল। তখন কম্পাউণ্ডার দুইটা গুণ্ডা কয়েদী আনিয়া বলিল—'আসামীর বুক ডলিয়া দেও।' তাহারা আসিয়া আশুবাবুর বুক ডলিতে লাগিল। বুকে অমনি ছিল যন্ত্রণা, তাহার উপর এই তাণ্ডব! আশুবাবু যতই 'না' 'না' বলেন, তাহারা শোনে না। আশুবাবু ঘুষি দিতে লাগিলেন। তবু যায় না। শেষে ভাগলপুরের একটি ইংরেজী জানা কয়েদী বুঝাইয়া বলেন যে, রোগীর বুকে ভয়ানক ব্যথা—এইভাবে 'ডলাই মলাই' করিলে মরিয়া যাইবে। অবশেষে ডাক্তার আসিয়া বুকে তুলা-ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিল। আর ঔষধের ব্যবস্থা করিল, কেবলমাত্র কুইনাইন পাউডার। এই জ্বরের অবস্থায়ই ৮ দিন পর কলিকাতা কিড্ ষ্ট্রীটে লোম্যানের হেড্ কোয়ার্টারে আশুবাবুকে নিয়া আসে। বুকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। অতিশয় দুর্বল। এদিকে রাস্তায় দুই দিন সম্পূর্ণ অনাহার।

এলাহাবাদ হইতে নলিনীকান্ত ঘোষকেও কিড্ ষ্ট্রীটে লইয়া আসা হয়—ভিন্ন ট্রেনে ঐ একদিনেই। রঘুবীর সিং (বাঁকিপুর—ছাত্র) অনুশীলনের সদস্য ছিল। রঘুবীরের নিকট 'দাদা' লিখিত খান কয় পত্র পায় (রঘুবীর War Infantry officeএ ক্লার্কএরও কাজ করিত। তাহাকে কোর্টেই গ্রেফ্‌তার করে)। রঘুবীরকেও ভয়ানক পীড়ন করে। রঘুবীর কিছুটা বলে বটে, তবে দেখা যায় অনেক কথাই বলে না। যেমন—আশুবাবু ও নলিনীকান্ত ঘোষ কাহাকেও জানিত না বলে। 'দাদা' কে, আসলে তাহাও বলে না। সে বলে—'আমি পরীক্ষা দিবার পর বড়ই অভাবে পড়ি। তখন একটি বাঙ্গালী বাবু (বাঁকিপুরে) আমাকে বলে কাগজগুলি ('Liberty') বিলি করিলে

দুই টাকা দিবে। আমি রাজী হই ও বিলি করি। আরো দুই বার আমাকে কাগজ দেয় ও আমি বিলি করি। আমি তাহাকে দেখিলে চিনিব—কিন্তু ইহারা কেউ নয়। এই চিঠিগুলি সেই ভদ্রলোকই লিখিতে পারে।' রঘুবীরের প্যাম্ফ্লেটিংএ দুই বৎসর সাজা হয়। সে কিন্তু জানিত অনেক, তবে বলে নাই।

ক্ষেত্র সেন ও আশুবাবুকে একই সঙ্গে আনে। পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন সেলে রাখে। জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য এক একজন করিয়া আফিসে লইয়া যাইত। ঐ আফিসের উপরে থাকিতেন মিঃ লোম্যান। জিজ্ঞাসার নমুনা—'বল্, শালা, কি জানিস্ ?' ইহা বলিয়াই, পুলিশগুণ্ডার দল কিল্, ঘুষি, লাথি, চড় মারিতে থাকে। সঙ্গে হিন্দুস্থানী পুলিশ থাকিত। উহারা অফিসারদের আদেশ তামিল করিত। ইহার পর আরম্ভ হইত নানা যন্ত্রণা। শালা বোস্—শালা উঠ্, এর পর পা ফাঁক্ করা হইল। দুইটা কনেস্‌টব্‌ল্ পা ধরিয়া টানিয়া নিয়া ফাঁক করে। পড়িয়া গেলে, লাথি। উঠ-বস্ চলিতে থাকে (পেছনে হাতকড়া) ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আই-বি পুলিশের অফিসারেরা বাঙ্গালী। কিন্তু যে ধরণের গালাগালি তাহারা করিয়াছে—তাহা ইতরের মুখেও বাধে। সিপাহীদের বুট দিয়া এবং বাঙ্গালী অফিসারদের জুতা দিয়া পায়ে মাথায় সর্বত্র মারিত। আশুবাবু অতিশয় দুর্বল, দাঁড়াইতে গেলেই মাথা ঘোরে। এই অবস্থায়ই পীড়ন চলে। জল চাহিলেও জল দেয় নাই। রুগ্ন ও দুর্বল দেহের উপর অতিশয় পীড়নে আশুবাবু মূর্ছিত হইয়া পড়েন। যখন জ্ঞান হয়, দেখেন—তাঁহার চোখে মুখে একটি এ-এস-আই জল দিতেছে। বেলা ২টা হইতে অত্যাচার সুরু হয়। যখন সেলে আনে তখন সন্ধ্যা। আবার রাত্রি ১টার সময় পীড়ন করিতে নেয়। আশুবাবুর বুকে তখনও তুলার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কিছু প্রহার করিয়া যখন দেখে যে হয়তো বড় রকমের অসুখ তখন আবার সেলে লইয়া আসে। আবারও মূর্ছা যান। তখন জল পিপাসায় যদিও জল দিত—তাহাও এক আঁজলা মাত্র। ঘটি সরাইয়া লইয়া যাইত। একবার আশুবাবুকে ঠেলিয়া ইলেক্‌ট্রিক সুইচ্ বোর্ডে ফেলে—যাহাতে shock লাগে।

বাঙ্গালী অফিসার যাহারা প্রহার করে—বিজয় বসু, মনোজ বসু, মনি বসু, কে একজন ঘোষ (১৯২৫ সালেও সে আই-বি-তে ছিল)—তাহাদের অন্যতম।

সাহেবদের মধ্যে একবার টেগার্ট আসিয়া একটা ঘুষি দেয়। নামের লিষ্ট হাতে লইয়া টেগার্ট প্রশ্ন করিতে থাকে। আশুবাবু প্রত্যেক প্রশ্নেই বলেন—'নো' 'নো'। টেগার্ট উত্তেজিত হইয়া মুখ বিকৃত করিয়া 'no—o'—বলিয়াই একটা প্রচণ্ড ঘুষি দেয়।

এন্‌কোয়ারী কমিটিতে (স্যর ষ্টীফেন মুর-কমিটি) সাক্ষ্যদান কালে আশু-বাবুকে স্যর বিনোদ মিত্র প্রশ্ন করেন—'লোম্যান মারিয়াছে?' আশুবাবুকে প্রকৃতপক্ষেই লোম্যান মারে নাই—মারিয়াছে টেগার্ট। তাই আশুবাবু যতই বলেন, টেগার্ট মারিয়াছে—স্যার বিনোদ অমনি বলেন—'ও কথা শুনতে চাই না—আমরা জানতে চাই লোম্যান মারিয়াছে কি না।' মিসেস এ্যানি বেসান্তের পত্রে বোধহয় লোম্যান সাহেব অত্যাচার করিয়াছে, লেখা ছিল। তাই টেগার্টের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ করা হইলেও টেগার্টের বিষয়ে কোন note-ই লওয়া হইল না। বাঙ্গালী অফিসারদের নাম করা হইলেও, কমিটি তাহা মোটেই কানে তোলে না, বলে—ওসব শুনিতে চাই না।

তদন্ত কমিটির নিকট ক্ষেত্র সেন সাক্ষ্য দিতে আসিয়া বলেন—'আমি যদি অত্যাচারের কথা এখানে প্রকাশ করি—তাহ'লে কমিটি আমাকে পুনরায় অধিকতর অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন কি না?' এ কথার উত্তরে কমিটির সদস্যেরা বলেন—'এসব প্রশ্ন আমরা শুনিব না—এর কোন উত্তরই আমরা দিব না।' ক্ষেত্র বলেন, 'তবে সাক্ষ্য দিয়া লাভ কি?' কমিটি লিখিয়া লইল—'সাক্ষ্য দিতে অসম্মত।'

কমিটি দুইজনের বিষয়ে বলেন যে, তাঁহারা সাক্ষ্য দিতে আসিয়া বলেন যে তাঁহাদের উপর অত্যাচার করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা কোথাও আবেদন বা পত্র প্রেরণ করেন নাই। আসলে ব্যাপারটি এই—কোন কোন বিপ্লবীকে তেমন কোন অত্যাচার করে নাই। তাহারা অত্যাচার করার ভয়েই হউক বা অন্য দুর্বলতার জন্যই হউক 'কনফেশান' করে, এবং বাহিরে প্রচার করে যে অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে। এইরূপ বলার উদ্দেশ্য—একরার করার কথা প্রকাশ পাইলে অপরাধ হালকা হইবে। তেমন দুইজনই তদন্ত কমিটিতে আসিয়া বলে যে, মারের জন্য তাহারা কোন নালিশ করে নাই। তাহাদের নাম অপরে দিয়াছে। সত্যই অপরেই তাহাদের নাম দিয়াছে। কিন্তু বাহির হইয়া তাহারা অত্যাচারের কথা প্রচার করিয়াছিল। কিন্তু এই দুর্বলতা পাছে

প্রকাশ হয়, পুলিশ আবারও বিরূপ হয়—এইসব কারণে আর নূতন বিপদ ডাকিয়া আনিতে চায় নাই।

নলিনীকান্ত ঘোষকে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। অবিশ্রান্তভাবে তাঁহার হাঁটুতে এতো আঘাত করে যে তাঁহার হাঁটু ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। হাঁটু ভীষণভাবে ফুলিয়া উঠে। ১৫ দিন পরে যখন তাঁহাকে অন্যত্র নেয়—তখনো পায়ের হাঁটু ও গোড়ালি অসম্ভব ফোলা ছিল। ৭ দিন (সমস্ত দিন রাত্রি) হাত-কড়া দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখে। ১৪ দিন প্রায় অনাহারে রাখিয়া যে অমানুষিক অত্যাচার করে—তাহার তুলনা নাই। এমন কোন দৈহিক ও মানসিক 'টর্‌চার্' কল্পনা করা যায় না—যাহা অবলম্বিত হয় নাই। একদিন গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবার 'আয়োজন' দেখানো হয়। ঘোষণা করে—কারমাইকেল (গভর্ণর) অর্ডার দিয়াছেন মারিয়া ফেলিলে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না। ইহাও বলে, ৪টিকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে বসন্ত চ্যাটার্জির হত্যার পর—পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার নিয়মিত ব্যাপার হয়। এর আগেও ছিল—কিন্তু এতোটা ব্যাপক ও ভয়াবহ ছিল না। পুলিশ হিংস্র হইয়া যেন বিপ্লবীদের মনে পাল্টা সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য অত্যাচার করিতে থাকে। তাহা যেমনই নিষ্ঠুর—তেমনি বর্বর। নলিনীকান্তের উপর অত্যাচার চালাইয়াও যখন কিছু করা গেল না, তখন পুলিশের বড়কর্তা হাল ছাড়িয়া বলেন—"না—এ লোকের কিছু করা যাবে না: There is something in him." পুলিশরাও পরে অনেক সময় বলিয়াছে—নলিনী ঘোষ মানুষ নয়, এ কি মানুষ সহ্য করিতে পারে!

ক্ষেত্র সেনকেও ভয়ানক পীড়ন করে। তাঁহার গোঁফ্ ছিল। গোঁফ্গুলি টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত। ফলে তাঁহার মুখ ফুলিয়া যায়। চুল উল্টা করিয়া টানা একটা সাজার সাধারণ রকম ছিল।

অনাহারে রাখার অত্যাচার—

কীড্ ষ্ট্রীটে নলিনীকান্তের ১৪ দিনে ২২ পাউণ্ড ওজন হ্রাস পায়। এইরূপ সকলেরই ওজন হ্রাস পায়। ঘুমাইতে দিত না। সরকারী বরাদ্দ ছিল প্রতিদিন দুই আনা। এক আনা বেলা। কিন্তু পুলিশ চার জনের জন্য এক পয়সার মুড়ি আনিত আর হয়তো এক পয়সার ৪টা নাড়ু। গরাদের বাহির হইতে একমুঠো করিয়া চার জনকে চার মুঠো মুড়ি দিত। জল প্রয়োজন মত দিত না।

পুলিশের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত দিত। কেবলমাত্র একজন বাঙ্গালী এ-এস-আই ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম। যেদিন তাঁহার ডিউটি থাকিত সেদিন তিনি সরকারী বরাদ্দের পুরাই দিতেন। তিনি তিন পয়সার তিনটি ছোট পাঁউরুটি ও এক পয়সার চিনি আনিয়া দিতেন। বন্দীরা তাঁহার ভদ্রব্যবহারের জন্য তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—"নাম শুনিয়া কি করিবেন? চাকুরী করিতে হয়। তবে সবাই সমান নয়—এই মাত্র।" সরকারী ব্যবস্থার খাদ্যও দেওয়া হয় নাই। তাহা ভারপ্রাপ্ত পুলিশগুলি চুরি করিয়াছে। তবে চুরির জন্যই শুধু হইতে পারে না। উহারা চুরিতো করিয়াছেই, তবে খাওয়া না দিবার অর্থাৎ কেবল নামমাত্র খাওয়া দিয়া জীবনটা রক্ষা করিবার—গোয়েন্দা বিভাগের নির্দেশ ছিল। অন্যথায় ১৪।১৫ দিন এইরূপ নামমাত্র আহার চলিতে পারে না। ১৪।১৫ দিনের মধ্যে একদিনও ভাত দেয় নাই।

এখানে উল্লেখ করা উচিত যে—ষ্টিভেন্স ও স্যার বিনোদ কমিটিতে সাক্ষ্য দানের জন্য শুধু তাহাদেরই ডাকেন, মিসেস্ এ্যানি বেসান্তের পত্রে মাত্র যাহাদের নাম ছিল। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে সর্বাধিক অত্যাচারিত হইয়াছেন—নলিনীকান্ত ঘোষ, পুলিন মুখার্জী, অমৃত সরকার ও কুঞ্জ ঘোষ প্রভৃতিকে সাক্ষ্য হিসাবে আনাই হয় নাই। কুঞ্জ ঘোষ অত্যন্ত ক্ষীণকায়। বয়স ছিল তখন ৩১। কিন্তু ওজন ছিল স্বাভাবিক অবস্থায় মাত্র ৭৮ পাউণ্ড। এই লোককে অনাহারে রাখিয়া ময়মনসিংহে ও কলিকাতায় ভীষণ অত্যাচার করে। যখন তাহাকে ডিফেন্স অফ্ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট-এ দলন্দায় নেয় (১৭ দিন পরে) তখনও তাহার জামা ও কানের পাশে রক্ত লাগিয়া ছিল।

আই-বি-র বড় কর্মচারীদের অন্যতম, রায় বাহাদুর সতীশ মজুমদার নির্যাতন অভিযোগের তদন্তকালে writer's buldingএ ছিলেন। একদিন বলেন :—মারধোর করিয়া আমরা কৃতকার্য হইতে পারি নাই। কারণ আপনাদের মতো প্রধানগণের নিকট হইতে কিছু পাওয়া যায় নাই। অত্যাচার ব্যর্থ হইয়াছে। কথা আদায় হইয়াছে অত্যাচারের ভয়ে, অত্যাচারের দ্বারা নয়। ভয়ানক অত্যাচার হইবে এই ভয়ে কারো কারো নিকট মূল্যবান প্রমাণাদি পাইয়াছি। মারিয়া বড় কিছু করা যায় নাই। জানেনই-তো সামান্য একটু কথা পাইলেই

বাকিটা আমরা যোগ করিয়া লইতে পারিয়াছি—পুলিশ কর্মচারীর এই উক্তি সত্য।

একরার করাইবার পদ্ধতি—দেখা যাইত লোক বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রকমের চেষ্টা করিত। যেমন কোন কোন অফিসার নির্যাতন করিত; আবার এরই মধ্যে একজন আসিয়া নিতান্ত ভদ্রভাবে নানাবিধ যুক্তি ও প্রলোভন দেখাইত।[১] আশুবাবুকে রায় বাহাদুর সতীশ মজুমদার বলেন :—'আপনাকে কেন যে এরা মারধোর করলে, ছিঃ!' পরে বলেন : যাক্ গে, আপনি এক কাজ করুন। আপনি পুরনো লোক অনেক জানেন। সকলের নামই বলতে পারেন। দরকার নেই। আপনি সাধারণ একজনের মত একটা confession করবেন, এতো হতেই পারে না। কারো নামই আপনার বলতে হবে না। এক কাজ করুন—আপনি কেবলমাত্র অমৃত সরকারের ঠিকানাটা বলুন। আমরা জানি, আপনি সে বাসার ঠিকানা জানেন। আমরা জানি, আপনি বৌবাজারের গলির বাসায় গিয়েছেন। এখান হতে গাড়ীতে বন্ধ হয়ে যান, যদি বাসার নম্বর মনে না থাকে দূর থেকে খড়খড়ি দিয়ে দেখিয়ে দেবেন।

—রাখুন এই দশ হাজার টাকা। এই একটা মাত্র নাম বলবেন। কেউ জানবে না—সেই সম্ভাবনাই নেই। অথচ আপনি এই দশ হাজার টাকা পেয়ে গেলেন। কত লোক arrest হয়েছে। অমৃত সরকারও তো arrest হবে, আপনি কিছু না বললেও arrest হবে। মাঝখান হতে আপনি এতগুলি টাকা পাচ্ছেন—অথচ আপনার position নষ্ট হল না। ভেবে দেখুন।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ভয় দেখাইয়াছে—রেগুলেশন থ্রি করা হইবে। অনেকে জানিত না রেগুলেশন থ্রিটা কি? বলিত, সারা জীবন একটা অন্ধকার কক্ষে থাকিয়া যাইবেন। আর, একটা নাম বলিলে—বাড়ীতে হোম-ইনটার্নড করিয়া দিব। আবার যদি আপনাদের দল গড়িয়া উঠে, এবং

১ পরবর্তীকালে ১৯৩৬ সালেও ইহা দেখা যায়। টিটাগড় মামলার আসামী প্রফুল্ল সেন বেলঘরিয়া খেলার মাঠে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়। প্রফুল্ল ঐ দিন নিরস্ত্র ছিল। ধস্তাধস্তি হয়। থানায় নিয়া পুলিশ মারধোরও করে। সংবাদ পাইয়া আই-বি-র কর্তা নলিনী মজুমদার আসেন। তিনিই চিনিতে পারেন। প্রফুল্লর সম্মুখেই পুলিশদের গালাগালি করেন। ছিঃ ছিঃ তোমরা কি পশু ইত্যাদি। পরে প্রফুল্লকে বলেন, আপনি স্কলার—ভাল ছাত্র, কত আপনার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি।

তাকে—অনায়াসে পলাইতে পারিবেন। কাহাকেও বলিত—আপনি একজন brilliant scholar, আপনি এভাবে জীবন নষ্ট করিবেন না। আপনাকে বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। আপনি Ph. D. নিয়া আসুন। দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন। এসব দল তো ভাঙ্গিয়াই গিয়াছে। যাইবেই, দেখিতেছেনই-তো, বড় বড় কেউ তো আর নাই—কেউ থাকিবেও না। আপনি দেশের নাম-করা একজন পণ্ডিত হইয়া foreign degree নিয়া আসুন ইত্যাদি।

শেষের দিকে একজন মেধাবী (স্কলার) ছাত্র বড়রকমের কন্‌ফেশন্ করিয়া সরকারী সাহায্য লইয়াছে। যাহাতে অপরেও কন্‌ফেশন্ করে সেই চেষ্টা করিয়াছে, পরে বিদেশের ডিগ্রী আনিয়াছে। কেবল নিজেই যাহা জানিত বলে নাই, অপরেও যাহাতে বিপ্লব পথ ছাড়ে এবং বলিয়া মুক্ত হয় সেইভাবে প্রচার করিয়াছে।

বাংলার বিপ্লবদলের ইতিকথা

বাংলার বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে দেশবাসী বিখ্যাত অনেক বিপ্লবীর যেমন নাম জানিতে পারিয়াছে তেমনি জানিয়াছে কয়েকটি বিপ্লবদলের নাম। এই নাম ও নামকরণ সম্পর্কে ভুল ধারণাও আছে।

বিপ্লবদলের প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা আদিস্রষ্টা তাঁহাদের বিবৃতি, লেখা ও বিভিন্ন উক্তি হইতে জানা যায় বাংলার বিপ্লবদলরূপে প্রথম কোন বিশেষ নামের দল সৃষ্টি হয় নাই। 'গুপ্ত সমিতি'র পক্ষে তখন নামের প্রয়োজন-বোধ দেখা দেয় নাই মনে হয়। ১৯০৪ সালে পুনরায় বারীনবাবু বিপ্লবদল গঠন করিতে শ্রীঅরবিন্দের পরিচয়-পত্র নিয়া আসেন এবং পি. মিত্র ও সরলাদেবী চৌধুরাণীর সহিত পরিচিত হন। বরোদা হইতে যতীন বন্দোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী) আসেন তারও পূর্বে এবং বিপ্লব সমিতি পত্তন করেন। কিন্তু তখনও গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি তাঁহারা কোন বিশেষ নামে চিহ্নিত করেন নাই। শরীর চর্চার ও আত্মরক্ষার বিবিধ কৌশল শিক্ষার জন্য এবং স্বাধীনতা তথা বৃটিশ বিতাড়নের

জন্য ইতিমধ্যে পি. মিত্রের নেতৃত্বে যে সমিতি স্থাপিত হয় উহার নাম রাখা হয় 'অনুশীলন'। এই অনুশীলনের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে অরবিন্দও ছিলেন। অনুশীলন ছাড়া 'আত্মোন্নতি' নামেও একটি দল ছিল। সতীশ সেন আত্মোন্নতির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া খ্যাত। এ ছাড়া দেখা যায় অনুশীলন ও আত্মোন্নতির প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ময়মনসিংহে 'সুহৃদ সমিতি' গঠিত হয়। এই সুহৃদ সমিতি সরলাদেবী চৌধুরাণীরই সমিতি অর্থাৎ তিনিই নেত্রী বলিয়া জানা যায়। কিন্তু দেখা যায় তখন পর্যন্ত অনুশীলন, সুহৃদ বা আত্মোন্নতির দলগত স্বাতন্ত্র্যের দানা বাঁধে নাই। এমন কি মফঃস্বলে সমিতির শাখা করিয়া উহার কি নাম রাখা হইবে এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথম প্রথম নেতৃস্থানীয়েরা এমনও বলিতেন,—যে নাম ইচ্ছা হয়, দাও। 'অনুশীলন' 'সুহৃদ' একই। অর্থাৎ সকলেরই নেতৃস্থানীয় পি. মিত্র ও অরবিন্দ। ময়মনসিংহে কোন্ নামে দল গড়া হইবে, ময়মনসিংহের জ্ঞান মজুমদারের এই প্রশ্নের উত্তরে নেতা পুলিনবিহারী দাস এইরূপ উত্তরই দিয়াছিলেন, যে নাম ইচ্ছা দাও—অনুশীলন সুহৃদ একই —একই নেতা। কলিকাতায় অনুশীলন ও আত্মোন্নতি সমিতি ছিল বটে কিন্তু 'যুগান্তর' বলিয়া কোন গুপ্ত বা প্রকাশ্য সমিতি বা দল ছিল না। বারীনবাবুদের বিপ্লব মন্ত্র প্রচার, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং গীতার বাণী প্রচার করিয়া মৃত্যুঞ্জয় স্বাধীনতার সৈনিক বা সন্তানদল গঠনের উদ্দেশ্যে 'যুগান্তর' নামে পত্রিকা পরিচালনার ব্যবস্থা হয়। বিপ্লবীদল কি চায়, দেশের লোক কি করিবে, কি করা উচিত, ইংরেজ বিতাড়ন যে সম্ভব এবং কোন পথে সম্ভব, আগুনের অক্ষরে 'যুগান্তর' দিনের পর দিন তাহাই প্রকাশ করিতে লাগিল। মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণের এবং মুরারিপুকুরে বাগানবাড়ী তল্লাস ইত্যাদির পরে বারীন বাবু ও অরবিন্দ বাবু প্রভৃতিকে লইয়া ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হইল। 'যুগান্তর' পত্রিকা ছিল এই দলের পরিচালিত কাগজ। তাই পুলিশ কখনো কখনো এই দলটিকে বুঝাইতে 'যুগান্তর' শব্দও ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু সত্যই 'যুগান্তর' নামে কোন প্রতিষ্ঠান বারীন বাবু অরবিন্দ বাবু বা কানাই সত্যেন বা কেহ গঠন করেন নাই। পরেও 'যুগান্তর' বলিতে বিশেষ একটি বা কতগুলি দলের সমষ্টিকেও বুঝাইত না। গবর্ণমেণ্ট দলিলপত্রেও 'যুগান্তর' দলের নির্দিষ্ট উল্লেখ নাই। আত্মোন্নতি দলের নেতারূপে বিপিনবাবুর (গাঙ্গুলীর) নামও শোনা যাইত। আবার বিপিন গাঙ্গুলীর দল বলিয়াও উল্লেখ করা হইত। যতীনবাবু

(মুখার্জী) যুগান্তর নাম দিয়া দল করেন নাই। পরবর্তী কালে তাঁহার সহকর্মী-দের মধ্যে অনেকে কলিকাতার অনুশীলনেরই সদস্য ছিলেন—যথা, যাদুগোপাল মুখার্জী, হরিকুমার চক্রবর্তী, মানবেন্দ্র রায়, ভূপতি মজুমদার, অতুল ঘোষ প্রভৃতি। যতীনবাবু (মুখার্জী) কলিকাতা অনুশীলনের সঙ্গে অথবা আত্মোন্নতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিনা বা কতটা যুক্ত ছিলেন তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাই না—তবে মুরারিপুকুরের তথা অরবিন্দ-বারীনের দলের সঙ্গে তাঁহার যে যোগা-যোগ ছিল তাহা নিশ্চিত। বারীনবাবুদের মেদিনীপুর শাখার নাম ছিল 'আনন্দমঠ'।*

* চিংড়িপোতা ডাকাতির (১৯০৬ ডিসেম্বরে) পর হরিকুমার চক্রবর্তী, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য অনুশীলন কেন্দ্রে যখন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ঐ স্থানে যতীন্দ্রনাথকে অনুশীলনের সতীশ বাবুর সঙ্গে বারান্দায় আলাপ করিতে দেখেন। সতীশবাবু হরিকুমার ও নরেন্দ্রকে যতীনবাবুর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। যতীনবাবু সম্পর্কে বলেন, ইনি একজন বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মী। হরিকুমার বাবুরা এই পরিচয়ে বিস্মিত হন। কারণ যতীন বাবুকে যদিও তাঁহারা ইতিপূর্বে তাঁহাদের গ্রামে (কোদালিয়া) দেখিয়াছিলেন এবং আলাপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে সরকারী চাকুরিয়া বলিয়াই জানিতেন, বিপ্লবী বলিয়া জানিতেন না। হরিবাবু বলেন, যতীন্দ্রনাথ অনুশীলন কেন্দ্রে আসিলেও তিনি ঐ সংস্থাভুক্ত ছিলেন না। বারীনবাবুদের সঙ্গে গোড়ায় তাঁহার যোগাযোগ থাকিলেও পরবর্তী কালে তাঁহার নিজস্ব কর্মধারা ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছে। হরিকুমার বাবু আরও বলেন, অনুশীলন সমিতি নিষিদ্ধ হইলে এবং অপর সব সংস্থা ভাঙ্গিয়া গেলে তাঁহাদের ন্যায় তরুণ কর্মিগণ যখন নূতনভাবে কর্মক্ষেত্রে নামিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন (সতীশবাবুদের কর্মনীতিও যখন তাঁহাদের আর আকৃষ্ট করিতে পারে না) তখন একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নায়কের সন্ধান করিতে গিয়া যতীন্দ্রনাথের প্রতিই তাঁহারা আকৃষ্ট হন। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার পরে কিছুকাল যতীন্দ্রনাথকে অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনে কন্ট্রাক্টরের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হয় (হরিবাবু বলেন, স্যার ব্রীজের) ; প্রকৃত প্রস্তাবে দামোদর বন্যায় সেবা কার্যে সমবেত কর্মিগণের সঙ্গে যোগাযোগের পর হইতেই যতীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে—নূতন করিয়া বিপ্লব-কর্মের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত অতুল ঘোষ বলেন, যতীন্দ্রনাথের পল্লীনিবাস ও আমাদের পল্লীনিবাস সন্নিকটেই। আমাদের কলিকাতার গৃহেও তিনি আসিতেন। আমাদের ব্যায়াম সমিতিতেও তিনি আসিতেন। কিন্তু আমরা ছিলাম অনুশীলনভুক্ত, যতীনবাবু কোন্ দলভুক্ত জানিতাম না। কিন্তু তিনি যে অরবিন্দ-বারীন্দ্রের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন তাহা নিশ্চিত। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী যাইবার পর খুলনার বিজয় নাগকে দিয়া একটি 'মেসেজ' পাঠান। অতুলবাবু বলেন, তিনি কিছুটা

পূর্বোক্ত কলিকাতার অনুশীলন সমিতিরই শাখা হয় ঢাকায়। এই শাখা স্থাপন উপলক্ষে পি. মিত্র ও বিপিন চন্দ্র পাল ঢাকায় গমন করেন।

ঢাকা সমিতি—পুলিনবাবুর নেতৃত্বগ্রহণ। পি. মিত্র ও বিপিন চন্দ্র ঢাকা গমন করেন ১৯০৫ সালে। পুলিনবাবুকে দীক্ষা দেন পি. মিত্র মহাশয়। ঐ দীক্ষা দিনেই ঢাকায় বিপিন চন্দ্র 'নেতার আদেশ' সর্বাবস্থায় মানিতে হইবে, ইহা বলিয়া জানান, 'পি. মিত্র আমাদের নেতা, ছাত্রদের পিকেটিংএ যোগ দেওয়া আমার মত ছিল, কিন্তু নেতা অমত করা মাত্র আমি তাহা নির্বিবাদে মানিয়া লই।' সেই বৈঠকেই পি. মিত্র বলেন, কেবল স্বদেশী বয়কটে ইংরেজ দেশ ছাড়িবে না। কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, কিসে যাইবে? মিত্র মহাশয় দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন—"মেরে তাড়াতে হবে। আমাদের অসি কোষমুক্ত হয়েছে, আর পেছুলে চলবে না।" পুলিনবাবুর উপর পূর্ব বাংলায় সমিতি সংগঠনের ভার প্রদত্ত হইল। কলিকাতার ভার রহিল সতীশ বসুর উপর। বলা বাহুল্য, পি. মিত্র সর্বাধিনায়ক। এই সময় পি. মিত্রের সংগে শ্রীঅরবিন্দের কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হইতেছিল। তাহা উভয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কে না হউক উভয়ের অনুরাগীদের দ্বারা ঘটিতেছিল। প্রকৃতপক্ষে মুরারিপুকুরের গুপ্ত আড্ডায় অস্ত্রসংগ্রহ, বিপ্লবাত্মক কর্মপ্রয়াস,—মজঃফরপুরের অভিযান—

দূরে ছিলেন, উক্ত 'মেসেজে' কি ছিল জানিতেন না। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ উচ্চকণ্ঠে বিজয় নাগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তিনি সুস্পষ্ট শুনিতে পান। তাহা এই:—"অরবিন্দকে বলিবেন, বাংলায় যতীন মুখার্জী এখনও বেঁচে আছে।"

অতুলবাবু বলেন, কুষ্টিয়ার দিকে দেখিয়াছি অফিস ছুটির দিন তিনি ঐ অঞ্চলে গিয়াছেন। সাইকেলে করিয়া ঘুরিতেন, সঙ্গে থলিয়া ভরিয়া নিতেন গীতা ও বিবেকানন্দের বই। তাহা ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করিতেন। যতীনবাবুর দৈহিক সামর্থ্যের কথা প্রচারিত ছিল। তিনি যে অঞ্চলেই যাইতেন তথাকার ছেলে মহলে সাড়া পড়িয়া যাইত, তিনি নানা উপদেশ দিতেন। তিনি এইভাবে তরুণদের নিকট বিশেষ আকর্ষণীয় ছিলেন। অতুলবাবুও বলেন, পি. মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুর পর সতীশবাবুর তখনকার কর্মনীতি তাঁহাদের বিপ্লব আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিতে পারিত না। তাঁহারা পথ খুঁজিতেছিলেন। যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে তাঁহারা আকৃষ্ট হন। যতীন্দ্রনাথের বিশেষ অন্তরঙ্গ ও সহকর্মী শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারের উক্তির মর্ম: বারীন বাবুদের গ্রেফ্‌তারের পরে কলিকাতার দিকে যে সকল বিপ্লব কর্মানুষ্ঠান হইয়াছে উহার দায়িত্ব ও নেতৃত্ব প্রধানতঃ যতীন্দ্রনাথের।

বারীনবাবুর নেতৃত্বেই হইয়াছিল, সতীশবাবু বা মিত্র মহাশয়ের সাক্ষাৎ সম্পর্ক উহাতে ছিল না এবং দুইটি দল যেন স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। পরবর্তী কালে কলিকাতায় মূল অনুশীলন সমিতির কর্মপ্রবণতা দেখা যায় না। পি. মিত্রের মৃত্যুর পরে ক্রমশঃ সংস্থা হিসাবে উহা স্তিমিত হইয়া আসে। কিন্তু এই মূল সমিতির শাখা হিসাবে ঢাকা অনুশীলন সমিতি সুবিস্তৃত হইয়া পড়ে। পরবর্তী কালে অনুশীলন বলিতে ঢাকার এই অনুশীলন সমিতিকেই সাধারণতঃ বুঝাইত। এই অনুশীলনই পূর্ব ও উত্তর বাংলায়, কলিকাতায় এবং বাংলার বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে। ভারত গবর্ণমেন্ট ১৯০৯ সালে যে কয়টি বিপ্লব সমিতিকে বিপজ্জনক মনে করিয়া সমিতিগুলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন, তাহাতে কলিকাতার দিকের কোন সমিতির উল্লেখ নাই— না কলিকাতা অনুশীলন, না আত্মোন্নতি, অথবা অন্য কোন দল। সিডিশান কমিটির রিপোর্টেও কলিকাতা অনুশীলন বা অন্য সমিতির নাম—বে-আইনী ঘোষিত সমিতির তালিকায় নাই। কিন্তু কলিকাতা অনুশীলনের সদস্য, অতুলবাবুর মতো আরো কেহ কেহ, বলেন—কলিকাতা অনুশীলন সমিতিও নিষিদ্ধ করা হয়। হয়ত পরে 'গেজেট' হইয়া থাকিবে, অথবা এই ধারণাই প্রচলিত ছিল। এক উত্তর কলিকাতায়ই ৪০।৫০টি অনুশীলনের আখড়া ছিল বলিয়া জানা যায়। বস্তুতঃ পুলিশ কলিকাতার বিপ্লবী কর্মী ও নেতাদের পিছনে লাগিয়া থাকিয়া ঐ সময়ে তাহাদেরও ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। ঢাকার অনুশীলন, ময়মনসিংহের সুহৃদ ও সাধনা (হেমন্ত আচার্যের দল), বরিশালের স্বদেশবান্ধব ও ফরিদপুরের ব্রতী সমিতির উপরই ১৯০৯ সালে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। তবে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে অনুশীলন ব্যতীত আর চারটি সমিতির নামই ক্রমে তলাইয়া যায়। কোন কোন সমিতির নাম প্রথম বেশ শোনা গিয়াছিল। পরে ঐ সকল দলের কর্মীদের ও তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কাজকর্মের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া সরকারী দলিলপত্রে এবং বিপ্লবীদের মধ্যেও স্থানের নাম ব্যবহৃত হইত—যথা বরিশালের দল, ময়মনসিংহের দল, মাদারিপুরের দল, কলিকাতার দল, উত্তর বঙ্গের রংপুর ও বগুড়ার দল, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তাহাতেও সঠিক পরিচয় মিলিত না—কারণ বরিশাল দল বলিতে বরিশালের বিপ্লবীদের সকলকার একটি সংঘবদ্ধ দল বুঝাইত না, বোঝান সম্ভব ছিল না। বরিশালে যেমন মনোরঞ্জনবাবু বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন তেমনি অনুশীলনের যতীন্দ্রনাথ বা ফেণুরায়ও

বিশিষ্ট কর্মী। ফরিদপুরেও তাই; অন্যত্রও তাহাই। কর্মীরা একই জেলা বা সহরে কাজ করিলেও—ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে কাজ করিত। সুতরাং স্থানের নামেও শেষটায় সঠিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইত না। তাই দলের নেতার নামেই দলের পরিচয় চলিত। বিশেষ করিয়া পরবর্তীকালে তাহাই হইয়াছে। যথা: পূর্ণদাসের দল বলিতে মাদারীপুরের একটি বিশিষ্ট সংস্থাকে বুঝাইত। তেমনি হেমেন্দ্র আচার্যের দল বলিতে ময়মনসিংহে (সুরেন ঘোষ প্রভৃতি) একটি বিশেষ দলকে বুঝাইত। মানুষ নিজের নাম নিজে রাখে না, অপরেই নানা প্রয়োজনে নামকরণ করে তাহাতে কিছু যায় আসে না, পরিচয়ে গোলযোগ না হইলেই হইল। বহু বিপ্লবীদল নেতার নামে চলিত—তাই "দাদার দল" কথাটা কতকটা ঠাট্টাসূচক হইয়া পড়িয়াছিল।

উপরোক্ত যে সকল দলের নাম করা হইল—তাহা ছাড়া আরও দল ছিল। ঢাকায় শ্রীসংঘ, পরে বি-ভি, নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ, অনিল রায় প্রভৃতি। পরবর্তীকালে ঐ দলের কর্মানুষ্ঠান বিপ্লব ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। যথাস্থানে তাহার উল্লেখ আছে।

১৯১৪।১৫ সালে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যখন বাংলার কতকগুলি দল সংঘবদ্ধ হইয়া বিপ্লব সাধনায় অগ্রসর হয়, তখনও 'যুগান্তর' নাম পরিগৃহীত বা প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে এই সমস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দলের অস্তিত্বের অসুবিধা অনুভূত হওয়ায় এবং একটি নির্দিষ্ট নামে দল গড়িয়া না উঠাতে কর্মক্ষেত্রে অসুবিধা হইতে থাকায় যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে সকল দল একত্র হইয়াছিল সেই একত্রিত দলগুলিকে একটি নামে পরিচিত করিয়া ব্যক্তির পরিবর্তে নির্দিষ্ট একটি নামে পরিচয় দিবার সিদ্ধান্ত হয়। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন দলগুলিই কিছুদিন হয় "যুগান্তর" দল বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেছিল। এই সম্পর্কে এই বিভিন্ন দল লইয়া গঠিত হালের 'যুগান্তর' দলের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি বরিশাল দলের মনোরঞ্জন গুপ্ত বলেন: "যুগান্তর দল প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি উপদলের সমষ্টি—একটা সংহত সংঘবদ্ধ এককেন্দ্রিক দল নয়। এই উপদলগুলির নিজস্ব পৃথক পৃথক ইতিহাস আছে, পৃথক পৃথক নেতৃত্ব (Leadership) ও শাসন-শৃঙ্খলা (Discipline) আছে।" (আনন্দবাজার স্বাধীনতা সংখ্যা—১৯৪৭)—এইরূপ পৃথক পৃথক সত্তার অস্তিত্ব ও চেতনা বজায় রাখিয়া একটি কার্যকরী ও শক্তিশালী জমাট বিপ্লব সংস্থা গড়িয়া তোলা ও

দীর্ঘদিন রক্ষা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হাতে নাতে কাজ করার মানুষের নেতৃত্ব-মাহাত্ম্যে এবং ঐ সময়কালের (১৯১৪-১৫ সালের) 'উপদল'গুলির প্রয়োজন-বোধ হইতে মিলন সম্ভব হয়। মনোরঞ্জনবাবু বলেন—যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীনে বরিশালের প্রজ্ঞানানন্দের দল—মাদারীপুরের পূর্ণদাসের দল—ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যের দল, কলিকাতার অতুল ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলী, জ্যোতিষ ঘোষ, হরিশ সিকদারের দল, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও হরিকুমার চক্রবর্তীর দল, উত্তরবঙ্গের যতীন্দ্র রায়ের দল মিলিত হন এবং প্রকৃতপক্ষে একই নেতৃত্বাধীনে একযোগে বিপ্লব কার্যকরী করিতে আত্মনিয়োগ করেন।"

এদিকে দেখা যায় ঢাকার অনুশীলন দল। ১৯১১।১৯১২ সাল হইতে এই দলের কেন্দ্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়;—উহার ব্যাপক কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালিতে এবং উত্তরবঙ্গের রাজসাহী বিভাগে, কুচবিহারে, সিলেটে, কলিকাতায়, বিহারে, পাঞ্জাবে ও যুক্তপ্রদেশে।

অনুশীলনের সঙ্গে চন্দননগরের মতিলাল রায় ও রাসবিহারী বসুর বিপ্লবী-দলের ১৯১২ সালেই যোগাযোগ ঘটে। অনুশীলনের মাধ্যমেই কাশীর শচীন্দ্রনাথ সান্যালের রাসবিহারীর সহিত পরিচয় ঘটে। ১৯১৩-১৪-১৫ সালে কার্যকরীভাবে রাসবিহারীবাবুর নেতৃত্বে অনুশীলন ও কাশীর দল সম্পূর্ণ মিশিয়া যায়। রাসবিহারীর উত্তর ভারতের সংস্থার সঙ্গে এই সূত্রেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। ভারতব্যাপী বিপ্লবসাধনের জন্য এই মিলিত দলের প্রয়াসে নেতৃত্ব করেন বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী। এই মিলিত দল সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁহার "বন্দীজীবনে" লিখিতেছেন :—"পুলিনবাবু ১৯০৯ সালে নির্বাসিত হন। ১৯১০ সালে মুক্তিলাভ করেন, মুক্তির অল্পকাল পরেই ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত ও দণ্ডিত হইয়া দ্বীপান্তরে ৭ বৎসর আবদ্ধ থাকেন; ১৯১০ সালের পরে পুলিনবাবুর সাক্ষাৎ নেতৃত্ব থাকে না;—(শচীন্দ্র ইহাই বলিতেছেন) যাঁহারা ঢাকা সমিতির নেতৃস্থানীয় ছিলেন (এই সময়ের নেতৃস্থানীয় নরেন্দ্র সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, অমৃত হাজরা প্রভৃতির কথাই শচীন্দ্র-বলিতেছেন) তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে দেশের বিভিন্ন দল মিলিয়া সম্পূর্ণ একমত হইতে না পারিলে দেশের মঙ্গল নাই। তাই তাঁহারা দেশের

সকল দলের সহিতই মিলিতে ইচ্ছুক হইলেন। সেইজন্যই ঢাকা সমিতি চন্দননগর দলের সহিত মিলিত হইয়া যায়। কাশীর দলও এই ঢাকা সমিতির মারফতেই রাসবিহারীর উত্তর ভারতের দলের সহিত পরিচিত হয়। এইরূপে আমাদের দল পূর্ব বাংলা হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া একযোগে কাজ করিতে থাকে। লাহোর, দিল্লী, কাশী, চন্দননগর ও ঢাকার বিপ্লবীদল এইরূপে সর্বাংশে এক হইয়া যায়। একথা কিন্তু বাংলার অবশিষ্ট বিপ্লবীদল ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই।"—'বন্দীজীবন'—শচীন্দ্র সান্যাল।

'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতে বিপ্লব প্রয়াস' অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—'কারণ যাহাই হউক সমগ্র বাংলার বিপ্লববাদীরা একযোগে কাজ করিতে পারেন নাই। এই সম্পর্কে যাহা জানা গিয়াছে—তাহা উল্লেখ করিতেছি :—

শ্রীঅতুল ঘোষ বলেন, ১৯১৪ সালের শেষ দিকে চন্দননগর হইতে মতিলাল রায়ের পত্র নিয়া একজন মারাঠি যুবক আসেন। অপরিচিত। অতুলবাবু পত্রানুযায়ী চন্দননগরে যান। সেখানে শুনেন, রাসবিহারী বেনারসে দেখা করিতে চান। এই সংবাদ যতীনবাবুকে দেন এবং যতীনবাবু, নরেন্দ্র ও অতুল বেনারসে গিয়া রাসবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে তাঁহারা রাসবিহারীর মুখে সৈন্যদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা শুনেন। রাসবিহারী সম্ভাব্য আয়োজনের কথা জানাইয়া বলেন, সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে তাঁহারা সদলবলে তাহাতে যোগ দিবার জন্য যেন ব্যবস্থা করেন। দুই একজন শিখের নিকটও পরিচয়-পত্র দেওয়া হয়। ইহাতে ইহাই বুঝা যায়, রাসবিহারীর পূর্বোক্ত সর্বভারতীয় সৈন্য অভ্যুত্থান প্রয়াসের সঙ্গে যতীনবাবুদের সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল না। থাকিলে মতিবাবুর মারফতে তাহাদের ডাকিয়া নিয়া আসন্ন বিদ্রোহের প্রয়াস-প্রচেষ্টার কথা বলিতে হইত না।

স্পষ্টতঃই বুঝা যায় সৈন্যদল-সাহায্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং জার্মান অস্ত্র আমদানী প্রয়াস প্রচেষ্টা স্বতন্ত্র ভাবেই হইয়াছিল। গুপ্ত বিপ্লবপন্থার প্রকৃতি ও ধারা অনুযায়ী ইহাই স্বাভাবিক। কোন বিশেষ সংস্থা কর্তৃক কোন কর্মনীতি আরম্ভ হইলে তাহা ভিন্ন দলের নিকট হইতেও যথাসম্ভব গোপনই রাখা হইত। বেশী জানাজানি আশঙ্কা করিতেন। তাই দেখা যায়, পরিকল্পনা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসার পর রাসবিহারী যতীন্দ্রনাথকে উহা জানানো প্রয়োজন মনে করিয়াছেন, তৎপূর্বে নহে। ইহাও লক্ষ্য করিবার, যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অনুগামিগণ

সৈন্ত সাহায্যে বিদ্রোহ ঘোষণার সম্ভাবনার কথা জানিয়াও উহার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টাই চালান নাই।* পয়ন্ত ইতিমধ্যে জার্মান অস্ত্র সাহায্যের সূত্রে যে কর্মনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারই সাফল্যের জন্য সর্ব শক্তি নিয়োগ করেন। যতীন্দ্রনাথের তখনকার অনুগামিগণও বলেন, তাঁহারা যদিও রাসবিহারীর সৈন্যদের অভ্যুত্থানের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন কিন্তু কার্যতঃ তাঁহারা জার্মান অস্ত্র লাভ ও উহার সাহায্যে বিদ্রোহের জন্যই সচেষ্ট ছিলেন। উহারই উদ্দেশ্যে সিগন্যালিং প্রভৃতি অভ্যাস করিতেন ও করাইতেন।

এদিকে ইহা যেমন সত্য তেমনি রাসবিহারীর সংস্থা এবং তাহার সঙ্গে সংযুক্ত অনুশীলন, ও শচীন্দ্র প্রভৃতিও জার্মান অস্ত্র গ্রহণ ব্যাপারে বা উহার গ্রহণের আয়োজনে যুক্ত ছিলেন না। উক্ত প্রয়াস সফল হইলে অবশ্য তাঁহারাও যোগ দিতেন। এই সম্পর্কে বিশিষ্ট বিপ্লবী নায়ক যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় যে বিবৃতি দিয়াছেন (ডাঃ ভূপেন দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসে' প্রকাশিত) তাহা এই : "জার্মানি থেকে অস্ত্রশস্ত্র এসে গেলে ঢাকা অনুশীলনের সাহায্যে পাওয়া যাবে, এই ভরসা আমাদের ছিল।" যাদুবাবুর এই উক্তি হয়ত, তাঁহার নিজস্ব অভিমত অথবা ধৃত হন নাই এমন সব তখনকার অনুশীলনের নেতৃস্থানীয়দের উক্তি হইতে এইরূপ ধারণা তিনি করিয়া থাকিবেন।

* তেমনি দেখা যায় রাসবিহারী ১৯১৪ সালের শেষভাগে কেদারেশ্বর গুহের নিকট জার্মান অস্ত্র সাহায্যের কথা জানিয়াও—কার্যতঃ ঐ দিকে অগ্রসর না হইয়া—সৈন্যদলের সাহায্যে বিদ্রোহ আরম্ভের কার্যেই রত থাকিতেছেন—১৪১ পৃষ্ঠা, রাসবিহারীর উক্তি দ্রষ্টব্য।

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসে' বিপ্লবী নায়ক শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরে তাঁহারই বিবৃতি বলিয়া যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা এই: "বেনারসে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রাসবিহারী যতীনদাকে ডেকে পাঠান। তাঁকে বাংলার ভার দিয়ে তিনি নিজে উত্তর ভারতের চার্জে থাকেন।" রাসবিহারীর সঙ্গে যতীনবাবুর সাক্ষাৎ ব্যাপারে উপস্থিত ছিলেন—অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ও নরেন্দ্র ভট্টাচার্য ; যাদুবাবু ছিলেন না—সুতরাং "যতীনবাবুকে বাংলার ভার" রাসবিহারী কেমন করিয়া দিতে পারেন তাহা বোধগম্য নহে। তিনিই একবার বলিতেছেন—যুদ্ধের অবস্থায় দেশব্যাপী বিপ্লবে ঢাকা অনুশীলন এই ভাবে আসে নি ; আবার এদিকে বলিতেছেন —ঢাকা অনুশীলন রাসবিহারীর সঙ্গে সরাসরি যোগ রেখেছিল।—যাদুবাবুর সম্পূর্ণ উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে কিনা জানি না, যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা বিভ্রান্তিকর মনে হয়। বাংলার গুপ্ত বিপ্লব দলের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা যাঁহারা জানেন তাঁহারাই বুঝিবেন—কাহারো পক্ষে কাহাকেও একটা

এই প্রসঙ্গে—যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে আর সকল দল মিলিলেও অনুশীলন মিলে নাই, এই ধরণের কথাও উঠিয়াছে। যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বেই, ১৯১৪ সালের প্রথম ভাগেই, যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার প্রস্তাব হয়। অনুশীলনের প্রতুল গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, রবি সেন প্রভৃতি যতীনবাবুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। শিয়ালদহের নিকট আর্যনিবাসে যতীন্দ্রনাথ ঝিনাইদহ হইতে আসিয়া থাকিতেন। একদিন যতীন্দ্রনাথের নিকট উক্ত আর্যনিবাসে প্রতুলবাবু ও রবিবাবুর সঙ্গে লেখকও ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ ভাবী কর্মনীতি সম্পর্কে ডাকাতি কর্ম বন্ধ করার প্রতি বিশেষ জোর দেন। অনুশীলনের পক্ষ হইতে বলা হয়, বিপ্লবানুষ্ঠানের প্রস্তুতির প্রয়োজনেই ডাকাতি। মিলিত কর্মসূচী অনুযায়ী মিলন ঘটিলে এবং সকলে মিলিয়া এক সংস্থাভুক্ত হইলে, সংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী ডাকাতি পরিত্যক্ত হইতে কোনই বাধা নাই। নানা কথার পর উক্ত আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। অতঃপর আরো একদিন শ্রীদাম মুদি লেনে অতুলবাবুর বাড়ীতে (অতুলবাবুর মাধ্যমেই অনুশীলনের কর্মীদের সংগে যতীন্দ্রনাথের সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইত) সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়। সেদিন যতীন্দ্রনাথ অপর বিশেষ প্রয়োজনে অল্প সময় থাকিয়াই চলিয়া যাইতে বাধ্য হন, আর একদিন বিশদ আলাপ হইবে বলিয়া যান। ইহার

গোটা বাংলার ভার দেওয়া বাস্তবতার সহিত সম্পর্কহীন অথবা বাত্‌কে বাত্‌—মূলাহীন। তাহা ছাড়া অতুলকৃষ্ণের উক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃত অবস্থার সহিত উহার সামঞ্জস্য আছে।

যাদুবাবুর আর একটি উক্তি: "ঢাকা অনুশীলন সকেন্দ্রিক ছিল। আমরা ছিলাম বিকেন্দ্রিক; উদ্দেশ্য পুলিশ যদি একটার খবর পায় সেইটাই ভাংগবে, বাকীগুলি বেঁচে যাবে।" এই উদ্দেশ্যে পরামর্শ করিয়া বিভিন্ন দলগুলি বিকেন্দ্রিক ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। পূর্বেই স্বতন্ত্র দল ছিল (মনোরঞ্জন গুপ্তের বিবৃতি দ্রষ্টব্য)। আর সকেন্দ্রিক দল ঢাকা অনুশীলন—পুলিশের চেষ্টায় দুই দিনেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ইহাও সত্য নহে। এই সম্পর্কে শচীন সান্ন্যালের ধারণা এইরূপ: পুলিনবাবুর পর ঢাকা সমিতিতে কাহারো একচ্ছত্র আধিপত্য থাকে নাই, তখন হইতে সমিতি অনেকটা গণতান্ত্রিক আদর্শে গড়িয়া উঠে।…কোন একজন নির্দিষ্ট নেতা না থাকায় ইহা শেষ পর্যন্ত ঢাকা অনুশীলন সমিতি নামেই পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। এইরূপে একজনের নেতৃত্ব না থাকায় এই দল যে কিছু কম শক্তিশালী হইয়াছিল তাহাও নহে; কারণ যত বড় তুফান এই ঢাকা সমিতিকে সহ্য করিতে হইয়াছে এতো আর কোন দলকে করিতে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বারবার বিষম বিপদে পড়িয়াও আবার মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে। (বন্দীজীবন—২য় খণ্ড)

তিন চারদিন পরেই প্রতুল গাঙ্গুলী ও লেখক ধৃত হন। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ)-ও ধৃত হন। ইহার পরবর্তী প্রয়াস সম্পর্কে নরেন সেন বলেন, তিনি ঢাকা হইতে এই সময় কলিকাতা আসেন। অনুশীলনের বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও ক্ষিতীশ ব্যানার্জী যতীনবাবুর সংগে মিলিয়া একযোগে কাজ করিবার প্রস্তাবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। সকল কথা শুনিয়া নরেন সেন বলেন, 'অনুশীলন কোন আঞ্চলিক সংস্থা নয়। বর্তমানে ইহা All India সংস্থা হিসাবে চলিতেছে। সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া কাজ করিতে হইলে তাড়াহুড়া করিলে ফল ভাল হইতে পারে না। আমাদের বাংলার বাহিরের নেতৃস্থানীয়গণের সঙ্গেও বিশেষ পরামর্শের দরকার। অনেকগুলো দল একত্র হইয়াছে, ভালই; তাহারা সংস্থা বৃদ্ধি করুক। তোমরাও organisation বাড়াও; কার্যকালে মিলন হইবেই। আমরা রাসবিহারীর সঙ্গে যেমন মিলিয়াছি সেইরূপ যতীনবাবুর সঙ্গেও মিলিতে পারিব।' ইহার অল্পকাল পরেই নরেন সেনও কলিকাতার গ্রীয়ার পার্কে ধৃত হন।

এখানে প্রসঙ্গতঃ রাসবিহারীর একটি উক্তি এই সুদীর্ঘকাল পরেও কানে বাজিতেছে। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে আর্যনিবাস, শোভাবাজার ও শ্রীদাম মুদি লেনে মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে যে সকল কথাবার্তা হয় তাহা কলিকাতায় গোপন কেন্দ্রে রাসবিহারীকে সবিস্তারে বলা হইলে তিনি রবি সেন ও লেখককে বলেন—এই জন্য ভাবিত হইবার কোন হেতু নাই। ইহা বলিয়া রবীন্দ্রনাথের গানটি উদ্ধৃত করেন—

"ঘণ্টা যখন উঠবে বেজে
    আসবে সবাই আপনি সেজে
এক সঙ্গে সব যাত্রী যত
    একই রাস্তা লবেই লবে"

বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ রাসবিহারীর এই জ্বলন্ত বিশ্বাস ও প্রত্যয় বাংলার সকল দল এবং সকল নেতা ও কর্মী সম্বন্ধেই সমান প্রযোজ্য।—

'রাসবিহারী ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে যখন কলিকাতার নিকটে কোথাও ছিলেন—তখন তিনি কলিকাতা অঞ্চলের বিভিন্ন দলের নিকট মেলামেশা করিবার প্রস্তাব পাঠান' বলিয়া শচীন্দ্র যাহা 'বন্দীজীবনে' লিখিয়াছেন, তাহা

অপর দলের অনিচ্ছার দরুণ ব্যর্থ হইয়াছে মনে করি না; নানা বাধা ও ব্যতিব্যস্ততাই উহার ব্যর্থতার কারণ মনে হয়।

শচীন্দ্র রাসবিহারীর ভারত ত্যাগের ২।৩ মাস পরেই ধরা পড়েন। রাসবিহারীর অপর দক্ষিণ হস্ত নগেন্দ্র দত্ত তখনো বাহিরে থাকিয়া সংস্থার সংহতি রক্ষা ও দলের বিস্তার সাধনে রত ছিলেন—এবং রাসবিহারী অস্ত্র লইয়া অথবা অস্ত্রের বন্দোবস্ত করিয়া সত্বরই আসিবেন এই আশা পোষণ করিতে থাকেন। এই নগেন্দ্রনাথ ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা হইতে নাটোর যাত্রাকালে নাটোর ষ্টেশনে ধৃত হন। শচীন্দ্র বলেন—"জেলে নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'রাসবিহারী সংবাদ পাঠাইয়াছেন শীঘ্রই দেশে ফিরিতেছেন।' রাসবিহারীর সঙ্গে কথা ছিল বিপ্লব চালাইবার পক্ষে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করার সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলে তবেই তিনি দেশে ফিরিবেন। তাই 'দেশে ফিরিতেছি' এই সংবাদ পাইয়া আমরা মনে করি যে তিনি উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন।" (বন্দীজীবন)।

বিভিন্ন দলে সহযোগিতাও ছিল

বাংলায় কতগুলি বিপ্লবীদল থাকিলেও—বিপ্লবীগণ শুধু দলাদলিই করিয়াছেন —ইহা সত্য নহে। একদল অপর দলের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা তো করে-ই নাই, বরং আপদে-বিপদে একে অপরকে সাহায্য করিয়াছে—ইহার বহু প্রমাণ আছে। বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট নেতা ও কর্মীদের মধ্যে আলাপ পরিচয় ছিল—সৌহার্দ্য দেখিয়াছি। কখনো কখনো এক সংস্থা হইতে অপর সংস্থায় কোন কোন কর্মী গিয়াছেন—তাহা অনেকটা ব্যক্তিগত রুচির দরুণ এবং স্বীয় বিশ্বাস বা অভিরুচি মতো কাজ করিবার সুযোগ লাভের আগ্রহে। ইহা লইয়া বিরোধ বা কলহ ঘটিয়াছে, দেখি নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ্লবদলে কলহ হইয়াছে কংগ্রেস আন্দোলন সম্পর্কে; অন্যথায় বিপ্লবপ্রয়াস ও বিপ্লবকর্মানুষ্ঠান চলিবার কালে দলাদলির পরিবর্তে পরস্পর সাহায্য ও সহযোগিতা-ই করিয়াছে।

কলিকাতা মুসলমানপাড়ায় বসন্ত চ্যাটার্জীর বৈঠকখানায় আক্রমণ চালাইতে গিয়া যে দুর্ঘটনা ঘটে তাহাতে বোমা বিস্ফোরণের ফলে অনুশীলনের কর্মী আহত নগেন সেন মির্জাপুর ষ্ট্রীটে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়া ধৃত হয়,—অপর যুবক কালী মৈত্রও গুরুতর রূপে আহত হয়। এই আহত বিপ্লবী কালী মৈত্রকে ঢাকা

অনুশীলনের খগেন চৌধুরী, প্রফুল্ল বিশ্বাস, প্রবোধ বিশ্বাস (পরে দলদ্দা হইতে পালায়) গোপনে চিকিৎসার জন্য কলিকাতার বিশিষ্ট বিপ্লবী নায়ক অতুলকৃষ্ণ ঘোষের ২নং শ্রীদাম মুদি লেনের বাটীতেই প্রথম লইয়া আসেন। অতুল বাবু কালী মৈত্রকে তাঁহাদের মানিকতলা মেসে নিয়া রাখেন। এই সম্পর্কে প্রবোধ বিশ্বাস বলেন,—আমরা ২।৩ জন রোগীকে নার্স করিতে যাইতাম, বড় ডাক্তারকে সাহায্য করিতে একজন ছাত্র-ডাক্তার মত যাইতেন—(প্রবোধ বলে, তিনিই যে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাহা পরে চন্দননগরে পলাতক অবস্থায় একত্র থাকিয়া জানিয়াছি)—ডাক্তারের ব্যবস্থাদি অতুলবাবুরাই সব করিতেন। এই সম্পর্কে স্বয়ং অতুলবাবু বলেন,—"১৯১৪ সালের শেষ ভাগ—পুলিশ অত্যন্ত active—অত্যন্ত গোপনে চিকিৎসা করাইতে হইবে বলিয়া দাদাকে (ডাক্তার অঘোর ঘোষকে) দিয়াই অপারেশন করাই। দাদাকে প্রকৃত ঘটনা পূর্বে বলি নাই। কিন্তু অপারেশন করিতে গিয়াই বোমার Splinter (টুকরা) দেখিতে পান। পরে দাদা মাকে বলেন—ওদের জন্যে আমাকে জেলে যেতে হবে দেখ্‌চি।"

গৌহাটি খণ্ডযুদ্ধের অন্যতম সৈনিক মণীন্দ্র রায় বলেন: ১৯১৮ সালে অনুশীলনের গৌহাটি কেন্দ্রে পলাতক নগেন চক্রবর্তীদের নিকট হইতে (ময়মনসিংহে হেমেন্দ্র আচার্য তথা সুরেন ঘোষদের সংস্থার বিশিষ্ট কর্মী নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী ও সতীশ ঠাকুর কুচবিহারের প্রান্ত সীমায় দলের আশ্রয়-কেন্দ্রে ছিলেন)। দারুণ অর্থাভাবের সংবাদ আসিতেই,—গৌহাটি কেন্দ্রের নেতা নলিনীকান্ত ঘোষ মণীন্দ্র রায়কে অর্থ দিয়া গোপন ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন। মণীন্দ্র গোপনে অর্থ দিয়া আসেন।

চন্দননগরে বিভিন্ন দলের ফেরারী ও বিপ্লবী কর্মিগণ শুধু পরস্পরকে সর্বরকমে সাহায্যই করেন নাই; নটবর দাসের বাড়ীতে তাঁহারা একত্রই রহিয়াছেন।

তেমনি দেখিতে পাই—গৌহাটি কেন্দ্রের আশ্রয়-স্থলে বিখ্যাত বিপ্লবী নায়ক অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সতীশ চক্রবর্তী প্রভৃতি থাকিতেছেন, যাওয়া আসা করিতেছেন।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে যে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ আছে তাহা এই:—আসামী প্রফুল্ল সেনের নির্দেশে যে ফেরারীকে কালীপদ ভট্টাচার্য আশ্রয়

দিয়াছিল,—সেই ফেরারী চট্টগ্রাম অস্ত্রলুণ্ঠন মামলার ফেরারী আসামী ক্ষীরোদ।

বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী বলেন—কুমিল্লায় ১৯১৫ সনে সংযুক্তযুগান্তর দলের অনুষ্ঠিত বলদা ডাকাতির ব্যাপারে তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া যে কর্মভার দেওয়া হয়, তাহা তিনি পালন করেন—ন্যস্ত অস্ত্রাদি ও অর্থ নির্দেশ-মত গ্রহণ করেন এবং নির্দিষ্ট স্থানে তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। অনুশীলনের নগেন সেনের নিকট কতগুলি মসার পিস্তল অতুলকৃষ্ণ ঘোষ রাখেন। উহা অতুলবাবুদের নির্দেশিত স্থানে গোপনে প্রেরিত হয়।

টিটাগড় মামলার প্রখ্যাত বিপ্লবী প্রফুল্ল সেন বলেন—বরিশাল সংস্থার বিপ্লবী নায়ক বিখ্যাত মনোরঞ্জন গুপ্তের ভ্রাতা নিশিকান্ত গুপ্ত ছিলেন বরিশাল চন্দ্রহার স্কুলের শিক্ষক। প্রফুল্ল সেনদের ফেরারী জীবনে (বরিশাল) তিনি নানা ভাবে অকুণ্ঠ সাহায্য করিয়াছেন (১৯৩৩-৩৪ সালে)। প্রফুল্ল, সীতানাথ দে, গাভার মুকুন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি ফেরারীগণের আদর্শ জীবন ও চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া উদারহৃদয় নিশিকান্ত বলেন—আপনাদের কোন দল নাই, জাত নাই, আপনারা খাঁটি বিপ্লবী, ও-সবের উর্ধ্বে। আপনাদের সঙ্গে মিশিয়া কখনো মনে হয় নাই, যে আমাদের মধ্যে অনুশীলন যুগান্তর বলিয়া কোন দল বা দলাদলি আছে।

জালালাবাদের পরে লোকনাথ বল—অনুশীলনের কুমিল্লা কেন্দ্রে আত্মগোপন করিয়া থাকেন।—কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জীকে জড়ানো হইবে—সংবাদ পাওয়া যায় বহরমপুর জেলে। বাংলার বিভিন্ন দলের অনেকেই তখন বহরমপুর জেলে আবদ্ধ। যোগেশচন্দ্রকেও কিছু দিন পূর্বে ঐ জেলে নেওয়া হইয়াছে। পরামর্শ হয়—যোগেশ জেল হইতে পলায়ন করিবেন। এই সম্বন্ধে পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত বলেন—'যোগেশবাবুর পলায়নের উদ্যোগের সময় মাদারীপুর দলের (পূর্ণবাবুর) সন্তোষ দত্ত অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে জানায়—যোগেশবাবু যেন আমার স্কন্ধে উঠিয়া প্রাচীর পার হন।' সন্তোষবাবুর দেহ ছিল সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ।

১৯১৪ সালে শ্রমজীবী সমবায়ে বিখ্যাত বিপ্লবী নায়ক অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনুশীলনের নরেন সেনের সাক্ষাৎ হইলে, অমরেন্দ্রনাথ নরেন সেনকে প্রসঙ্গতঃ বলেন: আমরা তো আবার কাজে নাব্‌ছি। এবার

ডাকাতি-টাকাতিগুলো শিখিয়ে দিন না। নরেন সেন বলেন:—আচ্ছা, কাজে নাবুন তো, তখন এর জন্যে ঠেকবেন না। অমরেন্দ্রবাবুর ও নরেন্দ্রবাবুর উক্তি লঘু ভাবেই করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশিষ্ট দুই বিপ্লবীর মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা হইতেই—অদলীয় ভাব ও অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পাইতেছে। দলাদলির সংকীর্ণতা কোথায় ?

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া চন্দননগর যান। সেখান হইতে গোপনে যান পণ্ডিচেরী। ১৯১২।১৩ সালে শ্রীঅরবিন্দের তথা পণ্ডিচেরী কেন্দ্রে দেখা দিল অর্থাভাব। সেই সময়ে পণ্ডিচেরী কেন্দ্রের অর্থাভাব হইলে—শ্রীযুত মতিলাল রায়কেই তাহা দূর করিতে হইয়াছে। মতিলালও তখন রীতিমত দারিদ্র্য-ব্রতধারী—সাধন-ভজন লইয়া আছেন। মতিবাবু বলেন "সেযুগে শ্রীঅরবিন্দের নাম করিতে মানুষ ভয় পায়, আমার নিজের পশ্চাতেও সর্বদা পুলিশ প্রহরী।" কিন্তু তথাপি অরবিন্দের অর্থসংকট দূর করিবার যথাসম্ভব দায়িত্ব তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হয়। 'জীবন-সঙ্গিনী' গ্রন্থে প্রবর্তক-সংঘ-গুরু আচার্য মতিলাল রায় লিখিতেছেন, 'শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে এমন খবরও আসিয়াছে, "The situation just now is that we have Re ¼ or so in hand".' শ্রীঅরবিন্দ মতিলালকে অর্থাভাবের কথা এই মর্মেও জানান: 'I must ask you to procure for me by will-power or any other power in heaven or on earth……' পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ ঐ সময়ে কিরূপ অর্থ-সংকটে ছিলেন তাহা উপরোক্ত উক্তিতে প্রকাশ। শ্রীমতিলাল রায় শ্রীঅরবিন্দের অভাবের কথা বাংলার বিপ্লবী বন্ধুদের জানাইয়াছিলেন এবং অর্থ চাহিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। কোন্ কোন্ দল অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন জানিতে পারি নাই। কিন্তু অনুশীলন টাকা পাঠাইয়াছে। প্রতুল গাঙ্গুলী বলেন: তিনি নিজে মতিবাবুর হস্তে এই উদ্দেশ্যে টাকা দিয়াছেন। [প্রবর্তক সংঘের সাপ্তাহিক 'নবসংঘে'র ১৯৫০, ২৭শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রতুল গাঙ্গুলীর 'বিপ্লবের এক অধ্যায়' দ্রষ্টব্য।]

শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষ বলেন: "১৯১৫ সালেও আমি শ্রীঅরবিন্দের জন্য মতিবাবুর নিকট মাসে মাসে নির্দিষ্ট টাকা দিয়াছি। কোন মাসে টাকা দেওয়া সম্ভব না হইলে পরের মাসে দুই মাসের টাকা দিয়াছি।" শ্রীঅরবিন্দ তখনও বিপ্লব-কর্মীদের নিকট বিপ্লবী নায়ক বলিয়াই গণ্যমান্য ও পরম শ্রদ্ধেয়।

শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবের মন্ত্রদ্রষ্টা—মহানায়ক ; তাঁহার অর্থাভাবের সংবাদে দলের প্রশ্নই কাহারো মনে দেখা দেয় নাই।

নোয়াখালির প্রখ্যাতনামা বিপ্লবী নগেন্দ্র গুহরায় বলেন: দুর্গাপুরের জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরীর নিকট হইতে ১ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া শ্রীঅরবিন্দের জন্য সুকুমার মিত্রের নিকট তিনি দিয়াছেন।

শ্রমজীবী সমবায় তথা অমরেন্দ্রনাথও ঐ সময় শ্রীঅরবিন্দকে অর্থসাহায্য করিতেন।

মিলিত যুগান্তর দলের ত্যাগনিষ্ঠ সমর্পিত-প্রাণ কুন্তল চক্রবর্তী ও চারু ঘোষ ১৯১৭ সালে অনুশীলনের গোপন আশ্রয় কলিকাতা কেন্দ্রে অবস্থান করেন। কুন্তল ও চারু পরে টি. বি.-তেই মারা যান। তেমনি মিলিত যুগান্তর কেন্দ্রেও অনুশীলনের বহু কর্মী একসঙ্গেই ছিল।

১৯১৭ সালে বাংলার বিপ্লবীরা অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করিলেই তাহাদের ভাগ ভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জেলে পাঠান হয়। আশু কাহিলী বলেন:—মিলিত যুগান্তর দলের সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহাকেও কাশীর জেলে নিয়া যায়। আশুবাবু অসুস্থ ছিলেন—তিনি জেল গেটে গিয়া একটি চেয়ারে বসেন। একটা উদ্ধত সার্জেণ্ট আশুবাবুকে উঠিতে বলিলে, আশুবাবু উঠেন না। সার্জেণ্টটা উগ্র হইতেই সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় আশুবাবুর পক্ষ লইয়া সার্জেণ্টের প্রতি ধাবমান হন ; ঠিক এই সময়ে জেলার আসিয়া না পড়িলে সংঘর্ষ অনিবার্য হইত। বিপ্লবী বন্ধুর চেতনা-ই এখানে কাজ করিয়াছে।

কিরণদা (মুখার্জি)-র জন্য 'সেলে' সাগুজাল দিবার দাবী করেন অনুশীলনের পূর্ণ চক্রবর্তী (মৃত) ও লালমোহন দে। তাঁহাদের এই দাবীর সূত্রেই মেদিনীপুর জেলে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ হয়। সকলের মধ্যে একই বিপ্লবী চেতনা কাজ করিয়াছে ; স্বতন্ত্র দলের চেতনা কোথাও কাজ করিয়াছে বলিয়া লক্ষ্য করি নাই।

বিপ্লবী আশু কাহিলী বলেন—১৯৩০ সালে তাঁহার ফেরারী অবস্থায় বগুড়ার প্রখ্যাত নায়ক যতীন রায় তাঁহাকে গোপন-আশ্রয় দানের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করেন—এবং আশুবাবু যতীনবাবুর সাহায্য গ্রহণ করেন।

১৯১৬ সালে বসন্ত চ্যাটার্জীর হত্যার ব্যবস্থা পাকা হইলে, অনুশীলনের তখনকার নেতা অমৃত সরকার বিভিন্ন দলকে সেই কথা জানান, উদ্দেশ্য, অন্য দলের ফেরারীগণও যেন সতর্ক হইয়া সরিয়া থাকিতে পারেন।

জগদানন্দ বাজপেয়ী বলেন :—১৯১৩ সালে ভূপেশচন্দ্র নাগের নিকট দীক্ষিত হইয়া অনুশীলনভুক্ত হই। ১৯১৫ সালে গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানার গোপন সংবাদ পাইয়াই—সহপাঠী রমা চৌধুরীকে (যুগান্তর দলের) সাবধান করি—এবং আত্ম-গোপনের পূর্বে রমার নিকট যে সকল গুপ্তবস্তু ছিল—রাত্রির অন্ধকারে তাহা বহন করিয়া অন্যত্র লইয়া যাই। আমাদের মধ্যে অনুশীলন-যুগান্তর ভেদ ছিল না।

তবে দলাদলি যে কোথাওই ছিল না—তাহাও বলি না। যেমন সমাজে—এবং একই পরিবারে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার মত উদার চরিত্র সকলেরই হয় না, অনুদার-সংকীর্ণমনা লোকও থাকে—তেমনি বিপ্লবীদলেও ছিল। তেমন দুচার জন রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিরোধ করিতে পারে। তেমন লোক বিপ্লব-প্রয়াসের অধ্যায় চুকিয়া-বুকিয়া গেলেও বিরোধ করে, এমনকি স্বদলেও মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারে না। দীর্ঘ বিপ্লব ইতিহাসের কর্মানুষ্ঠানে 'দলাদলি'র গ্লানিই অধিক, ইহা যে সত্য নহে—ইহাই আমাদের বক্তব্য।*

[* এইখানে প্রসঙ্গতঃ বিপ্লবীদলের উপাদানের কথা বলিতেছি। বাংলার বিপ্লব আন্দোলন বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বারাই সৃষ্ট ও পুষ্ট। বাংলায় বুঝি এমন মধ্যবিত্ত পরিবার নাই যে পরিবার কোন না কোন প্রকারে বিপ্লব প্রচেষ্টার সংস্পর্শে আসে নাই। কোন ব্যক্তির সঙ্গে আজিকার এ-দিনে আলাপ করিলেও শোনা যাইবে—তিনি নিজে বা তাঁহার পরিবারের কেহ কোন-না-কোন বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। কেহ কেহ বিপ্লব আন্দোলনকে বাংলার 'মধ্যবিত্ত সমাজের আন্দোলন' বলিয়া উহাকে খাটো করিতে চেষ্টা করিয়াছেন দেখা যায়। কিন্তু বিপ্লব-আন্দোলন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বারা সৃষ্ট এবং পুষ্ট হইলেও মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা বা স্বার্থের জন্য ঐ আন্দোলন ছিল না। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের ফলে স্বভাবতঃই আন্দোলন মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বারা প্রসার লাভ করে। কিন্তু উহার আবেদন ও প্রেরণা ছিল গোটা বন্দী ভারতের মুক্তি সাধন। বাংলায় মধ্যবিত্ত সমাজের যুবকগণ সর্বত্রই আন্দোলনের আবেদনে সাড়া দেয়। বাংলায় বিভিন্ন বিপ্লবী দল এই সকল যুবকগণের দ্বারাই পুষ্টিলাভ করে। সেই কারণে যে জেলায় বা যে অঞ্চলে এই মধ্যবিত্ত সমাজ অধিক পুষ্ট সেই জেলার বা সেই অঞ্চলের বিপ্লবী-সংস্থা অধিক সংখ্যক কর্মীর দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। ইহা কোন দল বা দলপতির বিশেষ যোগ্যতা বা অযোগ্যতার পরিচয় নহে। বিপ্লব সংস্থায় কোন্ শ্রেণী হইতে কত সংখ্যক কর্মী আসিয়াছে সরকারী একটি তালিকায় তাহা দেখা যাইতেছে—পৃষ্ঠা ২২১ দ্রষ্টব্য। পূর্ববঙ্গে এই মধ্যবিত্ত সমাজ অধিকতর পুষ্ট ছিল বলিয়াই পূর্ববঙ্গে বিপ্লবী কর্মী অধিক জুটিয়াছে। পূর্ববঙ্গেরও আবার যে জেলায় এই সমাজ অধিক পুষ্ট, সেই জেলায় অধিক কর্মী স্বভাবতঃই মিলিয়াছে। অর্থাৎ ইহা কোন জেলার বিশেষ গুণ নহে। তেমনি পশ্চিমবঙ্গের যে অঞ্চলে এই মধ্যবিত্ত সমাজ অধিক সমৃদ্ধ সেই অঞ্চল ও জেলা হইতে কর্মী আসিয়াছে অধিক। কলিকাতা ও বাংলার অন্যান্য সহরগুলি সম্পর্কে ঐ একই কথা সমভাবে প্রযোজ্য। যে উপাদান লইয়া নায়কগণকে বিপ্লবী সংস্থা গড়িয়া তুলিতে হইত—সেই উপাদান মধ্যবিত্ত সমাজেই ছিল, সুতরাং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ যেখানে জমাট ও পুষ্ট সেখানে কর্মীর সংখ্যা-বাহুল্য স্বভাবতঃই দেখা দিত। ইহার ব্যতিক্রম যে একেবারেই ছিল না তাহা নহে—তবে তাহা ব্যতিক্রম বলিয়াই ইতিহাস গণ্য করিবে।]

বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র

কিশোর জীবনেই সুভাষচন্দ্র একদিকে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শে ত্যাগ-ধর্মে অনুপ্রাণিত হন,—অপরদিকে রাজনৈতিক জীবনে বাংলার বিপ্লবীদের আত্মভোলা ত্যাগ-নিষ্ঠা তাঁহাকে প্রভাবিত করে। অসহযোগ আন্দোলনের আবেদন সুভাষচন্দ্রকে স্বভাবতঃই আকৃষ্ট করিয়াছিল। কারণ উহাতে ছিল সংগ্রামশীল কর্মনীতি ; ছিল ত্যাগ-দুঃখ বরণের আহ্বান। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিলেও—বাংলায় বিভিন্ন বিপ্লবীদলের নেতৃবর্গের সংস্পর্শে আসেন।

১৯২৮ সালে কলিকাতার কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র যে শক্তি দেখান—ভাবী নেতাজীর লক্ষণ উহাতে লক্ষ্য করা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে—সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের কাজকর্মের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিপ্লবীদলের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশিলেও—বিপ্লবীদলের গুপ্ত কর্মনীতির প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। এমন কি কোন বিপ্লবীদলের গোপন কার্যে সাহায্য করিলেও—উহাতে লিপ্ত হন নাই। একবার কোন বিপ্লবী সংস্থা তাঁহার নিকট নেতৃত্ব গ্রহণের প্রস্তাব করিলে সুভাষচন্দ্র দূরদর্শী নেতার ন্যায় বলেন :—'যতদিন কংগ্রেসের সভাপতি বা অনুরূপ বিশেষ দায়িত্ব লইয়া কংগ্রেসে থাকিতেছি,—ততদিন আপনাদের প্রতি আমার যত সহানুভূতিই থাকুক—আমি বিপ্লবদলের গুপ্ত কর্মনীতির সঙ্গে যুক্ত হইতে পারি না'। সুভাষচন্দ্র বিপ্লবী নায়ক না হইয়া কংগ্রেস নায়ক রূপে সর্বভারতে গণ্য হইয়াছিলেন। তাই বিপ্লবীদের মতই ভারতরক্ষা আইনে পুলিশ তাঁহাকে যখনই আটক করিয়াছে, তখন স্বাধীনতাকামী কংগ্রেসনায়ক বলিয়াই বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত করিতেছে, ইহাই ভারতের জনসাধারণ হৃদয়ঙ্গম করিল—এবং বৃটিশ-বিরোধী, সংগ্রাম-নিষ্ঠ কংগ্রেস নায়করূপে সুভাষচন্দ্রের প্রভাব সর্বভারতে প্রসারিত হইল। সুভাষচন্দ্র কলিকাতার কলেজ জীবন শেষ করিয়া—দেশের কাজে—রাজনৈতিক কর্মে আত্মনিয়োগ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের স্নেহপ্রবণ মেজদা শরৎচন্দ্র তাঁহাকে তখন এই বলিয়া নিবৃত্ত করেন :—'তুমি রাজনৈতিক কর্মে আত্মনিয়োগ করো—কিন্তু

বিলাতে গিয়ে আই-সি-এস পাশ করে,—বলিনা, তুমি সরকারী চাকুরী নেবে; পাশ করার পর তুমি ইচ্ছামতো রাজনীতিক্ষেত্রে নেবো।'—এই সিদ্ধান্তের কারণ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—'কংগ্রেসের নেতৃত্ব করতে হ'লেও—আই-সি-এস সুভাষচন্দ্রের ত্যাগ উহার অনুকূলে কার্য করবে।' বড় রকমের ত্যাগ দেখাইতে না পারিলে এদেশের রাজনীতিক্ষেত্রেও নেতৃত্ব করা যায় না—ইহাই শরৎচন্দ্রের অভিমত ছিল। ইহা যে সত্য—তাহাতেও সন্দেহ নাই। একজন বি. এ. পাশ ছাত্র—অসহযোগে যোগ দিয়াছে, ইহা অপেক্ষা একজন আই-সি-এস সরকারীপদ ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছে—ইহার মূল্য জনচিত্তে অধিক। শরৎচন্দ্রের নিজের উক্তির মর্ম এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইতেছে। প্রাচ্যে চীন-জাপান যুদ্ধ বহুদিন চলিয়াছে। চীনের প্রতি ভারতীয় কংগ্রেস সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই, আক্রমণকারী জাপানের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কঠোর মন্তব্য প্রকাশ, এমন কি জাপানী দ্রব্য বর্জনের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তখনও জাপানকে তোষণ করিয়াই চলিয়াছেন। ইউরোপে হিটলার একে একে ভার্সাই সন্ধির সর্ত পদদলিত করিয়া চলিয়াছেন। বৃহত্তর জার্মান রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার জন্য সামরিক অভিযান সুরু করিয়াছেন। ইউরোপে যুদ্ধ যে আসন্ন তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় নাই। বাংলার বিপ্লবীরা তখন হইতেই কংগ্রেসকে প্রস্তুত হইবার জন্য চাপ দিতেছে। যুদ্ধ আসন্ন, এবারে বৃটিশকে চরমপত্র দেওয়া হউক; ৬ মাসের মধ্যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিবে, অন্যথায় সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে (দিনাজপুর) বিপ্লবী কর্মীদের নেতারূপে কংগ্রেস-নায়ক সুভাষচন্দ্র এই চরমপত্র দিবার স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল। কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রধানগণ দাঁড়াইলেন। নির্বাচিত সভাপতিকে পঙ্গু করিয়া দিবার সেই চেষ্টা কংগ্রেস ইতিহাসের কলঙ্ক হইয়া রহিল। ক্রমে বিভেদ স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের সেই সংকটকালে এবং সেই নূতন সংগ্রামী অভিযানে বাংলার বিপ্লবী দলের সকলেই তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়ায় নাই। যাহারা তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া তখন দাঁড়াইয়াছিল তন্মধ্যে বিস্তৃত সংঘশক্তিসম্পন্ন

অনুশীলন এবং জ্যোতিষ ঘোষ, সুরেশ মজুমদার ও হেমন্ত বসুদের কলিকাতার দল, মাদারীপুরের পূর্ণ দাসের দল, ঢাকার শ্রীসঙ্ঘ ও বি. ভি. প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যুগান্তর দল বলিয়া পরিচিত বিভিন্ন বিপ্লবীদলের কতক অংশ তখনকার কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডকেই সমর্থন করেন এবং কার্যতঃ সুভাষবাবুকে সমর্থন করেন না।

এই সময়ে রামগড়ের কংগ্রেসের পাশে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আপোষ-বিরোধী সম্মেলন বসে। যুদ্ধের সময়ে কংগ্রেস আপোষ রফার পথে রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জন করিতে পারিবেন, যুদ্ধে আক্রান্ত ও বিপন্ন বৃটিশকে এই সময়ে বিব্রত করা সত্যাগ্রহের নীতিসম্মত নহে—মহাত্মা গান্ধীর ইহাই ছিল অভিমত। মীমাংসার পথে এই সময়ে সহজে স্বাধীনতা লভ্য হইবে—ইহাও কংগ্রেস নেতৃবর্গের বিশ্বাস ছিল। পক্ষান্তরে সুভাষবাবুর বিশ্বাস ছিল—ইহাই দাবী ও সংগ্রামের উপযুক্ত সময়।

পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। কিন্তু যাহা ভাবা গিয়াছিল তাহা হইল না। হিটলারের পরম শত্রু স্ট্যালিন হিটলারের বিরুদ্ধে না গিয়া হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণের দোসর হইলেন। পোল্যাণ্ড ভাগাভাগি করিয়া নেওয়া হইল। নাৎসীবাদ ও সাম্যবাদের এই অসবর্ণ মিলনে সকলে অবাক হইলেও এবং ভারতীয় কমিউনিষ্টগণ ইহাতে নিজেদের অসহায় ও বিব্রত বোধ করিলেও, শেষটায় 'দাদার' জয়ধ্বনি করিয়াই এই মিলন 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে' বলিয়া প্রচার চালাইলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে সুভাষচন্দ্র ভারত হইতে অন্তর্ধান করিয়া জার্মানীতে গমন করেন। এই যুদ্ধকালেই বৈদেশিক সাহায্যলাভ করিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন করা যায় কিনা সেই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। পূর্ব এশিয়ায় সুভাষচন্দ্র আসিয়া ক্ষেত্র অনেকটা প্রস্তুত দেখিতে পান। কারণ জাপান, সিংগাপুর, জাভা ও মালয়ে ইতিপূর্বেই বাংলার কতিপয় বিপ্লবী কার্য করিতেছিলেন। যুদ্ধের সুযোগ কি করিয়া গ্রহণ করা যায় ইহাই ছিল তাঁহাদের চিন্তার বিষয়। সেখানে বাংলার শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সন্তান রাসবিহারী বসু অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময় তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইলেও 'ইণ্ডিয়া লীগ' প্রতিষ্ঠানের মারফতে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়গণকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সুযোগ গ্রহণ করার উদ্দেশ্য লইয়া সংঘবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার সহায় ছিলেন স্বামী সত্যানন্দ প্রভৃতি

বাঙালী বিপ্লবীগণ। স্বামী সত্যানন্দ আসলে অনুশীলনের পুরাতন কর্মী ফরিদপুর নিবাসী প্রফুল্লকুমার সেন।

জাপান একের পর এক বৃটিশ-অধিকৃত স্থান কাড়িয়া লইতে লাগিল। একে একে সিংগাপুর, মালয়, রেংগুন গেল। বহু ভারতীয় সৈন্য জাপানীদের হস্তে বন্দী হইল। তাহারা বৃটিশের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যই একদা অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধবন্দী হইয়া এবং বৃটিশ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তাহারাই তখন ভারতের স্বাধীনতার কথা ভাবিতে লাগিল। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাহাদেরও যে কিছু করণীয় আছে, তাহাও তাহাদের কতকের মনে উদিত হইল। এইরূপ অবস্থায় রাসবিহারী তাহাদের একত্র করিয়া স্বাধীনতা লীগ গড়িলেন। এমনি দিনে পূর্ব এশিয়ায় সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব। সুভাষচন্দ্র ছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি। তাঁহার দেশ সেবার কথা সকলেরই শুনা ছিল। তাঁহার যাদুকরী ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অঘটন ঘটিয়া গেল।

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি,
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারই লাগি তাড়াতাড়ি···

ঐ যে কবির কথা—লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে—তাহা বর্মায়, মণিপুর অভিযানে, ইম্ফলের মাটিতে প্রত্যক্ষ হইল।

জার্মানীতে সুভাষচন্দ্র

১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে সুভাষচন্দ্র বার্লিনে আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্বোধন করেন এবং নিয়মিত কাজ আরম্ভ করেন। ২রা নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম সভা আহূত হয়। সভায় কার্য পরিচালনার নিয়মাবলী রচিত হয়। আজাদ হিন্দ কেন্দ্র আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে। অপরাপর বৈদেশিক কূটনৈতিক দূতাবাসের মত সমমর্যাদা ও সুযোগ পাইয়াছে। এই সভাতে আরও তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহা—

(১) 'জয় হিন্দ' ধ্বনি দ্বারা সম্ভাষণ, পারস্পরিক অভিবাদন বিনিময়।

(২) সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' বলিয়া গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত। (বস্তুতঃ ঐদিন হইতে সুভাষচন্দ্র নেতাজী নামের মধ্যে লীন হইয়া গেলেন)।

(৩) জাতীয় সঙ্গীত—জনগণমন। কিন্তু বার্লিন হইতে ভারতীয় জনগণের উদ্দেশ্যে যে বেতার প্রচার-কার্য চলিত, তাহাতে বন্দেমাতরম্‌ও গীত হইয়াছে। পরবর্তী কালে জাপান হইতে বেতার যোগে বন্দেমাতরম্ জাতীয় সংগীতরূপে গীত হইয়াছে।

বার্লিনে যে সকল ভারতীয় ছাত্র ও বিভিন্ন বৃত্তিজীবী ছিলেন তাঁহারা প্রথম আজাদ হিন্দ কেন্দ্রে যোগ দেন। ফ্রান্স হইতে ৭জন ভারতীয় যুবক ছাত্র আসেন। বন্দী ভারতীয়দের 'রিক্রুট' করার কাজেও ইঁহারা আত্মনিয়োগ করেন। ইঁহারা নেতাজীর বাসনামত কঠোর সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এমনকি ভারতীয় সৈন্যদলের (বন্দী অবস্থায় যাহারা বার্লিনে নীত হয়) সকলকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর ট্রেনিং নিতে হইত। শিক্ষা দিতেন জার্মান সামরিক শিক্ষকগণ।

সুভাষচন্দ্র জার্মান কর্তৃপক্ষকে রাজী করাইয়াছিলেন—তাঁহাকে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে দিতে। জার্মানীর সাহায্য তিনি ঋণ স্বরূপ লইতেছেন, ভারত স্বাধীন করিবার জন্য; ভারত স্বাধীন হইলে তথা বৃটিশ-শাসন-মুক্ত হইলে—জার্মানীর ঋণ জাতীয় ঋণ বলিয়া গৃহীত হইবে।

আজাদ হিন্দের কাজকর্মের দ্বারা অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনার দ্বারা লাভবান হইবেন ইহা হিটলার মনে করিতেন না; ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ কোন আগ্রহও ছিল না। হিটলার তখন সর্বত্রই জয়ী হইয়া চলিয়াছেন, তথাপি জার্মান গভর্ণমেন্ট নেতাজীকে স্বাধীনভাবে আজাদ হিন্দ কেন্দ্র গঠন ও পরিচালনার সকল সুযোগ দিলেন; ভারতীয় বন্দী-সৈনিকদের মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে দিলেন। ইহা ছাড়া অর্থ-সমরোপকরণ-খাদ্য প্রভৃতি সরবরাহের সুবন্দোবস্ত নিয়মিত ভাবে অনুসৃত হইত। কিন্তু বার্লিনে থাকিয়া বেতার-প্রচার ভিন্ন স্বাধীনতার সংগ্রামে সাক্ষাৎ অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা কি? তাহারই জন্য এবার সুভাষচন্দ্র অকূলে ঝাঁপ দিলেন। ডুবো জাহাজে টোকিও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বিপ্লবী রাসবিহারী টোকিও হইতে আহ্বান জানাইয়াছেন—"ক্ষেত্র প্রস্তুত, উপাদান রহিয়াছে। আসুন, নেতৃত্ব গ্রহণ করুন।" স্বাধীনতা লীগ পূর্বেই গঠিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রহ্মদেশ, সিংগাপুর, মালয় প্রভৃতি স্থানের ভারতীয়গণ প্রস্তুত। বন্দী ভারতীয় সৈন্যগণ

মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লীগে যোগ দিয়াছে। যে অস্ত্র ইংরেজের নফররূপে ইংরেজের নির্দেশে চালনা করিয়াছে, সেই অস্ত্রই স্বাধীনতাকামী বাহিনীর নেতার নির্দেশে চালনা করিতে তাহারা প্রস্তুত। কিন্তু তখনও সংগঠন বাকি। রাসবিহারী বহুদিন ধরিয়া জাপানে চেষ্টা চালাইয়াছেন; এখন এই যুদ্ধের সুযোগে সৈন্যবল লইয়া ভারত উদ্ধারের চেষ্টা করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার ছিল কর্মকুশল বুদ্ধি, জাপানী নায়কদের উপরও তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ১৯১৫ সালে সৈন্য-সাহায্যে সমস্ত ভারতে বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টার জন্য বৃটিশ সরকারের ক্রোধাগ্নি হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে তিনি ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তদবধি জাপানে বসবাস করিতেছিলেন তাহাও শিক্ষিত ব্যক্তিদের অজানা নহে। কিন্তু ভারতের কংগ্রেস ও জন-আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়া 'সুভাষবাবু' যেরূপ সর্বজন-পরিচিত ও প্রিয় হইয়াছিলেন—সুভাষ নামের যে মোহ ছিল—বিপ্লবী রাসবিহারীর তাহা থাকিবার কথা নহে। ভারতে তাঁহার ছিল বিপ্লবীর গোপন জীবন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি। তাঁহার নামের আবেদন ছিল সর্বজনমনোহারী। রাসবিহারীর ন্যায় স্বদেশভক্তের তাহা বুঝা শক্ত নহে। এবং সেই কারণে সর্বাগ্রে সুভাষচন্দ্রকেই তিনি নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান করিলেন।*

*এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় পুরাতন বিপ্লবীরা ইউরোপ ও আমেরিকায় থাকিয়া ভাবগত বিপ্লব—বৃটিশ বিদ্বেষ প্রচার করিতে ক্ষান্ত থাকেন নাই। সুযোগ বা সুবিধা পাইলে তাহাও গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতীয় বিপ্লবী বলিয়া তাঁহাদের কিছুটা নামও বিদেশের রাজনীতিক মহলে ছিল। সর্দার অজিত সিং ১৯৪২ সালে রোমে ছিলেন। তিনি বেতার যোগে বিপ্লব মন্ত্র প্রচার করিতেন। ত্যাগবীর রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ছিলেন—বিপ্লবনিষ্ঠ হরদয়াল ছিলেন। বরকতউল্লা ছিলেন। ইঁহারা প্রবীণ ও প্রখ্যাতনামা। কিন্তু ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের লইয়া সেনাবাহিনী গঠন করিতে নেতাজীরই প্রয়োজন ছিল। নেতাজীর ব্যক্তিত্বই শুধু নয়—নেতাজীকে যুদ্ধবন্দী ভারতীয়গণ কংগ্রেসের তথা ভারতের জননায়ক বলিয়াই জানিতেন—তাঁহার 'নাম-কাম' তাহাদের জ্ঞানের মধ্যেই ছিল। কিন্তু বিদেশস্থ বিপ্লবীর আর কাহারো তাহা ছিল না, থাকা সম্ভব ছিল না। তাঁহারা বিপ্লবীনায়ক—জননায়ক নহেন। তাঁহারা গুপ্তপথে ভারতের স্বাধীনতার জন্য দেশে এবং দেশ হইতে পলায়ন করিয়া বিদেশে যাহাই করুন—যত বিপ্লবনিষ্ঠাই তাঁহাদের থাকুক—তাহা বড় রকমের কাজে লাগাইবার উপযোগী ছিল না।

অন্তর্ধানের পূর্বে

কংগ্রেস হইতে পদত্যাগ, রামগড় সম্মেলন এবং সুভাষচন্দ্রের তখনকার কর্মনীতি ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া—সুভাষচন্দ্র নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন, আবার কারারুদ্ধ হইবেন; বেশীদিন বাহিরে মুক্ত থাকিতে পারিবেন না। তখনই সংকল্প করেন, এবার আর কারাগারে পচিবেন না। তাঁহার এই সংকল্পের কথা প্রসংগতঃ—কিছুটা হালকাভাবে হইলেও—কোন কোন সহকর্মীর নিকট এইভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন: আর জেলে না পচিয়া—বিদেশে চলিয়া যান। রামগড় সম্মেলনের পরে পূর্ববঙ্গ সফর কালে ময়মনসিংহ হইতে ঢাকায় আসিয়া লেখকের ঢাকার বাসায় অবস্থান কালে একদিন রাত্রিতে সুভাষচন্দ্র আসন্ন যুদ্ধ-পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা করেন; এবং গ্রেফ্‌তার যে নিকটবর্তী ইহার প্রসংগ উঠিলে বলেন, 'এবার আর জেলে পচিব না। কিছু করিতে হইলে বিদেশে আমাদের যাইতেই হইবে।' তখনো কিন্তু এতো সত্বরই তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করা হইবে মনে করেন নাই। জেলে অনশন আরম্ভের পূর্বে তিনি এইরূপ একটা সংকল্পের আভাষ প্রতুল গাঙ্গুলীকে দিয়াছিলেন বলিয়া প্রতুলবাবু বলেন। জেলে যাওয়ার (১৯৪০, জুলাই) পূর্বেও যে সুভাষচন্দ্র বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং যুদ্ধকালে ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্য লাভের চেষ্টাও করিয়াছিলেন—তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে।

১৯৪০ সালের প্রথম ভাগে শ্রীনিরঞ্জন সিং তালিব, বর্তমানে 'দেশদর্পণে'র এডিটার', শ্রীরবি সেনকে আসিয়া বলেন যে, কলিকাতায় আলিপুরে অবস্থিত শিখ সৈন্যগণ বাংলার বিপ্লবীদলের সহিত যোগ স্থাপন করিতে চাহে। রবি সেন সম্মত হন, এবং নেপাল মহারাজের আলিপুর ভবনের যে অংশে অনেক অবসর-প্রাপ্ত শিখসেনানী থাকিতেন, সেখানে রবিবাবু, নিরঞ্জন সিং তালিব শিখসৈন্যের নেতৃস্থানীয় তিনজনের সঙ্গে পূর্ব-নির্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাৎ করে। শিখ সেনারা দৃঢ়তার সহিত জানান, যে, এবার আর তাঁহারা বৃটিশের cannon fodder (কামানের বারুদ) রূপে ব্যবহৃত হইবেন না। তাঁহারা বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশিয়া সুযোগ গ্রহণ করিবেন। দুইদিন এইভাবে সাক্ষাৎ হয়। সৈন্যগণ বিদ্রোহ করিবেন, তাঁহারা অস্ত্রাগার বা ম্যাগাজিন হাত করিবেন, কেল্লায় প্রবেশের ব্যবস্থা

করিয়া দিবে, ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি দান করে। তাঁহারা সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা করিবার আগ্রহও প্রকাশ করেন। আলোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এবং সৈন্যদের আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া রবিবাবু সুভাষবাবুর নিকট গিয়া সব কথা জানান এবং সৈন্যদের সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব করেন। প্রথম জার্মান যুদ্ধে যেভাবে সৈন্যদের সাহায্য লইয়া ভারতব্যাপী সশস্ত্র বিদ্রোহ করার চেষ্টা রাসবিহারীর নেতৃত্বে হইয়াছিল, এবারও সুযোগ যখন আসিতেছে, তখন এই সুযোগ নেওয়া উচিত—রবিবাবু প্রসঙ্গতঃ ইহাও জানান। সকল কথা শুনিয়া সুভাষবাবু সৈন্য-দলের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে দেখা করিতে রাজী হন। প্রশ্ন উঠে, কোথায় কখন দেখা করা হইবে। কিছুটা কথাবার্তার পর সুভাষবাবু বলেন—তাঁহার বাড়ীতেই যথাযথ সতর্কতার সহিত দেখা করার ব্যবস্থা হউক। তাহাই হইল।—নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে সুভাষবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সৈন্যগণ সর্বভারতে সেনা-বিদ্রোহ করার কথায় সম্মত হয়। তখন এই সৈন্যদলটি আলিপুরে অবস্থান করিতেছিল। বিভিন্ন সেনাবারিকে খবরাখবর করিতেছিল—দল বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু এই প্রচেষ্টার মাসদেড়েকের মধ্যেই জানা গেল তাহাদের সম্পূর্ণ রেজিমেণ্টটাই অন্যত্র বদলি করা হইয়াছে। বদলির পর এই সৈন্যদলটি আম্বালায় ছিল। যুদ্ধে তাহাদের সীমান্তে পাঠাইবার নির্দেশ আসিলে তাহারা একযোগে হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহ করে। এই দলের অনেককে গুলি করা হয়—অনেকে ধৃত হয়। রবিবাবু যখন ১৯৪০ সালের শেষভাগে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে আবদ্ধ ছিলেন, তখন এই সকল শিখ বন্দীদের মধ্যে পূর্ব-পরিচিত শিখ-সৈন্যরাও ছিল, দেখা গেল। প্রেসিডেন্সী জেল হইতে তাহাদের একেবারে আন্দামানে লইয়া যায়।

ইহার কিছুদিন পরে সুভাষবাবু সর্দার বলদেব সিংহের মারফতে অচ্ছদ্ সিং সিন্নার সাহায্য গ্রহণের চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য ছিল—যাহাতে অচ্ছদ্ সিং সিন্নার সাহায্যে সুভাষ বাবু ভারতের বাহিরে যাইতে পারেন। একদিন সুভাষবাবু রবি সেনকে বলেন, 'দেখুন রবিবাবু, আমি মনস্থ করিয়াছি পাঠান সাজিয়া বাহিরে চলিয়া যাইব। এইজন্য কিছু জামা-কাপড় দরকার। তৈয়ারীর ব্যবস্থা করা যায় কিনা।' এইসব কথা হয় রামগড়ের কন্‌ফারেন্সের পরে। সুভাষবাবু এবারে জেলে পচিবেন না; যে করিয়াই হউক, বিদেশে যাইবেন, এই সংকল্পই প্রকাশ করেন। রবি সেনকে একদিন সুভাষবাবু বলেন—জাপানী কন্‌সাল অফিসে আপনাদের দলের কে একজন আছেন, বলিয়াছিলেন; এখন তাঁহার

সাহায্যে কিছু করা যায় কি? কন্‌সাল অফিসে কাজ করিতেন জিতেন বসু। রবি সেন জিতেন বাবুকে বলেন, সুভাষবাবুর বিদেশে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। সেই সময় কন্‌সাল কলিকাতায় ছিলেন না। Vice-consul ছিলেন। জিতেনবাবু তাঁহাকে সুভাষবাবুর কথা জানাইলে, Vice-consul জিতেনবাবুকে বলেন,—সুভাষবাবু যখন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, তখন জাপানের মিলিটারী এ্যাটাচি সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু সুভাষবাবু কোন আগ্রহ দেখান না। সুতরাং এখন জাপান এই ব্যাপারে খুব 'favourable attitude' (উৎসাহ) নাও দেখাইতে পারে। যাই হোক—Vice-consul জিতেনবাবুকে বলেন, কন্‌সাল আসিলেই এই বিষয়ে আলাপ করিয়া ফলাফল জানাইব। ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই সুভাষবাবু রবি সেনকে বলেন, "আর Vice-consulএর সঙ্গে ঐ বিষয় লইয়া আলাপ চালাইবেন না। আমি আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়াছি।"—অচ্ছদ্ সিং সিন্না ছিলেন কমিউনিষ্ট। কিন্তু যুদ্ধে যখন রাশিয়া বৃটিশের মিত্রস্থানীয় হইল, তখন এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিবর্তে সহসা তাঁহার নিকট people's war বা জনযুদ্ধে পরিণত হইয়া গেল। ফলে রাতারাতি বৃটিশরা শত্রুস্থান হইতে মিত্রস্থানে আসিয়া পড়িল। ইহারই ফলে—এই অচ্ছদ্ সিং সিন্নাই সুভাষবাবু যে কাবুলের মধ্য দিয়া বিদেশে চলিয়া গিয়াছেন—এই সংবাদ বৃটিশের নিকট প্রকাশ করিয়া দেন। অবশ্য সুভাষবাবু তখন কাবুলও ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

সুভাষচন্দ্রের অপূর্ব অন্তর্ধান

১৯৪০ সালের ২রা জুলাই তারিখে সুভাষচন্দ্রকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করিয়া আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হইল। জেলে থাকার সময়েই, ২৮শে অক্টোবর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২৯শে নভেম্বর তিনি বন্দী অবস্থায় প্রায়োপবেশন আরম্ভ করেন এবং ৫ই ডিসেম্বর স্বাস্থ্যহানির জন্য তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।* মুক্তি পাওয়ার অল্পদিন পরেই সুভাষচন্দ্র রুদ্ধকক্ষে আত্মসমাহিত অবস্থায় থাকেন।

---

* খাজা নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিত্বকালে অনশন করেন। প্রকাশ, সুভাষবাবুকে জোর করিয়া খাওয়াইতে নাজিমুদ্দীন চাহেন না, তাই ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার এলগিন রোডস্থ ভবন ত্যাগ করিয়া একখানি মোটরগাড়ী যোগে কলিকাতা হইতে কয়েকশত মাইল দূরে একটি স্টেশনে যাইয়া দিল্লী মেলে আরোহণ করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু মোটর গাড়ীখানি চালাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। নেতাজীর ভারত ত্যাগের ব্যাপারে শিশিরকুমার বসু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এতৎসম্পর্কে তিনি বলেন,—'অনশন অবলম্বনের পর নেতাজীকে মুক্তি দেওয়া হয়, মুক্তিলাভের পর হইতেই তাঁহার যাত্রার আয়োজন চলিতে থাকে। ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারী রাত্রি ১-২৫ মিনিটে আমরা একখানি মোটরযোগে সত্যসত্যই যাত্রা সুরু করিতে সমর্থ হই। আমি ও নেতাজী মাত্র এই দুই জনেই ঐ গাড়ীর আরোহী। নেতাজী পশ্চিমা মুসলমানের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া একটি সুটকেশ, বিছানা ও একটি এ্যাটাচী কেস সঙ্গে লইয়াছিলেন। এলগিন রোড হইতে যাত্রা সুরু করিয়া কলিকাতা সহর ছাড়াইয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া তীব্র বেগে আমাদের গাড়ী চলিল। সমস্ত রাত্রি চলিবার পর প্রত্যূষে আমরা একস্থানে আত্মগোপন করিলাম। সন্ধ্যায় আবার যাত্রা সুরু হইল; অধিক রাত্রিতে আমরা কলিকাতা হইতে আনুমানিক ২১০ মাইল দূরবর্তী গোমোতে পৌঁছিলাম, এই দিনটি ছিল ১৯৪১ সালের ১৮ই জানুয়ারী; শেষ রাত্রিতে নেতাজী ট্রেনে উত্তরভারত অভিমুখে রওয়ানা হইয়া যান। স্টেশনেই তাঁহার নিকট হইতে আমি বিদায় লইলাম। বাংলার সীমান্ত হইতে বহুদূরে লইয়া গিয়া তাঁহার যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় নেতাজীর ভারত ত্যাগের পরিকল্পনায় আমার কর্তব্য কার্যতঃ শেষ হইল। আমি বিদায় লইলাম।' "তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও"—ইহাই ছিল তাঁহার প্রতি নেতাজীর শেষ কথা।

কাবুলে উত্তমচাঁদের রেডিওর দোকান ছিল, তিনিই কাবুলে সুভাষচন্দ্রকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। কাবুলেই উত্তমচাঁদ গ্রেপ্তার হইয়া ভারতবর্ষের কারাগারে দীর্ঘকাল বন্দী থাকেন এবং সেই সময়েই তিনি নিম্নোক্ত কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করেন। দীর্ঘ কাহিনীটি সংক্ষেপে এই :—

যখন লাল পাগড়ী পুলিশের দল কলিকাতার এলগিন রোডে তাহাদের কর্মতৎপরতা দেখাইতে ব্যস্ত তখন সুভাষচন্দ্র মৌলভীর বেশে ভারত সীমান্তের দিকে আগাইয়া চলিলেন। দুইদিনের মধ্যে তিনি পেশোয়ারে আসিয়া পৌঁছিয়া গেলেন। সেখানে তিনি মৌলভীর শেরওয়ানী ও ফেজের বদলে পাঠানের

পোষাক পরিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের মৌলভী বেশ বদল করিয়া হইয়া গেলেন পাঠান।

তিনি এই বেশে রহমৎ খাঁ নামক একজনের সঙ্গে কাবুলের দিকে রওয়ানা হইলেন। কয়েকদিন ধরিয়া অতি দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা কাবুল নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নদী পার হওয়ার জন্য কোনো নৌকা পাওয়া গেল না, কতকগুলি চামড়ার ব্যাগ জেলেদের জালে বাঁধিয়া—সেই অদ্ভুত ভাসমান 'বাহনে' চাপিয়া তাঁহারা নদী পার হইয়া গেলেন। কিন্তু বিপদ অপেক্ষা করিয়া ছিল নদীর পরপারে। কাবুলের উন্মুক্ত আকাশতলে, ভয়ঙ্কর শীতের মধ্যে দাঁড়াইয়া, যদি কোনো যানবাহন পাওয়া যায় তাহারই আশায় তাঁহারা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই রাস্তার পাশে বড় বড় গাছের ঝোপ—তাহারই মধ্যে একটি কুয়া—অবিরাম পদব্রজে আসিয়া—পরিশ্রান্ত অবসন্ন দেহ লইয়া সুভাষচন্দ্র সেই গাছের তলায় শুইয়া পড়িলেন। শীতের সমাচ্ছন্ন কুয়াসার উপর নামিয়া আসিল রাত্রির গভীর অন্ধকার। সুভাষচন্দ্র ঘুমাইয়া আছেন, রহমৎ খাঁ একখানি লরীকে থামাইলেন। কিন্তু অসংখ্য বাক্সতে বোঝাই সেই লরী—সুভাষচন্দ্র জাগিয়া উঠিয়া ভাবিতে লাগিলেন কি করিয়া এই লরীতে বসা যাইবে। কিন্তু লরীর 'ক্লিনারের' তাড়ায় তাঁহার চিন্তার অবসর রহিল না। অগত্যা একটি বাক্সের উপর তিনি চড়িয়া বসিলেন। এইভাবে তুষারাবৃত শীতের রাত্রে বিনা গরম পোষাকে তিনি একটা বাক্সের উপরে কোনো রকমে বসিয়া রহিলেন। মুক্ত প্রান্তর দিয়া লরীখানি ছুটিতে লাগিল। মাঝে মাঝে গাছের লম্বিত শাখা-প্রশাখার আঘাত লাগিতে লাগিল তাঁহার দেহে, বার বার মাথা নীচু করিয়া তাঁহাকে সে আঘাত সামলাইতে হইতেছিল। সে রাত্রির অভিজ্ঞতা অতি ভয়াবহ। দ্বিতীয় দিনে একজন আফগান গোয়েন্দা তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল—তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব দিলেন। রহমৎ খাঁ বলিলেন, তিনি তাঁহার এই হাবা কালা ভাই জিয়াউদ্দিনকে সাকী সাহেব মস্‌জিদে তীর্থ করাইতে লইয়া যাইতেছেন। কাবুলে জিয়াউদ্দিন এমন কোনো আশার লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না যাহাতে মনটা তাঁহাদের প্রফুল্ল হইয়া উঠে। কিছুদিনের মধ্যেই একটি আফগান কন্‌ষ্টেবল্‌ তাঁহাদের উপর জুলুম আরম্ভ করিল। ঠিক সেই সময় তাঁহারা উত্তমচাঁদের সন্ধান পাইয়া তাঁহার সাহায্য চাহিলেন। যে সময়ে তিনি কাবুলে

উত্তমচাঁদের গৃহে আত্মগোপন করিয়া আছেন, সে সময়ে দেশের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সরকারী কর্মচারীরা শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। দৈনিক কাগজগুলিতে বড় বড় হরফে সুভাষচন্দ্রের নিরুদ্দেশের সংবাদ প্রত্যহ ছাপা হইতেছে।

সুভাষচন্দ্র কোথায়? কাবুলে? রাশিয়ায়? জাপানে? রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি আজ দেশান্তরী হইয়াছেন?—দেশে যখন এইরূপ জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে তখন আদর্শ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র গৃহত্যাগ করিয়া একাকী অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির দুর্নিবার আকর্ষণে। স্বাধীন ভারতের কল্পনা তাঁহাকে সমস্ত দৈহিক ক্লেশ সহ্য করিবার অসীম শক্তি দিয়াছিল।

১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর ইঙ্গ-আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংস-বহ্নি জলিয়া উঠিল সারা পৃথিবীতে। এমনই সময়ে আচম্বিতে সারা ভারতবর্ষের রেডিও-শ্রোতারা শুনিতে পাইলেন সুভাষচন্দ্রের উদাত্ত মধুর কণ্ঠস্বর।

কথাগুলি এই:—

"আমি সুভাষ; এতদিন আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য বিষয় বল্‌বার সুযোগ ছিল না। শত্রুপক্ষ যে অপবাদই দিক—আমি জানি আপনারা তা' বিশ্বাস করেন না। আমি আমার কাজ ক'রে চলে যাব, কে কি বলে না বলে তাতে আমার কিছুমাত্র আসে যায় না। অক্ষশক্তির আক্রমণ থেকে নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষা করবার জন্যে যদি ব্রিটেন আজ আমেরিকার দ্বারস্থ হ'তে লজ্জা না পায়, তাহ'লে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে অপর কোন জাতির সাহায্যপ্রার্থী হওয়া আমার পক্ষে অন্যায়ও নয় অপরাধও হতে পারে না। আপনারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত থাকবেন। আমি যে ভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে ভারতবর্ষ থেকে চলে এসেছি, ঠিক তেমনি করেই উপযুক্ত সময়ে আপনাদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হ'ব। প্রয়োজনের উপযুক্ত পাথেয় আপনাদের কাছে ঠিক সময়েই হাজির হ'বে, আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। যে সুযোগ আসছে সেটা সম্পূর্ণ ভাবে যাতে কাজে লাগাতে পারেন—তার জন্যে নিজেরা জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে অবিলম্বে সংঘবদ্ধ হোন—চাই ঐক্য ও একাগ্রতা।"

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার

২১শে অক্টোবর (১৯৪৩) তারিখে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু স্বাধীন ভারত সরকারের প্রধান (Chief of the State), প্রধান সচিব (Prime Minister), সমর সচিব (Minister of War), পররাষ্ট্র সচিব (Foreign Minister), জাতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (Commander-in-Chief of the National Army); মিঃ এম, এ, আয়ার (প্রচার ও আন্দোলন); ক্যাপ্টেন মিস্ লক্ষ্মী স্বামীনাথন (নারী সংগঠন); লেঃ কঃ এ, সি, চ্যাটার্জ্জী (অর্থ সচিব); লেঃ কঃ আজিজ আহম্মদ; লেঃ কঃ এম, এস, ভগত; কঃ জে, কে, ভোঁসলে; লেঃ কঃ গুলজারা সিং; লেঃ কঃ এম, জেড্, কিয়ানী; লেঃ কঃ এ, পি, লোগনাথন; লেঃ কঃ এহ্‌শান কাদির; লেঃ কঃ শা' নওয়াজ (সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিবর্গ); মিঃ এ, এম, সহায় (সম্পাদক, সচিব—পদাধিকারে); শ্রীরাসবিহারী বসু (প্রধান পরামর্শদাতা); মেসার্স করিম গনি, দেবনাথ দাস, ডি. এম. খান; এ. ইয়াপাপ্পা; জে. থিবি, সর্দার ঈশার সিং (পরামর্শদাতা); এবং মিঃ এ. এন. সরকার (আইন বিষয়ে পরামর্শদাতা) নির্বাচিত হইলেন, এবং আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের হেড্ কোয়ার্টার্স বা প্রধান শিবির হইল সিঙ্গাপুরে।

স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থ বিভাগ পূর্ণ হইয়াছিল প্রধানতঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অকুণ্ঠ দানে। শুধু বর্মা হইতেই ৪ কোটি টাকা উঠিয়াছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের ও গভর্ণমেণ্টের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হইত এই টাকা হইতে। 'সুভাষ বসু' এই নামের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে টাকা আসিত অফুরন্ত ভাবে। তাঁহার অভিনন্দনের একটি ফুলের মালা প্রকাশ্য সভায় নিলাম করিয়া তখন তখনই ১২ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছিল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে ভারতের সকল প্রদেশের লোকই ছিল। বে-সরকারী বিবরণীতে পাওয়া যায়—এই ফৌজে ১৪০০ অফিসার এবং ৫০০০০ সাধারণ সৈন্য ছিল।

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট ১৯টি বিভাগের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইত; অক্ষশক্তির সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময় করা হইয়াছিল। মালয়ে ৭০টি, বর্মায় ১০০টি, থাইল্যাণ্ডে ২৭টি স্বাধীনতা সঙ্ঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল। ইহা ছাড়া আন্দামান, সুমাত্রা, জাভা, সেলীবিস্, বোর্ণিও, ফিলিপাইন্স্, চীন, মাঞ্চুকু এবং জাপানে তাহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর দ্বারা কোহিমা অঞ্চল অধিকৃত হওয়ার পর আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সেখানে পৌরশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছিল। ইহার পরই তাহাদের সংকল্প ছিল, ভারতীয় জাতীয় বাহিনী প্রথমতঃ আসামে ও বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমশঃ ভারতের অন্যান্য স্থানে নিজেদের সম্প্রসারিত করিবে।

বাঙালী মেয়েদের মধ্যে শিপ্রা সেন, রামু ভট্টাচার্য, মায়া গাঙ্গুলী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা সকলেই বাঙালীর মেয়ে—রাইফেল হাতে লইয়া ইহারা সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইয়াছিলেন। "বিদ্রোহিণী মেয়ের রোজনামচা" (Diary of a Rebel Daughter) হইতে আমরা জানিতে পারি—এক জায়গায় ঝাঁসী বাহিনী ৪৮ ঘণ্টা শত্রুপক্ষকে রুখিয়া রাখিয়াছিল এবং লড়াইয়ে বিজয়িনী হইয়া তাহারা ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

ভারতে নেতাজীর দূত

নেতাজী আজাদ হিন্দ অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়া কিছুদিনের মধ্যেই ভারতের বিপ্লবী বন্ধু ও সহকর্মীদের উদ্দেশে ভারতে দূত প্রেরণ করেন। এই দৌত্য কার্যের জন্য মনোনীত হন ডাঃ পবিত্র রায়, অমৃত সিং, মাহিন্দ্র সিং ও তুহিন মুখার্জী। এই দূত-চতুষ্টয় সাবমেরিণ যোগে নির্বিঘ্নেই পুরীর সমুদ্রের তীরে অবতরণ করেন। মাহিন্দ্র সিং যান পাঞ্জাবে—তুহিন যান বোম্বাইয়ে। তুহিন ও মাহিন্দ্র সিং শুধু ধৃতই হন না, অমানুষিক অত্যাচারে নাকি স্বীকারোক্তিও করেন। মাহিন্দ্র সিং পরে অনুতাপে লাহোরে আত্মহত্যা করেন। ডাঃ পবিত্র রায় ও অমৃত সিং কলিকাতায় আসেন। ডাঃ পবিত্র রায় বলেন—নেতাজীর নির্দেশমত পরিচিত প্রতুল গাঙ্গুলী প্রভৃতিকে (পবিত্র রায় ঢাকা অনুশীলনের ছাত্র ও যুবক কর্মী, মালয়ে ছিলেন) খোঁজেন। কিন্তু যোগাযোগ করিতে পারেন না, পূর্ব-পরিচিত অনেকেই তখন কারারুদ্ধ। তখন অমৃত সিংকে এলগিন্ রোডে সুভাষবাবুর বাড়ীতে পাঠান—যদি কোন সূত্র পাওয়া যায়। পবিত্র খিদিরপুরের গোপন আবাসে রোগী হইয়া থাকেন, তাঁহার জন্য নেতাজীর ভ্রাতা ডাঃ সুনীল বসুকে অমৃত সিং

call দিতে যান। দৈবক্রমে এলগিন রোডের বাড়ীতে তখন হরিদাস মিত্র উপস্থিত ছিলেন। অমৃত সিংকে হরিদাস বাবুই জানান যে ডাঃ সুনীল বসু ওখানে নাই, হাজারীবাগে আছেন। ইহার পর অমৃত সিং কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে হরিদাসবাবুকে বলেন, সুভাষবাবুর মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করা সম্ভব কি? —অমৃতের এই প্রশ্ন হরিদাস বাবুর বিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করে। হরিদাসবাবু অমৃতকে একটি কামরায় নিয়া মায়ের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেই অমৃত দুই চারিটা কথা বলেন। হরিদাসবাবু অমৃতকে জানান— 'আমাকে বিশ্বাস করিয়া সব বলিতে পারেন—আমি এ বাড়ীর জামাতা (হরিদাস মিত্র সুভাষবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী বেলা মিত্রের স্বামী)। তখন অমৃত বলেন, যে তাঁহারা সুভাষবাবুর নিকট হইতে আসিয়াছেন এবং অপর বন্ধু ডাঃ রায়ের নিকট হরিদাসবাবুকে লইয়া যান। সেখানে বিস্তারিত আলাপের পর হরিদাসবাবু যোগাযোগ স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই কার্যে হরিদাসবাবুর কর্মচারী যতীশচন্দ্র বসুও যোগ দেন। কলিকাতা ও ঢাকায় কিছুটা সংযোগ স্থাপিত হইতে থাকে। কিন্তু মাহিন্দ্র সিংয়ের কন্‌ফেশনের ফলেই হউক অথবা যে সূত্রেই হউক যতীশবাবুকে পুলিশ গ্রেফ্‌তার করে। প্রকাশ, তাহারই ফলে পুরী হোটেলে গোয়েন্দা পুলিশ ডাঃ পবিত্র রায়কে গ্রেফ্‌তার করিতে সক্ষম হয়। হরিদাসবাবুকেও গ্রেফ্‌তার করে এবং তাঁহার নিকট গোপন ট্রান্‌সমিটার পায়। গোপন বিচারে (সরকারী প্যানেল হইতে আসামীরা উকিল নিযুক্ত করে) পবিত্র রায়, অমৃত সিং, হরিদাস মিত্র, যতীশ বসুর ফাঁসির হুকুম হয়। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া আলিপুর জেলে থাকা অবস্থায় বীরেন্দ্র গাঙ্গুলী পবিত্রকে সান্ত্রীর সঙ্গে যাইতে দেখিতে পাইয়া তাহার দাদা প্রতুল গাঙ্গুলীকে পবিত্র রায়ের কথা জানায় (তাঁহারাও উক্ত জেলে আটক ছিলেন)। অতঃপর প্রতুলবাবুর সঙ্গে পবিত্র ও হরিদাসবাবুদের গোপনে যোগ স্থাপিত হয়। প্রথমটায় তাঁহারা আপীল করিতেও চান না—mercy petition করিতেও চান না। কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা ও ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া কিছুটা সময় নিবার জন্যই তাঁহারা বিশেষ আপত্তি সত্বেও প্রতুলবাবুর নির্বন্ধাতিশয্যে দরখাস্ত করেন। দরখাস্তে সহি করিয়া পবিত্র, অমৃত সিং ও হরিদাস বেদনাহত চিত্তে বলেন—প্রকৃত মৃত্যু আমাদের হইল। কারণ বৃটিশের কাছেই আবেদন করিতে হইল। ইতিমধ্যে হরিদাস

মিত্রের পত্নী বেলা মিত্র মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের বাঁচাইতে অনুরোধ করেন। মহাত্মাজীর চেষ্টায় তদানীন্তন বড়লাট মৃত্যুদণ্ড মকুব করেন এবং তাহার পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেন। ইতিমধ্যে যুদ্ধ শেষ, আই এন্-এর মামলা শেষ হইয়া গেল—অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে পবিত্র, হরিদাস, অমৃত সিং ও যতীশ মুক্তিলাভ করিলেন। আলিপুর জেলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত পবিত্র রায় উক্ত জেলে প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়াই সর্বপ্রথম গোপনে যে পত্র লেখেন তাহা ইতিপূর্বে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর 'জেলে ত্রিশ বৎসর' পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পত্রে জাপানীদের সাময়িক সাহায্য গ্রহণের যৌক্তিকতা, ভারতের স্বাধীন সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিবার এবং কোনোমতে জাপানের তাঁবেদার না হইবার দৃঢ়তা, ভারত সম্পর্কে জাপানের কোন দুরভিসন্ধি ছিল না, নেতাজীর আবির্ভাবের গুরুত্ব এবং পুরাতন বিপ্লবী বন্ধুগণের প্রতি রাসবিহারীর ভালবাসার কথা, ভারতের মুক্তি অভিযানে পরিচিত বিপ্লবী সুহৃদ্‌গণের নিশ্চিত সাহায্য লাভ সম্পর্কে নেতাজীর প্রত্যয়—পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়গণকে অনুপ্রাণিত ও সংঘবদ্ধ করিবার কার্যে সত্যানন্দ পুরী ও প্রীতম সিংহের কর্মনিষ্ঠার কথা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ আছে।

সুভাষবাবুর সংবাদ-সংগ্রহ-ব্যবস্থা

সুভাষবাবু বিপ্লবীদলের সঙ্গে কেবল যে যুক্ত ছিলেন তাহা নহে। বৈপ্লবিক নেতা হইতে হইলে যে-সকল দক্ষতা থাকা প্রয়োজন তাহাও যে তাঁহার ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। সুদক্ষ নেতাকে একদিকে যেমন গোপনতা রক্ষা করিতে হয়, তেমনি শত্রুপক্ষের গতিবিধি ও কর্মপ্রচেষ্টার সন্ধানও রাখিতে হয়। সুভাষবাবুরও যে সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল—তাহার প্রমাণ মিলিতেছে। ঘটনাটি এই:—যুদ্ধ আরম্ভের কিছু পরেই—রামগড় আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের কিছুটা আগে—কলিকাতায় রবি সেনের নিকট অনুশীলন দলের বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য কাশী হইতে পত্র দিয়া একজন লোক পাঠায়। বীরেন্দ্র উত্তর ভারতে সৈন্যদলের মধ্যে কাজ করিত। গোপনে সংযোগ রক্ষা করিত। লোকটি বীরেন্দ্রের একটি পত্র আনিয়া রবিবাবুকে কলিকাতায় দেয়। পত্রে সৈন্যদের সম্পর্কে কিছু কথা ছিল। চিঠিতে নিম্নলিখিত গোপন ঠিকানা—

"বিমলাসুন্দরী দেবী—পাতালেশ্বর" লিখিত ছিল। রবিবাবুর নিকট হইতে উত্তর লইয়া লোকটি কাশীতে বীরেন্দ্রের নিকট যাইবে। ঐ লোকটি যখন আসে, তখন রবিবাবু বাড়ী ছিলেন না। লোকটি অপেক্ষা করে এবং খাওয়া দাওয়া করে। রবিবাবু বাড়ী আসিলে তাঁহার ভাগিনেয় রবিবাবুকে একটু সতর্ক করিয়া দিয়া বলে, ভদ্রলোকের চালচলন যেন কেমন কেমন,—ভাল লাগে নাই। পূর্বে সতর্ক হইয়াছিলেন বলিয়া, ভদ্রলোক যখন রবিবাবুকে বলে যে, বীরেন্দ্রবাবু উত্তর লইয়া যাইতে বলিয়াছেন, তখন রবিবাবু বলেন—'বীরেন্দ্র যেন আসিয়া দেখা করে।' ইহার ২।৪ দিন পরেই রাত্রি ১১টায় সুভাষবাবু রবিবাবুকে ফোন্ করেন :—'জরুরী দরকার, আসবেন।' রবিবাবু রাত্রে দেখা করিলে, সুভাষবাবু প্রশ্ন করেন :—বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য নামে আপনাদের কেহ কাশীতে আছেন? রবিবাবু বলেন—আছেন। "তিনি আপনাকে লোক মারফতে একখানা পত্র পাঠাইয়াছেন, পত্রে, 'বিমলাসুন্দরী দেবী—পাতালেশ্বর' ঠিকানা ছিল?"—রবিবাবু এই প্রশ্নে বিস্মিত হন। কারণ এই ঠিকানা বীরেন্দ্র ও রবিবাবু ভিন্ন অপরের জানার কথা নহে। সুভাষবাবু রবিবাবুকে বলেন, যে লোকটি আসিয়াছিল—সে স্পাই। ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট আপনার বিরুদ্ধে সে রিপোর্ট করিয়াছে। ইত্যাদি। রবিবাবুর বিস্ময় অপনোদন করিয়া সুভাষবাবু জানান যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে সংবাদ পাইবার কতকটা ব্যবস্থা তাঁহার আছে। অবশ্য এই জন্য সুভাষবাবুকে মাসে মাসে হাজার খানেক টাকা ব্যয় করিতে হয়।

এইরূপ সংবাদ সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা অপর বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বাবুর ছিল। এখানে সেই সম্পর্কে দুই একটা ঘটনার উল্লেখ করা গেল। রাসবিহারীর বিপ্লবীর সন্ধানী দৃষ্টি ছিল। আর ছিল বৈপ্লবিক কর্মাদর্শে ঐকান্তিক নিষ্ঠা—যে কারণে তাঁহার মধ্যে ভাবপ্রবণতা ছিল না, শান্তসমাহিত নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে কাজ করিয়া যাইতে পারিতেন। রাসবিহারী দিল্লীতে বড়লাটের উপর বোমা-নিক্ষেপের (রাসবিহারীর সহকর্মী ও অনুগত শ্রীবসন্ত বিশ্বাস বোমাটি নিক্ষেপ করে, রাসবিহারী নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন) উদ্যোক্তা ছিলেন। বোমা নিক্ষেপের পরে বোমাবর্ষণের নিন্দা করিয়া দেশে বহু সভাসমিতি হয়। দেরাদুনের এমনি একটি সভায় রাসবিহারী বড়লাটের উপর বোমাবর্ষণের তীব্র নিন্দা করিয়া বক্তৃতা দিলেন। সেই বক্তৃতা শুনিয়া

কে মনে করিবে, যে, তিনি কখনো এ-কার্যের উদ্যোগী হইতে পারেন। রাসবিহারী পুলিশের নিকট হইতেই পুলিশের কর্মতৎপরতার সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের সেণ্ট্রাল আ-ই-বির সুশীলবাবু (বসু) ছিলেন তখনকার নামকরা ব্যক্তি। রাসবিহারী চাকুরী অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে বন্ধুর মতো মেলামেশা করিতেন। সুশীলবাবুর বিশ্বাস ছিল রাসবিহারী বিপ্লবীদলের বিরোধী। এই বিরুদ্ধতা কথায় প্রকাশ পাইত বলিয়া সুশীলবাবু রাসবিহারীকে বিপ্লবীদের, বিশেষ করিয়া বাঙালী বিপ্লবীদের খোঁজখবর লওয়ার কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেন। যে-সব সংবাদ পুলিশ জানিত রাসবিহারী তাহাই লইয়া আলাপ আলোচনা করিতেন, প্রকৃত খবর কিছুই দিতেন না, কিন্তু এই আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া পুলিশ হইতে খবর লইতেন, পুলিশের গতিবিধির সংবাদ লইতেন। ১৯১৩ সালে রাসবিহারী দিল্লী হইতে আসিয়া ঢাকা অনুশীলন সমিতির কলিকাতার তখনকার অন্যতম আড্ডা আপার সার্কুলার রোড্ সংলগ্ন রাজাবাজার খোলাঘরের দ্বিতলে থাকেন। অন্য আড্ডা বাদুড়বাগান বাড়ীতে রাসবিহারীর হাতে রিভলবারের গুলি লাগে। এই সময়েই কলেজ স্কোয়ারে গোয়েন্দা পুলিশ নিহত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের পরদিনই এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রবি সেনকে (রাসবিহারী বসু তখন আহত অবস্থায় শয্যাশায়ী) রাসবিহারী বলেন:—আপনাকে কিন্তু টেগার্ট সাহেব কালই ডাকবে। এই সংবাদ প্রথমটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। কারণ রবিবাবু তখন ছাত্র, টেগার্ট সাহেব কেন যে ডাকিবেন, কিছু কারণ বুঝা যায় নাই। কিন্তু সত্যই দেখা গেল পরদিন টেগার্ট সাহেব রবিবাবুকে ডাকাইয়াছেন। ডাকিয়া খুব করিয়া ধমকাইয়া দিলেন। স্পষ্টতঃ বুঝা যায় টেগার্টের আফিসে সংগোপনে যে কথা-বার্তা হইয়াছে সেই সংবাদ পাওয়ার ব্যবস্থাও রাসবিহারীর ছিল।

রাসবিহারী সম্পর্কে সুশীল বসুর (সেণ্ট্রাল আই-বি) সন্দেহ দেখা দেয় পরে! দুইজন একই ট্রামের আরোহী। ট্রামে দেখা। রাসবিহারী লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার পড়িয়া যাওয়া ট্রামের টিকিটখানা সুশীল বসু কুড়াইয়া নিলেন (যদিও তিনি মনে করিলেন, অলক্ষ্যে কুড়াইয়াছেন)। রাসবিহারীর তখনই সন্দেহ হয় যে তাঁহার আসল রূপ সম্পর্কে সুশীলবাবুও বোধ হয় কিছুটা দ্বিধায় পড়িয়াছেন, অথবা সজাগ হইতেছেন। 'সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি' আর নিরাপদ নহে, স্থির করিয়া, রাসবিহারীবাবু অতঃপর একেবারেই গা ঢাকা দেন।

সুভাষচন্দ্রের আত্ম-বিশ্বাস

১৯৩২ সালের ২রা জানুয়ারী কল্যাণ রেল স্টেশনে রেগুলেশন তিন আইনে সুভাষচন্দ্র বন্দী হইলেন। সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়। ১৯৩৩ সালে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইউরোপের স্বাস্থ্য নিবাসে যাওয়ার চুক্তিতে কারামুক্তির আদেশ দিলেন।—সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর নিকট হইতে ইউরোপের বিশিষ্ট নেতাদের বরাবরে পরিচয়-পত্র চাহিয়াছিলেন। গান্ধীজী জানান যে বিদেশে যাওয়ার পূর্বে তিনি সুভাষবাবুকে পত্র দিবেন। সুভাষচন্দ্র বিদেশে যাইতেছেন,—মহাত্মাজীর পরিচয়-পত্র নিতে পারিলে সেখানে পরিচয়ের এবং কাজকর্মেরও বিশেষ সুবিধা হইবে ইহা মনে করেন এবং চিঠির প্রত্যাশা করেন। যখন বোম্বাইয়ে জাহাজে—তখনো চিঠি আসিল না। অনেকেই দেখা করিতে আসেন, কংগ্রেস নেতৃবর্গও অনেকে আসেন ; সুভাষচন্দ্র আশা করেন, এবার হয়তো পত্র আসিতেছে ! অবশেষে একেবারে শেষ মুহূর্তে দেখা গেল—মহাদেব দেশাই আসিতেছেন ; এবারে বাঞ্ছিত 'পরিচয়-পত্র' আসিবে, সুভাষবাবু সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাদেব সুভাষবাবুর হস্তে মহাত্মাজীর একখানা পত্র দিলেন। খামখানা অতি ক্ষীণকায়—হাতে লইয়াই সুভাষবাবু মনে করিলেন পত্র কোথায় ? পত্র খুলিলেন ! মহাত্মাজী সংক্ষেপে জানাইয়াছেন "আমি পরে ভাবিয়া দেখিলাম (second thought) আমি বিদেশে পরিচয়-পত্র দিতে পারি না।"—সুভাষচন্দ্রের হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া যাইবে, এমন-ই অবস্থা হইল। বড়ই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। কিন্তু সহসা দুর্জয় আত্ম-বিশ্বাস—এই আত্ম-বিশ্বাসই ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রকৃতি-গত ধর্ম—দেখা দিল। সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতেও একখানা পরিচয়-পত্র সঙ্গে আনিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পত্রখানা বাহির করিলেন : তাহাও টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। 'অপরের প্রত্যাশা আর করিব না। আমার পরিচয় আমিই দিব।'—তাহাই হইল। অতঃপর মিশরে নাহাশ পাশার সহিত কি ভাবে পরিচিত হন—ইতালীতে মুসোলিনীর জামাতা সিয়ানোর সঙ্গে কোন্ সূত্রে বুঝাপড়া হয়—ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে—বিশিষ্ট-ব্যক্তিদের নিকট—কংগ্রেসের বামপন্থী নেতারূপে—বিপ্লবী নেতারূপে গণ্য হন তাহা বিশদ করিয়া না বলিলেও চলে।

যাহারা প্রাণ দিল কিন্তু কেহ মনে রাখিল না

বাংলার বিপ্লব-প্রবাহে অবগাহন করিয়া উহারই তরঙ্গভঙ্গে সন্তরণ করিতে করিতে যাহারা একদা ডুবিয়া গেল তাহাদের বিস্মৃতির অতল হইতে তুলিয়া আনা যাইবে কি ?

যাঁহারা ডুবিয়া গিয়াছেন—ইতিহাসে যাঁহাদের কোন চরণ-চিহ্ন নাই, আর যাঁহারা মৃত্যুবরণ করিয়াও বিস্মৃত হন নাই—ইতিহাসে চিহ্ন রাখিতে পারিয়াছেন—এবং যাঁহারা মরণের পথে গিয়াও, দৈবক্রমেই শুধু মরেন নাই—আজও বরেণ্য কর্মী ও নেতারূপে বাঁচিয়া আছেন, বিপ্লব-সংস্কার দিক হইতে এবং বিপ্লবনিষ্ঠার দিক হইতে তাঁহাদের সকলেরই মূল্য আছে। বিস্মৃত ও বিস্মৃতপ্রায় বিপ্লবনিষ্ঠ কতিপয় বিপ্লবীরই নামমাত্র আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি। বলা বাহুল্য, জীবিত বিপ্লবী কাহারো নাম এখানে উল্লেখ করিব না। যাঁহারা বিপ্লব ইতিহাসে নানা সূত্রে স্থান পাইয়াছেন—মামলার রায়ে, তথা দলিলপত্রে স্থান পাইয়াছেন—তাঁহাদের প্রসঙ্গ এখানে তুলিব না।

প্রফুল্ল চক্রবর্তী—উল্লাসকর দত্ত বোমা তৈয়ারী করিয়া প্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য দেওঘর রোহিণী পাহাড়ে যান। বারীনবাবুরা দূরে ছিলেন। উল্লাসকর প্রফুল্ল চক্রবর্তীকে লইয়া পাহাড়ে উঠেন এবং বোমাটি প্রফুল্লের সাহায্যে নীচে ফেলিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ঐ পরীক্ষা কালে বোমাটি ফাটিয়া গিয়া উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় ; উল্লাসকর সামান্য আহত হন, কিন্তু প্রফুল্ল ঐ বোমার আঘাতে নিহত হন। প্রফুল্লের কথা পৃথিবীর কেহ জানিলও না। প্রফুল্ল ছিল বারীনবাবুদের রংপুর কেন্দ্রের ছেলে।

সুশীল সেন—প্রাগপুর ডাকাতিতে মারা যায়। অতুলকৃষ্ণ ঘোষ সুশীল সম্পর্কে বলেন, একেবারে সমর্পিতপ্রাণ, এমন ছেলে হয় না। বলেন—পুলিন মুখার্জী একদিন বেদনাহত চিত্তে আসিয়া জানায়—'রেখে এলাম সুশীলকে।' প্রাগপুর ডাকাতিতে সুশীল নিজেদের গুলিতেই নিহত হয়। বিপ্লবীগণ অগত্যা সুশীলের দেহ নৌকা হইতে নদীর জলে নিক্ষেপ করে। এই সুশীলকেই কিংসফোর্ড সাহেব বেত্রদণ্ড দান করিয়াছিলেন।

গোপেশ রায়—রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। অতিশয় বিশ্বস্ত, যে কোন বিপদ বরণ করিতে প্রস্তুত। পাথরপ্রতিমায় অন্তরীণাবস্থায় মারা যায়।

প্রবোধ ভট্টাচার্য—বিপ্লব সংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী ১৯১৬ সালে অন্তরীণ হইতে পলায়নের মাস দুই পরে ললিতেশ্বর ডাকাতিকালে সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করে। রাজসাহীর আদর্শ বিপ্লবকর্মী।

গোপাল সেন—ঢাকা বাহ্রা ডাকাতিতে যোগদান করে। গৌরীপুর কেন্দ্রের তরুণ কর্মী। পুলিশের গুলিতে নৌকা বিদ্ধ হওয়ায়, ছিদ্রপথে নিয়ত জল উঠিতেছিল। গোপাল একমনে নৌকার জল সেচিতেছিল। এমনি অবস্থায় পুলিশের নিক্ষিপ্ত গুলি গোপালের মস্তক বিদ্ধ করিয়া যায়। গোপাল গীতাখানা চাহিয়া বক্ষে ধারণ করে এবং বন্দেমাতরম্ বলিতে বলিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

সত্যেন সরকার—ঢাকার ত্যাগনিষ্ঠ কর্মী। ১৯১৮ সালে এক পল্লীতে আটক থাকাকালে পাগলা শিয়ালের কামড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অনুজা সেন—কলিকাতার বিপ্লবকর্মী। ১৯৩০ সালে মিঃ টেগার্টের উদ্দেশ্যে বোমা (ডালহাউসী স্কোয়ার) নিক্ষেপ করে। বোমা বিস্ফোরণে অনুজা সেন গুরুতর আহত হয় ও মারা যায়।

শচীন দাশগুপ্ত—১৯১৪ সালে বিপ্লবী দলে যোগ দেয়। অন্তরীণ রাখার পীড়নমূলক নীতির (অস্বাস্থ্যকর স্থানে রাখা, অসুখে চিকিৎসার অভাব, প্রয়োজনীয় অর্থ না দেওয়া ইত্যাদি) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া এইরূপ অত্যাচারের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শচীনই প্রথম রংপুরে ১৯১৭ সালে আত্মহত্যা করে।

নিশি পাইনের মা—আসক জমাদার গলিতে (ঢাকা) বিপ্লবীদের বাসস্থানে তিনজন ফেরারীকে—অতুল দত্ত, মথুর চক্রবর্তী, সুধীর মজুমদারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয়। সেখানে নিশি পাইনের মাও ছিলেন। বাড়ী ভাড়ার সুবিধার জন্যই মাও সন্তানদের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছেন। পুলিশ সকল রকম চেষ্টা করিয়াও এই বৃদ্ধার নিকট হইতে একটা কথাও আদায় করিতে পারে নাই। তিনি যে কে, কোথায় ঘরবাড়ী কোন পরিচয়ই দেন না। পুলিশ এমন বেয়াড়া মহিলাকে ঐ বাড়ীতেই আটক রাখে। দ্বারে পুলিশ রাখিয়া পূর্বোক্ত ফেরারীদের লইয়া যায়। নিশি পাইনের মা কিন্তু পলায়নের চেষ্টায়

ছিলেন। পুলিশ একটু অসতর্ক হইতেই বৃদ্ধা পলাইয়া যান ও পরে ফেরারী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

যোগেন রায়—ফরিদপুরের কর্মী, রাজাবাজার বোমার মামলার পলাতক। কাশীতে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। পথ্যের অভাবে ক্ষুধায় কাতর হইয়া রাস্তায় বাহির হয়। ষাঁড় গুঁতাইয়া দেয়, ফলে মারা যায়।

নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—বিনায়ক রাও কাপলের হত্যাকারী বলিয়া সুশীল লাহিড়ী ধৃত হয়, এবং ফাঁসী হয়; সুশীলের সঙ্গে নৃপেন্দ্র কাশীতে থাকিত। সুশীলের সঙ্গে নৃপেন্দ্র ছিল বলিয়া পুলিশ খবর পায় এবং নৃপেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করে। সেই সময় দলের যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। নৃপেন্দ্র পলাতক। অর্থসঙ্গতি নাই। ভগ্নীর বাড়ীতে একবেলা খাইতে যাইত—ভগ্নীপতিকে লুকাইয়া। কারণ ভগ্নীপতি ফেরারীকে বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসিতে দিতে নারাজ। একদা ভগ্নীপতি অকস্মাৎ নৃপেনকে দেখিতে পায় এবং বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়। অন্নের সংস্থান নাই, দলের সংযোগ ছিন্ন, কোথাও স্থান নাই—নৃপেন কাশীতেই আত্মহত্যা করে।

পরিশিষ্ট—বিবিধ কথা

নরেন্দ্রনাথ ও অতুল ঘোষের মুক্তির কারণ

গার্ডেন রীচ্ ডাকাতিতে নরেন ভট্টাচার্য এবং অতুল ঘোষও ধৃত হন। জার্মান ষড়যন্ত্রের জন্য যতীন মুখার্জী নরেনের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেন, এবং নরেন ভট্টাচার্যকে থানা হইতে প্রেসিডেন্সী জেলে চালান দিবার সময় পুলিশের হেফাজত হইতে ছিনাইয়া লইবার জন্য বিপ্লবীদের নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী বিপ্লবীগণ প্রস্তুত হইয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন পুলিশ ভ্যান পূর্বেই নরেনকে লইয়া জেলে চলিয়া গিয়াছে।*

অতঃপর নরেনকে জামীনে খালাস করার ব্যবস্থা হয়। মামলার কোন আসামী ডাকাতির অপরাধ নিজের উপর লইলে নরেনের জামীন সম্ভব, উকীলের এই উক্তিতে মাদারীপুরের অপূর্ব ত্যাগনিষ্ঠ কর্মী রাধাচরণ প্রামাণিক এক স্বীকারোক্তিতে ডাকাতি সম্পর্কে নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, নেতা পূর্ণচন্দ্র দাস (তখন তিনি ফরিদপুর জেলে আবদ্ধ ছিলেন) ষড়যন্ত্রের প্রয়োজনে রাধাচরণকে উপরোক্ত স্বীকারোক্তি করিতে অনুমতি দেন। নরেন্দ্র জামীন পাইয়া ভারতের বাহিরে যান।

অতুলচন্দ্র ঘোষকেও গার্ডেন রীচ্ ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন তিনি এম. এস্-সি-র ছাত্র। বড়তলা থানার হেম লাহিড়ী তদন্ত করেন। হেম লাহিড়ীর বাড়ী অতুলবাবুর দেশে। ডাকাতিতে ব্যবহৃত ট্যাক্সির ড্রাইভার সনাক্তের সময় অতুলবাবুকে দেখিয়া বলে—'এইসান বাবু থা'। কিন্তু যেই পুলিশ ইন্স্পেক্টার (ললিতবাবু) বলেন—শালা ঠিক

* অমৃতবাজার পত্রিকায় Etcher যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন—নরেন্দ্র ভট্টাচার্যকে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে মুক্ত করিবার জন্য যতীন্দ্রনাথ জেল আক্রমণের প্রস্তাব করেন। এই সম্পর্কে অতুলবাবু বলেন, যতীন্দ্রনাথ জেল আক্রমণের অবাস্তব প্রস্তাব করেন নাই, শুধু পুলিশ হেফাজত হইতে ছিনাইয়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অতুলবাবুর উক্তিই যথার্থ মনে হয়।

বল্, অমনি ড্রাইভার বলে—'নেহি, এ বাবু নেহি থা'। ইহারই ফলে অতুল বাবু জামীনে মুক্তি পান। অতুলবাবু বলেন—নরেন্দ্র ভট্টাচার্যকে সুরেশ মুখার্জী (পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার) গ্রেপ্তার করে শুনিয়া যতীনবাবু অতুলবাবুদের বলেন, 'I want Suresh—dead or alive.' চিত্তপ্রিয় বলে, 'আমি চিনি সুরেশকে'। চিত্তপ্রিয় হেদোর নিকট (মাণিকতলা মোড়) একটা ফুলুরীর দোকানের কাছাকাছি দাঁড়ায়। মনোরঞ্জন, নীরেন, অতুলবাবু প্রভৃতি আশে পাশে থাকেন। সুরেশ ট্রাম হইতে নামিয়াই চিত্তকে ধরে এবং বলে—'ও! আবার রিভলবার দেখছি একটা'। সুরেশ ঐখানেই বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়।

ভগৎ সিংয়ের উদ্যম

লালা লজপৎ রায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী লাহোর পুলিশের এসিষ্টাণ্ট-সুপার মিঃ সেণ্ডার্সকে মৃত্যুদণ্ড দেন ভগৎ সিং। এই হত্যাকাণ্ডের পর ভগৎ সিং ফেরারীরূপে কলিকাতায় আসেন। বেতিয়ার ফণী ঘোষ সঙ্গে ছিলেন। জানা যায়, আত্মগোপন করিয়া কলিকাতায় আসিবার সময় অনুশীলন সংস্থার পাঞ্জাবের বিশিষ্ট সদস্য, বোমা বিস্ফোরণে নিহত ভগবতীচরণ ভোরার পত্নী শ্রীমতী দুর্গাদেবী ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে আসেন। দুর্গাদেবী শিশুপুত্র সহ যেন স্বামী-স্ত্রী এইরূপে ভগৎকে কলিকাতায় নিরাপদে নিয়া আসেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে (পৃষ্ঠা ২৮৮), ফণী ঘোষ ও যতীন দাস সহ ভগৎ সিং, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যদিও ১৯২৮ সালের কর্মনীতি অনুসারে অনুশীলনের নেতৃগণ ভগৎ সিং-কে জানান যে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসমূলক কাজ আরম্ভ করিলে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন ব্যর্থ হইবে, বিগত বহু বৎসরের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে; কিন্তু ভগৎ সিং বলেন,—বাংলা দেশে ইহার প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু পাঞ্জাবে ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। একদল শিক্ষিত যুবকের দরকার—যাহাদের আত্মবিসর্জনের দ্বারা দেশের ভয় ভাঙ্গিবে—মুক্তি সংগ্রামের একটা ধারাবাহিকতা থাকিয়া যাইবে, যেমন আছে বাংলায়। পাঞ্জাবে ইহার অভাব আছে।—ভগৎ সিং আরও বলেন—এমন-কাজ করিতে হইবে যাহাতে পৃথিবীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দিল্লীর এসেম্‌ব্লিতে এই রকম কিছু করা যায় কিনা দেখিতে হইবে।—আলোচনার পরে প্রতুলবাবুরা

অস্ত্র দিতে সম্মত হন। যতীন দাসও কিছুকাল পূর্ব হইতেই কিছু একটা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। ভগৎ সিং-কে কয়েকটা রিভলভার দিলে ভগৎ বোমাও চাহেন। যতীন দাস নূতন ধরণের যে বোমা তৈয়ারী শিখিয়াছিল—তাহা পুরাতন পদ্ধতিতে তৈয়ারী বোমার মত কার্যকরী না হইলেও—দেখা যায়, ভগৎ সিং আর বিলম্ব করিতে চাহেন নাই, যতীনের তৈয়ারী বোমাই দিল্লী এসেম্ব্লিতে নিক্ষেপ করিবার জন্য নেন। দিল্লী পরিষদের বোমা কার্যকরী অর্থাৎ মারাত্মক হয় নাই। অবশ্য ভগৎ সিং বোমা ফাটাইতেই চাহিয়াছিলেন—কাহাকেও হত্যা করিতে নহে। ফণী ঘোষ এপ্রুভার হইয়াছিল, তাহা উক্ত হইয়াছে।

হিজলী বন্দীনিবাসে হাঙ্গামা

হিজলী বন্দীনিবাসে নিরস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে সিপাহীদের সংগ্রাম হয়। তাহাতে (আলিপুর দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র মামলার আসামী) সন্তোষ মিত্র এবং বরিশালের তারকেশ্বর দত্ত পুলিশের গুলিতে নিহত হন। ২০ জন বিপ্লবী আহত হয়, তন্মধ্যে ৪ জনের আঘাত গুরুতর। সিপাহী এবং অফিসারও জনকয় আহত হয়। এই ঘটনা হয় ১৯৩১ সালের মাঝামাঝি। বক্সা প্রভৃতি বন্দীনিবাসেও এই দুঃসংবাদ পৌঁছায়। বন্দীরা অনশন করে। বক্সার ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিজলীর সংবাদে উক্ত বন্দীনিবাসে উত্তেজনা সৃষ্টি হইবে—আশঙ্কা করিয়া সতর্ক হন এবং ইহাও বন্দীদের বলেন—তোমাদের হিজলীর বন্ধুদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য যাহা করিতে চাও সেই ব্যবস্থা করিয়া দিব। অর্থাৎ ইহা লইয়া অসহায় বন্দিগণও মরীয়া হইয়া গোলযোগ করিতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা ছিল। আটক বন্দীদের উপর এইরূপ গুলি বর্ষণের তীব্র নিন্দা উত্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সমগ্র জাতির মূক-ভাষা ধ্বনিত হইয়া উঠে।

বিপ্লবীর সন্ন্যাস গ্রহণ

বিপ্লব-কর্মিগণ অনেকে শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত—শান্তিনাথ (গম্ভীরনাথের গদীতে), সূর্যকুমার সেন—নির্বাণানন্দ (রামকৃষ্ণ মিশন), রাধিকা অধিকারী—স্বামী সুন্দরানন্দ (উদ্বোধন

সম্পাদক) শান্তি মুখার্জী—দীনানন্দ, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়—নিরালম্ব স্বামী, শিশির গুহ রায়—সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, নাম জানা নাই, প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত—আত্মপ্রকাশানন্দ (রামকৃষ্ণ মিশন), সতীশ দাসগুপ্ত—স্বামী সত্যানন্দ, প্রফুল্লকুমার সেন—সত্যানন্দপুরী, নগেন্দ্রনাথ সরকার—সহজানন্দ (রামকৃষ্ণ মিশন), আকালু (ময়মনসিংহ)—নিবৃত্তিনাথ (গম্ভীরনাথের আশ্রম), দীনেশ দাশ—নিখিলানন্দ, সতীশ মুখার্জী—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, দেবব্রত বসু—প্রজ্ঞানন্দ, নরেন সেন—নরেন মহারাজ (রামকৃষ্ণ মিশন), পরেশ লাহিড়ী (বিপ্লবী হেমেন্দ্র আচার্যের সহকর্মী)—স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি, ভোলা গিরি আশ্রমের প্রধান মোহন্ত।

ইহা ছাড়াও অনেকে আছেন। একদা ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবীগণ অনেকে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যায়। ইহা একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সহানুভূতি

বিপ্লব-আন্দোলনের প্রতি বাংলার প্রাণবান শ্রেষ্ঠ মনীষী যাঁহারা তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। বিদেশী-শাসন-শৃঙ্খল এই বিপ্লবীদের দ্বারাই বুঝি টুটিয়া যাইবে বা যাইতে পারে, এমনই ভরসা তাঁহারা রাখিতেন।

যদি ইঁহাদের কার্যে কোনরূপে সাহায্য করিতে পারা যায়—এজন্য তাঁহাদের উৎসাহ কম ছিল না। এস্থলে একটি দৃষ্টান্ত লইতেছি—

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে পুলিনবিহারী দাসের আলাপের ব্যবস্থা হয়, জ্ঞানচন্দ্র মজুমদারের মাধ্যমে। জ্ঞানবাবু তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েন। পুলিনবাবু ডিপোরটেশন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পুলিনবাবুর তখন অত্যন্ত সুনাম। তাঁহার কর্মকুশলতা ও মন্ত্রগুপ্তিতে লোকের বিশ্বাস ছিল। পুলিনবাবুও চাহিতেছিলেন একটি ভালো রকমের বিস্ফোরক তৈয়ারীর কারখানা করিতে। ছাত্র জ্ঞানচন্দ্র গুরুদেব আচার্যকে পুলিনবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইলেন—আচার্যদেবের তখনকার বাসস্থানের সন্নিকট গ্রীয়ার পার্কে (পরে জেনানা পার্ক হয়)। আচার্যদেব তিনদিন রাত্রিতে জ্ঞানবাবুসহ পার্কে গিয়া পুলিনবাবুর সঙ্গে আলাপ করেন। কিভাবে এই বিপ্লব-সংঘটন সম্ভব হইতে পারে, ব্যাপক অভ্যুত্থানের জন্য কিভাবে অস্ত্র ও বিস্ফোরক সংগ্রহ ও তৈয়ারী হইতে

পারে—এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়। আচার্যদেব তখন স্বীকার করেন যে গোপন বিস্ফোরক কারখানার তিনি ভার নিবেন, এই ব্যাপারের জন্য তাঁহার বিশ্বাসবান অপর বৈজ্ঞানিক ছাত্রদেরও দিবেন। এই গ্রীয়ার পার্কেই একদিন বিস্ফোরক দ্রব্য তৈয়ারীর আলোচনা প্রসঙ্গে জ্ঞানবাবু 'Nitro-explosives' বইখানার কথা উল্লেখ করেন। আচার্যদেব বলেন, "হ্যাঁ—ও বেশ ভাল বই। ও-বই বাজারে পাওয়া যায় না। তুমি এই বই কোথায় দেখলে?" তখন জ্ঞানবাবু জানান—'প্রেসিডেন্সি কলেজ লাইব্রেরী হইতে পড়িতে আনিয়াছিলাম—ফেরৎ দেই নাই। রাখিয়া দিয়াছি।' এই কথা শোনা-মাত্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রাগিয়া গিয়া বলিলেন—এইভাবে বই নিয়া আসিয়াছ? —ফেরৎ দিয়ে দেও, কালই ফেরৎ দিবে…ইত্যাদি। অবশ্য সেই বই আর কখনো ফেরৎ দেওয়া হয় নাই। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে —আচার্যদেব বিপ্লবীদের ইংরেজ বিতাড়ন-কার্যে সহানুভূতিশীল, এবং তাহাদের বিস্ফোরক তৈয়ারী ব্যাপারে গোপনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেও —বিপ্লবীদের মতোই—বিপ্লব-প্রয়োজনকে ধর্মকর্ম মনে করিতে অভ্যস্ত হন নাই। তাঁহার মধ্যে যে সহজ সাধুতা ও নীতিজ্ঞান অক্ষুণ্ন বা অবিকৃত ছিল —ঐ পুস্তক-সরানো কার্যটাকে তাহাই অসাধু কার্য বলিয়া গণ্য করাইয়াছে। বিপ্লবীগণ "দেবী আমার—সাধনা আমার—স্বর্গ আমার—আমার দেশ"—এই প্রেরণা লইয়াই বিপ্লব-উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে সব কিছু করার জন্য, দেহ-মনে যেভাবে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল—ভালো মানুষ আচার্যদেব এবং ঐ ধরণের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের দেহ-মন তদনুযায়ী হয় নাই। আচার্যদেব বিপ্লব আয়োজনের একটা দিকের অংশ গ্রহণে সম্মত হন—কতকটা উৎসাহই বোধ করেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে—নিরালায় ছাত্র জ্ঞানবাবুকে ডাকিয়া নিয়া বলিতেন—তোমাদের সঙ্গে যোগ দিলাম বটে, কিন্তু রাত্রে যে ঘুম হয় না হে। যাই হোক—পরে পুলিনবাবু ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হন—ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। ঐ পাঠ ঐখানেই শেষ। বিপ্লব আন্দোলন কি পরিমাণ প্রেরণা দেশে আনিয়া জাতির অন্তরাত্মার সমগ্র রূপকে কিভাবে স্পর্শ করিয়াছিল—অল্পবিস্তর রূপায়িত করিতেও সক্ষম হইয়াছিল—তাহার পরিচয় দিতেই ইহার উল্লেখ করিলাম। ইহার প্রভাব যে কত গভীরে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা বুঝিবার। Handful of misguided youth-ই কেবল ইহাতে সাড়া দেয় নাই।

বিপ্লবী নায়কের দৈব-শক্তিতে তথা যোগবলে বিশ্বাস

পি. মিত্র (প্রমথ মিত্র মহাশয়) জগৎপুর আশ্রমের স্বামী পূর্ণানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। যোগ-দীক্ষা। মিত্র মহাশয়—অলৌকিক শক্তিতে বা যোগশক্তিতে ভারত উদ্ধার হইবে—ইহা শেষ জীবনে বিশ্বাস করিতেন। এই সম্পর্কে ঢাকা অনুশীলন সমিতির ত্যাগনিষ্ঠ কর্মী আশুতোষ দাশগুপ্ত (তিনি মিত্র মহাশয়ের অত্যন্ত প্রিয় ও শিষ্যস্থানীয় ছিলেন) মিত্র মহাশয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "আমি (আশুতোষ দাশগুপ্ত) মিত্র মহাশয়কে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনি নাকি দিল্লীতে কি দেখিয়াছিলেন? মিত্র মহাশয় উত্তরে বলেন: একবার হাইকোর্টের ছুটি উপলক্ষে দিল্লীতে যাই। পায়ে হাঁটিয়া পুরাতন দিল্লী দেখিতেছি—প্রখর রৌদ্র। একস্থানে দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছি—অত্যন্ত ক্লান্ত। সম্মুখে রাজপথ—দ্বিপ্রহর, জনপ্রাণী নাই। অন্যমনস্ক হইয়া দিল্লীর ইন্দ্রপ্রস্থের কত কাহিনী মনে করিতেছি। মোগলদের কথা—এখন ইংরেজের কথা—ভারতের পরাধীনতার কথা—ভারতবাসীর দুর্গতির কথা—হায় ভারত, কেমন করিয়া আমরা আবার স্বাধীন হইব? —এইরূপ ভাবিতেছি—এমন সময় কানে আসিল—অশ্বখুরের টকটক্ শব্দ। চাহিয়া দেখি সত্যই একদল বিচিত্রবেশধারী অশ্বারোহী যাইতেছে। প্রত্যেকেই বলিষ্ঠ—দীর্ঘ দেহ, হস্তে মুক্ত তরবারি। এই পর্যন্ত টক্টক্ শব্দ ভিন্ন কিছুই শুনি নাই। কিন্তু সর্বশেষ অশ্বারোহী যখন আমাকে অতিক্রম করিল তখন কয়টি কথা কানে আসিল—সব কথা মনে নাই—আমি অভিভূত ছিলাম —কিন্তু এই কথা কয়টি মনে আছে: 'যোগসে হোগা, নেহি হোগা তরবারিসে'।" আশুবাবু বলেন—আমি তখন অস্ত্র-বলেই বিশ্বাসী সুতরাং 'নেহি' কথাটি প্রথম বাক্যাংশে (যোগসে হোগা নেহি) যোগ করিতে ইচ্ছা করিলাম। হেমচন্দ্রের লেখা মনে হইল 'হবে না হবে না খোল তরবার—এসব দৈত্য নহে তেমন।' কিন্তু শেষে বুঝিলাম, মিত্র মহাশয় নেহি শব্দটি পরবর্তী বাক্যাংশেই যোগ করিয়া উহাই বিশ্বাস করিতেছেন। কারণ পরে দেখিয়াছি —তিনি (মিত্র মহাশয়) যোগেই পূর্ণমাত্রায় আস্থাবান। তিনি কখনো বলিতেন —তপস্যালব্ধ শক্তিতেই ভারত উদ্ধার হইবে। একদিন কেমন করিয়া ভারত স্বাধীন হইতে পারে, আমি তাহার পন্থা,—পথের খুঁটিনাটি একটি চার্টের মত

করিয়া লিখিয়া মিত্র মহাশয়কে দেখাই, তাঁহারই আজ্ঞাক্রমে। তিনি উহা মনোযোগ সহকারে দেখিলেন। পরে একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন: "আশু, তুমি কি মনে কর পাশ্চাত্যজাতির কাছে বিজ্ঞান ও অস্ত্রাদিনির্মাণ শিখে রণনীতি শিখে তোমরা ইংরাজকে দেশ হতে তাড়াতে পারবে? আমি কিন্তু তা বিশ্বাস করিনা। একদিন তোমার বা তোমাদের মতো আমিও বিশ্বাস করতাম;—সে পথে চেষ্টাও করেছি, কিন্তু দিন দিন আমার মন থেকে সেভাব দূর হয়ে যাচ্ছে।' আমি তাঁহার এই কথায় বড়ই হতাশ হইলাম। তবে কি এত আশা ব্যর্থ হইবে? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে কোন্ উপায়ে ভারত উদ্ধার হইবে? মিত্র মহাশয় বলিলেন—হবে তপস্যায় —তপস্যার শক্তিতে। অর্জুনের জয় দ্রোণাচার্যের অস্ত্রশিক্ষায় হয় নি—হয়েছিল তপস্যালব্ধ পাশুপত অস্ত্রে। একজনের অটুট তপস্যায়ও ভারত উদ্ধার হতে পারে। আমার মনে হয়, কামান বন্দুক দিয়ে ইংরেজকে তাড়ানো যাবে না —যাবে না।" আমার বিশ্বাস হইল না—হতাশই হইলাম। কিন্তু তিনি তপস্যার শক্তির কথাই বলিতে লাগিলেন। বলিলেন: পুলিনকে তপস্যার দ্বারা পাশুপত অস্ত্রলাভের সম্ভাবনার কথা বলছিলুম। কিন্তু দেখলুম পুলিন (দাস) জপ-তপ-যোগ বিশ্বাস করে না। তাই তাকে বলি, "তোমার হাতে এতো ছেলে, তার মধ্য থেকে ২।১ জন ভাল ছেলে দাও। পুলিন ভূপেশ (নাগ) ও তোমার (আশু) নাম করে। ভূপেশ এসেছিল, কিন্তু দেখলাম তাকে দিয়ে এ কাজ হবে না। কিন্তু তোমাকে দিয়ে হতে পারে। তুমি চতুর্বর্গ জ্ঞানযোগ পেয়েছ। আমি পত্র দিয়ে দেবো—শ্রীগুরুদেব যাতে তোমাকে গুরুবীজ ও ব্রহ্মগায়ত্রী দিয়ে দেন। তুমি সেই আসনটি করতে থাক। এক বৎসর পরে, কোথায় কিভাবে সাধন করতে হবে, তোমাকে বলে দেবো। তোমাকেই একাজ করতে হবে।" ইহার পর যোগ্‌সে হোগা,—নেহি তরবারিসে হোগা—ইহাই যে মিত্র মহাশয় বিশ্বাস করিতেন—তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। আশুবাবু নিজেও পরবর্তীকালে এই বিশ্বাসেই—দেশোদ্ধারের জন্যই কঠোর যোগসাধন করিতে আরম্ভ করেন। আশুবাবু বলেন: গুরু পূর্ণানন্দ বলিতেন—"নিজেদের জ্ঞানাদি মনুষ্যত্ব বাড়াও—ওদের অত্যাচার ক্রোধ পশুত্ব বাড়তে দাও"। রবীন্দ্রনাথের উক্তি, 'বোঝাখানি ভারী হলে ডুব্‌বে তরীখান', 'ওরা ধর্ম যত দল্‌বে তত্তই ধূলায় ধ্বজা লুটবে' প্রভৃতি স্বতঃই মনে পড়িয়া যায়।

আশুবাবু আরও লিখিতেছেন: "একদিন মিত্র মহাশয় কথায় কথায় ভগ্নী নিবেদিতার কথা বলেন: নিবেদিতা আমার নিকট আসতেন। তিনি শুনেছিলেন অনুশীলন সমিতির উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা অর্জন।"

ভগ্নী নিবেদিতার প্রসঙ্গে মিত্র মহাশয় একদিন বলেন: নিবেদিতা একদিন আমাকে নিভৃতে বলেন "দেখুন কুরুক্ষেত্র দেখবার সাধ হলো—গেলাম। সারাদিন কুরুক্ষেত্র ময়দান ঘুরে ঘুরে দেখলাম। পরে আশ্রয় নিলাম এক কর্ণেলের বাংলায়। রাত্রিতে একখানা গীতা পড়তে পড়তে ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছি। রাত্র দুপুরে হঠাৎ জেগে যাই—কুরুক্ষেত্রের দিক থেকে একটা শব্দ আমার কানে আসতে লাগলো। সেই বজ্রগম্ভীর শব্দ সংস্কৃত শ্লোক বলে মনে হলো। ভাবলাম, স্বপ্ন দেখছি না তো,—চোখ দুটো রগ্‌ড়িয়ে উঠে বসলাম। আবার সেই বজ্রগম্ভীর শব্দ। তখন বেরিয়ে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরের দিকে ছুটলাম। সঙ্গে কেউ নেই, একাই ছুটছি। প্রান্তরের নিকটবর্তী হতেই স্পষ্ট শুনতে পেলাম গীতার সেই চতুর্থ অধ্যায়ের শ্লোকদুটি:

"যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

এই চারিটি লাইনই কেবল পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হচ্ছে। ভাবলাম, কে এই গভীর নিশীথে এই শ্লোক এখানে আবৃত্তি করছে। যেদিক থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম—তখন সেই দিকেই চললাম। প্রান্তরের কেন্দ্রের দিকে যতই যাই ততই যেন ঐ একই শ্লোক উচ্চারিত হতে শুনি। গুরুগম্ভীর অথচ অতীব সুস্পষ্ট।"—পরে নিবেদিতা আমাকে বলিলেন, "আপনি ওদিকে গেলে একবার কর্ণেলের বাংলায় যাবেন।—এ-ঘটনার পর থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সত্য, যুদ্ধক্ষেত্রে গীতা প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল এ সবই সত্য বলে বিশ্বাস হয়েছে আমার। শ্রীকৃষ্ণ যে সত্য তা স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রমাণ করে গেছেন।"

পি. মিত্র মহাশয় সম্পর্কে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি খুব স্বাস্থ্যবান ছিলেন। বিলাতে যান ব্যারিষ্টারী পড়িতে। সেখানে ভারতের

স্বাধীনতা লাভের আগ্রহ দেখা দেয়। সুরেন্দ্রনাথও তখন ওখানে ছিলেন। মিত্র মহাশয় স্থির করেন দেশে ফিরিয়া 'দল গড়বেন'। স্পেন ও ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধ বাধে। মিত্র মহাশয় ফরাসী গবর্ণমেণ্টের জনৈক কর্তৃপক্ষকে বলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য ভলাণ্টিয়ার নিযুক্ত হন। কিন্তু তখন সন্ধি হইয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া হইল না।

মিত্র মহাশয় সুরেন্দ্রনাথের পরামর্শে দেশে আসিয়া চাষীদের লইয়া এক বিরাট দল গঠন করেন। সুরেন্দ্রনাথ সে-দল (তাহারা লাঠিখেলা করিত) দেখিয়া খুব আশ্চর্য হন। পরে টাকার প্রশ্ন ওঠে। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠন করা হয়। কিন্তু মিত্র মহাশয়দের গোপন উদ্দেশ্য কিছুটা প্রকাশ পায়। ফলে তাঁহার বাবা তাঁহাকে আবার বিলাতে পাঠান। এইবার ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরেন। কিছুকাল পরে একটি অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন সাধুর (সন্ন্যাসীর) সাক্ষাৎ পান। তাঁহার কাছে দীক্ষা নেন। লাঠিখেলা শরীর-চর্চার জন্য দল গঠন করেন। ক্রমে গুরুর দীক্ষায় সাধন আরম্ভ করেন। বরিশালে মিত্র মহাশয় কিছুকাল আইন ব্যবসায় করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া একদা বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট গিয়াছিলেন। সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরমের প্রুফ্ দেখিতেছিলেন। প্রেসে পাঠাইবার সময় পুনঃ পুনঃ প্রেসের লোকটিকে বলেন, দেখো ভুল যেন থাকে না। মিত্র মহাশয়কে বলেন—'দেখো, এই গান থেকে ৩০ বৎসর পরে বিরাট আন্দোলন আরম্ভ হবে।' বঙ্কিম বাবুর নিবাস ও মিত্র মহাশয়ের পৈতৃক নিবাস কাছাকাছিই ছিল। বঙ্কিম বাবুর অনুশীলন তত্ত্ব হইতেই মিত্র মহাশয়ের সমিতির নামকরণ 'অনুশীলন' হইয়াছে ইহা শোনা গিয়াছে।

বিপ্লবী দল ও কংগ্রেস

১৯১৮ সালের মধ্যে অধিকাংশ বিপ্লবী নেতা ও কর্মীই কারারুদ্ধ হইলেন। কতক তখনো আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে ১৯১৯ সালে রাউলাট বিল লইয়া দেশে গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভকে সুনির্দিষ্ট পথে রূপ দিবার জন্য মহাত্মাজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস অগ্রসর হইয়া আসে। ক্রমে বাংলার বহু বিপ্লবী কংগ্রেসের মাধ্যমে গণ-সংযোগ সম্ভব মনে করিয়া এবং আন্দোলনে একটা সংগ্রামশীল মনোবৃত্তি দেখা দিতে পারে, ইহা চিন্তা করিয়া

কংগ্রেস অথবা শ্রমিক ও যুব আন্দোলনে যোগদান করেন। ইহারই ফলে ১৯১৯ সাল হইতে '২২ সাল পর্যন্ত অথবা বলা চলে শাঁখারিটোলা হত্যাকাণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত বিশেষ কোন বিপ্লবাত্মক কর্ম অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু এই সময়টাতে বিপ্লবীগণ ছাত্র ও যুব আন্দোলন এবং শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে দলগতভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এ সকল ক্ষেত্রেও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ছিল না।

এখানে উল্লেখ করা চলে, বাংলার বিপ্লবী দলগুলি কংগ্রেসে যোগদান করিলেও—উহাদের দলগত স্বাতন্ত্র্যের চেতনা পরিত্যক্ত হয় নাই। কংগ্রেস-নেতারা জনবল সংগ্রহ করিতে চাহিলে ইহাদেরই উপরে ভরসা করিতেন। বাংলার কংগ্রেসের কথা বলিতেছি। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বহুদিনের হইলেও উহার কোন দেশব্যাপী organisation বা সংস্থা ছিল না। একটা প্রতিষ্ঠান আছে কিন্তু উহার সংস্থা বা সমিতি গড়িয়া উঠে নাই, ইহা প্রতিষ্ঠানের শক্তির পরিচয় নয়—দুর্বলতারই পরিচয়। কিন্তু এদিকে বিপ্লবীদলের organisation বা সংস্থা ছিল, সংহতি ছিল, কর্মী ছিল এবং উহারই মাধ্যমে জনবল ছিল। মহাত্মা গান্ধীর ভারতে আগমন ও কংগ্রেসে যোগদান এবং তাঁহার কর্মনীতি কংগ্রেসের সমর্থক দলেরই শুধু সংখ্যা বৃদ্ধি করে না, সহরে সহরে ও পল্লীতে পল্লীতে কংগ্রেস সংগঠনও বিস্তৃত হয়। কিন্তু যেহেতু বাংলার বিপ্লবীরা ইতিপূর্বেই সহরে সহরে এবং পল্লীতে পল্লীতে বহু বিপ্লবীদল গড়িয়াছিল, যুবকদের সদস্য করিতেছিল, সেহেতু তাহাদের বাস্তব শক্তি ছিল। দেশের বহু পল্লীতে বিপ্লবীদের শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইলে—সংস্থার নামই মাত্র বদলায়, আসল রূপ বদলায় না। নাম হয়তো হইল পানাম বা আমীনপুর (ঢাকা জেলা) কংগ্রেস কমিটি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার কার্য পরিচালনা করেন বিপ্লবী সংস্থারই এককালের স্থানীয় সদস্যগণ। নূতন সদস্যরা নামে বা অনামে ঐ একই সংস্থার লোক হিসাবেই কংগ্রেসের কাজেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। অপর জেলার পল্লী ও মহকুমার ঐ একই অবস্থা। কংগ্রেস নির্দেশ বা নেতৃত্ব তাঁহারাও মানেন, কংগ্রেসের আহ্বানে আইন অমান্য করেন, জেলে যান, সবই করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দলগত আনুগত্য থাকে অর্থাৎ কর্মীদের বিশেষ সম্পর্ক থাকে বিপ্লবী দলের নেতৃত্বেরই সংগে। এই ভাবেই কংগ্রেসের শক্তি যেমন বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী

দলের কর্মীরা বাংলায় বৃদ্ধি করিয়াছে, তেমনি বিপ্লবীদলের স্বতন্ত্র সত্তার বিদ্যমানতার জন্য কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগত শক্তিরও লাঘব ঘটিয়াছে। বিপ্লবী দলের সংঘবদ্ধ বিরূপতা দেখা দিলে স্থানীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিকূলতা অতিক্রম করিতে পারে নাই। কারণ সাধারণভাবে কংগ্রেস জনপ্রিয় হইলেও বিপ্লবনিষ্ঠ কর্মীরা পল্লীতে পল্লীতে ছিলেন অধিকতর জনপ্রিয়। জনসাধারণ কংগ্রেসকে জনসেবার প্রতিষ্ঠান বলিয়াই গণ্য করিত, কংগ্রেস জনগণের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে মনে করিত; কিন্তু কংগ্রেসের সেই জনসেবার এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সেবক ও সৈনিক যে ঐ সকল বিপ্লবনিষ্ঠ কর্মী, জনগণের এই বিশ্বাস ছিল বদ্ধমূল। ইহারাই বাংলার বহু অঞ্চলে কংগ্রেসের প্রতিভূ রূপেই পরিচিত। নির্বাচনে কংগ্রেসের নাম বিকাইত বটে, কিন্তু জন-হাটে ঐ নাম বেচিতে হইলে বিক্রেতারূপে প্রয়োজন ছিল যুবক কর্মীর। সেই কর্মী ছাত্র ও যুবকদের অধিকাংশ ছিল কোন-না-কোন বিপ্লবী দলভুক্ত বা বিপ্লবীদের দ্বারা প্রভাবিত। তাই দেখা গিয়াছে কংগ্রেস-নির্বাচন ক্ষেত্রে বিপ্লবীসংস্থার প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। অন্য প্রদেশের অবস্থা এমন নহে। বাংলায় প্রায় প্রতি সহর ও মফঃস্বলেই ছিল কোন-না-কোন বিপ্লবী সংস্থা। কোন সহরে ও পল্লীতে একাধিক বিপ্লবী সংস্থার অস্তিত্ব ছিল। তাহাদের মধ্যে অনৈক্য থাকিলে তাহা কংগ্রেসেও আসিয়া পড়িয়াছে। এদিকে কংগ্রেসী নেতৃবর্গের নিজেদের সংস্থা না থাকায় এবং বাংলার ক্ষেত্রে তাহা ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিতে না পারায় কার্যক্ষেত্রে, নির্বাচনে ও প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানে কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহাদের বিপ্লবীদলের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। ইহা যেমন সত্য, তেমনি বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা না থাকায়, প্রকাশ্য আন্দোলনের নেতৃত্বের অভ্যাস না থাকায় এবং ব্যক্তিত্ব ও অর্থ-সম্পর্কিত প্রতিপত্তির অভাব-বোধ থাকায় ইহারা কোন-না-কোন কংগ্রেস নেতার সংগে 'বিশেষ সম্পর্ক' স্থাপনের প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন। ইহার ফলে বিপ্লবীদের শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

বক্তব্যের সমর্থনে

আমরা বলিয়াছি মহারাষ্ট্রে বা পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রয়াস থাকিলেও ছিল না বিপ্লববাদ; সে কারণে ঐ দুই দেশে ব্যক্তিবিশেষের বিপ্লবকর্মের গৌরব থাকা

সত্ত্বেও বাংলার বিপ্লব-প্রয়াসের মত ধারাবাহিকতা দেখা যায় নাই। ব্যক্তি-বিশেষের অন্তর্ধানে বা অদর্শনে সংস্থা ভাঙিয়া গিয়াছে।* কিন্তু বাংলায় বিপ্লব-প্রয়াস সুদীর্ঘ কাল চলিতে পারিয়াছে। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নোক্ত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক রাত্রিতে লেখকের কলিকাতার বাড়ীতে, পুরাতন মারাঠী বন্ধু ডাঃ এথলে (Dr. V. V. Athalye, A. V. P.—Saraswati Sadan—Satara City) লেখকের খোঁজে আসেন। এই সাক্ষাৎ ৪৪ বৎসর পরে। প্রথমটায় লেখক ঠিক চিনিতে পারেন না। ১৯০৯ সালে—১৭২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট—মহারাষ্ট্রীয় মেস—গণপতি উৎসব প্রভৃতির উল্লেখে ক্রমে সব কথাই স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠে। ১৯০৮-৯ সালে মহারাষ্ট্রীয় ছাত্র (কলিকাতায় ডাক্তারী পড়িতেন) জন কয়েকের সঙ্গে লেখকের যোগাযোগ ঘটে। Athalye, Pimputkar প্রভৃতি বিপ্লবী দলভুক্ত হন। সাতারায় বিপ্লবী দল গড়ার চেষ্টা করেন। ১৯১০ সালে গরমের ছুটিতে এথলে সাতারায় যান—কিছুকাল পরেই গ্রেফ্‌তার হন—সাতারা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামীরূপে। ১৯১০ সালের প্রথম ভাগে লেখকও ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হন। সাতারা মামলায় বিভিন্ন তিনটি ধারায় ডাঃ এথলের মোট ১৫ বৎসর সাজা হয়। ৫ বৎসর জেল ভোগ করিতে হয়। এই জেল ভোগের সময়কার কাহিনী অপূর্ব। ডাঃ এথলে বলেন : জেলে ভগবৎ-বাণী বা প্রত্যাদেশ লাভের

* ১৯০৬ সাল হইতে সাভারকরের বিদেশে বিপ্লব কর্ম-প্রয়াস,—ধিঙ্‌ড়ার কর্মকে তাঁহার সমর্থন—১৯০৯ সালে নাসিকের জ্যাকসন হত্যাকাণ্ডে (সাভারকরের প্রেরিত পিস্তলে উক্ত কাণ্ড হয়) তাঁহাকে আসামী করিয়া ভারতে আনার পথে জাহাজ হইতে পলায়নের চেষ্টা,—সাভারকরের ভ্রাতাদের দীর্ঘ মেয়াদ প্রভৃতি ঘটনা বীরত্বপূর্ণ। কিন্তু ১৯১০ সাল হইতে সাভারকরের সংস্থার আর কোন কার্যকরী পরিচয় নাই।

পাঞ্জাবেও তাই। হরদয়ালের দলের কর্মীরা রাসবিহারীর সঙ্গে মিলিত হইয়া যান। স্বতন্ত্র কোন বিপ্লবী সংস্থা দেখা যায় না। ভগৎ সিং সশস্ত্র স্বাধীনতার কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে—বাঙ্গালী বিপ্লবীদের সঙ্গেই মিলিত হন। পাঞ্জাবের অপর তরুণদেরও তাহাই করিতে হইয়াছে। বাংলার বিপ্লব-সাহিত্য ও দর্শন—বাংলার বিপ্লবীদের একেবারে ঘরছাড়া—স্বরাজ-সন্ন্যাসী করিয়াছিল—বাংলার যুবকগণের মধ্যে ব্যাপক প্রেরণা জাগাইয়াছিল—তাই, বাংলার বিপ্লব-প্রয়াসের ধারা রুদ্ধ হয় নাই। অন্যত্র গৌরবময় বীরত্ব ও ত্যাগ থাকিলেও সংস্থাগত ধারাবাহিকতা ছিল না।

জন্য সাধন আরম্ভ করেন। জেলে তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল লেখকের সন্ধান। ডাঃ এথলে বলেন: ১৯১৪ সালের শেষভাগে যারবেদা (পুনা) জেলে তিনি অনন্যচিত্ত হইয়া প্রার্থনা করেন—সত্য যাহা তাহা আবির্ভূত হউক—৭ দিনের মধ্যে যেন মিঃ গুহের (লেখকের) সন্ধান জানিতে পাই। এথলে বলেন: এখন মনে হইতে পারে ইহা পাগলামো—কিন্তু ঐ সময় ঐরূপ পাগলামোই আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।* একদিন-দুদিন করিয়া ৬ দিন চলিয়া গেল। সাত দিনের দিন জেলের এক কয়েদী (সে-ই জেলের কাজ বুঝিয়া নিত—সশ্রম কারাদণ্ড ছিল) আসিয়া এথলেকে অতি গোপনে জানায়—'একজন বাঙ্গালী বাবুকে একটা সেলে আনিয়া রাখিয়াছে। সাহেব লোক নিয়া আসে। কথা বলার হুকুম নাই।' এথলে এই সংবাদে যেন আকাশের চাঁদ পান—তবে আমার সাধনা সফল হইয়াছে! এই বাঙ্গালী বাবু নিশ্চয় মিঃ গুহ। এক টুকরা চটে পেন্সিলের শিস দিয়া লেখেন: N. K. Guha? বাঙ্গালী বাবুকে পূর্বোক্ত কয়েদী ঐ চটটুকু গোপনে দিতেই কয়েদীটি আকারে-ইঙ্গিতে লিখিবার বস্তু চাহে। এথলে পেন্সিলের শিস ও চটের টুকরা দেন। বাঙ্গালী বাবু লেখেন: 'No. But I know N. K. Guha.' এই বাঙ্গালী বাবু বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডিত আসামী যতীন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁহার বাড়ী যে দক্ষিণ পাইকৃসা (জেলা ঢাকা), ৪০ বৎসর পরেও এথলে তাহা স্মরণ রাখিয়াছেন। অতঃপর যতীন্দ্র ঘোষের নিকট হইতে লেখকের বাড়ীর ঠিকানা (বজ্রযোগিনী—ঢাকা) নেন। যারবেদা জেল হইতে মুক্ত হইয়া লেখকের বাড়ীর ঠিকানায় এথলে পত্র দেন। লেখকের অনুসন্ধান করেন। লেখক তখন জেলে রাজবন্দী। ইতিমধ্যে মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনে এথলে যোগ দেন। কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৪৭ সালে (দেশ স্বাধীন হইলে) বোম্বাইয়ের জনৈক বীমা ব্যবসায়ী প্রসঙ্গতঃ এথলেকে বলেন—একখানা বাংলা কাগজের সম্পাদকের নাম মিঃ গুহ। এই কাগজ ঢাকার 'সোনার বাংলা'। এথলে সোনার বাংলার ঢাকার ঠিকানায় পত্র দেন। সেই পত্র কলিকাতায় লেখকের নিকট পাঠানো হয়

* ডাঃ এথলে তাঁহার 'Life Enduring' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এথলে কারাগারে 'Offerings To Bliss' কবিতা পুস্তক লেখেন—অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে দুইবার কারাবরণ করেন।

বটে, কিন্তু কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় (Great killing) অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে ঐ পত্রও খোয়া যায়। অতঃপর এথলে ১৯৫৩ সালে চেষ্টা করেন। বোম্বাইতে একজন বাঙ্গালী মহিলাকে প্রশ্ন করেন—একজন বাঙ্গালী বিপ্লবী—মিঃ গুহ, তাঁর বিষয় কিছু জানেন কিনা। উক্ত মহিলা বিখ্যাত দেশকর্মী প্রভাত গাঙ্গুলীকে চিনিতেন। এথলেকে তাঁহার কথা বলেন এবং বলেন—তিনি হয়তো মিঃ গুহের সন্ধান দিতে পারেন। এথলে সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে কংগ্রেস আফিসে গিয়া প্রভাত গাঙ্গুলীর খোঁজ করেন। প্রভাত বাবুর কর্মস্থলে গিয়া শুনেন—তিনি কলিকাতায় নাই। প্রভাত বাবুর বাড়ীতে যান। প্রভাত বাবুর ছেলে সব কথা শুনিয়া বলেন—পুরাতন বিপ্লবী অতুলকৃষ্ণ ও অমরকৃষ্ণ ঘোষ নিকটেই থাকেন, তাঁহারা মিঃ গুহের ঠিকানা জানিতে পারেন। এথলে অমরকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া লেখকের বিষয় বলিতে, অমর বাবু বলেন: তিনি 'আনন্দবাজারে' আছেন। এথলে আনন্দবাজার অফিসে গিয়া লেখকের বাড়ীর ঠিকানা (লেখক অসুস্থতাবশতঃ বাড়ীতেই ছিলেন) সংগ্রহ করিয়া রাত্রিতে লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন—৪৪ বৎসর পরে। কত কথাই হইল। লেখক কৌতুহলী হইয়া ডাঃ এথলেকে প্রশ্ন করেন: ১৯১৪ সাল হইতে এবং ১৯১৫ সালে কারামুক্ত হইয়া লেখককে এই যে সন্ধান করিতেছিলেন তাহার হেতু কি? ডাঃ এথলে বলেন: ১৯০৯ সালে বাংলার বিপ্লবী দলে তিনি যুক্ত হন লেখকের মাধ্যমে। সহসা সেই সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। সাতারায় তাঁহাদের প্রয়াস অঙ্কুরেই ব্যর্থ হয়। লেখক প্রশ্ন করেন: বেশ তো বাংলার যোগাযোগ না হয় ছিন্ন হইল—কিন্তু পুনা বা বোম্বাইয়ের বিপ্লব-সংস্থার খোঁজ তিনি করিতে পারিতেন। এথলে বলেন: তাহার কোন সুযোগ ছিল না। সাভারকারের দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বিপ্লবের প্রসঙ্গও ওখানে কেহ করিতেন না। তাই বিপ্লবী হিসাবে কি করা উচিত, তাহা জানিতেই—লেখককে সন্ধান করিতেছিলেন।

একটি গোপন কথা

সুভাষবাবু কলিকাতা করপোরেশনের চীফ্ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মেয়র। সুভাষবাবু যখন করপোরেশনের পুঞ্জীভূত গলদ

দূর করার কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া তাহাতেই ডুবিয়া আছেন, তখন সহসা একদিন সুভাষবাবুকে বিনা বিচারে আটক রাখার জন্য গ্রেফ্‌তার করা হইল। বাংলার বিপ্লবীদের জরুরী আইনে ধরিয়া গোপন ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বিনা বিচারে আটক রাখিলে দেশের সংবাদপত্রে বিনা বিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে যতই লেখালেখি হউক না কেন, ব্যাপারটা ইহাদের বেলায় দেশবাসীর কতকটা গা'-সহা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সুভাষবাবু প্রকাশ্য কংগ্রেস আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; সহসা তাঁহাকে গোপন ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আটক করা কেন? করপোরেশনের কার্যে সুভাষচন্দ্রের কৃতিত্বই আমলাতন্ত্রের চক্ষুশূল হইয়াছে —এই কথা তখন দেশে অনেকেই বলাবলি করিত। সুভাষবাবুকে আটক রাখার কারণ একাধিক হইতে পারে। তবে, সুভাষচন্দ্র এই সম্পর্কে একটি গোপন কথা বলেন মান্দালয় জেলে, বিপ্লবী কর্মীদের নিকট:—একদা দেশবন্ধুর নিকট একজন জার্মান সাহেব আসিয়া দেখা করেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতাদের সংগ্রামের প্রশংসা করিয়া তিনি প্রস্তাব করেন যে, শ'চারেক রিভলবার দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করিতে পারেন। দেশবন্ধু লোকটিকে উত্তরে বলেন, 'আমি এ-সবের মধ্যে নেই; তবে তুমি এ-বিষয় নিয়ে সুভাষ-সত্যেনের সঙ্গে আলাপ করতে পার'। লোকটি যথাসময়ে, সময় ঠিক করিয়া সুভাষবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁহারা তথাকথিত জার্মান বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করার পর এবং অন্য সূত্রেও টের পান যে, লোকটি বৃটিশ-স্পাই। লোকটিকে বিদায় দিয়া পরে সুভাষচন্দ্র চিত্তরঞ্জনকে বলেন, 'আপনি এ কি করিয়াছেন? ঐ লোকটা যে বৃটিশ-স্পাই!' দেশবন্ধু তখন তাঁহার ভুল বুঝিলেন এবং লজ্জিত হইয়া বলিলেন—'তাই তো, আমি লোকটাকে genuine মনে করিয়াছি—international arms smuggler মনে করিয়াছি। ভাবিলাম, তোমরা তো ও সবের মধ্যে কিছু কিছু থাক—একেবারে তাড়াইয়া দেই কেন—যদি তোমাদের কোন কাজে লাগে।' দেশবন্ধু বৃটিশ-স্পাইটিকে সুভাষ ও সত্যেন্দ্রের কথা বলায় গভর্ণমেণ্ট সুভাষবাবু সম্পর্কে অধিকতর সাবধান হইয়া থাকিবেন। সুভাষবাবুকে যখন গ্রেফ্‌তার করে তখন সম্ভবতঃ চিত্তরঞ্জন শিলংএ ছিলেন। গ্রেফ্‌তারের সংবাদ শুনিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠেন। দেশবন্ধুর মনে এই অনুশোচনাও থাকিতে পারে যে, তিনি যে বৃটিশ-স্পাইটিকে সুভাষের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, সেই হয়তো সুভাষচন্দ্রের গ্রেফ্‌তারের কারণ। দেশবন্ধু

করপোরেশনের সভায় ক্ষোভে-দুঃখে সিংহগর্জনে প্রিয় সুভাষচন্দ্রের গ্রেফ্‌তার প্রসঙ্গে বলেন, "If love of country is a crime, I am a criminal. If the Chief Executive Officer is a criminal, then I declare that the Mayor is also a criminal." "দেশকে ভালবাসা যদি হয় অপরাধ, আমি অপরাধী। যদি চীফ্‌ একজিকিউটিভ্‌ অফিসার অপরাধী তাহা হইলে মেয়রও অপরাধী।" পুত্রাধিক স্নেহভাজন সুভাষচন্দ্রের সকল কর্মের দায়িত্ব ও অংশ আদর্শ নেতা দেশবন্ধু এইভাবেই গ্রহণ করেন।